# আসহাবে রাসূলের জীবনকথা

৫

মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ

# আসহাবে রাসূলের জীবনকথা

## [পঞ্চম খণ্ড]

[উম্মাহাতুল মু'মিনীন]

মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ. কে. এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
ঢাকা-১০০০

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN 984-31-0707-1 set

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯৯
দ্বিতীয় প্রকাশ : অকটোবর ২০০৩
তৃতীয় প্রকাশ : রবিউল আউয়াল ১৪২৭
বৈশাখ ১৪১৩
এপ্রিল ২০০৬

প্রচ্ছদ
সরদার জয়নুল আবেদীন

মুদ্রণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

**নির্ধারিত মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র**

---

**Ashabe Rasuler Jiban Katha** (Vol. V) Written by Muhammad Abdul Mabud Published by AKM Nazir Ahmalld Director Bangladesh Islamic Centre Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 First Edition December 1999 Third Edition April 2006 Price Taka 150.00 only.

## সূচীপত্র


- ভূমিকা ॥ ৫

১. হযরত খাদীজা বিন্‌ত খুওয়াইলিদ (রা) ॥ ১১
২. হযরত সাওদা বিন্‌ত যাম'আ (রা) ॥ ৪০
৩. হযরত 'আয়িশা বিন্‌ত আবী বকর (রা) ॥ ৫৩
৪. হযরত হাফসা বিন্‌ত 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ॥ ১৯৬
৫. হযরত যায়নাব বিন্‌ত খুযায়মা (রা) ॥ ২১০
৬. হযরত উম্মু সালামা (রা) ॥ ২১৩
৭. হযরত যায়নাব বিন্‌ত জাহাশ (রা) ॥ ২৩৪
৮. হযরত জুওয়াইরিয়া বিন্‌ত হারিস (রা) ॥ ২৫২
৯. হযরত উম্মু হাবীবা বিন্‌ত আবী সুফইয়ান (রা) ॥ ২৫৯
১০. হযরত মায়মুনা বিন্‌ত হারিস (রা) ॥ ২৬৭
১১. হযরত সাফিয়্যা বিন্‌ত হুয়ায় ইবন আখতাব (রা) ॥ ২৭২

- গ্রন্থপঞ্জি ॥ ২৮১

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

আল্লাহ্‌ পাকের বিশেষ মেহেরবানীতে 'আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, ৫ম খণ্ড' প্রকাশিত হচ্ছে। অল্প কথায় বাংলাভাষী পাঠকদের নিকট সাহাবায়ে কিরামের (রা) পরিচয় তুলে ধরাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। ইতিপূর্বে প্রকাশিত চারটি খণ্ডে পুরুষ সাহাবীদের জীবনকথা আমরা আলোচনা করেছি। ৫ম খণ্ডে এগারোজন 'উম্মাহাতুল মুমিনীন' এর জীবনকথা আলোচনা করা হয়েছে। এ এগারো জন ছিলেন হযরত রাসূলে কারীমের (সা) 'আযওয়াজে মুতাহ্‌হারাত' বা পূতঃপবিত্র সহধর্মিণী।

ইসলামে পুরুষ ও নারীকে সমান দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। উভয়ের সমান দায়িত্ব ও সমান অধিকার ঘোষিত হয়েছে। এ বিশ্বে ইসলামের প্রচার-প্রতিষ্ঠায় পুরুষের যেমন ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অবদান রয়েছে, তেমনি আছে নারীরও। পুরুষরা যেমন জুলুম-অত্যাচারের শিকার হয়েছেন, জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছেন, নারীরাও তেমনি জুলুম অত্যাচার সহ্য করেছেন, দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নারীরা ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। মোটকথা, এ বিশ্বে ইসলামকে বিজয়ী করতে মহিলা সাহাবীরা কোন অংশে পুরুষ সাহাবীদের থেকে পিছিয়ে থাকেননি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা প্রধান হয়ে উঠেছে। রাসূলুল্লাহর (সা) নুবুওয়াত ও রিসালাতের উপর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছেন একজন নারী, সর্বপ্রথম সালাত আদায় করেছেন একজন নারী। ইসলামের জন্য নারীর অবদান পুরুষের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তাই আমরা পুরুষ সাহাবীদের পাশাপাশি মহিলা সাহাবীদের জীবন ও কর্মের কথা পাঠকদের কাছে তুলে ধরার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

আরবী ভাষায় রচিত 'আসমা আর-রিজাল' (চরিত-অভিধান) শাস্ত্রের প্রায় সকল গ্রন্থে মহিলা সাহাবীদের পরিচয় ও জীবনকথা আলোচিত হয়েছে। ইবন মুন্দাহ্‌ (হিঃ ৩৯৫), আবু নু'আইম, ইবন 'আবদিল বার (হিঃ ৪৬৩), আবু মূসা ইসফাহানী (হিঃ ৫৮১) প্রত্যেকেই নিজ নিজ গ্রন্থে মহিলা সাহাবীদের জীবনী আলোচনা করেছেন। ইবন 'আবদিল বার তাঁর *'আল ইসতী'আব'* গ্রন্থে মোট ৩৯৮ জন মহিলা সাহাবীর জীবনী আলোচনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবন সা'দের (হিঃ ২৩০) *'আত-তাবাকাত আল-কুবরা'* গ্রন্থে মোট ৬২৭ জন মহিলার জীবনী এসেছে। তার মধ্যে ৯৩ জন সাহাবী নন এমন মহিলাও আছেন। তাঁর গ্রন্থের ৮ম খণ্ডে মহিলাদের জীবনী সন্নিবেশিত হয়েছে।

আল্লামা ইবনুল আসীর *'তারিখ আন-নিসা'* শিরোনামে মহিলাদের জীবনীর উপর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তীকালে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে এ নামটি পাওয়া যায়। তবে বর্তমানে গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য। ইবনুল আসীরের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *'উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা'*। এর একটি খণ্ডে শুধু মহিলাদের জীবনকথা এসেছে। এ গ্রন্থে মোট ১০২২ জন মহিলা সাহাবীর নাম পাওয়া যায়। হিজরী নবম শতকের আরেকজন

বিখ্যাত লেখক আল্লামা ইবন হাজার আল-আসকিলানী (হিঃ ৮৫২)। তিনি *'তাহজীবুত তাহজীব'* ও *'আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা'* নামে দুইখানি বৃহদাকৃতির গ্রন্থ রচনা করেন। *'তাহজীবুত তাহজীব'*-এর ১২তম খণ্ডে ৩২২ জন মহিলার জীবনী আলোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু মহিলা তাবে'ঈর জীবনীও আছে। তবে *'আল-ইসাবা'* গ্রন্থে ১৫৪৫ জন মহিলা সাহাবীর জীবনকথা স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থেই সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মহিলা সাহাবীর নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়। তবে উপরে বিভিন্ন গ্রন্থের মহিলা সাহাবীদের যে সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে অনেক নামের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। ইমাম আজ-জাহাবীর (হিঃ ৭৪৮) *'সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'* ও *'তাজকিরাতুল হুফফাজ'*– দুইখানি বড় আকারের গ্রন্থ। তাতে তিনি বহু মহিলা সাহাবীর জীবনী সন্নিবেশ করেছেন। উল্লেখিত গ্রন্থগুলিই মূলতঃ সাহাবীদের উপর রচিত মৌলিক গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থগুলির সবই আমাদের সামনে রয়েছে।

হযরত রাসূলে কারীমকে (সা) যাঁরা ঘরের জীবনে সার্বিকভাবে সাহায্য করেছেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) পারিবারিক জীবনের আদর্শের কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁরা হলেন—'আযওয়াজে মুতাহ্হারাত'। আল্লাহ পাক তাঁদেরকে 'উম্মাহাতুল মুমিনীন' (ঈমানদারদের মা) বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁরা মুসলিম নারীদের মডেল বা আদর্শ। ৫ম খণ্ডে আমরা তাঁদের কথাই আলোচনা করেছি। তাঁদের সংখ্যা মোট এগারো জন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন পৃথিবী থেকে বিদায় নেন তখন তাঁদের সংখ্যা ছিল নয়।

বর্তমান সময়ে আমরা মুসলমানরা যখন পাশ্চাত্য জীবন দর্শন দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত এবং ইসলামের 'আকীদা-বিশ্বাস, কৃষ্টি-কালচার, আইন-কানুন ইত্যাদি সবই তাদের দৃষ্টি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করছি, বিশেষতঃ নারী স্বাধীনতা ও প্রগতির নামে ইসলাম বিরোধী যে কর্মতৎপরতা প্রবল বেগে বয়ে চলেছে তখন রাসূলুল্লাহর (সা) একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বিষয়টি একজন ঈমানদারের মনেও প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। আমরা সে প্রশ্নের জবাব দানের চেষ্টা এখানে করবোনা। কারণ, এ প্রশ্ন নতুন নয়, বরং খ্রীস্টান-ইহুদীরা তা বহুকাল আগেই উত্থাপন করেছে এবং মুসলিম মনীষীরা যুগে যুগে নানাভাবে তাদের জবাব দিয়ে এসেছেন। আমরা আর তার পুনরাবৃত্তি করতে চাইনে।

আমরা আমাদের পাঠকদেরকে যে কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তা হলো, একজন সত্যিকার মুমিনের অবশ্যই এ বিশ্বাস থাকতে হবে যে, রাসূলুল্লাহর (সা) গোটা জীবন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত ছিল। নিজের ইচ্ছায় তিনি কিছুই করতেন না বা বলতেন না। সুতরাং তিনি যে বিয়েগুলি করেছেন তা সবই আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশে করেছেন। দ্বিতীয়তঃ খ্রীষ্টান-ইহুদীদের প্রচার-প্রপাগাণ্ডায় যে প্রশ্ন আমাদের মনে দেখা দেয়, সেই রকম কোন প্রশ্ন কি কোন পুরুষ বা মহিলা সাহাবীর মনে কখনও দেখা দিয়েছিল? ইতিহাস অন্তত সে কথা বলে না। তাহলে আমরা আজ কেন বিভ্রান্ত হবো? আসলে এ জগতের সকল সৃষ্টির মালিক একমাত্র আল্লাহ। একজন মালিকের অধিকার আছে তার মালিকানাধীন বস্তু যাকে এবং যত পরিমাণ খুশী দান করার। সে

ক্ষেত্রে যেমন কারও কোন প্রশ্ন করার অধিকার থাকে না, এ ক্ষেত্রেও তাই। আল্লাহ্ তাঁর নবীকে (সা) এগারো জন স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দান করেছেন, যেমন একজন মুমিন পুরুষকে শর্তসাপেক্ষে চার স্ত্রী গ্রহণের সুযোগ রেখেছেন। এটাই ছিল আল্লাহর হিকমাত। মূলত এ সবই ঈমানের ব্যাপার। আমাদের ঈমান হতে হবে সাহাবায়ে কিরামের ঈমানের মত। আল্লাহর রাসূলের (সা) যাবতীয় কর্ম ও আচরণ আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতিতে হয়েছে—এ বিশ্বাস শক্ত হলে কোন সংশয়, কোন অবান্তর প্রশ্ন অন্তর মাঝে উঁকি দিতে পারে না। যেমন পারেনি সাহাবায়ে কিরামের (রা) মনে।

রাসূলুল্লাহর (সা) বেগমগণ যেদিন থেকে তাঁর সাথে বিয়ের বাঁধনে আবদ্ধ হন এবং আল্লাহ তাঁদেরকে মুমিন বা বিশ্বাসীদের মা বলে ঘোষণা দেন সেদিন থেকেই জগতের সকল মুসলমানের অন্তরে এক বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের আসন তাঁরা লাভ করেছেন। প্রতিটি মুসলিম নর-নারী নিজের মায়ের থেকেও বেশী সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাঁদেরকে দেখে এসেছেন। মুসলিম উম্মার নিকট থেকে তাঁরা যে মর্যাদার আসন লাভ করেছেন, বিশ্বের নারী জাতির ইতিহাসে তার দ্বিতীয় কোন নজীর নেই।

রাসূলুল্লাহর (সা) এক বেগমের ইনতিকাল হলে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাস (রা) সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। লোকেরা প্রশ্ন করলো, আপনি এ সময় সিজদা করছেন কেন? বললেন ঃ 'যখন কিয়ামতের কোন নিদর্শন দেখ তখন তোমরা সিজদা করে থাক। তাহলে আযওয়াজে মুতাহ্হারাত-এর মৃত্যুর চেয়ে কিয়ামতের বড় নিদর্শন আর কী হতে পারে?' (আবু দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত, বাবুস সুজূদ ইনদাল আয়াত।)

মক্কার অদূরে 'সারাফ' নামক স্থানে হযরত মায়মূনার (রা) ইনতিকালের সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) উপস্থিত ছিলেন। লাশ খাটিয়ায় উঠানোর সময় তিনি লোকদের বলেন ঃ 'ইনি মায়মূনা, তাঁর লাশ আদবের সাথে উঠাবে, বেশী নাড়াচাড়া করবে না।' (নাসাঈ ঃ কিতাবুন নিকাহ, জিকরু আমরি রাসূলিল্লাহ্ সা. ফিন-নিকাহ ওয়া আযওয়াজিহি)

কোন কোন সাহাবী আযওয়াজে মুতাহ্হারাতকে এত বেশী পরিমাণ ভালোবাসতেন যে, তাঁদের জন্য নিজের অনেক বিষয় সম্পত্তি ওয়াক্ফ করে দিয়েছেন। হযরত আবদুর রহমান ইবন 'আউফ (রা) তাঁদের জন্য একটি বড় বাগিচা ওয়াক্ফ করেন, যা চার হাজার দিরহামে বিক্রি করা হয়েছিল। (তিরমিযী ঃ মানাকিবু আবদির রহমান ইবন আউফ)

খুলাফায়ে রাশেদুন-এর প্রত্যেক খলীফা 'আযওয়াজে মুতাহ্হারাত'-এর খুবই সমাদর ও সম্মান করতেন। হযরত 'উমার (রা) তাঁর খিলাফতকালে তাঁদের সংখ্যা অনুযায়ী নয়টি পিয়ালা বানিয়েছিলেন। কোন ফল বা কোন খাবার জিনিস যখন তাঁর নিকট আসতো তখন নয়টি পিয়ালা করে তাঁদের প্রত্যেকের নিকট পাঠাতেন। (মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ঃ কিতাবুয যাকাত)

উটের যুদ্ধের সময় হযরত আলী (রা) সহ অন্যান্য সাহাবী জনতা উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করেছেন, ইতিহাসের কোথাও কি তার তুলনা পাওয়া যায়?

হযরত যায়িদ ইবন হারিসার (রা) সাথে বিয়ে হয় হযরত যায়নাব বিন্‌ত জাহাশের (রা)। প্রায় বছর খানেক তাঁরা একসাথে ঘর করেন। বনিবনা না হওয়ায় ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। 'ইদ্দত' শেষ হওয়ার পর রাসূল (সা) সেই যায়িদকেই পাঠালেন যায়নাবের (রা) কাছে বিয়ের পয়গাম দিয়ে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা) যায়নাবকে (রা) বিয়ের পয়গাম পাঠিয়েছেন, তাই যায়িদের অন্তরে যায়নাবের (রা) প্রতি এত বেশী ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমবোধ সৃষ্টি হয় যে, তিনি যায়নাবের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই পারেননি। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে তাঁর সাথে কথা বলেন। এসব অলীক কোন কিস্‌সা-কাহিনী নয়, সবই বাস্তব সত্য।

হিজরী ২৩ সনে যখন খলীফা 'উমার (রা) 'আমীরুল হাজ্জ' হিসেবে হজ্জে যান তখন অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে 'আযওয়াজে মুতাহ্‌হারাত'কেও সফরসঙ্গী করেন। হযরত 'উসমান (রা) ও হযরত আবদুর রহমান ইবন 'আউফের (রা) উপর তাঁদের নিরাপত্তা ও দেখাশুনার সার্বিক দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাঁরা দুইজন 'আযওয়াজে মুতাহ্‌হারাতে'র বাহনের আগে পিছে চলতেন, কাউকে তাঁদের কাছে ঘেঁষতে দিতেন না। যখন কোথাও যাত্রাবিরতি করতেন, কাউকে তাঁদের তাঁবুর ধারে কাছে আসতে দিতেন না। (তাবাকাত ঃ আবদুর রহমান ইবন আউফের জীবনী)

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর উম্মাহাতুল মুমিনীনের অনেকে দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। মুসলিম উম্মাহ যে তাঁদেরকে কী পরিমাণ সম্মান ও শ্রদ্ধা করেছে তা আমরা তাঁদের জীবনীতে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। মোটকথা, তাঁদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানো একজন মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য। মুসলিম উম্মাহ কোনকালেই সে দায়িত্ব ও কর্তব্য বিস্মৃত হয়নি। আমরাও যখন তাঁদের জীবনী পাঠ করবো, তখন আমাদের অন্তরেও তাঁদের সম্পর্কে একটা পবিত্র চিন্তা ও ভাব বজায় রাখবো।

আসহাবে রাসূলের জীবনকথা বাংলাভাষী পাঠকদের নিকট তুলে ধরার চিন্তা ও পরিকল্পনা মূলতঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার-এর পরিচালক অধ্যাপক নাজির আহমদ সাহেবের। তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহ এ কাজ এতদূর এগিয়ে আনতে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। নানাভাবে তিনি আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে চলেছেন। এ জন্য আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই এবং দু'আ করি আল্লাহ যেন তাঁকে এর ভালো প্রতিদান দেন।

সাহাবীদের জীবনকথা লেখার ব্যাপারে পাঠকদের নিকট থেকেও অনেক মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ পাওয়া গেছে। অনেক পরামর্শ আমরা গ্রহণ করতে পারিনি বলে দুঃখিত। এ গ্রন্থের তথ্যসমূহ আরবী-উর্দূর নির্ভরযোগ্য সূত্রসমূহ থেকে গ্রহণ করার

চেষ্টা করেছি। উম্মাহাতুল মুমিনীন-এর সুউচ্চ সম্মান ও মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে যথাযথ ভাষা ব্যবহারেরও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও যদি তথ্য ও ভাষাগত কোন অসংগতি পাঠকদের নিকট ধরা পড়ে তাহলে তা আমার দৃষ্টিগোচর করার জন্য অনুরোধ করছি। বাংলার মুসলিম মা-বোনদের উপর 'উম্মাহাতুল মুমিনীন'-এর বিশ্বাস ও কর্মের ছাপ পড়বে—এই আশা নিয়ে আমরা কাজ করে যাব।

আল্লাহ পাক আমাদের এ শ্রমটুকু কবুল করুন। আমীন ॥

৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯
২১ ভাদ্র ১৪০৬

মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ
সহযোগী অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

# খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ (রা)

রাসূলুল্লাহর (সা) প্রথমা স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা)। তাঁর ডাকনাম 'উম্মু হিন্দা' ও 'উম্মুল কাসিম'[১] এবং উপাধি বা লকব 'তাহিরা'। পিতা খুওয়াইলিদ ইবন আসাদ মক্কার কুরাইশ খান্দানের বনু আসাদ শাখার সন্তান। পিতৃ-বংশের উর্ধপুরুষ 'কুসাঈ'-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সা) নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে।[২] অর্থাৎ খাদীজা বিন্‌ত খুওয়াইলিদ ইবন আসাদ ইবন 'আবদুল 'উয্‌যা ইবন কুসাঈ। এই 'কুসাঈ' রাসূলুল্লাহরও (সা) ৪র্থ উর্ধতন পুরুষ। হযরত খাদীজার (রা) মাতা ফাতিমা বিন্‌ত যায়িদও ছিলেন কুরাইশ বংশীয়া।[৩] যুবাইর ইবন বাক্‌কার বলেন ঃ জাহিলী যুগেই খাদীজার লকব ছিল 'আত-তাহিরা'। বয়স ও বুদ্ধি হওয়ার পর পুতঃপবিত্র চরিত্রের জন্য এ লকব পান।[৪] রাসূলুল্লাহ (সা) ও হযরত খাদীজার (রা) মধ্যে ফুফু-ভাতিজার দূর-সম্পর্ক ছিল। এ কারণে, নুবুওয়াত লাভের পর হযরত খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবন নাওফিলের কাছে নিয়ে গিয়ে বলেন, 'আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। সম্ভবত বংশগত সম্পর্কের ভিত্তিতেই তিনি একথা বলেছিলেন।

হযরত খাদীজার (রা) পরিবারটি ছিল মক্কার এক অভিজাত ও বিত্তবান পরিবার। তাঁর জন্ম হয় 'আমুল ফীল' (হাতীর বছর)-এর ১৫ বছর পূর্বে, মুতাবেক হিঃ পূঃ ৬৮/ খ্রীঃ ৫৫৬ সনে মক্কা নগরীতে।[৫] হাকীম ইবন হিযাম বলেন, আমার ফুফু খাদীজা আমার চেয়ে দুই বছরের বড়। আমার জন্ম হাতীর বছরের তেরো বছর আগে।[৬]

হযরত খাদীজার (রা) পিতা খুওয়াইলিদ ইবন আসাদ নিজ খান্দানের একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মক্কায় এসে চাচাতো ভাই আবদুদ দার ইবন কুসাঈ-এর হালীফ বা চুক্তিবদ্ধ হয়ে স্থায়ী আবাস গড়ে তোলেন। এখানেই মক্কার মেয়ে ফাতিমা বিন্‌ত যায়িদকে বিয়ে করেন।[৭] এই ফাতিমা উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজার জননী। খুওয়াইলিদ ছিলেন ফিজার যুদ্ধে নিজ গোত্রের কমাণ্ডার। তিনি ছিলেন বহু সন্তানের জনক। প্রথম পুত্র হিযাম, এই হিযামের পুত্র প্রখ্যাত সাহাবী হাকীম জাহিলী যুগে মক্কার 'দারুন নাদওয়া'র পরিচালনভার লাভ করেছিলেন। দ্বিতীয় সন্তান খাদীজা (রা)। তৃতীয় সন্তান 'আওয়াম' প্রখ্যাত সাহাবী হযরত যুবাইরের (রা) পিতা। রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু এবং হযরত হামযার (রা) আপন বোন হযরত সাফিয়্যা বিন্‌ত আবদিল মুত্তালিব ছিলেন

---

১ সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১০৯

২ আজ-জাহাবী ঃ তারীখুল ইসলাম-১/৪১; তাবাকাত-৮/৫২

৩ আল-ইসাবা ৪/২৮১: তাবাকাত-১/১৩৩

৪ সিয়ারু আ'লাম আন নুবালা-২/১১১

৫ আল-আ'লাম ২/৩৪২; তাবাকাত-১/১৩২

৬ আনসাবুল আশরাফ-১/৯৯; আল ইসাবা-৪/২৮২

৭ সিয়ারুস সাহাবিয়াত-১; তাবাকাত-৮/১

আওয়ামের স্ত্রী তথা যুবাইরের (রা) মা। অর্থাৎ খাদীজার (রা) ছোট ভাই-বউ। চতুর্থ সন্তান হালা। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) মেয়ে হযরত যায়নাবের (রা) শ্বাশুড়ী, তথা আবুল 'আস ইবন রাবী'র মা। আবুল 'আস রাসূলুল্লাহর (সা) বড় জামাই। পঞ্চম সন্তান রুকাইয়া। তাছাড়া, বালাজুরী খালিদা ও রাকীকা নাম্নী তাঁর আরও দুই মেয়ের নাম উল্লেখ করেছেন। খালিদার বিয়ে হয় 'ইলাজ ইবন আবী সালামার সাথে, আর রাকীকার বিয়ে হয় আবদুল্লাহ ইবন বিজাদের সাথে।[৮] হযরত খাদীজার ভাই-বোনদের মধ্যে একমাত্র হালা (রা) ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

হযরত খাদীজার (রা) বাল্য ও কৈশোর জীবনের তেমন কোন তথ্য সীরাতের গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায় না। তবে সেই জাহিলী সমাজে তিনি যে অতি পুতঃপবিত্র স্বভাব-বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেড়ে উঠেছিলেন সে কথা বিভিন্নভাবে জানা যায়। পিতা খুওয়াইলিদ মেয়ের এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে তৎকালীন আরবের বিশিষ্ট তাওরাত ও ইনজীল বিশেষজ্ঞ ওয়ারাকা ইবন নাওফিলকে তাঁর বর নির্বাচন করেছিলেন,[৯] কিন্তু কেন যে সে বিয়ে হয়নি সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা নীরব। শেষ পর্যন্ত আবু হালা হিন্দা ইবন যুরারা আত-তামীমীর সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়। জাহিলী যুগেই তাঁর মৃত্যু হয়। আবু হালার মৃত্যুর পর 'আতীক ইবন আবিদ, মতান্তরে 'আয়িজ-এর সাথে দ্বিতীয় বিয়ে হয়। এ কথা বলেছেন ইবন আবদিল বারসহ অধিকাংশ সীরাত বিশেষজ্ঞ।[১০] তবে কাতাদার সূত্রে জানা যায়, তাঁর প্রথম স্বামী 'আতীক, অতঃপর আবু হালা। ইবন ইসহাকও এ মত পোষণ করেছেন বলে ইউনুস ইবন বুকাইর বর্ণনা করেছেন।[১১] বালাজুরী বলেছেন, দ্বিতীয় স্বামী 'আতীকের সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তারপর রাসূলুল্লাহকে (সা) বিয়ে করেন।[১২]

হযরত খাদীজার (রা) পিতা কখন মারা যান, সে সম্পর্কে সীরাতের গ্রন্থাবলীতে দুই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর বিয়ের সময় পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন এবং বিয়ের পর কোন এক সময় মারা যান।[১৩] কেউ কেউ বলেছেন ফিজার[১৪] যুদ্ধে তিনি মারা যান।[১৫] ঐতিহাসিক আল-ওয়াকিদী বর্ণনা করেছেন, খাদীজার (রা) পিতা ফিজার যুদ্ধের পূর্বে মারা যান এবং তাঁর চাচা আমর ইবন আসাদ

---

৮. আনসাবুল আশরাফ-১/৪০৬
৯. প্রাগুক্ত-১/৪০৭: আল-ইসাবা-৪/২৮২
১০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/১১১: আজ-জাহাবী ঃ তারীখ-১/১৪০
১১. আল-ইসাবা-৪/২৮১
১২. আনসাবুল আশরাফ-১/৪০৭
১৩. হায়াতুস সাহাবা-২/৬৫২: আজ-জাহাবী; তারীখ-১/৪২
১৪. ফিজার যুদ্ধটি হয় 'আমুল ফীল' বা হাতীর বছরের বিশ বছর পর। পবিত্র হারাম মাসে এ যুদ্ধ হয় বলে একে 'ফিজার' বলা হয়। যুদ্ধটি হয় কুরাইশ ও তার মিত্র গোত্রসমূহ এবং কায়স 'আসলানের মধ্যে। (তাবাকাত-১/৮১, ১২৬-১২৮)
১৫. তাবাকাত-৮/৯; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩৪৬

তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ে দেন। তিনি আরও বলেছেন, ফিজারের পূর্বে যে তাঁর পিতা মারা যান সে ব্যাপারে আমাদের সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে ইজমা হয়েছে। কোন দ্বিমত নেই।[১৬] ইমাম সুহায়লীও একথা বলেছেন।

পিতার মৃত্যু বা স্বামী থেকে বিচ্ছিন্নতা বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, কুরাইশ বংশের অনেকের মত হযরত খাদীজাও (রা) ছিলেন একজন মস্তবড় ব্যবসায়ী। ইবন সা'দ তাঁর ব্যবসায় সম্পর্কে বলেছেন ঃ 'খাদীজা ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ও সম্পদশালী ব্যবসায়ী মহিলা। তাঁর বাণিজ্য সম্ভার সিরিয়া যেত এবং তাঁর একার পণ্য কুরাইশদের সকলের পণ্যের সমান হতো।' ইবন সাদের এ মন্তব্য দ্বারা হযরত খাদীজার (রা) ব্যবসায়ের পরিধি উপলব্ধি করা যায়। অংশীদারী বা মজুরীর বিনিময়ে যোগ্য লোক নিয়োগ করে তিনি দেশ-বিদেশে মাল কেনাবেচা করতেন।[১৭]

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) তখন চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবক। এর মধ্যে চাচা আবু তালিবের সাথে বা একাকী কয়েকটি বাণিজ্য সফরে গিয়ে ব্যবসায় সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফেলেছেন। ব্যবসায়ে তাঁর সততা ও আমানতদারীর কথাও মক্কার মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। সবার কাছে তিনি তখন 'আল-আমীন'। তাঁর সুনামের কথা খাদীজার (রা) কানেও পৌঁছেছে। বিশেষতঃ তার ছোট ভাই-বউ সাফিয়্যার কাছে 'আল আমীন' মুহাম্মাদ (সা) সম্পর্কে বহু কথাই শুনে থাকবেন।

এ সময় হযরত খাদীজা (রা) সিরিয়ায় পণ্য পাঠাবার চিন্তা করলেন। এ জন্য যোগ্য লোকের সন্ধান করছেন। অবশেষে মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহকে নিয়োগ দান করেন। যেভাবে তিনি নিয়োগ লাভ করেন, সে সম্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা আমরা এখানে তুলে ধরছি।

হযরত ইয়া'লার বোন নাফীসা বিন্‌ত মুনইয়া বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) যখন পঁচিশ বছরে পদার্পণ করেছেন তখন আবু তালিব একদিন তাঁকে ডেকে বললেন ঃ 'ভাতিজা! আমি একজন বিত্তহীন মানুষ, সময়টাও আমাদের জন্য খুব সঙ্কটজনক। মারাত্মক অভাবের কবলে আমরা নিপতিত। আমাদের কোন ব্যবসায় বা অন্য কোন উপায় উপকরণ নেই। তোমার গোত্রের একটি বাণিজ্য কাফিলা সিরিয়া যাচ্ছে। খাদীজা তার পণ্যের সাথে পাঠানোর জন্য কিছু লোকের খোঁজ করছে। তুমি যদি তার কাছে যেতে, হয়তো তোমাকে সে নির্বাচন করতো, তোমার চারিত্রিক নিষ্কলুষতা তার জানা আছে। যদিও তোমার সিরিয়া যাওয়া আমি পছন্দ করিনে এবং ইহুদীদের পক্ষ থেকে তোমার জীবনের আশঙ্কা করি।[১৮] তবুও এমনটি না করে উপায় নেই। জবাবে রাসূল (সা) বললেন, সম্ভবতঃ সে নিজেই লোক পাঠাবে। আবু তালিব বললেন ঃ হয়তো অন্য কাউকে সে

---

১৬. তাবাকাত-১/১৩২-১৩৩; আল-ইসাবা-৪/২৮২

১৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩৪২

১৮. কিশোর বয়সে একবার রাসূল (সা) চাচার সাথে সিরিয়া গিয়েছিলেন। তখন পাদরী 'বাহীরা' তাঁর সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এ বর্ণনায় আবু তালিব সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

নিয়োগ দিয়ে ফেলবে। চাচা- ভাতিজার এ সংলাপের কথা খাদীজার কানে গেল। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট লোক পাঠিয়ে বললেন ঃ অন্য লোকে আপনাকে যে পারিশ্রমিক দিবে, আমি তার দ্বিগুণ দিব।[১৯]

বালাজুরী বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) বয়স যখন বিশ বছর তখন আবু তালিব একদিন বললেন ঃ ভাতিজা! খাদীজা বিন্‌ত খুওয়াইলিদ একজন ধনবতী ব্যবসায়ী মহিলা। তার এখন প্রয়োজন তোমার মত একজন সৎ, বিশ্বস্ত ও চরিত্রবান লোকের। আমি যদি তোমার ব্যাপারে কথা বলি, হয়তো সে তার কোন ব্যবসায়ে তোমাকে দায়িত্ব দিতে পারে। রাসূল (সা) বললেন ঃ চাচা! আপনি যা ভালো মনে করেন, করুন।

আবু তালিব খাদীজার নিকট গেলেন এবং তাঁর কোন ব্যবসায় মুহাম্মাদকে (সা) নিয়োগের ব্যাপারে কথা বললেন। খাদীজা প্রস্তাব শুনে আগ্রহ্ প্রকাশ করলেন এবং খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁকে সিরিয়া পাঠিয়ে দিলেন।[২০]

'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আকীল বলেছেন ঃ আবু তালিব মুহাম্মাদকে (সা) বলেন ঃ ভাতিজা! শুনেছি খাদীজা অমুককে দুইটি জওয়ান উটের বিনিময়ে মজুর হিসেবে নিয়োগ করেছে। তোমার ব্যাপারে আমরা এতে রাজি হবো না। তুমি তার সাথে কথা বলতে চাও? বললেন ঃ চাচা! আপনি যা ভালো মনে করেন। এরপর আবু তালিব খাদীজার নিকট যেয়ে বলেন ঃ খাদীজা! তুমি কি মুহাম্মাদকে মজুরীর বিনিময়ে নিয়োগ করতে চাও? শুনেছি তুমি অমুককে দুইটি জওয়ান উটের বিনিময়ে নিয়োগ করেছো। মুহাম্মাদের ব্যাপারে চার উটের কমে আমরা রাজি হবোনা।[২১]

উল্লেখিত বর্ণনাগুলি দ্বারা বুঝা যায়, হযরত খাদীজা একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসা পরিচালনার জন্য তিনি বহু শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগ করতেন। তাঁর বুদ্ধিও ছিল প্রখর। তাই তিনি যথাসময়ে মুহাম্মাদকে (সা) নির্বাচনে এবং তাঁর উপর ব্যবসার দায়িত্ব প্রদানে মোটেই ভুল করেননি। আর এই নিয়োগ লাভের ব্যাপারে জনাব আবু তালিব মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। নিয়োগ লাভের পর জনাব আবু তালিব রাসূলুল্লাহকে (সা) বলেন, এ তোমার প্রতি আল্লাহর একটি অনুগ্রহ।

খাদীজার (রা) পণ্য-সামগ্রী নিয়ে তাঁর বিশ্বস্ত দাস মায়সারাকে সংগে করে মুহাম্মাদ (সা) সিরিয়ার দিকে বেরিয়ে পড়লেন। যাত্রাকালে চাচারা তাঁর সহযাত্রীদের সতর্ক করে দিলেন তাঁর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার জন্য। কাফিলা সিরিয়া পৌঁছলো। পথে এক গীর্জার পাশে একটি গাছের ছায়ায় বসে আছেন তিনি। মায়সারা গেছেন একটু দূরে কোন কাজে। গীর্জার পাদ্রী এগিয়ে গেলেন মায়সারার দিকে। জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'গাছের নিচে বিশ্রামরত লোকটি কে?'

---

১৯. তাবাকাত-১/১২৯: সীরাতু ইবন হিশাম. (পাদটীকা)-১/১৮৮

২০. আনসাবুল আশরাফ-১/৯৭

২১. তাবাকাত-১/১৩০

মায়সারা বললেন ঃ 'মক্কার হারামবাসী কুরাইশ গোত্রের একটি লোক।' পাদ্রী বললেন ঃ 'এখন এ গাছের নিচে যিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন তিনি একজন নবী ছাড়া আর কেউ নন।' পাদ্রী আরও জানতে চান ঃ 'তাঁর চোখ দুইটি কি লালচে?' মায়সারা বললেন ঃ হাঁ। এই লাল আভা কখনও দূর হয় না। পাদ্রী বললেন ঃ তিনি নবী। তিনিই আখিরুল আম্বিয়া—শেষ নবী।[২২]

রাসূল (সা) মায়সারাকে সংগে নিয়ে বাজারে পণ্য বিক্রি করেন। এক পর্যায়ে সেখানে এক ব্যক্তির সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) কিছু বিবাদ হয়। লোকটি রাসূলকে (সা) বলে ঃ আপনি লাত ও উয্যার নামে শপথ করে বলুন। রাসূল (সা) বললেন ঃ আমি তো কক্ষণও তাদের নামে শপথ করিনে। আমি তাদের প্রত্যাখ্যান করি। লোকটি বললো ঃ আপনার কথাই ঠিক। অতঃপর সে মায়সারাকে বলে ঃ আল্লাহর কসম! তিনি একজন নবী।

রাসূলুল্লাহ (সা) খাদীজার (রা) বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে কোন্ বাজারে গিয়েছিলেন, সে ব্যাপারে সামান্য মতবিরোধ আছে। একটি মতে, তিনি সিরিয়ার 'বুসরা' বাজার গিয়েছিলেন।[২৩] আল্লামা আয-যিরিকলী 'হাওরান' বাজারের কথা উল্লেখ করেছেন।[২৪] তাবারী ইবন শিহাব যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সিরিয়া নয়, বরং ইয়ামনের একটি হাবশী বাজারে গিয়েছিলেন। তবে সিরিয়া যাওয়ার বর্ণনাটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।[২৫]

রাসূলুল্লাহ (সা) সিরিয়ার বাজারে পণ্যদ্রব্য বিক্রী করলেন এবং যা কেনার তা কিনলেন। তারপর মায়সারাকে সঙ্গে করে মক্কার পথে রওয়ানা হলেন। পথে মায়সারা লক্ষ্য করলেন, রাসূল (সা) তাঁর উটের উপর সওয়ার হয়ে চলেছেন, আর দুইজন ফিরিশতা দুপুরের প্রচণ্ড রোদে তাঁর মাথার উপর ছায়া বিস্তার করে রেখেছে। এভাবে মক্কায় ফিরে খাদীজার (রা) পণ্য সামগ্রী বিক্রী করলেন। ব্যবসায়ে এবার দ্বিগুণ অথবা দ্বিগুণের কাছাকাছি মুনাফা হলো।[২৬] এই সফরে আল্লাহ তা'আলা মায়সারার অন্তরে রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন। তিনি যেন রাসূলুল্লাহর (সা) দাসে পরিণত হন। যখন তাঁরা মক্কার অদূরে 'মাররুজ জাহরান' নামক স্থানে তখন মায়সারা বলেন ঃ মুহাম্মাদ (সা), আপনি খাদীজার কাছে যান এবং আল্লাহ আপনার সাথে যে আচরণ করেছেন তা তাঁকে অবহিত করুন।[২৭]

---

২২. ঐতিহাসিকরা এই পাদ্রীর নাম 'নাসতুরা' বলে উল্লেখ করেছেন। (সীরাতু ইবন হিশাম (টীকা)-১/১৮৮)। ইবন হাজার আল-আসকিলানী এই পাদ্রীর নাম 'বাহীরা' বলেছেন। (আল-ইসাবা-৪/২৮১)

২৩. তাবাকাত-১/১৩০; আল-ইসাবা-৪/২৮১

২৪. আল-আ'লাম-২/৩৪২

২৫. তারীখুল উম্মাহ্ আল-ইসলামিয়্যা-১/৬৪,

২৬. তাবাকাত-১/৮৩

২৭. প্রাগুক্ত-১/১৩১

তাঁরা ব্যবসা থেকে মক্কায় ফিরে আসলেন। দাস মায়সারা অত্যন্ত সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে সফরে রাসূলুল্লাহর (সা) যাবতীয় কর্মকাণ্ড, পাদ্রীর মন্তব্য, ফিরিশতার ছায়াদান, দ্বিগুণ মুনাফা ইত্যাদি বিষয়ের একটি বিস্তারিত রিপোর্ট মনিব খাদীজার (রা) নিকট পেশ করেন। মায়সারা একথাও বলেন ঃ 'আমি তাঁর সাথে খেতে বসতাম। আমাদের পেট ভরে যেত, অথচ অধিকাংশ খাবার পড়ে থাকতো।'[২৮] এ সফরের ঘটনাবলী বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে সব বর্ণনার বিষয়বস্তু একই আছে।[২৯]

হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন তৎকালীন মক্কার একজন বিচক্ষণ বুদ্ধিমতী ও দৃঢ়চেতা ভদ্রমহিলা। তাঁর ধন-সম্পদ, ভদ্রতা ও লৌকিকতায় মক্কার সর্বস্তরের মানুষ মুগ্ধ ছিল। তিনি ছিলেন বংশত কৌলিন্যের দিক দিয়ে কুরাইশদের মধ্যমণি। অনেক অভিজাত কুরাইশ যুবকই তাঁকে সহধর্মিণী হিসেবে পাওয়ার প্রত্যাশী ছিল। তাদের অনেকে প্রস্তাবও পাঠিয়েছিল এবং সেজন্য প্রচুর অর্থও ব্যয় করেছিল।[৩০] তিনি তাঁদের সকলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং নিজেই রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বিয়ের পয়গাম পাঠান।[৩১]

হযরত খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) বিয়ে করার সিদ্ধান্ত কেন নিলেন? এ প্রশ্নের উত্তরে সাধারণভাবে যে কথাটি বলা হয় তা হলো, বিশ্বস্ত দাস মায়সারার মুখে রাসূলুল্লাহর (সা) নৈতিক গুণাবলী ও অলৌকিক ঘটনাবলীর কথা শুনে তিনি মুগ্ধ হন এবং বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। হয়তো এটাই মূল কারণ। তবে এর পশ্চাতে হযরত খাদীজার (রা) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও কাজ করে থাকতে পারে। যেমন ইবন সা'দ বর্ণনা করেছেন। সিরিয়া থেকে ফেরার সময় রাসূল (সা) চলতে চলতে এক সময় মক্কায় প্রবেশ করলেন। তখন ছিল দুপুর বেলা। খাদীজা (রা) তখন তাঁর ঘরের ছাদে। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে দেখলেন, মুহাম্মাদ উটের উপর বসে আছেন এবং দুইজন ফিরিশতা তাঁকে ছায়া দান করে আছে। তিনি সঙ্গের অন্য মহিলাদেরকে এ দৃশ্য দেখান।[৩২] এছাড়া আর একটি ঘটনার কথা আল মাদায়িনী ইবন আব্বাসের (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। জাহিলী যুগে মেয়েদের কোন এক উৎসব উপলক্ষে মক্কার মেয়েরা এক স্থানে সমবেত হয়। তখন দূরে এক অপরিচিত ব্যক্তি দেখা যায়। লোকটি আরও নিকটে এসে উঁচু গলায় ঘোষণা করে ঃ ওহে মক্কার মহিলারা! তোমরা শুনে রাখ। খুব শিগ্‌গির তোমাদের এ মক্কা নগরীতে একজন নবীর আবির্ভাব হবে। তাঁর নাম হবে আহমাদ। তোমাদের মধ্যে যার পক্ষে সম্ভব সে যেন তাঁর স্ত্রী হয়।[৩৩] ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন ঃ খাদীজা (রা) দাস মায়সারার মুখে পাদ্রীর মন্তব্য ও দুইজন ফিরিশতা কর্তৃক মুহাম্মাদকে (সা)

---

২৮. আনসাবুল আশরাফ-১/৯৭; ইবন হিশাম-১/১৮৯

২৯. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ আজ-জাহাবী; তারীখ-১/৪১-৪২; তাবাকাত-১/১২৯-১৩১; আনসাবুল আশরাফ-১/৯৬-৯৭

৩০. আল-ইসাবা-৪/২৮৩; তাবাকাত-১/১৩২; ইবন হিশাম-১/১৮৯

৩১. সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৮৯

৩২. তাবাকাত-১/১৩০

৩৩. আল-ইসাবা-৪/২৮২

ছায়াদানের কথা শুনে ওয়ারাকা ইবন নাওফিলের নিকট যেয়ে তাঁকে এসব কথা বলেন। খাদীজার কথা শুনে তিনি বলেন ঃ খাদীজা! তোমার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে মুহাম্মাদ এই উম্মাতের নবী। আমি জেনেছি, খুব শিগগির এই উম্মাতের একজন নবী আসবেন। এ তাঁরই সময়। এরপর ওয়ারাকা প্রতীক্ষা করতে থাকেন।[৩৪] সম্ভবতঃ উল্লেখিত সকল ঘটনা হযরত খাদীজার (রা) সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে।

এখানে ওয়ারাকা ইবন নাওফিলের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। কারণ হযরত খাদীজার (রা) জীবনকে সঠিক ধারায় চলমান রাখতে তাঁকে আমরা বারবার দৃশ্যপটে দেখতে পাই। ইসলামের সূচনা পর্বের ইতিহাসে সকাল বেলার সূর্যের সোনালী আভার মত তিনি দীপ্তিমান। তিনি ওয়ারাকা ইবন নাওফিল ইবন আসাদ ইবন আবদুল 'উয্যা। তাঁর মায়ের নাম হিন্দা বিন্ত আবী কাবীর। তিনি আসমানী কিতাবের ও মানুষের জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন। তাঁর কোন সন্তানাদি ছিল না। রাসূলুল্লাহর (সা) নবী হিসেবে আত্মপ্রকাশের পূর্বেই যাঁরা তাঁর উপর ঈমান আনেন এবং মারা যান তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম।[৩৫]

বিয়ের প্রস্তাব কিভাবে এবং কেমন করে হয়েছিল সে সম্পর্কে নানা রকম বর্ণনা রয়েছে। তবে খাদীজাই (রা) যে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট প্রস্তাবটি পেশ করেন সে ব্যাপারে প্রায় সব বর্ণনা একমত।

একটি বর্ণনায় এসেছে, নাফীসা[৩৬] বিন্তু মুন্ইয়া বলেন, মুহাম্মাদ সিরিয়া থেকে ফেরার পর তাঁর মনোভাব জানার জন্য খাদীজা (রা) আমাকে পাঠালেন। আমি তাঁকে বললাম ঃ মুহাম্মাদ! আপনি বিয়ে করছেন না কেন? বললেন, বিয়ে করার মতো অর্থ তো আমার হাতে নেই। বললাম ঃ যদি আপনাকে একটা সুন্দরের প্রতি আহ্বান জানানো হয়, অর্থ-বিত্ত, মর্যাদা ও অভিজাত বংশের প্রস্তাব দেওয়া হয়, রাজি হবেন? বললেন ঃ কে তিনি? বললাম ঃ খাদীজা। বললেন ঃ এ আমার জন্য কিভাবে সম্ভব হতে পারে? বললাম ঃ সে দায়িত্ব আমার। তিনি রাজি হয়ে গেলেন।[৩৭]

ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, খাদীজা ছিলেন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতী মহিলা। তিনি দূতের মাধ্যমে মুহাম্মাদকে (সা) একথা বলেন ঃ 'হে আমার চাচাতো ভাই! আপনার সাথে আমার আত্মীয়তা, নিজের কাওমের মধ্যে আপনার স্থান ও মর্যাদা, আপনার বিশ্বস্ততা, সততা ও উন্নত নৈতিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে।'[৩৮] সম্ভবতঃ এই দূত নাফীসা বিন্ত মুনইয়া।

---

৩৪. সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৯১
৩৫. তাফসীর আল-কাশ্শাফ ঃ সূরা ইয়াসীন
৩৬. নাফীসা বিন্ত মুনইয়া 'ইয়া'লা ইবন মুনইয়া আত-তামীমীর বোন। এ মহিলা মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/৯৮)
৩৭. তাবাকাত-১/১৩২; আল ইসাবা-৪/২৮২
৩৮. সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৮৯; আজ-জাহাবী ঃ তারীখ-১/৪২

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, খাদীজা (রা) নিজেই রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে কথা বলেন এবং তাঁর পিতার নিকট প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য রাসূলুল্লাহকে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানান এই বলে যে, দারিদ্রের কারণে হয়তো খাদীজার পিতা তাকে প্রত্যাখ্যান করবেন। অবশেষে খাদীজা নিজেই বিষয়টি তাঁর পিতার কাছে উত্থাপন করেন এবং তাঁর সম্মতি আদায় করেন।[৩৯]

অনেকে এমন কথা বলেছেন যে, প্রথমে খাদীজা (রা) নাফীসাকে পাঠান বিয়ের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর (সা) মনোভাব জানার জন্য। তিনি ইতিবাচক সাড়া পেয়ে সরাসরি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে কথা বলেন।[৪০] আর এটা সম্ভবত এ কারণে যে, তৎকালীন আরবে মেয়েদের, বিশেষত অভিজাত বংশের মেয়েদের বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার ছিল। তাই পিতা অথবা চাচা জীবিত থাকতেও খাদীজা নিজেই নিজের বিয়ের সকল পর্যায় অতিক্রম করেন।[৪১]

আল-কালবী বলেন ঃ খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) বলে পাঠালেন, তিনি যেন তাঁর চাচা 'আমর ইবন আসাদের নিকট আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দান করেন। 'আমর তখন থুত্থুড়ে বুড়ো। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) খাদীজার প্রস্তাবের কথা চাচাদের বললেন। তিনি তাঁর দুই চাচা আবু তালিব ও হামযাকে সংগে করে একটি নির্দিষ্ট দিনে খাদীজার গৃহে যান। খাদীজা ছাগল জবাই করে আপ্যায়নের আয়োজন করেন। চাচা 'আমর ও খান্দানের লোকদেরও ডাকেন। চাচাকে পানীয় পান করান। পানাহারের পর্ব শেষ হলে খাদীজা রাসূলুল্লাহকে (সা) বলেন ঃ আপনি আবু তালিবকে আমার চাচা 'আমরের নিকট আমার বিয়ের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পেশ করতে বলুন। অতঃপর আবু তালিব বিয়ের খুতবা পাঠ করে খাদীজার সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) বিয়ের কাজ সমাধা করেন। এই বিয়ের অল্প কিছুদিন পর খাদীজার (রা) চাচা মারা যান।[৪২]

এ প্রসঙ্গে হযরত খাদীজার (রা) পিতা সম্পর্কিত কয়েকটি বর্ণনা ও দেখতে পাওয়া যায়।

ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। খাদীজার (রা) পিতা এ বিয়েতে রাজি ছিলেন না। একদিন খাদীজা (রা) তাঁর গৃহে পিতার সাথে আরও কিছু কুরাইশ ব্যক্তিবর্গকে পানাহারের আমন্ত্রণ জানালেন। তারা পরিতৃপ্তি সহকারে পানাহার করে মাতাল হয়ে পড়লে খাদীজা (রা) পিতাকে বললেন ঃ মুহাম্মাদ আমাকে বিয়ের পয়গাম পাঠিয়েছেন। আপনি এ বিয়েতে সম্মতি দিন। পিতা সম্মতি দান করেন। খাদীজা (রা) প্রথা অনুযায়ী পিতাকে নতুন পোশাক পরান। জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি প্রশ্ন করেন ঃ আমার এ নতুন পোশাক কেন? খাদীজা (রা) বলেন ঃ মুহাম্মাদের সাথে আমার বিয়েতে আপনি সম্মতি দান করেছেন, তাই। পিতা বললেন ঃ তোমাকে আমি আবু

---

৩৯. হায়াতুস সাহাবা-২/৬৫২
৪০. সীরাতু ইবন হিশাম, (টীকা)-১/১৮৭
৪১. সিয়ারুস সাহাবিয়াত-৩
৪২. আনসাবুল আশরাফ-১/৯৭,৯৮

তালিবের এই ইয়াতীমের সাথে বিয়ে দিব? আমার জীবনের শপথ! কক্ষণও তা হয় না। খাদীজা (রা) প্রতিবাদের সুরে বলেন ঃ আপনি আমার ব্যাপারটি নিয়ে নিজেকে কুরাইশদের নিকট নির্বোধ প্রতিপন্ন করতে চাচ্ছেন? আপনি তাদের জানাতে চাচ্ছেন যে, আপনি মাতাল ছিলেন। খাদীজার (রা) এ কথায় তিনি সম্মতি দান করেন। আল-আ'মাশ জাবির ইবন সামুরা থেকেও এ রকম কথা বর্ণনা করেছেন। ইমাম যুহরীও এরকম কথা উল্লেখ করেছেন।[৪৩]

আবু মিহলায বর্ণনা করেছেন। খাদীজার (রা) পিতাকে মদপান করিয়ে মাতাল করা হয়। তারপর মুহাম্মাদকে (সা) ডাকা হয় এবং তাঁর দ্বারা বিয়ের কাজ সমাধা করা হয়। অতঃপর প্রথা অনুযায়ী বৃদ্ধকে নুতন পোশাক পরানো হয়। সুস্থ হয়ে বৃদ্ধ প্রশ্ন করেন ঃ আমার গায়ে এ নতুন পোশাক কেন? লোকেরা বললো ঃ এ পোশাক আপনার মেয়ের স্বামী মুহাম্মাদ আপনাকে পরিয়েছেন। তিনি রাগে ফেটে পড়েন এবং হাতে অস্ত্র তুলে নেন। বনু হাশিমও প্রতিরোধের জন্য অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে যায়। শেষমেষ একটা আপোষ-মীমাংসা হয়ে যায়।

অন্য একটি সনদে এ রকম বর্ণিত হয়েছে যে, খাদীজা (রা) তার পিতাকে অতিরিক্ত মদপান করিয়ে অচেতন করে ফেলেন। গরু জবেহ করেন, পিতার গায়ে রং লাগান এবং নতুন পোশাক পরান। তিনি সুস্থ হয়ে জানতে চান ঃ এ গরু জবেহ কেন, এসব রং কেন এবং এ পোশাকই বা কেন? খাদীজা (রা) বলেন ঃ কেন, আপনি আমাকে মুহাম্মাদের সাথে বিয়ে দিয়েছেন, তাকি মনে নেই? তিনি বললেন ঃ না, আমি তা করিনি। কুরাইশ বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, সেখানে আমি মত দিইনি। আর মুহাম্মাদের সাথে আমি তোমাকে বিয়ে দিয়েছি?[৪৪]

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ের সময় খাদীজার পিতা বেঁচে ছিলেন কিনা সে ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতবিরোধ আছে। সুতরাং এ ব্যাপারেও মতপার্থক্য আছে যে, এ বিয়েতে খাদীজার (রা) অভিভাবক (ওয়ালী) কে হয়েছিলেন। কেউ কেউ চাচা 'আমর ইবন আসাদের কথা বলেছেন, আবার অনেকে ভাই 'আমর ইবন খুওয়াইলিদের নাম উল্লেখ করেছেন।[৪৫] হযরত আয়িশা (রা) ও ইবন 'আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ খাদীজার চাচা আমর ইবন আসাদ তাকে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ে দেন। কারণ ফিজার যুদ্ধের পূর্বে তাঁর পিতা মারা যান। ইবন আব্বাস আরও বলেন ঃ 'আমর সে সময় থুত্থুড়ে বুড়ো।' তিনি ছাড়া আসাদের আর কোন সন্তান তখন জীবিত ছিলেন না। আর আমরেরও কোন সন্তান ছিল না।[৪৬] মুহাম্মাদ ইবন উমারও বলেছেন ফিজারের পূর্বে খাদীজার পিতা মারা যান। আর খাদীজার (রা) বিয়ের ব্যাপারে

---

৪৩. আজ-জাহাবী ঃ তারীখ-১/৪২
৪৪. তাবাকাত-১/১৩৩
৪৫. সীরাতু ইবন হিশাম-(টীকা)-১/১৯০; আনসাবুল আশরাফ-১/৯৮
৪৬. তাবাকাত-১/১৩২

তাঁর পিতাকে জড়িয়ে যেসব বর্ণনা এসেছে সবই অসত্য ও অমূলক। তাঁর চাচাই তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ে দেন।[৪৭]

যাই হোক, পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষের লোকদের উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা আবু তালিব আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের খুতবা পাঠ করেন। সংক্ষিপ্ত হলেও খুতবাটি সাহিত্য-উৎকর্ষের দিক দিয়ে জাহিলী যুগের আরবী গদ্য সাহিত্যের একটি মডেল হিসেবে চিহ্নিত। আরব ঐতিহাসিক ও সাহিত্য-রসিকরা খুতবাটি সংরক্ষণ করেছেন। পাঠকদের অবগতির জন্য আমরা তা এখানে তুলে ধরছি।[৪৮]

الحمد لله الذى جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا وجعلنا الحجام على الناس ، وإن محمد بن عبد الله لا يوزن به فتى من قريش الا رجح به بركة وفضلا وعضلا، وان كان فى المال مقلا، فان المال عارية مسترجعة وظل زائل، وله فى خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أردتم من الصداق فهو على -

-'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে ইবরাহীমের বংশধর ও ইসমাঈলের ফসলের অন্তর্গত করেছেন। মানুষের উপর আমাদেরকে কর্তৃত্ব দান করেছেন। মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহকে যে কোন কুরাইশ যুবকের সাথে পাল্লায় ওজন দেওয়া হোক না কেন, কল্যাণ, মাহাত্ম্য ও ন্যায়নিষ্ঠায় তার পাল্লা অবশ্যই ভারী হবে-যদিও বিত্ত-বৈভবে সে সর্বনিম্নে। তবে অর্থ-সম্পদ ক্ষণস্থায়ী ও অপসৃয়মান ছায়াস্বরূপ। খাদীজা বিনত খুওয়াইলিদের প্রতি তাঁর আগ্রহ আছে এবং তার প্রতিও খাদীজার একই রকম ঝোঁক আছে। আপনারা যে পরিমাণ মোহর চান, তা আদায় করার দায়িত্ব আমার।'

রাসূলুল্লাহ (সা) ও খাদীজার (রা) বিয়েতে দেন-মোহর কত ধার্য হয় সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ মতপার্থক্য আছে। একটি বর্ণনায় এসেছে, চাচা 'আমরের পরামর্শে পাঁচশো স্বর্ণমুদ্রা ধার্য হয়।[৪৯] আল-কালবী বলেন ঃ মোহর নির্ধারিত হয় বারো উকিয়া স্বর্ণ। এক উকিয়া চল্লিশ দিরহামের সমান।[৫০] ইমাম জাহাবী ইবন ইসহাকের সূত্রে বলেছেন, রাসূল (সা)

৪৭. প্রাগুক্ত-১/১৩৩
৪৮. আবু আলী আল-কালী ঃ কিতাবুল আমালী-২/২৮৪; ঈলীয়া হাবী ঃ ফানুস খিতাবা-৫২
৪৯. সিয়ারুস সাহাবিয়াত-পৃ.৩
৫০. আনসাবুল আশরাফ-১/৯৭

খাদীজাকে (রা) 'বিশ বাক্রাহ' দেন-মোহর দান করেন।[৫১]

হযরত খাদীজা (রা) নিজেই উভয় পক্ষের যাবতীয় খরচ বহন করেছিলেন। তিনি দুই উকিয়া সোনা ও রূপো রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠান এবং তা দিয়ে উভয়ের পোশাক ও ওয়ালীমার বন্দোবস্ত করতে বলেন।[৫২]

এভাবে খাদীজা (রা) হলেন 'উম্মুল মুমিনীন'। এ রাসূলুল্লাহর (সা) নুবুওয়াত প্রকাশের পনেরো বছর পূর্বের ঘটনা। অবশ্য তখন তাঁদের উভয়ের বয়স সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতপার্থক্য আছে।

আল-কালবী ইবন 'আব্বাসের (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী (সা) যখন খাদীজাকে (রা) বিয়ে করেন তখন খাদীজার (রা) বয়স আটাশ (২৮) বছর।[৫৩] তবে বিশেষজ্ঞরা এ বর্ণনাটির সনদ দুর্বল বলে গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। যুরকানী 'শারহুল মাওয়াহিব' গ্রন্থে বিয়ের সময় খাদীজার (রা) বয়স চল্লিশ বছর বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম জাহাবী বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) বয়স তখন পঁচিশ এবং খাদীজা (রা) তাঁর চেয়ে পনেরো বছরের বড়।[৫৪] হযরত খাদীজার (রা) ভাতিজা হাকীম ইবন হিযামও এ রকম কথা বলেছেন।[৫৫] আল-ওয়াকিদী নাফীসা বিন্ত মুনইয়ার সূত্রে রাসূলুল্লাহর (সা) বয়স চব্বিশ বছর বলে বর্ণনা করেছেন।[৫৬] কোন কোন বর্ণনায় রাসূলুল্লাহর (সা) বয়স পঁচিশ ও খাদীজার বয়স ছেচল্লিশ। তেমনিভাবে তেইশ ও আঠাশ বছরের কথাও এসেছে।[৫৭] সর্বাধিক সঠিক মতটি হলো পঁচিশ ও চল্লিশ।

বিয়ের পনেরো বছর পর হযরত নবী করীম (সা) নুবুওয়াত লাভ করেন। পূর্ব থেকেই খাদীজা (রা) স্বামী মুহাম্মাদের (সা) নবী হওয়া সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে উঠেছিলেন। সহীহ বুখারীর 'ওহীর সূচনা' অধ্যায়ে একটি হাদীসে বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। হযরত আয়িশা (রা) অতি চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

'রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি প্রথম ওহীর সূচনা হয় ঘুমে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। স্বপ্নে যা কিছু দেখতেন তা সকাল বেলার সূর্যের আলোর ন্যায় প্রকাশ পেত। তারপর নির্জনে থাকতে ভালোবাসতেন। খানাপিনা সঙ্গে নিয়ে হিরা গুহায় চলে যেতেন। সেখানে কয়েকদিন ইবাদাতে মশগুল থাকতেন। খাবার শেষ হয়ে গেলে আবার খাদীজার কাছে ফিরে আসতেন। খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আবার গুহায় ফিরে যেতেন। এ অবস্থায় একদিন তাঁর কাছে সত্যের আগমন হলো। ফিরিশতা এসে তাঁকে বললেন ঃ আপনি পড়ুন। তিনি বললেন ঃ আমি তো পড়া-লেখার লোক নই। ফিরিশতা তাঁকে এমন জোরে চেপে ধরলেন যে,

---

৫১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১১৪; আজ-জাহাবী ঃ তারীখ-১/৪২। 'বাক্রাহ' অর্থ জওয়ান মাদী উট।
৫২. হায়াতুস সাহাবা-২/৬৫২
৫৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১১১
৫৪. আজ-জাহাবী ঃ তারীখ-১/৪২
৫৫. আনসাবুল আশরাফ-১/৯৯
৫৬. আল-ইসাবা-৪/২৮২
৫৭. আনসাবুল আশরাফ-১/৯৮

তিনি কষ্ট অনুভব করলেন। ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন ঃ পড়ুন। তিনি আবারও বললেন ঃ আমি পড়া-লেখার লোক নই। ফিরিশতা দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারও তাঁর সাথে প্রথম বারের মত আচরণ করলেন। অবশেষে বললেন ঃ[৫৮]

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ - اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

–'পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে। যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড থেকে। পড়ুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।'

রাসূল (সা) ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ফিরলেন। খাদীজাকে ডেকে বললেন ঃ 'আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও, কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও।' তিনি ঢেকে দিলেন। তাঁর ভীতি কেটে গেল। তিনি খাদীজার নিকট পুরো ঘটনা খুলে বললেন এবং নিজের জীবনের আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করলেন। খাদীজা বললেন ঃ

كلّا والله مايخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق -

–'না, তা কক্ষণো হতে পারে না। আল্লাহর কসম! তিনি আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ়কারী, গরীব-দুঃখীর সাহায্যকারী, অতিথিপরায়ণ ও মানুষের বিপদে সাহায্যকারী।'

অতঃপর খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) সঙ্গে করে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবন নাওফিলের নিকট নিয়ে যান। সেই জাহিলী যুগে তিনি খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। হিব্রু ভাষায় ইনজীল কিতাব লিখতেন। তখন তিনি বৃদ্ধ ও দৃষ্টিহীন। খাদীজা বললেন ঃ 'শুনুন তো আপনার ভাতিজা কি বলে।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'ভাতিজা তোমার বিষয়টি কি?' রাসূলুল্লাহ (সা) পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। সব কথা শুনে ওয়ারাকা বললেন ঃ এতো সেই 'নামূস'–আল্লাহ যাকে মূসার (আ) নিকট পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! সেদিন যদি আমি জীবিত ও সুস্থ থাকতাম, যেদিন তোমার দেশবাসী তোমাকে দেশ থেকে বের করে দিবে।' রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'এরা কি আমাকে দেশ থেকে বের করে দেবে?' তিনি বললেন ঃ হাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছো, যখনই কোন ব্যক্তি তা নিয়ে এসেছে, সারা দুনিয়া তাঁর বিরোধী হয়ে গেছে। যদি সে সময় পর্যন্ত আমার শক্তি থাকে এবং আমি বেঁচে থাকি, তোমাকে সব ধরনের সাহায্য করবো।[৫৯]

ইমাম যুহরী বলেন ঃ খাদীজা (রা) প্রথম ব্যক্তি যিনি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেন।

---

৫৮. সূরা আল 'আলাক-৫

৫৯. সহীহ আল-বুখারী-বাবু বুদুয়িল ওহী। আজ-জাহাবী ঃ তারীখ-১/৬৭-৬৮

তারপর রাসূল (সা) রিসালাত লাভ করেন। রিসালাত লাভ করে ঘরে ফেরার পথে প্রতিটি পাথর, প্রতিটি গাছ, তাঁকে সালাম জানাতে থাকে। ঘরে এসে খাদীজাকে (রা) বলেন, যে সত্তাকে আমি স্বপ্নে দেখি বলে তোমাকে বলতাম, তিনি জিবরীল। প্রকাশ্যে আমাকে দেখা দিয়েছেন। আমার প্রতিপালক তাঁকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তারপর তিনি খাদীজাকে (রা) ওহীর সকল ঘটনা খুলে বলেন। তাঁর কথা শুনে খাদীজা (রা) বলেন ঃ 'সুসংবাদ, আল্লাহ আপনার কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণ করবেন না। আল্লাহর নিকট থেকে যা এসেছে তা গ্রহণ করুন। তা অবশ্যই সত্য।'৬০

এরপর খাদীজা (রা) ছুটে যান উতবা ইবন রাবী'আর দাস 'আদ্দাসের নিকট। তিনি ছিলেন 'নিনাওয়ার' অধিবাসী একজন নাসারা। খাদীজা (রা) আল্লাহর নামে কসম খেয়ে 'আদ্দাসের নিকট জানতে চান ঃ জিবরীল সম্পর্কে তোমার কি কিছু জানা আছে? আদ্দাস বললেন ঃ কুদ্দুস, কুদ্দুস— পবিত্র, পবিত্র! খাদীজা বলেন ঃ তুমি তাঁর সম্পর্কে যা কিছু জান আমাকে একটু বল। 'আদ্দাস বললেন ঃ জিবরীল হচ্ছেন আল্লাহ ও তাঁর নবীদের মধ্যের আমীন বা পরম বিশ্বাসী সত্তা। তিনি মূসা (আ) ও ঈসার (আ) নিকট এসেছেন। 'আদ্দাসের নিকট থেকে উঠে খাদীজা (রা) যান ওয়ারাকার নিকট। দুইজনের কথা শুনে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ফিরে আসেন।৬১

ইবন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ওহী লাভের পর আমি গুহা থেকে বের হলাম। আমি যখন পাহাড়ের মাঝামাঝি তখন আকাশের দিকে একটি ধ্বনি শুনতে পেলাম। কেউ যেন আমাকে বলছে ঃ মুহাম্মাদ আপনি আল্লাহর রাসূল। আমি মাথা উঁচু করতেই দেখলাম, একজন ধবধবে পরিষ্কার লোকের আকৃতিতে জিবরীল দাঁড়িয়ে। তাঁর দুই খানি পা মহাশূন্যের দুই দিগন্তে। তিনি আমাকে বলছেন ঃ মুহাম্মাদ, আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আমি জিবরীল। আমি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখতে লাগলাম। আকাশের যে দিকেই তাকালাম একই দৃশ্য দেখতে পেলাম। আমি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। এদিকে আমার ফিরতে দেরী দেখে খাদীজা আমার খোঁজে লোক পাঠালেন। তাঁরা মক্কার উঁচু ভূমিতে আমাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোথায়ও না পেয়ে খাদীজার নিকট ফিরে আসলো। আমি কিন্তু তখন একই স্থানে স্থির দাঁড়িয়ে।

এক সময় জিবরীল অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি ঘরে ফিরে খাদীজার রান ঘেঁষে বসলাম। খাদীজা বললো ঃ আবুল কাসিম! আপনি কোথায় ছিলেন? আমি আপনার খোঁজে লোক পাঠিয়েছিলাম। তাঁরা মক্কার উঁচু ভূমিতে খোঁজাখুঁজি করে কোথাও না পেয়ে ফিরে এসেছে। আমি তখন সকল ঘটনা খুলে বললাম। আমার কথা শুনে খাদীজা বললো ঃ আমার চাচাতো ভাই, আপনি অটল থাকুন। খাদীজার জীবন যাঁর হাতে, সেই সত্তার শপথ! আমি আশা করি, আপনি এই উম্মাতের নবী হবেন।' তারপর তিনি রাসূলকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিয়ে ওয়ারাকার নিকট চলে যান।৬২

৬০. আল-ইসাবা-৪/২৮১

৬১. আজ-জাহাবী ঃ তারিখ-১/৭৩; আনসাবুল আশরাফ-১/১১১

৬২. সীরাতু ইবন হিশাম-১/২৩৮-২৩৯

ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কার 'আজইয়াদ' এলাকায় একাকী আছেন। তিনি দেখেন যে, একটি ফিরিশতা এক পায়ের উপর আরেকটি পা উঠিয়ে আকাশের দিগন্তে বসে আছেন। তিনি চেঁচিয়ে বলছেন-'ইয়া মুহাম্মাদ! আমি জিবরীল।' রাসূল (সা) ভয় পেয়ে দ্রুত খাদীজার কাছে ফিরে এসে বললেন ঃ 'আমার ভয় হচ্ছে, আমি কাহিন'[৬৩] হয়ে না যাই। খাদীজা বললেন ঃ আমার চাচাতো ভাই! আপনি এমন কথা বলবেন না। তা হতে পারে না। আপনি আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখেন, সত্য বলেন, আমানত ফেরত দেন। আপনার চরিত্র তো অতি মহৎ।[৬৪]

আবূ মায়সারা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ওহী লাভের প্রথম পর্বে একাকী নির্জনে কোথাও গেলে-'ইয়া মুহাম্মাদ' ডাক শুনতে পেতেন। তিনি ভয় পেয়ে যেতেন। একথা খাদীজাকে (রা) জানালেন। খাদীজা (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্ আপনার কোন অকল্যাণ করবেন না। তারপর তিনি আবু বকরের (রা) সাথে রাসূলকে (সা) ওয়ারাকার নিকট পাঠিয়ে দেন।[৬৫]

ইমাম যুহরী থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট প্রথম ওহী আসার পর বেশ কিছু দিন যাবত ওহী আসা বন্ধ থাকে। ইসলামের পরিভাষায় এ সময়কে 'ফাতরাতুল ওহী' বলে। রাসূল (সা) দারুণ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি হেরা গুহায় যেতে থাকেন। এ সময় একদিন জিবরীলকে উপরে দেখতে পান এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে খাদীজার কাছে দ্রুত ফিরে এসে বলেন ঃ আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও। খাদীজা কম্বল দিয়ে ঢেকে দেন। এ অবস্থায় নাযিল হয় সূরা আল-মুদ্দাস্সির। জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা) থেকে একই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি সূরা আল-মুয্যাম্মিল নাযিলের কথা বলেছেন।[৬৬]

খাদীজা (রা) এ সময় একদিন পরীক্ষা করতে চাইলেন। ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন। খাদীজা (রা) একদিন রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন ঃ আমার চাচাতো ভাই! আপনার সাথী (জিবরীল আ.) যখন আপনার নিকট আসেন তখন কি আপনি আমাকে একটু জানাতে পারেন? এরপর জিবরীল যখন আসলেন, রাসূল (সা খাদীজাকে বললেন, এই জিবরীল এসেছেন। খাদীজা (রা) রাসূল্লাহকে (সা) নিজের ডান উরুর উপর বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি এখন তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন? বললেন ঃ হাঁ, দেখতে পাচ্ছি। খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) বাম উরুর উপর বসিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ

---

৬৩. 'কাহিন' অর্থ ভবিষ্যদ্বক্তা। প্রাচীন আরবে অনেক কাহিনের নাম পাওয়া যায়, যারা ভবিষ্যৎ জানার দাবী করতো এবং বিভিন্ন বিষয়ে আগাম খবর দিত। তারা বিশ্বাস করতো যে, তাঁদের নিকট অনুগত জ্বিন আছে এবং তারাই এসব গায়েবী খবর তাদেরকে সরবরাহ করে থাকে। (আল-আলুসী ঃ বুলূগুল আরিব-১/১৮৮)

৬৪. আনসাবুল আশরাফ-১/১০৪; আল-ইসাবা-৪/২৮১

৬৫. আনসাবুল আশরাফ-১/১০৪-১০৫

৬৬. প্রাগুক্ত-১/১০৮-১০৯

এখন কি তাঁকে দেখা যায়? বললেন ঃ হাঁ, দেখা যায়। অতঃপর খাদীজা (রা) নিজের ওড়না ফেলে দিয়ে বুক উন্মুক্ত করে ফেললেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন ঃ এখনও কি তাঁকে দেখা যায়? বললেন ঃ না, এখন দেখা যায় না। তখন খাদীজা (রা) বললেন ঃ সুসংবাদ! আল্লাহর শপথ, তিনি অবশ্যই ফিরিশতা। কোন শয়তান নয়। কারণ, এ অবস্থায় ফিরিশতা নিশ্চয় লজ্জা পাবে।[৬৭]

একদিন হযরত খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য আহার-সামগ্রী নিয়ে তাঁর খোঁজে মক্কার উঁচু ভূমির দিকে চলেছেন। পথে জিবরীল (আ) এক অপরিচিত ব্যক্তির রূপ ধরে আবির্ভূত হন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। খাদীজা (রা) ভীত হয়ে পড়েন। তিনি শঙ্কিত হয়ে ওঠেন এই ভেবে যে, না জানি লোকটি তাঁকে অপহরণ করে কিনা। পরে খাদীজা (রা) কথাটি রাসূলুল্লাহকে জানালে তিনি বললেন, লোকটি ছিল জিবরীল (আ)। তিনি আমাকে বলেছেন, আমি যেন তোমাকে সালাম জানাই এবং জান্নাতে মণি-মুক্তোর তৈরী একটি বাড়ীর সুসংবাদ দান করি।[৬৮]

পূর্বে উল্লেখিত ঘটনাবলীর সবই ইসলামের অব্যবহিত পূর্ব সময়ের ও সূচনা পর্বের। এ ধরনের আরও বহু ঘটনার কথা জানা যায় যাতে হযরত খাদীজার (রা) ধৈর্য, বিচক্ষণতা, স্বামীর প্রতি প্রবল আবেগ ও বিশ্বাস এবং সর্ব অবস্থায় স্বামীর পাশে দাঁড়ানোর দৃশ্য ফুটে উঠেছে। এ সকল ঘটনা পর্যালোচনা করলে আর যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো, রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট জিবরীলের (আ) আগমনের পূর্বেই তিনি যেন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন, তাঁর স্বামী একজন অসাধারণ মানুষ হবেন। তিনি হবেন একজন নবী। আর তাই রাসূল (সা) যখন তাঁর কাছে এসে সর্বপ্রথম দাবী করলেন, তাঁর নিকট জিবরীল এসেছেন, তিনি ওহী লাভ করেছেন, তখন ক্ষণিকের জন্যও তাঁর মনে কোন দ্বিধা-সংশয় দেখা দেয়নি। তিনি যেন আগে থেকেই এমন একটি সংবাদ পাওয়ার জন্য প্রতীক্ষায় ছিলেন, মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর সে সময়ের বিভিন্ন কর্ম ও আচরণ দ্বারা এ কথাগুলি প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত হয়।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত খাদীজা (রা) তাঁর সকল ধন-সম্পদ-বিত্ত-বৈভব তাবলীগে দ্বীনের লক্ষ্যে ওয়াক্‌ফ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে আল্লাহর ইবাদাত এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। সংসারের সকল আয় বন্ধ হয়ে যায়। সেইসাথে বাড়তে থাকে খাদীজার (রা) দুশ্চিন্তা। তিনি ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে সব প্রতিকূল অবস্থার মুকাবিলা করেন। ইবন ইসহাক বলেন ঃ[৬৯]

فكان لا يسمع من المشركين شيئا يكرهه من ردعليه وتكذيب له إلا فرج الله بها تتثبته وتصدقه وتخفف عنه وتهون عليه مالقى من قومه -

---

৬৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১১৬; সীরাতু ইবন হিশাম-১/২৩৮-২৩২; আল-ইসাবা-২/২৮১

৬৮. আল-ইসাবা-৪/২৮৩

৬৯. আল-ইসতীয়াব (আল-ইসাবার পার্শ্বটীকা)-৪/২৮৩

–'মুশরিকদের প্রত্যাখ্যান ও অবিশ্বাসের কারণে রাসূল (সা) যে ব্যথা অনুভব করতেন, খাদীজার (রা) দ্বারা আল্লাহ তা দূর করে দিতেন। কারণ, তিনি রাসূলকে (সা) সান্ত্বনা দিতেন, সাহস ও উৎসাহ যোগাতেন। তাঁর সব কথাই তিনি বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করতেন। মুশরিকদের সকল অমার্জিত আচরণ তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে অত্যন্ত হালকা ও তুচ্ছভাবে তুলে ধরতেন।'

ইবন ইসহাক আরও বলেন ঃ[৭০]

وكان له وزير صدق على الإسلام، يشكو إليها -

–রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য খাদীজা (রা) ছিলেন ইসলামের ব্যাপারে সত্য ও সঠিক উযীর। রাসূল (সা) সকল বিপদ-আপদে তাঁর কাছে মনের কথা বলতেন, অভিযোগ করতেন। নুবুওয়াতের সপ্তম বছর মুহাররম মাসে কুরাইশরা মুসলমানদের বয়কট করে। তাঁরা 'শিয়াবে আবু তালিবে' আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে হযরত খাদীজাও (রা) সেখানে অন্তরীণ হন।[৭১] প্রায় তিনটি বছর বনু হাশিম দারুণ অভাব ও দুর্ভিক্ষের মাঝে অতিবাহিত করে। গাছের পাতা ছাড়া জীবন ধারণের আর কোন ব্যবস্থা প্রায় তাদের ছিল না। স্বামীর সাথে হযরত খাদীজাও (রা) হাসিমুখে সে কষ্ট সহ্য করেন। এমন দুর্দিনে তিনি নিজের প্রভাব খাটিয়ে নানা উপায়ে কিছু খাদ্য খাবারের ব্যবস্থা মাঝে মাঝে করতেন। তাঁর তিন ভাতিজা–হাকীম ইবন হিযাম, আবুল বুখতারী ও যুম'আ ইবনুল আসওয়াদ–সকলে ছিলেন কুরাইশ নেতৃবর্গের অন্যতম। অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা বিভিন্নভাবে একঘরে করা মুসলমানদের কাছে খাদ্যশস্য পাঠানোর ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

একদিন হাকীম ইবন হিযাম চাকরের মাথায় কিছু গম উঠিয়ে নিয়ে চলেছেন ফুফু খাদীজার (রা) কাছে। তিনি তখন রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে 'শিয়াবে আবী তালিবে' অন্তরীণ। পথে নরাধম আবু জাহলের সাথে দেখা। সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো ঃ খাদ্য নিয়ে তুমি বনু হাশিমের কাছে যাচ্ছ? আল্লাহর কসম, এ খাদ্যসহ তুমি সেখানে যেতে পারবে না। যদি যাও, তোমাকে আমি মক্কায় লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবো। এমন সময় আবুল বুখতারী ইবন হাশিম সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা ঝগড়া করছো কেন? আবু জাহ্ল বললো ঃ সে বনু হাশিমের কাছে খাদ্য নিয়ে যাচ্ছে। আবুল বুখতারী বললেন ঃ এ খাদ্য তো তার ফুফুর, হাকীমের কাছে ছিল। ফুফুর সে খাদ্য সে দিতে যাচ্ছে, আর তুমি তাতে বাধা দিচ্ছো? পথ ছেড়ে দাও। কিন্তু আবু জাহ্ল তাঁর কথায় কান দিল না। তখন দুই জনের মধ্যে ভালোরকম একটা মারপিট হয়। এভাবে হাকীম প্রায়ই খাদ্য পাঠাতেন।[৭২]

---

৭০. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪১৬; আজ-জাহাবী ঃ তারীখ-১/২৪০

৭১. সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৯২

৭২. প্রাগুক্ত-১/৩৮৪; আনসাবুল আশরাফ-১/২৩৫

আর একদিন হযরত 'আব্বাস (রা) কিছু খাবার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে 'শিয়াব' থেকে বের হলেন। আবু জাহ্ল তাঁর উপর হামলা করার ফন্দি আঁটে। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করেন। এ কথা খাদীজা (রা) জানতে পেয়ে চাচা যুমআ ইবন আল-আসাদকে লোক মারফত বলে পাঠান ঃ আবু জাহ্ল খাদ্য ক্রয়ে বাধা দিচ্ছে। তাঁকে কিছু কথা শুনিয়ে দিন। যুমআ খাদীজার (রা) কথামত কাজ করেন। এরপর সে বাড়াবাড়ি থেকে বিরত হয়।[৭৩]

নামায ফরযের হুকুম নাযিল হওয়ার আগেই হযরত খাদীজা (রা) ঘরের মধ্যে গোপনে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে একত্রে নামায আদায় করতেন।[৭৪] ইবন ইসহাক বলেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মক্কার উঁচু ভূমিতে তখন জিবরীল (আ) আসেন এবং উপত্যকার এক প্রান্তে একটি স্থানে আঘাত করে একটি ঝর্ণার সৃষ্টি করেন। প্রথমে জিবরীল (আ) সেই পানি দিয়ে ওজু করেন, তারপর রাসূল (সা) তাঁর মত ওজু করেন। জিবরীল (আ) নামায পড়েন এবং রাসূল (সা)ও তাঁর মত নামায পড়েন। তারপর রাসূল (সা) ঘরে এসে খাদীজাকে (রা) ওজু শিখান এবং তাঁকে নিয়ে নামায পড়ে বাস্তব শিক্ষা দেন।[৭৫]

ইবন ইসহাক আরও উল্লেখ করেছেন, একদিন আলী (রা) দেখতে পেলেন, তাঁরা দুইজন অর্থাৎ নবী (সা) ও খাদীজা (রা) নামায আদায় করছেন। আলী (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ মুহাম্মাদ, এ কি? রাসূল (সা) তখন নতুন দ্বীনের দাওয়াত আলীর (রা) কাছে পেশ করলেন এবং একথা অন্য কাউকে বলতে বারণ করলেন।[৭৬] এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, উম্মাতে মুহাম্মাদীর (সা) মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে নামায আদায়ের গৌরব অর্জন করেন।[৭৭]

'আফীফ আল-কিন্দী নামক এক ব্যক্তি সে সময় কিছু কেনাকাটার জন্য মক্কায় এসেছিলেন। তিনি হযরত 'আব্বাসের (রা) গৃহে অবস্থান করছিলেন। একদিন সকালে লক্ষ্য করলেন, এক যুবক কা'বার কাছে এসে আসমানের দিকে তাকালো। তারপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালো। একজন কিশোর এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর এলো এক মহিলা। সেও তাদের দুই জনের পিছনে দাঁড়ালো। তারা নামায শেষ করে চলে গেল। 'আফীফ আল কিন্দী দৃশ্যটি দেখলেন। 'আব্বাসকে (রা) তিনি বললেন ঃ 'বড় রকমের একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে।' 'আব্বাস (রা) বললেন ঃ হাঁ। এ জওয়ান আমার ভাতিজা মুহাম্মাদ। কিশোরটি আমার আরেক ভাতিজা আলী এবং মহিলাটি মুহাম্মাদের স্ত্রী। আমার ভাতিজার ধারণা, তার ধর্ম বিশ্বপ্রতিপালকের ধর্ম। আর সে যা

---

৭৩. আনসাবুল আশরাফ-১/২৩৫

৭৪. তাবাকাত-৮/১০

৭৫. সীরাতু ইবন হিশাম-১/২৪৪; আনসাবুল আশরাফ-১/১১২

৭৬. হায়াতুস সাহাবা-১/৭০

৭৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১০৯

কিছু করে, তাঁরই হুকুমে করে। আমার জানা মতে দুনিয়ায় তারা তিনজনই মাত্র এই নতুন ধর্মের অনুসারী।[৭৮]

হযরত খাদীজার (রা) ইনতিকালের সঠিক সন সম্পর্কে একটু মতপার্থক্য আছে। হিজরতের তিন, চার অথবা পাঁচ বছর পূর্বে তিনি মক্কায় মারা যান বলে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম নব্বী বলেন, তিন বছর পূর্বের কথাটি সঠিক। তাঁর মৃত্যু হয় আবু তালিবের মৃত্যুর তিনদিন পর।[৭৯]

বালাজুরী বলেন ঃ শি'য়াবে আবু তালিব থেকে বনু হাশিম বের হয় নুবুওয়াতের দশম বছরে। এখান থেকে বের হওয়ার পর সেই বছর জিলকাদ মাসের প্রথম দিকে অথবা শাওয়ালের মাঝামাঝি আবু তালিব মারা যান। আবু তালিব ও খাদীজার (রা) মৃত্যুর মধ্যে সময়ের ব্যবধান সম্পর্কে মতভেদ আছে। যথা ৩৫, ২৫, ৫ ও ৩ দিন। খাদীজার মৃত্যু হয় আগে। তাঁকে মক্কার 'হাজূন' গোরস্তানে দাফন করা হয়। তখন জানাযার নামাযের প্রচলন হয়নি।[৮০] হযরত খাদীজার (রা) ভাতিজা হাকীম ইবন হিযাম বলেন ঃ আমরা তাঁকে ঘর থেকে উঠিয়ে নিয়ে 'হাজূন'-এ দাফন করি। নবী (সা) তাঁর কবরে নামেন। তাঁর মৃত্যু হয় নুবুওয়াতের দশম বছর রমজান মাসে। তখন তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি বছর।[৮১] ইবনুল জাওযীও একথা বলেছেন।[৮২]

হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। খাদীজা (রা) নামায ফরজ হওয়ার পূর্বে ইনতিকাল করেন। আর একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর মৃত্যু হয় রমজান মাসে, তখন তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি বছর। মক্কার উঁচু ভূমিতে অবস্থিত 'হাজূন' গোরস্তানে দাফন করা হয়।[৮৩] কাতাদা ও উরওয়া বলেছেন, হিজরাতের তিন বছর পূর্বে মারা যান। আল-ওয়াকিদী বলেছেন ঃ 'বনু হাশিমের' উপত্যকা থেকে তাঁরা মুক্ত হন হিজরাতের তিন বছর পূর্বে। তারপর আবু তালিব মারা যান। দুই জনের মৃত্যু হয় একই বছর। তবে আবু তালিবের মৃত্যুর তিনদিন পর খাদীজার (রা) মৃত্যু হয়।[৮৪] ইমাম আজ-জাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ের সময় খাদীজার (রা) বয়স ছিল ৪০ বছর। তাঁর সাথে জীবন কাটান ২৪ বছর।[৮৫] এই হিসাবে তিনি ৬৪ বছর জীবন লাভ করেন।

---

৭৮. তাবাকাত-৮/১০-১১। আল্লামা 'উকায়লী এ বর্ণনাটিকে দা'ঈফ (দুর্বল) বলেছেন। কিন্তু অনেকের মতে, এতে দুর্বল হওয়ার মত কোন কারণ বিদ্যমান নেই। তাছাড়া এই মর্মের আরও বর্ণনা ভিন্ন সনদেও এসেছে। ইমাম বাগাবী, আবু ইয়ালা, নাসাঈ নিজ নিজ গ্রন্থে হাদীসটি সংকলন করেছেন। হাকেম, ইবন খায়সামা, ইবন মুন্দাহ বর্ণনাটি 'মাকবূল' (গ্রহণযোগ্য) বলে মনে করেছেন। তাছাড়া ইমাম বুখারীর মত মুহাদ্দিস তাঁর তারীখে বর্ণনাটি স্থান দিয়েছেন এবং 'সহীহ' বলেছেন। (সিয়ারুস সাহাবিয়াত-পৃ.৭)

৭৯. তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-২/৩৪১

৮০. আনসাবুল আশরাফ-১/২৩৬-২৩৭

৮১. প্রাগুক্ত-১/৪০৬

৮২. সিফাতুস সাফওয়া-২/৩

৮৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১১২, ১১৭; আজ-জাহাবী ঃ তারীখ-১/১৪০

৮৪. প্রাগুক্ত

৮৫. আজ-জাহাবী ঃ তারীখ-১/১৪০

পরম শ্রদ্ধেয় চাচা আবু তালিব ও প্রিয়তমা স্ত্রী খাদীজার (রা) ওফাতের পর রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। আর তা ছিল সর্বাধিক কঠিন অধ্যায়। হযরত রাসূলে কারীম (সা) নিজেই তাঁদের ওফাতের বছরকে 'আমুল হুয্‌ন'—দুঃখ ও শোকের বছর নামে অভিহিত করতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) অতিপ্রিয় এ দুই ব্যক্তির মৃত্যুতে কুরাইশ পাষণ্ডরা একেবারে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তারা অতি নির্দয়ভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) উপর অত্যাচার উৎপীড়ন চালাতে থাকে। এ সময়ই তিনি মক্কাবাসীদের প্রতি হতাশ হয়ে তায়েফ গমন করেন। খাদীজা (রা) জীবিত থাকলে তিনি অন্তত নিজের দুঃখের কথা তাঁকে বলতে পারতেন।[৮৬] ইবন ইসহাক বলেছেন ঃ খাদীজার (রা) তিরোধানের পর রাসূলুল্লাহর (সা) উপর একের পর এক মুসীবত আসতেই থাকে।[৮৭] কারণ, পৌত্তলিক শক্তিকে রুখতে পারে, আবু তালিব ও খাদীজার (রা) মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ তখন আর ছিলেন না।

ইবনুল আসীর বলেন ঃ[৮৮]

خديجة أول خلق الله أسلم، بإجماع المسلمين -

—'এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মার ইজমা' হয়েছে যে, হযরত খাদীজা (রা) আল্লাহর সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমান হয়েছেন।

যুহরী, কাতাদা, মূসা ইবন 'উকবা, ইবন ইসহাক, আল-ওয়াকিদী ও সাঈদ ইবন ইয়াহইয়া বলেছেন ঃ [৮৯]

أول من آمن بالله ورسوله خديجة وأبوبكر وعلى رضى الله عنهم -

—'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) উপর সর্বপ্রথম ঈমান আনেন খাদীজা, আবু বকর ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

হযরত হুজায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ[৯০]

خَدِيْجَةُ سَابِقَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ إلى الْإِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَبِمُحَمَّدٍ -

'আল্লাহ ও মুহাম্মাদের প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে খাদীজা বিশ্বের সকল নারীর অগ্রবর্তিনী।'

সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব বলেছেন ঃ[৯১]

أول النساء إسلاما خديجة -

---

৮৬. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪১৬
৮৭. আজ-জাহাবী ঃ তারীখ-১/১৪০
৮৮. উসুদুল গাবা-৫/৭৮
৮৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/১১৫
৯০. আল-মুসতাদরিক-৩/১৮৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১১৬
৯১. আনসাবুল আশরাফ-১/১১২

–'নারীদের মধ্যে খাদীজা (রা) প্রথম মুসলমান।'

ইমাম নব্বী বলেন ঃ যুহরী ও 'আলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দল উল্লেখ করেছেন যে, খাদীজা (রা) আল্লাহ ও রাসূলের (সা) প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান আনেন। আর এ কথার উপর ইজমা হয়েছে বলে ইমাম সা'লাবী বর্ণনা করেছেন।[৯২] ইসলাম গ্রহণের সময় হযরত খাদীজার (রা) বয়স হয়েছিল পঞ্চাশ বছর। তাঁর ইসলাম গ্রহণের প্রভাব তাঁর পিতৃকূলের লোকদের উপরও পড়েছিল। ইসলামের আবির্ভাবের সময় পিতৃকূল বনু আসাদ ইবন আবদিল 'উযযার পনেরো জন বিখ্যাত ব্যক্তি জীবিত ছিলেন। তাঁদের দশজনই ইসলাম গ্রহণ করেন। অন্য পাঁচজন কাফির অবস্থায় বদর যুদ্ধে নিহত হয়।

হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন বহু সন্তানের জননী। প্রথম স্বামী আবু হালার ঔরসে হালা ও হিন্দ নামে দুই ছেলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। হিন্দ বদর, মতান্তরে উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন। তবে বালাজুরীর বর্ণনায় বুঝা যায়, প্রথম স্বামীর ঘরে একটি মাত্র ছেলে ছিল, তাঁর নাম হিন্দ। পিতার নামে নাম রাখা হয়। তিনি ছিলেন একজন প্রাঞ্জলভাষী বাগ্মী পুরুষ। উটের যুদ্ধে তিনি আলীর (রা) পক্ষে শাহাদাত বরণ করেন। দ্বিতীয় স্বামী আতীকের ঔরসে হিন্দা নাম্নী এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।[৯৩] অবশ্য অন্য একটি বর্ণনা মতে প্রথম পক্ষে তাঁর তিনটি সন্তান জন্মলাভ করে। দুই ছেলে হিন্দ ও হারিস। হারিসকে এক কাফির কা'বার রুকনে ইয়ামানীর নিকট শহীদ করে ফেলে। এক কন্যা যায়নাব। আর দ্বিতীয় পক্ষের মেয়েটির ডাকনাম ছিল উম্মু মুহাম্মাদ।[৯৪] তার বিয়ে হয় সায়ফী ইবন উমাইয়্যার সাথে। মুহাম্মাদ নামে তাঁর এক ছেলে হয়। এ কারণে তাঁকে উম্মু মুহাম্মাদ নামে ডাকা হতো।[৯৫]

ইবন ইসহাক বলেন, একমাত্র ইবরাহীম (আ) ছাড়া রাসূলুল্লাহর (সা) সকল সন্তান হযরত খাদীজার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা হলেন ঃ আল-কাসিম, আত-তাহির, আত-তায়্যিব, যায়নাব, রুকাইয়া, উম্মু কুলসুম ও ফাতিমা (রা)।[৯৬] ইবন হিশাম বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) বড় ছেলে আল-কাসিম। তারপর আত-তায়্যিব ও আত-তাহির। বড় মেয়ে রুকাইয়া, তারপর যায়নাব, উম্মু কুলসুম ও ফাতিমা (রা)।[৯৭]

ইবন ইসহাক আরও বলেন, আল-কাসিম, আত-তায়্যিব ও আত-তাহির জাহিলী যুগেই মারা যান। আর মেয়েদের সকলে ইসলামী যুগ লাভ করেন। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করে

---

৯২. তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-২/৩৪১
৯৩. আনসাবুল আশরাফ-১/৪০৭; সীরাতু ইবন হিশাম (টীকা)-১/১৮৭
৯৪. দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ-ই-ইসলামী (উর্দু)-'খাদীজা' অংশ।
৯৫. আনসাবুল আশরাফ-১/৪০৭
৯৬. আজ-জাহাবী ঃ তারীখ-১/৪২; সীরাতু ইবন হিশাম-১/২১০
৯৭. সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৯০

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মদীনায় হিজরাত করেন।[৯৮]

ইবন ইসহাক ও ইবন হিশামের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, আত-তাহির ও আত-তায়্যিব ভিন্ন দুই ছেলে। অথচ এ দুইটি নাম রাসূলুল্লাহর (সা) ছেলে হযরত আবদুল্লাহর দুইটি লবক বা উপাধি।[৯৯] আল ওয়াকিদী বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) ঘরে হযরত খাদীজার (রা) আল-কাসিম ও আবদুল্লাহ নামের দুই ছেলে জন্মগ্রহণ করেন। নুবুওয়াত লাভের পর আবদুল্লাহর জন্ম হয় বলে তাঁকে আত-তায়্যিব বা আত-তাহির বলা হতো। এছাড়া চার মেয়েও জন্মগ্রহণ করেন। মোট ছয় সন্তানের মা হন।[১০০] প্রথম সন্তান আল-কাসিম। রাসূলুল্লাহর (সা) নুবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে দুগ্ধপোষ্য বয়সে মক্কায় মারা যান। তাঁর নাম অনুসারে রাসূলুল্লাহর (সা) কুনিয়াত বা উপনাম হয় আবুল কাসিম। মৃত্যুর পূর্বে তিনি পা পা করে হাঁটা শিখেছিলেন। বালাজুরীর মতে মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র দুই বছর।[১০১]

ইমাম আস-সুহাইলী বর্ণনা করেছেন, আল-কাসিম মারা যাওয়ার পর রাসূল (সা) খাদীজার (রা) কাছে যান। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দুধের টুকরো মারা গেছে। যদি সে দুধ পান শেষ করা পর্যন্ত বেঁচে থাকতো তাহলে আমার দুঃখ ছিল না। রাসূল (সা) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ তুমি চাইলে জান্নাতের মধ্য থেকে তার কণ্ঠস্বর তোমাকে শোনাতে পারবো। খাদীজা (রা) বলেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশী ভালো জানেন। এই বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় আল-কাসিমের মৃত্যু জাহিলী যুগে নয়, বরং ইসলামী যুগে হয়েছে।[১০২]

দ্বিতীয় সন্তান হযরত যায়নাব (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) বড় মেয়ে। খালাতো ভাই আবুল আস ইবন রাবী'র সাথে বিয়ে হয়। আবুল আসের মা হালা বিন্‌ত খুওয়াইলিদ।

তৃতীয় সন্তান হযরত আবদুল্লাহ। তাঁকেই আত-তায়্যিব ও আত-তাহির বলা হয়। যেহেতু নুবুওয়াত লাভের পর তাঁর জন্ম হয়, তাই এ নামে আখ্যায়িত করা হয়। শিশু বয়সে মক্কায় ইনতিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর কাফিররা, বিশেষতঃ 'আস ইবন ওয়ায়িল রাসূলুল্লাহকে (সা) 'আবতার' বা নির্বংশ বলে উপহাস করতে থাকে। তখন নাযিল হয় সূরা আল কাওসার-এর এ আয়াত ঃ

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ -

–যে আপনার শত্রু, সে-ই লেজকাটা, নির্বংশ।[১০৩]

অবশ্য এ ব্যাপারে প্রথম সন্তানের মৃত্যুর কথাও বর্ণিত হয়েছে।

---

৯৮. প্রাগুক্ত-১/১৯১

৯৯. প্রাগুক্ত (টীকা)।

১০০. আল-ইসাবা-৪/৮২

১০১. আনসাবুল আশরাফ-১/৩৯৬

১০২. সীরাতু ইবন হিশাম-(টীকা)-১/১৯০

১০৩. আনসাবুল আশরাফ-১/৪০৫; তাবাকাত-১/১৩৩

চতুর্থ সন্তান হযরত রুকাইয়া (রা)। তাঁর প্রথম বিয়ে হয় 'উতবা ইবন আবী লাহাবের সাথে। ইসলামের সাথে চরম দুশমনীর কারণে সে হযরত রুকাইয়াকে তালাক দেয়। তারপর হযরত 'উসমানের (রা) সাথে বিয়ে হয়। হিজরাতের পর মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় ইনতিকাল করেন।

পঞ্চম সন্তান হযরত উম্মু কুলসুম (রা)। তাঁর প্রথম বিয়ে হয় মু'আত্তাব, মতান্তরে 'উতাইবা ইবন আবী লাহাবের সাথে। সেও প্রবল ইসলাম বিদ্বেষের কারণে স্ত্রী উম্মু কুলসুমকে তালাক দেয়। তারপর বোন রুকাইয়ার মৃত্যুর পর হযরত উসমানের (রা) সাথে দ্বিতীয় বিয়ে হয়। এ কারণে হযরত উসমানের (রা) উপাধি হয় 'জিন-নূরাইন'। ষষ্ঠ সন্তান হযরত ফাতিমা (রা) চতুর্থ খলীফা হযরত 'আলীর (রা) স্ত্রী এবং হযরত ইমাম হাসান ও হুসাইনের মা।[১০৪]

উল্লেখ্য যে, ইবরাহীম ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) দাসী হযরত মারিয়া আল-কিবতিয়ার (রা) গর্ভজাত সন্তান। এই মারিয়াকে মিসরের শাসক 'মাকাওকাস' উপহার হিসেবে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠান।[১০৫] মোটকথা, একমাত্র ইবরাহীম ছাড়া রাসূলুল্লাহর (সা) সকল সন্তানের জননী হলেন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা)।[১০৬]

হযরত খাদীজা সন্তানদের খুব আদর যত্ন করতেন। আর্থিক সচ্ছলতাও ছিল। সন্তানদের প্রতিপালন ও দুধ পান করানোর জন্য ধাত্রী নিয়োগ করতেন। সন্তান প্রসবের আগেই সব ব্যবস্থা করে রাখতেন।[১০৭] সাফিয়্যার দাসী সালামাকে মজুরীর বিনিময়ে সন্তানদের দেখাশুনার জন্য নিয়োগ করেন। সালামা তাদেরকে দুধপান ও আহার করাতেন।[১০৮]

হযরত খাদীজা (রা) যে তাঁর সকল সন্তানকে কী পরিমাণ ভালোবাসতেন এবং তাদের মঙ্গল কামনায় কেমন অস্থির থাকতেন, একটি বর্ণনায় তা কিছুটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ঔরসে আমার যে সকল সন্তান হয়েছে এবং শিশু অবস্থায় মারা গেছে পরকালে তাদের অবস্থান কোথায় হবে? বললেন ঃ জান্নাতে। তিনি আবার জানতে চাইলেন ঃ আমার পৌত্তলিক স্বামীদের ঔরসে যে সন্তান হয়েছে এবং মারা গেছে, তারা কোথায় যাবে? বললেন ঃ জাহান্নামে। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ কোন রকম কর্ম ছাড়াই? বললেন ঃ আল্লাহ জানেন বেঁচে থাকলে কেমন কর্ম তারা করতো।[১০৯] বর্ণনায় সন্তানদের জন্য তাঁর যে আকুলতা তা প্রকাশ পেয়েছে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজার (রা) ফজীলাত, মহাত্ম্য ও মর্যাদা বর্ণনা করে শেষ করা

---

১০৪. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ আনসাবুল আশরাফ-১/৩৯৬-৪০৩; আজ-জাহাবী ঃ তারীখ-১/১৪২ তাবাকাত-১/১৩৩
১০৫. সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৯১
১০৬. তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-২/৩৪০
১০৭. আল-আলাম আন-নুবালা-২/৩৪৬
১০৮. আল-ইসাবা-৪/২৮২
১০৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১১৩

যাবে না। আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করি, আরবের সেই ঘোর অন্ধকার দিনে কিভাবে এক মহিলা সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন চিত্তে রাসূলুল্লাহর (সা) নুবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করছেন। তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ও সংশয় নেই। সেই ওহী লাভের প্রথম দিনটি, ওয়ারাকার নিকট গমন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) নবী হওয়া সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা সবকিছুই গভীরভাবে ভেবে দেখার বিষয়।

রাসূলুল্লাহর (সা) নুবুওয়াত লাভের পূর্ব থেকে খাদীজা (রা) যেন দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন–তিনি নবী হবেন। তাই জিবরীলের (আ) আগমনের পর ক্ষণিকের জন্যও তাঁর মনে একটুও ইতস্ততঃ ভাব দেখা দেয়নি। এতে তাঁর গভীর দূরদৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নুবুওয়াত লাভের আগে ও পরে সর্বদাই তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) সম্মান করেছেন, তাঁর প্রতিটি কথা প্রশ্নহীনভাবে বিশ্বাস করেছেন। পঁচিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে মুহূর্তের জন্য তাঁর মনে কোন প্রকার সন্দেহ দানা বাঁধতে পারেনি। সেই জাহিলী যুগেও তিনি ছিলেন পুতঃপবিত্র। কখনও মূর্তিপূজা করেননি। নবী করীম (সা) একদিন তাঁকে বললেন ঃ 'আমি কখনও লাত-উয্‌যার ইবাদাত করবো না।' খাদীজা (রা) বললেন ঃ লাত-উয্‌যার প্রসঙ্গ ছেড়ে দিন। তাদের কথাই উঠাবেন না।[১১০]

নুবুওয়াতে মুহাম্মাদীর (সা) উপর প্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারিণী এবং তাঁর সাথে প্রথম সালাত আদায়কারিণীই শুধু তিনি নন। সেই ঘোর দুর্দিনে ইসলামের জন্য তিনি যে শক্তি যুগিয়েছেন চিরদিন তা অম্লান হয়ে থাকবে। ইসলামের সেই সূচনা লগ্নে প্রকৃতপক্ষেই তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) পরামর্শদাত্রী। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ের পর নিজের সমস্ত সম্পদ তিনি স্বামীর হাতে তুলে দেন। যায়িদ ইবন হারিসা (রা) ছিলেন খাদিজার (রা) প্রিয় দাস। তাকেও তিনি স্বামীকে উপহার দেন।

ইবন হিশাম বলেন ঃ খাদীজার (রা) ভাতিজা হাকীম ইবন হিযাম সিরিয়ার বাজার থেকে অনেকগুলো দাস কিনে আনেন। তাদের মধ্যে যায়িদ ইবন হারিসাও একজন। ফুফু খাদীজা গেলেন ভাতিজা হাকীমের সাথে দেখা করতে। ভাতিজা বললেন ঃ ফুফু, এ দাসগুলির মধ্যে যেটি পছন্দ হয়, আপনি বেছে নিন। খাদীজা যায়িদকে পছন্দ করে নিয়ে আসেন। রাসূল (সা) যায়িদকে দেখে পছন্দ করেন। খাদীজা (রা) তা বুঝতে পেরে রাসূলুল্লাহকে (সা) উপহার দেন। রাসূল (সা) তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে পালিত পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন।[১১১]

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে; হাকীম তাঁর ফুফু খাদীজার (রা) জন্য যায়িদকে (রা) আরবের 'উকাজ মেলা থেকে কিনে আনেন। আর এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা) যখন খাদীজার (রা) পণ্য নিয়ে মায়সারার সাথে সিরিয়া যান, সেই সফরে যায়িদকে খাদীজার (রা) জন্য কিনে আনেন। বিয়ের পর খাদীজা (রা) যায়িদকে উপহার হিসেবে

---

১১০. মুসনাদ-৪/২২২

১১১. সীরাতু ইবন হিশাম-১/২৪৮

রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে তুলে দেন।[১১২]

হযরত খাদীজা (রা) স্বামী রাসূলুল্লাহকে (সা) গভীরভাবে ভালোবাসতেন। স্বামীর বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদেরকেও সম্মান করতেন, খোঁজ-খবর নিতেন এবং তাঁদের বিপদ-আপদে পাশে দাঁড়াতেন। একবার রাসূলুল্লাহর (সা) দুধমাতা হালীমা আসলেন দেখা করতে। খাদীজা (রা) আপন শাশুড়ীর মত মর্যাদা ও সম্মান দিয়ে তার সেবা-যত্ন করলেন। হালীমা রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন, তাঁদের অঞ্চলে খরা ও অনাবৃষ্টির কারণে পশু-পাখী মারা গেছে এবং অভাব দেখা দিয়েছে। রাসূল (সা) তাঁদের সমস্যা নিয়ে হযরত খাদীজার (রা) সাথে কথা বললেন। খাদীজা (রা) হালীমাকে চল্লিশটি ছাগল ও উট দান করলেন তাঁর খান্দানের মধ্যে বন্টনের জন্য।[১১৩]

আবু লাহাবের দাসী সুওয়ায়বা ছিলেন হযরত রাসূলে কারীমের (রা) আর এক দুধমাতা। তিনি মাঝে মাঝে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আসতেন। রাসূল (সা) তাঁর প্রতি সম্মান দেখাতেন, এবং তাঁর সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। খাদীজাও (রা) তাঁকে খুবই সম্মান ও সমাদর করতেন। তিনি সুওয়ায়বাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দানের উদ্দেশ্যে আবু লাহাবের নিকট তাঁকে কেনার প্রস্তাব করেন; কিন্তু সে বিক্রী করতে রাজি হয়নি।[১১৪]

মক্কার একজন বিত্তশালী মহিলা হওয়া সত্ত্বেও নিজ হাতে স্বামীর সেবা করতেন। সন্তানদের প্রতিপালনসহ গৃহকর্মের যাবতীয় দায়িত্ব নিজে পালন করতেন। স্বামীর আহার, বিশ্রাম ইত্যাদির তদারক নিজে করতেন। হযরত আবু হুরায়রার (রা) একটি হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন ঃ

أتى جبريل النبى صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله هذه خديجة قد اتت معها إناء فيه إدام أوطعام أوشراب فاذا هى اتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومنى وبشرها ببيت فى الجنة من قصب -

—একদিন জিবরীল (আ) নবীর (সা) নিকট এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই যে খাদীজা আসছেন পাত্রে করে আপনার জন্য তরকারি, খাদ্যসামগ্রী অথবা পানীয় কিছু নিয়ে। আপনি তাঁর রব ও আমার পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম বলবেন এবং জান্নাতে মণি-মুক্তার তৈরী একটি বাড়ীর সুসংবাদ দান করবেন।[১১৫]

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহর (সা) ঘর-গৃহস্থালীর যাবতীয় দায়িত্ব অন্যের উপর ছেড়ে না দিয়ে নিজেই সম্পন্ন করতেন।

---

১১২. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৬৭, ৪৭৬.

১১৩. প্রাগুক্ত-১/৯৫

১১৪. প্রাগুক্ত-১/৯৬

১১৫. বুখারী ঃ কিতাবুল মানাকিব ঃ তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-২/৩৪১; আল-ইসাবা-৪/২৮৩

হযরত রাসূলে কারীম (সা)ও খাদীজাকে (রা) গভীরভাবে ভালোবাসতেন। খাদীজার (রা) মৃত্যুর পরও আজীবন তাঁর স্মৃতি ও তার অবদান মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হননি। রাসূলুল্লাহর (সা) বহু আচরণ এবং বহু মন্তব্যে তা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হযরত আয়িশা (রা) বলেন ঃ

ما غرت على أحد من نساء النبى صلعم ماغرت على خديجة وما رأيتها ـ ولكن كان النبى صلي الله عليه وسلم يكثر ذكرها ، وربما ذبح الشاة، ثم يقطعها أعضاء، ثم يبعثها فى صدايق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن فى الدنيا إمرأة إلا خديجة ، فيقول إنها كانت وكانت وكان لى منها ولد ـ

–আমি খাদীজাকে (রা) দেখিনি। তাসত্ত্বেও তাকে যে পরিমাণ ঈর্ষা করতাম, রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য কোন স্ত্রীকে সে পরিমাণ ঈর্ষা করিনি। কারণ রাসূল (সা) খুব বেশী বেশী তাঁকে স্মরণ করতেন। তিনি যখনই কোন ছাগল জবেহ করতেন, তার কিছু অংশ কেটে খাদীজার বান্ধবীদের কাছে পাঠাতেন। আমি যদি বলতাম, দুনিয়াতে যেন খাদীজা ছাড়া আর কোন নারী নেই। তিনি বলতেন, খাদীজা এমন ছিল, এমন ছিল। তাঁর থেকেই আমি সন্তান লাভ করেছি।[১১৬]

'আয়িশা (রা) আরও বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) একবার খাদীজার কথা আলোচনা করলেন। আমি একটু কটূক্তি করে বললাম ঃ তিনি তো একজন বৃদ্ধা। তাছাড়া এমন, এমন। আল্লাহ তাঁর পরিবর্তে উত্তম নারী আপনাকে দান করেছেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহ তাঁর চেয়ে উত্তম নারী আমাকে দান করেননি। মানুষ যখন আমাকে মানতে অস্বীকার করেছে, তখন সে আমার প্রতি ঈমান এনেছে। মানুষ যখন আমাকে বঞ্চিত করেছে, তখন সে তার সম্পদে আমাকে অংশীদার করেছে। আল্লাহ তার সন্তান আমাকে দান করেছেন এবং অন্যদের সন্তান থেকে বঞ্চিত করেছেন। আমি বললাম ঃ আমি আর কক্ষণও তাঁকে নিয়ে আপনাকে তিরস্কার করবো না।[১১৭]

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে। আয়িশা (রা) বলেন ঃ খাদীজার মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহর (সা) গৃহে কোন ছাগল জবেহ হলেই বলতেন ঃ কিছু গোশ্‌ত তোমরা খাদীজার ব্যান্ধবীদের বাড়ীতে পাঠাও। একদিন তিনি খাদীজার আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ আমি খাদীজার বান্ধবীদের ভালোবাসি।[১১৮] আয়িশা (রা) আরও বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) খাদীজার কথা

---

১১৬. বুখারী ঃ আল-মানাকিব ঃ ফাদলু খাদীজা ; মুসলিম (২৪৩৫), সিফাতুস সাফওয়া-২/৩

১১৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১১৭; মুসনাদ ৬/১১৭-১১৮; আল-ইসাবা-৪/২৮৩

১১৮. সিফাতুস সাফওয়া-২/৩; আল-ইসাবা-৪/২৮৩

উঠলেই তাঁর কিছু প্রশংসা না করে বিরত হতেন না।[১১৯] তিনি খাদীজার কিছু আলোচনা না করে প্রতিদিন ঘর থেকে বের হতেন না।[১২০] আর একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) মুখে খাদীজার (রা) আলোচনা শুনে আয়িশা (রা) বলেন ঃ আল্লাহ তো এই বৃদ্ধার পরিবর্তে আপনাকে অন্য নারী দান করেছেন। একথার পর রাসূল (সা) ভীষণ রেগে যান। 'আয়িশা (রা) অনুতপ্ত হয়ে মনে মনে বলেন ঃ হে আল্লাহ, যদি তুমি রাসূলুল্লাহর (সা) রাগ দূর করে দাও, তাহলে আর কক্ষণও তার সম্পর্কে কোন মন্দ কথা উচ্চারণ করবো না। রাসূল (সা) 'আয়িশার (রা) মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন ঃ তুমি এমন কথা কি করে বলতে পার? মানুষ যখন আমাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে তখন সে আমার উপর ঈমান এনেছে। মানুষ যখন আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে তখন সে আশ্রয় দিয়েছে।[১২১] আরেকবার রাসূল (সা) আয়িশাকে (রা) বলেন ঃ 'আল্লাহ আমার অন্তরে তাঁর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।'

আবুল 'আস ইবনুর রাবী' মক্কার একজন সৎ, বিশ্বস্ত ও বিত্তবান ব্যবসায়ী যুবক। খাদীজার (রা) বোন হালা বিন্ত খুওয়াইলিদের ছেলে। খালা খাদীজা (রা) তাঁকে নিজের ছেলের মতই দেখতেন। তিনি নিজের মেয়ে হযরত যায়নাবের (রা) সাথে আবুল আসের বিয়ে দিতে চাইলেন। রাসূল (সা) অমত করলেন না। বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের সময় হযরত খাদীজা (রা) মেয়ে যায়নাবকে (রা) যে সকল জিনিস উপহার দিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি সোনার হার ছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা) নুবুওয়াত লাভ করলেন। খাদীজার (রা) কন্যারা মুসলমান হলেন। কিন্তু আবুল 'আস অমুসলিমই থেকে গেলেন। খাদীজা (রা) দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। রাসূল (সা) মদীনায় হিজরত করলেন। মেয়ে যায়নাব (রা) মক্কায় স্বামীর কাছে থেকে গেলেন। আবুল 'আস মক্কার কুরাইশদের সাথে বদরে গেলেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়তে। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। বন্দী হয়ে তিনি মদীনায় শ্বশুর রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পৌঁছলেন। মুক্তিপণের বিনিময়ে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত হলো। বন্দীদের আপনজনেরা মক্কা থেকে মুক্তিপণের অর্থ পাঠালো। যায়নাব (রা) স্বামীর মুক্তিপণ বাবদ যে অর্থ সম্পদ পাঠালেন তার মধ্যে একটি সোনার হার ছিল। মূলতঃ সেটি ছিল মা খাদীজার (রা) দেওয়া বিয়ের সময়ের সেই হারটি। হারটি দেখে রাসূলুল্লাহর (সা) মনটি ব্যথা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লো। তাঁর মানসপটে ভেসে উঠলো খাদীজার (রা) স্মৃতি। তিনি সাহাবীদের বললেন ঃ তোমরা পারলে যায়নাবের বন্দীকে ছেড়ে দাও এবং অর্থও ফেরত দাও। সাহাবীরা রাজি হলেন। তাঁরা কোন মুক্তিপণ ছাড়াই আবুল 'আসকে মুক্তি দিলেন।[১২২]

---

১১৯. আজ-জাহাবী; তারীখ-১/১৪১; আল-মুসনাদ-৬/১১৭, ১১৮; সিয়ারু আলাম আন-নুবালা-২/১১২
১২০. আল-ইসাবা-৪/২৮৩; তাহজীবুল আসমা-২/৩৪১
১২১. সিয়ারু আলাম আন-নুবালা-২/১১২
১২২. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬৫১-৬৫৩

হযরত আয়িশা (রা) বলেন ঃ

استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف أستيذان خديجة فارتاع لذلك فقال اللهم هالة قالت فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت فى الدهر قد أبدلك الله خيرا منها -

–খাদীজার (রা) বোন হালা বিন্‌ত খুওয়াইলিদ একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য অনুমতি চাইলেন। (দুই বোনের গলার স্বর ও অনুমতি চাওয়ার ভঙ্গি একই রকম ছিল বলে) রাসূল (সা) খাদীজার (রা) অনুমতি চাওয়ার কথা মনে করে হতচকিত হয়ে ওঠেন। তারপর (স্বাভাবিক হয়ে) তিনি বলে উঠলেন ঃ ইয়া আল্লাহ! এ তো দেখছি হালা। আয়িশা (রা) বলেন ঃ এতে আমার ভারী ঈর্ষা হলো। আমি বললাম ঃ কুরাইশ বুড়ীদের এক লাল গালের বুড়ী, যে শেষ হয়ে গেছে কতকাল আগে, তার আবার কি স্মরণ করেন। আল্লাহ তো তার চাইতেও উত্তম স্ত্রী দান করেছেন।[১২৩]

মুহাম্মাদ ইবন সালামা থেকে বর্ণিত হয়েছে। হযরত খাদীজার (রা) ইনতিকালের পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) এত শোকাতুর হয়ে পড়েন যে তাঁর জীবন-আশঙ্কা দেখা দেয়। অবশেষে তিনি আয়িশাকে (রা) বিয়ে করেন।[১২৪]

হযরত খাদীজার (রা) ফজীলাত ও মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) বহু বাণী ও মন্তব্য হাদীসে ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়। আমাদের পূর্বের আলোচনায় তার কিছু পেশ করেছি। এখানে আরও কয়েকটি বাণী তুলে ধরছি।

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

حسبك من نساء العالمين أربع -

–বিশ্বের নারীদের মধ্যে তোমার জন্য চারজনই যথেষ্ট।[১২৫]

আনাস (রা) থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, হয়েছে। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

خَيْرَ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ مَرْيَمَ، وَاٰسِيَةُ، وَخَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدْ، وَفَاطِمَةُ -

–বিশ্বের নারী জাতির মধ্যে সর্বোত্তম হলেন ঃ মারইয়াম, আসিয়া, খাদীজা বিন্‌ত খুওয়াইলিদ ও ফাতিমা (রা)।[১২৬]

---

১২৩. বুখারী ঃ আল-মানাকিব ঃ ফাদলু খাদীজা।

১২৪. সিয়ারু আলাম আন-নুবালা-২/১১৬; শারহুল মাওয়াহিব-৩/২২৭

১২৫. তিরমিজী ঃ আল-মানাকিব (৩৮৭৮); আল-হাকেম-৩/১৫৭; মুসনাদ-৩/১৩৫

১২৬. সিয়ারু আলাম আন-নুবালা- ২/১১৭

আলী (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি ঃ

خَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ -

—খাদীজা বিনত খুওয়াইলিদ তাঁর সময়ের সর্বোত্তম নারী। মারইয়াম বিনত ইমরান তাঁর সময়ের সর্বোত্তম নারী।[১২৭]

ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

سيدة نساء اهل الجنة بعد مريم فاطمة وخديجة وامرأة فرعون آسية.

—মারইয়াম বিনত ইমরানের পরে ফাতিমা, খাদীজা ও ফির'আউনের স্ত্রী আসিয়া জান্নাতের অধিবাসী মহিলাদের নেত্রী।[১২৮]

ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীসে এসেছে ঃ জান্নাতের অধিকারী নারীদের মধ্যে খাদীজা, ফাতিমা, মারইয়াম ও আসিয়া সর্বোত্তম। ইমাম নাসাঈ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[১২৯]

হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বহুবার বলতে শুনেছি ঃ

كَنَتْ خَدِيْجَةُ خَيْرِ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ -

—খাদীজা (রা) জগতের সর্বোত্তম নারী।[১৩০]

ইমাম আজ-জাহাবী হযরত খাদীজার স্থান ও মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ তাঁর ফজীলাত অনেক। তাঁর সময়ের বিশ্বের সকল নারীর নেত্রী। যে সকল নারী (বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায়) পূর্ণতা লাভ করেছেন, তিনি তাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী, অতি সম্মানিতা, ধর্মপরায়ণা, নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারিণী এক ভদ্রমহিলা। তিনি জান্নাতের অধিকারিণী। রাসূল (সা) তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং অন্য বিবিগণের উপর তাঁর প্রাধ্যান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তাঁর প্রতি অতিমাত্রায় সম্মান প্রদর্শন করেছেন। তিনি তাঁর পূর্বে এবং তাঁর জীবদ্দশায় দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। রাসূলুল্লাহর (সা) একাধিক সন্তানের জননী। রাসূলুল্লাহর (সা) সর্বোত্তম জীবন সঙ্গিনী। তাঁকে হারিয়ে রাসূল (সা) ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েছেন। নিজের ধন-সম্পদ রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য ব্যয় করেছেন, আর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ব্যবসা পরিচালনা করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁর নবীর মাধ্যমে তাঁকে জান্নাতে মণি-মুক্তার তৈরীর একটি বাড়ীর সুসংবাদ দান করেছেন।[১৩১]

---

১২৭. আজ-জাহাবী ঃ তারীখ-১/১৪১; তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-২/৩৪১; মুসনাদ-১/৩১৬, ৩২২,

১২৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১১৭

১২৯. তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-২/৩৪১; হাকেম-৩/১৮৫

১৩০. আনসাবুল আশরাফ-১/৪১২

১৩১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/১০৯-১১০

অনেকগুলি সূত্রে একথা বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'হে খাদীজা, জিবরীল তোমাকে সালাম জানিয়েছেন।' তাঁর মধ্যে কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, জিবরীল বলেন, 'হে মুহাম্মাদ আপনি আপনার রব ও আমার পক্ষ থেকে খাদীজাকে সালাম বলুন।' জবাবে খাদীজা বলেন ঃ১৩২

أَللّٰه السلام ، وَمِنْهُ السلام ، وَعلى جِبريل السلام -

হযরত আনাসের (রা) একটি বর্ণনায় হযরত খাদীজার (রা) জবাবটি এসেছে এ রকম ঃ১৩৩

إنّ الله هو السلام وعلى جبريل السلام و عليك السلام ورَحمة الله .

হযরত খাদীজা (রা) নবী মুহাম্মাদকে (সা) স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে, অটল হয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে এবং নিজের সবকিছু তাঁর হাতে তুলে দিয়ে মানব জাতির অপার কল্যাণ সাধন করে গেছেন। তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করে আমরা শেষ করতে পারবোনা। আল্লাহ পাক ও জিবরীলের (আ) মত আমরাও তাঁর প্রতি অগণিত বার সালাম পেশ করে আমাদের কথার সমাপ্তি টানছি।

---

১৩২. প্রাগুক্ত-২/১১৬; ইবন হিশাম-১/২৪১;
১৩৩. আল-ইসাবা-৪/২৮৩

# সাওদা বিন্‌ত যাম'আ (রা)

হযরত সাওদা (রা) সেই ভাগ্যবতী মহিলা যাঁকে হযরত রাসূলে কারীম (সা) উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজার (রা) মৃত্যুর পর বিয়ে করেন। শুধু তাঁকে নিয়েই তিনি প্রায় তিন বছর বা তার চেয়ে কিছু বেশী সময় দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেন। তারপর উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশাকে (রা) ঘরে তুলে আনেন।[১]

হযরত সাওদা মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের একটি শাখা গোত্র বনু 'আমের ইবন লুই-এর সন্তান। পিতা যাম'আ ইবন কায়স কুরাইশ বংশীয় এবং মাতা শামুস বিন্‌ত কায়স মদীনার বিখ্যাত নাজ্জার গোত্রীয়।[২] রাসূলুল্লাহর (রা) দাদা আবদুল মুত্তালিবের মা সালমাও ছিলেন এই নাজ্জার খান্দানের মেয়ে। সাওদার নানা কায়স ইবন 'আমর এবং সালমা বিন্‌ত 'আমর ছিলেন ভাই-বোন।[৩] হযরত সাওদার ডাকনাম ছিল 'উম্মুল আসওয়াদ'।[৪]

জাহিলী যুগে হযরত সাওদার প্রথম বিয়ে হয় সাকরান ইবন 'আমরের সাথে।[৫] সাকরান ছিলেন সাওদার চাচাতো ভাই।[৬] বিখ্যাত চার-সাহাবা সুহাইল ইবন 'আমর, সাহ্‌ল ইবন 'আমর, সালীত ইবন 'আমর ও হাতেব ইবন 'আমর—এঁরা ছিলেন সাকরানের ভাই।[৭]

হযরত রাসূলে কারীমের নুবুওয়াত লাভের প্রথম পর্বে হযরত সাওদা ও তাঁর স্বামী সাকরান ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা উভয়ে প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারী ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী নর-নারীদের অন্তর্গত। তাঁদের উভয়ের ইসলাম গ্রহণের সময়কাল একই।[৮]

কুরাইশদের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য মক্কার অসহায় মুসলমানদের প্রথম দলটি যখন হাবশায় হিজরাত করে তখনও এই মুসলিম পরিবারটি মক্কার মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকে। কিন্তু তাদের অত্যাচারের মাত্রা যখন সীমা অতিক্রম করতে লাগলো তখন মক্কার মুসলমানদের দ্বিতীয় একটি দল হাবশায় হিজরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সাওদা তাঁর স্বামীসহ এই দলটির সাথে হাবশায় হিজরাত করেন। কয়েক বছর সেখানে অবস্থানের পর আবার মক্কায় ফিরে আসেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের কিছুকাল

---

১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/২৬৫
২. তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত- ২/৩৪৮; তাহজীবুত তাহজীব-১২/৪৫৫
৩. আসাহ আস-সিয়ার- ৬১২
৪ তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত- ২/৩৪৮
৫. সীরাতু ইবন হিশাম- ২/৬৪৪; উসুদুলগাবা-৫/৪১২;
৬. শাজারাতুজ জাহাব-১/৩৪; আল-ইসতী'য়াব-৪/৩২৩
৭. আসাহ আস-সিয়ার- ৬১৩
৮. শিবলী নু'মানী ঃ সীরাতুন নবী- ২/৪০৪; সিয়ারুস সাহাবিয়াত-১৩

পূর্বে সাকরান মুসলমান অবস্থায় মক্কায় মারা যান। রাসূল (সা) তাঁকে মক্কায় দাফন করেন।[৯]

একথাও বর্ণিত হয়েছে যে প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় দলটির সাথে স্বামীসহ তিনি হাবশা হিজরাত করেন। আবু 'উবাইদাহ্ ও মা'মারসহ একদল সীরাত বিশেষজ্ঞ বলেছেন, সাকরান হাবশা থেকে মক্কায় ফিরে আসেন। তারপর মুরতাদ হয়ে অথবা খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে আবার হাবশায় ফিরে যান এবং সেখানেই মারা যান। বালাজুরী বলেন, প্রথম বর্ণনাটি সঠিক।[১০]

রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের প্রায় তিন বছর পূর্বে উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজার ইনতিকালের পর তিনি হযরত সাওদাকে (রা) বিয়ে করেন।[১১]

হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন হযরত রাসূলে কারীমের (রা) প্রথমা এবং প্রিয়তমা স্ত্রী। একাকীত্বের অস্থিরতায়, বিপদ-আপদের ভয়াবহতায়, এবং অত্যাচারী-উৎপীড়কের নিষ্ঠুর পৈশাচিকতায় তিনি ছিলেন প্রিয় স্বামীর একান্ত সংগিনী। প্রতিটি সংকটময় মুহূর্তে সান্ত্বনা দিতেন, সমবেদনা প্রকাশ এবং পাশে থেকে সকল বাধা অতিক্রমে সাহায্য করতেন। এমন একজন অন্তরঙ্গ স্ত্রী ও বান্ধবীর তিরোধানে রাসূল (সা) দারুণ বিমর্ষ ও বেদনাহত হয়ে পড়েন। তাঁর বিচ্ছেদ ব্যথায় এত কাতর হয়ে পড়েন যে জীবনও সংকটজনক হয়ে দাঁড়ায়।[১২] তাছাড়া খাদীজা ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) সন্তানদের জননী এবং গৃহকর্ত্রী। তাঁর অনুপস্থিতিতে মাতৃহারা সন্তানদের লালন-পালন ও ঘর সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। উপরন্তু পৌত্তলিকদের জ্বালাতন ও উৎপাতের মাত্রাও বেড়ে যায়।[১৩] রাসূলুল্লাহর (সা) এমন অবস্থা তাঁর সাহাবীদেরকে দারুণভাবে ভাবিয়ে তোলে।

'উসমান ইবন মাজ'উন (মৃ. হিঃ ২) একজন বড় মাপের সাহাবী। তাঁর স্ত্রী খাওলা বিন্ত হাকীম একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গেলেন। নানা কথার ফাঁকে এক সময় তিনি বলে ফেললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আবার বিয়ে করুন! প্রশ্ন করলেন ঃ পাত্রী কে? খাওলা বললেন ঃ বিধবা এবং কুমারী—দুই রকম পাত্রীই আছে। এখন আপনি যাকে পসন্দ করেন তার ব্যাপারে কথা বলা যেতে পারে। তিনি আবার জানতে চাইলেন ঃ পাত্রী কে ? খাওলা বললেন ঃ বিধবা পাত্রী সাওদা বিন্ত যাম'আ, আর কুমারী পাত্রী আবু বকরের মেয়ে আয়িশা।[১৪] রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ এ ব্যাপারে ভূমিকা পালনের জন্য মেয়েরা অধিকতর যোগ্য। এভাবে তিনি সম্মতি দান করেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) সম্মতি পেয়ে খাওলা গেলেন সাওদার গৃহে। সাওদার পিতা তখন

---

৯. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৩২৯; ৩৬৮; আল-আ'লাম-৩/২১৪ তাবাকাত-৮/৫৪.
১০. আনসাবুল আশরাফ-১/২১৯
১১. শাজারাতুজ জাহাব-১/৩৪
১২. তাবাকাত-৮৫৪; সুলায়মান নাদবী; সীরাতে 'আয়িশা-২৪
১৩. ডঃ আহমাদ শালবা : আত-তারীখ আল-ইসলামী-১/৩২৭
১৪. সীরাতে 'আয়িশা-২৪

জীবনের প্রান্ত সীমায়। পার্থিব সকল কর্মতৎপরতা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিয়েছেন। খাওলা তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে 'আনঈম সাবাহান!' (সুপ্রভাত) বলে জাহিলী রীতিতে সম্ভাষণ জানান।

বৃদ্ধ প্রশ্ন করেন ঃ কে তুমি ? খাওলা উত্তর দেন ঃ আমি খাওলা বিন্‌ত হাকীম। বৃদ্ধ খাওলাকে স্বাগতম জানিয়ে কাছে বসান। খাওলা বিয়ের পয়গাম পেশ করেন এভাবে ঃ মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন আবদুল মুত্তালিব সাওদাকে বিয়ের প্রস্তাব করেছেন। বৃদ্ধ বলেন ঃ এতো অভিজাত কুফু। তোমার বান্ধবী সাওদা কি বলে? খাওলা বলেন ঃ তার মত আছে। বৃদ্ধ সাওদাকে ডাকতে বলেন। সাওদা উপস্থিত হলে বলেন ঃ আমার মেয়ে! এই মেয়ে (খাওলা) বলছে, মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহ তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে তাকে পাঠিয়েছে। অভিজাত পাত্র। আমি তার সাথে তোমার বিয়ে দিতে চাই, তুমি কি রাজি? সাওদা বলেন ঃ হাঁ, রাজি। তখন বৃদ্ধ খাওলাকে বলেন ঃ তুমি যাও, মুহাম্মাদকে ডেকে আন। রাসূল (সা) বরবেশে উপস্থিত হন এবং সাওদার পিতা সাওদাকে তাঁর হাতে তুলে দেন।[১৫]

কোন কোন বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, বিয়ের পূর্বে রাসূল (সা) স্বয়ং সাওদার সাথে সরাসরি আলোচনা করেন। হতে পারে খাওলা এ আলোচনার ব্যবস্থা করেন। ইমাম আহমাদ আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) একটি বর্ণনা সংকলন করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ রাসূল (সা) তাঁর গোত্রের সাওদা নামের একটি মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। তিনি ছিলেন মুসীবতের বাস্তব রূপ। পাঁচ অথবা ছয়টি ছেলে-মেয়ে রেখে স্বামী মারা গেছেন। রাসূল (সা) তাঁকে বললেন ঃ আমার প্রস্তাবে রাজি হতে তোমার বাধা কিসের? সাওদা বললেন ঃ আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর নবী! সৃষ্টি জগতের মধ্যে আপনি আমার সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি। আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করতে আমার কোন বাধা নেই কিন্তু আমার ভয়, আমার এই সন্তানগুলি সকাল-সন্ধ্যা সর্বক্ষণ আপনাকে বিরক্ত করবে, আপনার সেবা থেকে আমাকে বিরত রাখবে। রাসূল (সা) বললেন ঃ এছাড়া আর কোন বাধা আছে? সাওদা বললেন ঃ না, আর কোন বাধা নেই। রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহ তোমাকে করুণা করুন। সর্বোত্তম নারী তারা যারা উটের পিঠে পিছন দিকে চড়ে। কুরাইশদের সৎকর্মশীলা নারী তারা যারা তাদের শিশুসন্তানদের প্রতি মমতাময়ী এবং স্বামীদের প্রতি যত্নশীলা।[১৬]

বুকাইর ইবনুল আশাজ্জ থেকে বর্ণিত হয়েছে। সাকরান সাওদাকে নিয়ে মক্কায় ফিরে এসে মারা যান। 'ইদ্দত পালনের পর রাসূল (সা) তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব করেন। সাওদা বলেন ঃ আমার বিষয়টি আপনার উপর ছেড়ে দিলাম। রাসূল (সা) বলেন ঃ তুমি তোমার গোত্রের কাউকে বিয়ের কাজটি সম্পন্ন করার দায়িত্ব দাও। অতঃপর সাওদা হাতেব ইবন

১৫. ইবন কাসীর ঃ সীরাতুননাবী-১/৩১৭-৩১৮; তাবাকাত-৮/৫৩; তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-১/১৬৬

১৬. ইবন কাসীর-১/৩১৮

'আমর আল-'আমেরীকে দায়িত্ব দেন। তিনিই সাওদাকে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ে দেন। এই হাতেব একজন মুহাজির ও বদরী ব্যক্তি।[১৭]

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়েতে সাওদার ওলী কে হয়েছিলেন সে সম্পর্কে দুই রকম ধারণা পাওয়া যায়। ১. সাওদার পিতা নিজেই ওলী হয়ে মেয়ের বিয়ে দেন। ২. সালীত ইবন 'আমর অথবা হাতেব মতান্তরে আবু হাতেব ইবন 'আমর আল-আমেরী। কেউ কেউ বলেছেন, সাওদার পিতা সম্ভবত বার্ধক্যের ভারে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। এ কারণে হাতেব অথবা সালীতকে ওলী নিয়োগ করেছিলেন।[১৮] ইবন ইসহাক বলেন ঃ সালীত ও আবু হাতেব উভয়ে এই বিয়ের সময় মক্কায় ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন হাবশায়।[১৯] সুতরাং তাঁদের ওলী হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। রাসূল (সা) সাওদাকে চার শো দিরহাম মোহর দান করেন।[২০]

আল-ওয়াকিদী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাওদার বিয়ে হয় নুবুওয়াতের দশম বছরে রমজান মাসে।[২১] যেহেতু সাওদা ও আয়িশার (রা) বিয়ে কাছাকাছি সময়ে হয়েছিল, এ কারণে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায় যে, কার বিয়েটি আগে সম্পন্ন হয়েছিল। এ সম্পর্কে যত বর্ণনা আছে, তা পর্যালোচনা করলে দুই রকমের ধারণা পাওয়া যায়। প্রথমতঃ খাওলা একই সাথে 'আয়িশা ও সাওদার বিয়ের প্রস্তাব দেন। রাসূল (সা) দুইটি প্রস্তাবেই সম্মতি দিয়ে খাওলাকে পাত্রী পক্ষের সাথে কথা বলার অনুমতি দান করেন। খাওলা প্রথমে 'আয়িশার পরিবারের সাথে কথা বলেন এবং বিয়ের ব্যবস্থা করেন। এরপর সাওদার বিয়ের ব্যবস্থা হয়। ইমাম আহমাদ 'আয়িশার (রা) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ সাওদা প্রথম মহিলা যাঁকে রাসূল (সা) আমার পরে বিয়ে করেন। আর এটাই আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আকীলের মত।[২২]

পক্ষান্তরে বুকাইর ইবনুল আশাজ্জের বর্ণনা মতে, খাদীজার পরে রাসূল (সা) সাওদাকে বিয়ে করেন।[২৩] ইবন হিব্বানও একথা বলেছেন।[২৪] আবদুল্লাহ ইবন মুসলিম বলেন ঃ খাদীজার মৃত্যুর পর এবং 'আয়িশাকে বিয়ের আগে রাসূল (সা) নুবুওয়াতের দশম বছরে রমজান মাসে সাওদাকে বিয়ে করেন। মক্কায় তাঁকে নিয়ে ঘর করেন এবং তাঁকে নিয়ে মদীনায় হিজরাত করেন।[২৫]

---

১৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৬৭; তাবাকাত-৮/৫৩
১৮. নিয়ায ফতেহপুরী : সাহাবিয়াত-৩৩
১৯. ইবন হিশাম-২/৬৪৪
২০. যারকানী: শারহুল মাওয়াহিব-৩/২৬০; শিবলী নু'মানী-২/৪০৪; ইবন হিশাম-২/৬৪৪
২১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৬৭; জাহাবী : তারীখ-১/১৬৬
২২. ইবন কাসীর-১/৩১৮, যারকানী-৩/২৬০
২৩. তাবাকাত-৮/৫৩
২৪. তাহজীবুত তাহজীব-১২/৪৫৫
২৫. তাবাকাত-৮/৫৩

আবু সালামা ইবন 'আবদির রহমান ও ইয়াহইয়া ইবন 'আবদির রহমান—উভয়ে বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতি পেয়ে খাওলা যথাক্রমে সাওদা ও আয়িশার নিকট প্রস্তাব নিয়ে যান এবং তাঁদের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। রাসূল (সা) সাওদাকে নিয়ে মক্কায় ঘর-সংসার করেন। আর 'আয়িশার বয়স তখন মাত্র ছয় বছর। মদীনায় হিজরাতের পর তাঁকে ঘরে তুলে নেন।[২৬] খাদীজার পরে এবং 'আয়িশার পূর্বে রাসূল (সা) সাওদাকে বিয়ে করেন– একথা বলেছেন ইবন ইসহাক, কাতাদাহ, আবু 'উবাইদাহ, ইবন কুতায়বাহ্ ও আরো অনেকে।[২৭]

ইবন ইসহাক রাসূলুল্লাহর (সা) সহধর্মিণীদের ক্রমধারা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ ১. খাদীজা, ২. সাওদা, ৩, 'আয়িশা, ৪. হাফসা, ৫. যয়নাব বিন্ত খুযায়মা, ৬. উম্মু হাবীবা, ৭. উম্মু সালামা, ৮. যয়নাব বিন্ত জাহাশ, ৯. জুওয়াইরিয়্যা, ১০. সাফিয়্যা, ১১. মায়মূনা।[২৮]

হযরত সাওদার ভাই 'আবদুল্লাহ ইবন যাম'আ এই বিয়ের সময় পর্যন্ত অমুসলিম ছিলেন। বিয়ের সময় তিনি গৃহে ছিলেন না। বিয়ের কাজ শেষ হওয়ার পর জানতে পেরে ক্রোধে উত্তেজনায় ফেটে পড়েন। দুঃখ ও ক্ষোভে মাথা কুটতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি একজন আদর্শ মুসলমান হন। তিনি আমরণ তাঁর সেইদিনের আচরণের জন্য সর্বদা দুঃখ প্রকাশ করতেন।[২৯]

হযরত সাওদার বিয়ের সময়কাল নিয়েও সীরাত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একটু মতবিরোধ দেখা যায়। তাবাকাতসহ বিভিন্ন গ্রন্থে নুবুওয়াতের দশম সনের কথা বর্ণিত হয়েছে। আর যারকানী (৩/৪৬০) অষ্টম সনের কথা লিখেছেন। মূলতঃ এই বিরোধের কারণ হলো হযরত খাদীজার (রা) মৃত্যুর সময়কাল নিয়ে মতবিরোধ।[৩০]

কিছু কিছু বর্ণনায় এসেছে, হযরত সাওদা (রা) তাঁর প্রথম স্বামীর জীবদ্দশায় দুইটি স্বপ্ন দেখেন এবং স্বামীর নিকট বর্ণনা করলে তিনি যে তা'বীর বা ব্যাখ্যা করেন তা সত্যে পরিণত হয়। হিশাম ইবন মুহাম্মাদের সূত্রে ইবন সা'দ লিখেছেন, সাওদা তাঁর প্রথম স্বামী সাকরানের জীবদ্দশায় একবার স্বপ্নে দেখলেন যে, রাসূল (সা) কাছে এসে একখানি পা তাঁর কাঁধে রাখলেন। সাওদা স্বপ্নের কথা স্বামীকে জানালে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি যদি এ স্বপ্ন দেখে থাক তাহলে আমার মৃত্যু হবে এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তোমার বিয়ে হবে।[৩১]

আর একবার স্বপ্নে দেখেন, তিনি বালিশে হেলান দিয়ে শুয়ে আছেন। হঠাৎ আকাশ

---

২৬. প্রাগুক্ত-৮/৫৭
২৭. তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-২/৩৪৮
২৮. প্রাগুক্ত-৩/৩৪৯
২৯. যারকানী-৩/৪৬০; জাহাবী : তারীখ-১/১৬৬
৩০. শিবলী নু'মানী-২/৪০৪
৩১. তাবাকাত-৮/৫৭; আল-ইসাবা-৪/৩৩৮

থেকে চাঁদ ভেঙ্গে তাঁর ওপর এসে পড়ে। স্বামী স্বপ্নের কথা শুনে বলেন, খুব শিগ্গির আমি মারা যাচ্ছি। আর আমার মৃত্যুর পর তোমার দ্বিতীয় বিয়ে হবে। সেই দিন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অল্প কিছুদিন পর মারা যান।[৩২]

অধ্যাপক আহমাদ 'আতিয়্যা তাঁর আল-কামুস আল-ইসলামী (৩/৫৫৭) গ্রন্থে কোন সূত্রের উল্লেখ ছাড়াই রাসূলুল্লাহর (সা) সাওদাকে বিয়ে করার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ 'সাওদা ছিলেন বয়স্কা বিধবা মহিলা। স্থূলকায় ও চলনে ছিলেন ভারী। রাসূল (সা) তাঁর দয়ার হাত বাড়িয়ে দেন তাঁর বার্ধক্যে সাহায্য এবং জীবনে তিনি যে দুর্ভোগ লাভ করেছেন, তার কিছুটা লাঘবের জন্য।[৩৩]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) নুবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করেন। মদীনায় পৌঁছে একটু স্থির হওয়ার পর যায়িদ ইবন হারিসাকে আবার মক্কায় পাঠান সাওদাসহ অন্যদের নেওয়ার জন্য। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) মদীনায় পৌঁছে যায়িদ ইবন হারিসা ও আবু রাফে'কে দুইটি উট ও পাঁচ শো দিরহাম দিয়ে মক্কায় পাঠান। অতঃপর আমরা সকলে মদীনার দিকে বেরিয়ে পড়ি। যায়িদ ও আবু রাফে' মদীনায় ফিরে যান ফাতিমা, উম্মু কুলসুম, সাওদা, উম্মু আয়মান ও উসামাকে নিয়ে।[৩৪]

দশম হিজরীর বিদায় হজ্জে হযরত সাওদা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন। রাসূল (সা) তাঁকে অন্য লোকদের মুযদালাফা থেকে যাত্রার আগেই মীনায় চলে যাবার অনুমতি দান করেন। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ মুযদালাফার রাতে সাওদা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট মানুষের ভীড়ের আগে মীনায় চলে যাওয়ার অনুমতি চান। সাওদা ছিলেন ভারী মহিলা। তিনি দ্রুত চলাফেরা করতে পারতেন না। রাসূল (সা) তাঁকে অনুমতি দান করেন।[৩৫]

একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) সহধর্মিণীগণ সকলে তাঁর পাশে বসা আছেন। এমন সময় একজন প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম কার মৃত্যু হবে? বললেন ঃ যার হাত সবচেয়ে দীর্ঘ। উপস্থিত সকলে এই উক্তির সরল অর্থ বুঝলেন। তাঁরা নিজেদের হাত মেপে দেখলেন, সাওদার হাত সবার চেয়ে দীর্ঘ। তাঁরা বিশ্বাস করলেন, সাওদার মৃত্যু হবে সবার আগে। কিন্তু যখন হযরত যয়নাব বিন্ত খুযায়মা সবার আগে মারা গেলেন তখন বুঝা গেল, হাত দীর্ঘ হওয়া অর্থ দানশীলতা। দান করা ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কাজ। আযওয়াজে মুতাহ্হারাত (পবিত্র স্ত্রীগণ)-এর মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম মারা যান। সাওদা তখন জীবিত।[৩৬]

---

৩২. যারকানী-৩/৪৬০; আনসাবুল আশরাফ-১/৪০৭

৩৩. আহমাদ শালবা-১/৩২৮

৩৪. তাবাকাত-১/২৩৭-২৩৮; আল-ইসতীয়াব-৪/৪৫০; আনসাবুল আশরাফ-১/২৬৯

৩৫. বুখারী-৩/৪২৩; মুসলিম-১২৯০; আহমাদ-৬/১৬৪; নাসাঈ-৫/২৬৬; তাবাকাত-৮/৫৬

৩৬. তাবাকাত-৮/৫৫; আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৬

হযরত সাওদার (রা) মৃত্যুর সময়কাল সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞদের দারুণ মতভেদ রয়েছে। আল-ওয়াকিদী বলেন, আমাদের নিকট এটাই সঠিক যে, হিজরী ৫৪ সনের শাওয়াল মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।[৩৭] ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী খলীফা হযরত মুয়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালে হিজরী ৫৫ সনের মতটি সর্বাধিক সঠিক বলে মনে করেছেন।[৩৮] ইবন হাজার বলেন, বুখারী তাঁর তারীখে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে তাঁর ইনতিকাল হয়। ইমাম জাহাবী জোর দিয়ে বলেছেন যে, খলীফা 'উমারের খিলাফতকালের শেষ দিকে তাঁর ইনতিকাল হয়। 'উমার শাহাদাত লাভ করেন হিজরী ২৩ সনের জিলহজ্জ মাসের শেষ দিকে। এ কারণে সাওদার ইনতিকাল তারও আগে হয়ে থাকবে।[৩৯] বালাজুরী বলেন, হিজরী ২৩ সনে তিনি মারা যান। খলীফা 'উমার (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান।[৪০] ইবন হিব্বান বলেন, হিজরী ৬৫ সনে তিনি মারা যান।[৪১] আবার একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, খলীফা 'উসমানের খিলাফতকালে প্রায় আশি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।[৪২]

হযরত সাওদার (রা) সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে অধিকাংশ সীরাত গ্রন্থকার কোন আলোচনা করেননি। তবে এতটুকু জানা যায় যে, হযরত রাসূলে পাকের সাথে বৈবাহিক জীবনে তাঁর কোন সন্তান হয়নি।[৪৩] প্রথম স্বামী সাকরানের পক্ষের একটি ছেলে, যার নাম আবদুর রহমান, পারস্যের জালুলার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।[৪৪]

রাসূলুল্লাহর (সা) সহধর্মিণীদের মধ্যে সাওদার চেয়ে দীর্ঘদেহী আর কেউ ছিলেন না। হযরত আয়িশা (রা) বলেছেন, যে একবার তাঁকে দেখেছে তার চোখ থেকে তিনি গোপন হতে পারতেন না।[৪৫] যারকানী বর্ণনা করেছেন, তাঁর কাঠামো ছিল লম্বা।[৪৬] আল্লামাহ শিবলী নু'মানী বলেছেন, তিনি ছিলেন স্থূলকায়।[৪৭] একথা ইমাম জাহাবাও বলেছেন।[৪৮] এ কারণে বিদায় হজ্জের সময় মানুষের ভীড়ের আগে তিনি মুযদালাফা থেকে মীনায় চলে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতি লাভ করেছিলেন।

হযরত সাওদার (রা) সূত্রে মাত্র পাঁচটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে ইমাম বুখারী মাত্র একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাহাবীদের মধ্যে ইবন আব্বাস, ইবন যুবাইর এবং

---

৩৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৬৭; তাবাকাত-৮/৫৭
৩৮. শাজারাতুজ জাহাব-১/৩৪
৩৯. উসুদুল গাবা-৫/৪৮৫; জাহাবী : তারীখ-২/৬৭, ২৯০
৪০. আনসাবুল আশরাফ-১/৪০৮
৪১. তাহজীবুত তাহজীব-১/৪৫৪
৪২. আনসাবুল আশরাফ-১/৪০৮
৪৩. উসুদুল গাবা-৫/৪৮৫
৪৪. যারকানী-৩/২৬০; শিবলী নু'মানী : সীরাত-২/৪০৪
৪৫. বুখারী-২/৭০৭
৪৬. যারকানী-৩/২৫৯
৪৭. সীরাতুন নাবী-২/৪০৫
৪৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৬৫

ইয়াহইয়া ইবন আবদিল্লাহ আল-আনসারী তাঁর থেকে হাদীস শুনেছেন ও বর্ণনা করেছেন।[৪৯]

হিজরাতের প্রায় তিন বছর পূর্বে হযরত সাওদা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) ঘরে আসেন। নুবুওয়াতের দশম বছরের রমজান মাস থেকে ত্রয়োদশ হিজরীর রবীউল আওয়াল মাস পর্যন্ত প্রায় তেরো বছর স্ত্রী হিসাবে রাসূলুল্লাহর (সা) সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। কিছু আগে-পরে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাওদা ও 'আয়িশার বিয়ে হয়। বিয়ের পর আয়িশা প্রায় তিন বছর পিতৃগৃহে অবস্থান করেন। এ সময় সাওদাই ছিলেন মূলতঃ একক গৃহিণী।[৫০] এ সময় তিনি অতি সুষ্ঠুভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) ঘর-গৃহস্থালীর যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন। মাতৃহারা কন্যা ফাতিমাসহ অন্য কন্যাদের লালন-পালনের দায়িত্বও নিজের কাঁধে তুলে নেন। সম্ভবতঃ তখন পর্যন্ত নবী পরিবারের সদস্য হযরত 'আলীরও তত্ত্বাবধান করেন।[৫১] মোটকথা, রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের এক কঠিন ও সংকটময় পর্বে হযরত সাওদা (রা) জীবন সংগিনী হিসাবে কঠিন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে খাদীজার শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করেন।

প্রথম হিজরী সনে 'আয়িশা (রা) যখন স্বামীগৃহে আসেন তখন সতীন সাওদা বিদ্যমান। এ অবস্থায় একে অপরের অধিকারে ভাগ বসানোর কল্পনা করতে পারতেন। কিন্তু এই স্বাভাবিক অনুমানের একেবারে বিপরীত ছিল এই দুইজনের অবস্থা। তাঁদের সংসার জীবনের সবকিছু ছিল পারস্পরিক সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও ঐক্যের। গার্হস্থ্য জীবনের অধিকাংশ বিষয়ে সাওদা ছিলেন আয়িশার বান্ধবী।[৫২] 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ 'সাওদা ছাড়া অন্য কোন মহিলাকে দেখে আমার এমন ইচ্ছা হয়নি যে, তার দেহে যদি আমার প্রাণটি হোত।'[৫৩]

রাসূলুল্লাহর (সা) আনুগত্য ও অনুসরণের ক্ষেত্রে তিনি সকল 'আযওয়াজে মুতাহ্হারাত' (পবিত্র স্ত্রীগণ) অপেক্ষা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী ছিলেন। বিদায় হজ্জে রাসূল (সা) 'উম্মাহাতুল মুমিনীন' এর (ঈমানদারদের মাতাগণ) উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমার পরে তোমরা ঘরে অবস্থান করবে।'[৫৪] হযরত সাওদা ও যয়নাব (রা) এই নির্দেশের উপর এত কঠোরভাবে আমল করেন যে, হজ্জের উদ্দেশ্যেও আর কখনও ঘর থেকে বের হননি। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহর ওফাতের পর তাঁর অন্য সহধর্মিণীগণ হজ্জ করতেন; কিন্তু সাওদা ও যয়নাব বিন্ত জাহাশ রাসূলুল্লাহর (সা) আদেশ কঠোরভাবে পালন করতেন। ঘরে থেকে বের হতেন না।[৫৫] সাওদা (রা) বলতেন, আমি হজ্জ ও

---

৪৯. তাহজীবুত তাহজীব-১২/৪৫৫; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৬৬, ২৬৯

৫০. জাহাবী : তারীখ-২/৬৭

৫১. দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ ইসলামিয়া (উর্দু)-১১/৪৪২

৫২. সীরাতে আয়িশা- ৬৮-৬৯; বুখারী-৩/৩০৮

৫৩. মুসলিম : হিবা অধ্যায়; তাহজীবুত তাহজীব-১২/৪৫৫; আল-ইসতীয়াব-৪/৩২৪

৫৪. তাবাকাত-৮/৫৫; মুসনাদ-২/৪৪৬, ৬/৩২৪, ৫/২১৮; আনসাব-১/৪০৮

৫৫. তাবাকাত-৮/৫৫

'উমরা—দুটোই আদায় করেছি। এখন আল্লাহর নির্দেশ মত ঘরে বসে থাকবো।[৫৬]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) আখলাক ও স্বভাব-চরিত্রের এক অনুপম দিক ছিল দানশীলতা। সাহাবীদের মধ্যে যিনি যত বেশী তাঁর নিকটে থাকার সুযোগ পেয়েছেন তাঁর মধ্যে এই বিশেষ গুণটির ছাপ পড়েছে অধিক। রাসূলুল্লাহর (সা) সান্নিধ্য ও সাহচর্য্য থেকে তাঁর সহধর্মিণীগণই সর্বাধিক মাত্রায় গ্রহণের সুযোগে পেয়েছেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহর (সা) এই বিশেষ গুণটি তাঁদের সকলের মধ্যে সাধারণভাবে পাওয়া গেলেও একমাত্র 'আয়িশা ছাড়া সাওদার মধ্যেই সবচেয়ে বেশী দেখা যায়।[৫৭] ইবন সীরীন বর্ণনা করেছেন, একবার খলীফা হযরত 'উমার (রা) হযরত সাওদার (রা) নিকট একটি থলি পাঠান। তিনি বহনকারীকে প্রশ্ন করেন ঃ থলিতে কি? বললো ঃ দিরহাম। 'থলিতে খেজুরের মত দিরহাম পাঠানো হয়'– একথা বলে তক্ষুণি সবগুলি দিরহাম মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেন।[৫৮]

ইছার বা নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দান করাও ছিল তাঁর চরিত্রের এক উজ্জ্বল দিক। তিনি এবং 'আয়িশা (রা) কিছু আগে-পরে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বৈবাহিক জীবন শুরু করেন। তবে 'আয়িশা অপেক্ষা তাঁর বয়স ছিল বেশী। এ কারণে তাঁর জীবনে বার্ধক্য এসে যায় এবং তাঁর মধ্যে পুরুষের প্রতি আকর্ষণে ভাটা পড়ে। তাই তিনি স্বামী রাসূলুল্লাহর (সা) সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিজের ভাগের রাতটি সতীন 'আয়িশাকে দান করেন।[৫৯] এ সম্পর্কে একবার হযরত আয়িশা (রা) 'উরওয়াকে বললেন ঃ ভাতিজা! রাসূল (সা) স্ত্রীদের জন্য তাঁর বণ্টিত রাতে অবস্থানের ব্যাপারে কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দিতেন না। অনেক দিন এমন গেছে তিনি আমাদের সকলের নিকট এসে ঘুরে গেছেন, কোন স্ত্রীকেই স্পর্শ করেননি। শেষে সেই স্ত্রীর নিকট রাত কাটিয়েছেন যার জন্য রাতটি নির্ধারিত ছিল। সাওদা বিন্ত যাম'আর যখন বার্ধক্য এসে যায় এবং এই ভয় পেয়ে যান যে না জানি রাসূল (সা) তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেন, তখন তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ভাগের রাতটি আমি 'আয়িশাকে দিলাম। রাসূল (সা) তাঁর এ আবেদন মঞ্জুর করেন।[৬০]

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া দরকার। হযরত সাওদার (রা) স্বামী সান্নিধ্যের সময়টুকু 'আয়িশাকে (রা) দান করার বিষয়টি হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহে এসেছে। কিন্তু তারই পাশাপাশি সীরাতের গ্রন্থসমূহে এমন কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় যাতে দেখা যায়, সাওদার (রা) জীবনে বার্ধক্য এসে যাওয়ায় রাসূল (সা) তাঁকে এক তালাক দান করেছিলেন।

---

৫৬. আনসাব-১/৪৬৫; সিয়ারুস সাহাবিয়াত-১৭
৫৭. শিবলী নু'মানী-২/৪০৬
৫৮. তাবাকাত-৮/৫৬; আল-ইসাবা-৪/৩৩৮;
৫৯. বুখারী-হিবা অধ্যায়-৩/৩০৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৬৬; আল-ফাতহুর রাব্বানী-২২/১০৯
৬০. এই বর্ণনাটি বিভিন্ন গ্রন্থে এসেছে। দেখুন ঃ সাহীহ বুখারী-নিকাহ অধ্যায়-৫/১৬১, ৯/২৭৪; মুসলিম-(১৪৬৩); আবু দাউদ (২১৩৫); তিরমিজী- (৩০৪০); ইবন সা'দ-৮/৫৩; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৬৬

তারপর তাঁর বিনীত অনুরোধে রাসূল (সা) তালাক প্রত্যাহার করে নেন। কিন্তু মুহাদ্দিসদের নিকট বর্ণনাগুলি অতি দুর্বল বিধায় গুরুত্বহীন। আর এটাই সঠিক যে রাসূল (সা) তাঁর কোন স্ত্রীকে তালাক দান করেননি।[৬১]

রাসূলুল্লাহ (সা) জীবনের এক বিশেষ সময়ে যাঁকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন এবং যিনি অতি দক্ষতার সাথে খাদীজার (রা) দায়িত্ব পালন করেন, তাঁর বার্ধক্যে রাসূল (সা) তাঁকে দূরে ঠেলে দেবেন, এমন কথা কেমন করে ভাবা যায়? তাই মুহাদ্দিসগণ এসব বর্ণনায় বিশ্বাস করেননি। কোন নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থেও এসব বর্ণনা স্থান পায়নি। কিন্তু তা না পেলে কি হবে? আধুনিক ইতিহাস লেখকদের অনেকে সাওদা (রা) সম্পর্কে অনেক অশালীন মন্তব্য করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) আদর্শ গৃহিণী হতে পারেননি।[৬২]

এ সম্পর্কিত বিভিন্ন বর্ণনা পর্যালোচনা করলে যে তথ্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো, সাওদার জীবনে বার্ধক্য এসে যায়। স্বামীকে তুষ্ট করতে অক্ষম হয়ে পড়েন। এদিকে রাসূলুল্লাহর (সা) একাধিক স্ত্রী বিদ্যমান ছিল। আর তিনি ছিলেন 'আদল ও ইনসাফের মূর্ত প্রতীক। সকল স্ত্রীকে সমান মর্যাদা দান করতেন। স্ত্রীদের জন্য যতটুকু সময় ব্যয় করতেন, তা সকলের জন্য সমানভাবে ভাগ করতেন। এভাবে সাওদাসহ আরো কয়েকজন স্ত্রী সমানভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) আরাম ও প্রশান্তি লাভের সময়ের ভাগ পেতেন। কিন্তু মূলতঃ তাঁদের বয়সের কারণে তাঁরা রাসূলকে (সা) প্রশান্তি দিতে অক্ষম ছিলেন। স্বেচ্ছায় নিজের অধিকার সতীন 'আয়িশার (রা) অনুকূলে ছেড়ে দিয়ে রাসূলকে (সা) দায়মুক্ত করেন। 'আয়িশার (রা) একটি বর্ণনা দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন ঃ সাওদা বৃদ্ধা হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বেশী কাছে পেতে চাইতেন না। আর রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আমার স্থান কি এবং তিনি যে আমাকে বেশী কাছে পেতে চান, তা তিনি বুঝতে পারেন। তিনি ভয় পেয়ে যান, না জানি রাসূল (সা) তাঁকে পৃথক করে দেন। তাই তিনি বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার বারির দিনটি 'আয়িশাকে দান করলাম। আপনি এ ব্যাপারে দায়মুক্ত। রাসূল (সা) তাঁর এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[৬৩]
হযরত সাওদা ছিলেন একটু রুক্ষ প্রকৃতির মহিলা। হযরত 'আয়িশার (রা) সীমাহীন শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন তিনি। তা সত্ত্বেও তিনি বলেছেন, সাওদা খুব দ্রুত রেগে যেতেন। পর্দার হুকুম নাযিলের পূর্ব থেকে হযরত 'উমার (রা) এ বিষয়ে নির্দেশ দানের জন্য প্রায়ই রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট দাবী জানাতেন। যেহেতু এ ব্যাপারে আল্লাহর কোন নির্দেশ আসেনি তাই তিনি চুপ থাকতেন। সে সময় মক্কার কোন গৃহের অভ্যন্তরে পায়খানার ব্যবস্থা ছিল না। পায়খানা থাকাটা তারা শোভন মনে করতো না। সে সময় মেয়েরাও প্রাকৃতিক কর্ম সমাধার জন্য রাতের বেলা বাড়ীর বাইরে খোলা ময়দানে চলে যেত।

---

৬১. টীকা ঃ সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৬৮

৬২. ড. আহমাদ শালবা ঃ আত-তারীখ-১/৩২৮

৬৩. তাবাকাত-৮/৫৩; তাহজীবুত তাহযীব-১২/৪৫৫

হযরত সাওদা ছিলেন স্থূলকায় ও দীর্ঘদেহী। বহু মানুষের মধ্যেও তাঁকে চেনা যেত। একদিন রাতে তিনি বাইরে যাচ্ছেন। পথে 'উমারের দৃষ্টিতে পড়েন। তিনি চেঁচিয়ে বলে ওঠেন ঃ 'আপনাকে আমি চিনে ফেলেছি।' 'উমারের এমন আচরণে সাওদা যেমন লজ্জা পেলেন, তেমনি রেগেও গেলেন। ফিরে এসে 'উমারের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহর নিকট অভিযোগ করেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হিজাবের আয়াত নাযিল হয়।[৬৪]

হিজাবের আয়াত নাযিলের কারণ সম্পর্কে দারুণ মতভেদ আছে। একটি বর্ণনা তো উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় একটি বর্ণনা এই যে, হযরত 'উমার (রা) রাসূলকে (সা) বললেন, আপনার নিকট ভালো-মন্দ সকল ধরনের লোকের সমাগম হয়। আপনি যদি তাদেরকে পর্দা করার নির্দেশ দিতেন, ভালো হতো। ইবন জারীর তাঁর তাফসীরে মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) সাহাবীদের সাথে আহার করছিলেন। হযরত 'আয়িশাও ভোজনে অংশীদার ছিলেন। তাঁর হাতে এক ব্যক্তির হাতের ছোঁয়া লাগে। ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে খুব খারাপ লাগে। এই ঘটনার পর হিজাবের আয়াত নাযিল হয়। তবে সাধারণভাবে একথা প্রসিদ্ধ যে, হযরত যয়নাবের (রা) ওলীমার আহার পর্ব উপলক্ষে 'আয়াতে হিজাব' নাযিল হয়। ইবন হাজার এই বর্ণনাগুলির সমন্বয় করেছেন এভাবে ঃ হিজাবের আয়াত নাযিলের একাধিক কারণ ছিল। তার মধ্যে যয়নাবের ঘটনাটি ছিল সর্বশেষ। আর সেটাই আয়াতের শানে নুযুল। কারণ উক্ত আয়াতের মধ্যেই ঘটনাটির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।[৬৫]

রুক্ষ স্বভাবের হলেও সাওদার (রা) মধ্যে সারল্য ভাবও ছিল। তাঁর কোন কোন কথায় রাসূল (সা) হেসে দিতেন। একদিন তিনি রাসূলকে (সা) বললেন, কাল রাতে আমি আপনার সাথে নামায পড়েছি। আপনি এত দীর্ঘ সময় রুকুতে ছিলেন যে, আমার নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে শুরু হয়েছে বলে মনে হয়েছিল। এ কারণে আমি দীর্ঘক্ষণ নাক চেপে ধরে রেখেছিলাম। রাসূল (সা) তাঁর কথায় মৃদু হেসে দেন।[৬৬]

তিনি একবার 'আয়িশা ও হাফসার (রা) সাথে যাচ্ছেন। তাঁরা একটু কৌতুক করে বললেন, আপনি কি কিছু শুনেছেন? তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ কোন বিষয়ে? তাঁরা বললেন ঃ দাজ্জাল বের হয়েছে। এ কথা শুনে তিনি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। পাশেই একটি তাঁবুতে কিছু লোক আগুন পোহাচ্ছিল। তিনি হঠাৎ সেই তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়েন। হযরত হাফসা ও হযরত আয়িশা তাঁর কাণ্ড দেখে হাসতে হাসতে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পৌঁছেন এবং তাঁদের কৌতুকের কথা বলেন। রাসূল (সা) এসে তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে বলেন, এখনো দাজ্জাল বের হয়নি। তখন সাওদা বেরিয়ে আসেন। গায়ে তাঁর মাকড়সার জাল লেগে ছিল, বাইরে এসে তা সাফ করেন। অনেকের নিকট এ বর্ণনাটির সূত্র দুর্বল

---

৬৪. বুখারী ঃ বাবুল হাদায়া; বাবুত তাহরীম।

৬৫. ফাতহুল বারী-১/২১৯; শিবলী নু'মানী-২/৪০৫

৬৬. তাবাকাত-৮/৫৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৬৮, আল-ইসাবা-৪/৩৩৯

এবং বর্ণনাটি সন্দেহযুক্ত।[৬৭]

হযরত সাওদার (রা) সরলতার আরো বহু ঘটনা আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের জন্য যে মধু পান হারাম করে নেন তার পিছনে ছিল দাম্পত্য জীবনের একটি মধুর ঘটনা। আর সেই ঘটনার সাথে সরলভাবে সাওদাও জড়িয়ে পড়েন বলে অনেকের ধারণা। সংক্ষেপে ঘটনাটি এই রকম ঃ

রাসূল (সা) মিষ্টি পছন্দ করতেন। তিনি স্ত্রী যয়নাব বিন্‌ত জাহাশ, মতান্তরে হাফসার ঘরে গেলে মধুর শরবত পান করতেন। এতে 'আয়িশার মনে কিছুটা ঈর্ষার সৃষ্টি হয়। তিনি চাইলেন, রাসূল (সা) যাতে সেখানে আর মধু পান না করেন। তাই সাওদার সাথে ফন্দি আঁটলেন। রাসূল (সা) মধু পানের পর যখন তাঁদের নিকট আসবেন তখন তাঁরা প্রত্যেকেই বলবেন, আপনার পবিত্র মুখ থেকে 'মুগফুর'-এর গন্ধ বের হচ্ছে। এতে হয়তো রাসূল (সা) মধু পান ছেড়ে দিবেন। কারণ, তিনি কোন রকম দুর্গন্ধ পছন্দ করেন না। রাসূল (সা) মধু পান করে যখনই তাঁদের কাছে গেলেন, তাঁরা পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে একই কথা বললেন। দ্রুত ফল হলো। রাসূল (সা) নিজের জন্য মধু হারাম করে বসলেন। তখন সূরা আত-তাহরীম-এর ১-৩ নং আয়াত নাযিল হয়।[৬৮]

হযরত সাওদার (রা) অন্তরটি ছিল অতি কোমল। আপনজনদের দুঃখ-কষ্ট দেখে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন। তাঁর প্রথম স্বামী সাকরান ইবন আমরের ভাই সুহাইল ইবন 'আমরকে বদরে বন্দী করে মদীনায় আনা হয়। চার হাজার দিরহামের বিনিময়ে তিনি মুক্তিলাভ করেন। এ সম্পর্কে ইবন ইসহাক বলেন ঃ বদরের বন্দীদের যখন মদীনায় আনা হয় তখন সাওদা ছিলেন 'আফরার ছেলে 'আউফ ও মু'য়াওবিজের গৃহে। এটা পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার আগে। এমন সময় বদরের বন্দীদের আগমনের কথা ঘোষণা করা হলো। সাওদা বাড়ী ফিরে এসে রাসূলকে (সা) ঘরেই পেলেন। হঠাৎ কক্ষের এক কোণে বন্দী আবু ইয়াযীদ সুহাইল ইবন আমরকে দেখতে পেলেন। গলার সাথে তার হাত দুইটি রশি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। এ দৃশ্য দেখে তিনি আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। বলে উঠলেন ঃ আবু ইয়াযীদ! তোমরা এভাবে ধরা দিলে? সম্মানের সাথে মরতে পারলে না? সাওদা বলেন ঃ ঘরের মধ্য থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) এ কণ্ঠস্বরে আমি সম্বিত ফিরে পাই ঃ সাওদা! তুমি কি তাঁকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছো? সাওদা বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আবু ইয়াযীদ সুহাইলকে এ অবস্থায় দেখে নিজেকে সামলাতে পারিনি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার জন্য আল্লাহর দরবারে মাগফিরাত কামনা করুন। রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন।[৬৯]

---

৬৭. সিয়ারুস সাহাবিয়াত-১৮

৬৮. তাফসীরে ইবন কাসীর-৪/৩৮৭; তাবাকাত-৮/৮৫; হায়াতুস সাহাবা-২/৬৮০-৬৮১

৬৯. আনসাবুল আশরাফ-১/৩০৩; ইবন হিশাম-/৬৪৫

হিজরী ৮ম সনে যয়নাব বিন্‌ত রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় ইনতিকাল করেন। তাঁকে গোসল দেন সাওদা, উম্মু আয়মান ও উম্মু সালামা।[৭০]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) খায়বারে সাওদার (রা) জীবিকার ব্যবস্থা করে যান। আবদুর রহমান আল-আ'রাজ মদীনায় বিভিন্ন মজলিসে বলতেন ঃ রাসূল (সা) সাওদাকে ৮০ ওয়াসাক খেজুর ও ২০ ওয়াসাক গম বা যবের দ্বারা তাঁর জীবিকার ব্যবস্থা করেন।[৭১]

---

৭০. আনসাবুল আশরাফ-১/৪০০

৭১. তাবাকাত-৮/৫৬; দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ ইসলামিয়া-১১/৪৪৩

# 'আয়িশা সিদ্দীকা (রা)

উম্মুল মুমিনীন আয়িশা সিদ্দীকা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) প্রিয়তমা স্ত্রী। তাঁর ডাকনাম বা কুনিয়াত উম্মু 'আবদিল্লাহ' এবং উপাধি 'সিদ্দীকা'। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তাঁর অন্য একটি উপাধি 'আল-হুমায়রা'। তিনি ফরসা সুন্দরী ছিলেন। এ কারণে 'আল-হুমায়রা' বলা হতো।[১] 'উরওয়া বলেন ঃ একবার হিজাবের হুকুম নাযিলের পূর্বে উয়ায়না ইবন হিস্ন রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। তখন আয়িশা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 'উয়ায়না 'আয়িশার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ 'আল-হুমায়রা' (সুন্দরীটি) কে? রাসূলুল্লাহ (সা) জবাব দেন ঃ এ হচ্ছে আবু বকরের মেয়ে আয়িশা।[২] অনেকে এই বর্ণনাটিকে ভিত্তিহীন মনে করেছেন।[৩]

আবদুল্লাহ ছিলেন 'আয়িশার (রা) বোন আসমার (রা) ছেলে। ইতিহাসে তিনি আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর নামে প্রসিদ্ধ। 'কুনিয়াত' হয় কোন সন্তানের নামের সাথে। আয়িশা (রা) ছিলেন নিঃসন্তান। তাই তাঁর কোন 'কুনিয়াত'ও ছিল না। সেকালের আরবে 'কুনিয়াত' ছিল শরাফত ও আভিজাত্যের প্রতীক। অভিজাত শ্রেণীর লোকদের নাম ধরে ডাকার নিয়ম ছিল না। কুনিয়াত বা উপনামেই তাদেরকে সম্বোধন করা হতো। একদিন 'আয়িশা (রা) স্বামী রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন ঃ আপনার অন্য স্ত্রীগণ তাঁদের পূর্বের স্বামীদের সন্তানদের নামে নিজেদের কুনিয়াত ধারণ করেছেন, আমি কার নামে কুনিয়াত ধারণ করি? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমার বোনের ছেলে আবদুল্লাহর নামে। সেই দিন থেকে তাঁর কুনিয়াত বা ডাকনাম হয় 'উম্মু আবদিল্লাহ'– আবদুল্লাহর মা।[৪]

একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, 'আয়িশা (রা) একটি পুত্র সন্তানের মা হন এবং শিশুকালেই তাঁর মৃত্যু হয়। তার নাম রাখা হয় আবদুল্লাহ।[৫] সেই সন্তানের নামেই তাঁর কুনিয়াত হয়। ইবন হাজার আসকিলানী– বলেন, এ বর্ণনা সঠিক নয়।[৬] তাছাড়া বিভিন্ন সহীহ হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।[৭]

আয়িশার (রা) পিতা খলীফাতু রাসূলিল্লাহ, আস্-সিদ্দীকুল আকবর আবু বকর (রা) এবং মাতা উম্মু রূমান যয়নাব বিন্ত আমের, মতান্তরে 'উমাইর আল-কিনানী। পিতার দিক দিয়ে তিনি কুরাইশ গোত্রের বনু তাইম শাখার এবং মাতার দিক দিয়ে বনু কিনানার

---

১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৪০
২. আনসাবুল আশরাফ-১/৪১৪
৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৬৭
৪. আবু দাউদ ঃ কিতাবুল আদাব; মুসনাদ-৬/৯,১০৭ তাবাকাত-৮/৬৪
৫. যারকানী ঃ শারহুল মাওয়াহিব-৩/২৬৯
৬. আল-ইসাবা-৪/৩৬০
৭. মুসনাদ-৬/১৫১

সন্তান। মা গানাম ইবন মালিক ইবন কিনানার মেয়ে।[৮] রাসূলুল্লাহ (সা) ও আয়িশার (রা) বংশধারা পিতৃকূলের দিক দিয়ে উপরের দিকে সপ্তম/অষ্টম পুরুষে এবং মাতৃকূলের দিক দিয়ে একাদশ/দ্বাদশ পুরুষে মিলিত হয়েছে।[৯]

আয়িশার (রা) পিতা আবু বকর (রা) হিজরী ১৩ সনে ইনতিকাল করেন। মা উম্মু রূমান সম্পর্কে অধিকাংশ ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, তিনি পাঁচ অথবা ছয় হিজরীতে ইনতিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কবরে নেমে তাঁকে দাফন করেন এবং জানাযার নামায পড়েন।[১০] কিন্তু এ তথ্য সঠিক নয়। কারণ, নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত যে, তিনি 'উসমানের খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। হিজরী ৬ষ্ঠ সনের 'ইফক (আয়িশার রা. চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ)-এর ঘটনা সংক্রান্ত সকল হাদীসে তাঁর নাম এসেছে। হিজরী নবম সনের 'তাখঈর' (যে কোন একটি জিনিস বেছে নেওয়ার ইখতিয়ার)-এর ঘটনার সময়ও তিনি জীবিত ছিলেন। এ কথা তাবাকাত, বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদের বর্ণনাসমূহে জানা যায়। ইমাম বুখারী 'তারীখে সাগীর' গ্রন্থে তাঁর নামটি ঐসকল লোকদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যাঁরা হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে ইনতিকাল করেন। তিনি প্রথম বর্ণনাটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। হাফেজ ইবন হাজার 'আত-তাহজীব' গ্রন্থে একটি বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন যে, ইমাম বুখারীর বর্ণনা সঠিক।[১১]

'আশিয়ার (রা) মা উম্মু রূমানের (রা) প্রথম বিয়ে হয় আবদুল্লাহ ইবন আল-হারিস আল-আযদীর সাথে। 'আবদুল্লাহ স্ত্রী উম্মু রূমানকে নিয়ে মক্কায় আসেন এবং আবু বকরের সাথে মৈত্রী চুক্তি করে সেখানে বসবাস করতে থাকেন। এটা ইসলাম-পূর্ব কালের কথা। আত-তুফাইল নামে তাঁদের একটি পুত্র সন্তান হয়। আবদুল্লাহ মারা যান এবং আবু বকর (রা) উম্মু রূমানকে বিয়ে করেন।[১২] এখানে তাঁর দুইটি সন্তান হয়– আবদুল্লাহ ও আয়িশা। হযরত 'আয়িশার জন্মের সঠিক সময়কাল সম্পর্কে তারিখ ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। এ কারণে তাঁর জন্মসন সম্পর্কে বেশ মতপার্থক্য দেখা যায়। সাইয়্যেদ সুলায়মান নাদবী বলেন ঃ 'ঐতিহাসিক ইবন সা'দ লিখেছেন এবং কোন কোন সীরাত বিশেষজ্ঞ তাঁকে অনুসরণ করে বলেছেন নুবুওয়াতের চতুর্থ বছরের সূচনায় আয়িশা জন্মগ্রহণ করেন এবং দশম বছরে ছয় বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু এ কথা কোনভাবেই সঠিক হতে পারে না। কারণ নুবুওয়াতের চতুর্থ বছরের সূচনায় তাঁর জন্ম হলে দশম বছরে তাঁর বয়স ছয় বছর নয়, বরং সাত বছর হবে। মূলত আয়িশার (রা) বয়স সম্পর্কে কয়েকটি কথা সর্বসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত। তা

---

৮. আনসাবুল আশরাফ-১/৬১৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৩৫

৯. উসুদুল গাবা-৫/৫৮৩

১০. আনসাবুল আশরাফ-১/৩৬০

১১. সীরাতে 'আয়িশা-২০

১২. আল-ইসাবা-৪/৪৫০; আনসাবুল আশরাফ-১/১৯৪, ২৪০

হলো, হিজরাতের তিন বছর পূর্বে ছয় বছর বয়সে বিয়ে হয়। প্রথম হিজরীর শাওয়াল মাসে নয় বছর বয়সে স্বামী গৃহে যান এবং এগারো হিজরীর রাবীউল আওয়াল মাসে আঠারো বছর বয়সে বিধবা হন। এই হিসাবে তাঁর জন্মের সঠিক সময়কাল হবে নুবুওয়াতের পঞ্চম বছরের শেষের দিক। অর্থাৎ হিজরাত পূর্ব নবম সনের শাওয়াল মাস, মুতাবিক জুলাই, ৬১৪ খ্রিষ্টাব্দ।'[১৩]

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহর (সা) তেইশ বছরের নুবুওয়াতী জীবনের প্রায় তেরো বছর মক্কায় এবং দশ বছর মদীনায় অতিবাহিত হয়। নাদবী সাহেবের বর্ণনা মতে 'আয়িশার (রা) যখন জন্ম হয় তখন নুবুওয়াতের চার বছর অতিক্রান্ত হয়ে পঞ্চম বছর চলছে। ইমাম জাহাবী বলেন ঃ আয়িশা (রা), ফাতিমার চেয়ে আট বছরের ছোট। আয়িশা বলেছেন, তিনি মক্কায় একজন বৃদ্ধ অন্ধ হাতী চালকের সাক্ষাৎ পেয়েছেন।[১৪]

'আয়িশা (রা) কখন কিভাবে মুসলমান হন সে সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে হযরত সিদ্দীকে আক্‌বরের (রা) বড় সৌভাগ্য যে, তাঁরই গৃহে সর্বপ্রথম ইসলামের আলো প্রবেশ করে। এই কারণে হযরত আয়িশা ঐ সকল ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী নর-নারীদের একজন যাঁদের কর্ণকুহরে মুহূর্তের জন্যও কুফর ও শিরকের আওয়ায পৌঁছেনি। আয়িশা (রা) বলেন ঃ 'যখন থেকে আমি আমার বাবা-মাকে চিনেছি তখন থেকেই তাঁদেরকে মুসলমান পেয়েছি।'[১৫] ইমাম জাহাবী শুধু বলেছেন ঃ আয়িশা ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৬] কিন্তু কখন কিভাবে, তা বলেননি। ইবন হিশাম, যাঁরা আবু বকরের (রা) হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন, তাঁদেরকে একটা স্বতন্ত্র শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। সেখানে আয়িশার (রা) নামটিও এসেছে।[১৭]

আয়িশাকে (রা) ওয়ায়িল-এর স্ত্রী দুধপান করান। এই ওয়ায়িল-এর ডাকনাম ছিল আবুল ফুকায়'য়াস। তাঁর ভাই আফলাহ– যিনি আয়িশার দুধচাচা– পরবর্তীকালে মাঝে মাঝে আয়িশার (রা) সাথে দেখা করতে আসতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতি নিয়ে আয়িশা (রা) তাঁর সামনে যেতেন। তাঁর দুধ-ভাইও মাঝে মাঝে দেখা করতে আসতেন।[১৮]

আয়িশার (রা) বাল্যজীবন অন্যসব শিশুদের মতই কেটেছে। তবে একটু ভিন্নতর ছিল। বাল্যকালেই তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা ও বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যসব শিশুদের মত খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। সমবয়সী প্রতিবেশী মেয়েরা তাঁর কাছে আসতো এবং তিনি অধিকাংশ সময় তাদের সাথে খেলতেন। কিন্তু সেই বয়সে খেলার মধ্যেও রাসূলুল্লাহর (রা) সম্মান ও মর্যাদার প্রতি সজাগ থাকতেন। অনেক সময় এমন হতো যে,

---

১৩. সীরাতে 'আয়িশা-২১; সাহাবিয়াত-৩৭
১৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৩৯
১৫. বুখারী-১/৫৫২; হায়াতুস সাহাবা-১/২৮২
১৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৩৯
১৭. সীরাতু ইবন হিশাম-১/২৫২, ২৫৪
১৮. বুখারী-১/৩৬০-৩৬১

তিনি অন্যদের সাথে পুতুল নিয়ে খেলছেন, এমন সময় রাসূল (সা) তাঁদের গৃহে এসেছেন এবং হঠাৎ তাঁদের মধ্যে হাজির হয়েছেন। আয়িশা (রা) পুতুলগুলি তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলতেন এবং অন্য সাথীরা রাসূলকে (সা) দেখামাত্র ছুটে পালাতো। রাসূল (সা) শিশুদের ভালোবাসতেন। তাঁদের খেলাধুলাকেও খারাপ মনে করতেন না। তিনি পালিয়ে যাওয়া শিশুদের ডেকে ডেকে আয়িশার সাথে খেলতে বলতেন।[১৯] শিশুদের খেলাগুলির মধ্যে দুইটি খেলা ছিল তাঁর সর্বাধিক প্রিয়। পুতুল খেলা ও দোল খাওয়া।[২০]

একদিন আয়িশা (রা) পুতুল নিয়ে খেলছেন, এমন সময় রাসূল (সা) এসে পড়লেন। পুতুলগুলির মধ্যে একটি দুই ডানাওয়ালা ঘোড়াও ছিল। রাসূল (সা) সেই ঘোড়াটির প্রতি ইঙ্গিত করে প্রশ্ন করলেন, আয়িশা! এটা কি? জবাব দিলেন ঃ ঘোড়া। রাসূল (সা) বললেন ঃ ঘোড়ার তো কোন ডানা হয় না। আয়িশা সাথে সাথে বলে উঠলেন ঃ কেন? সুলায়মান আলাইহিস সালামের ঘোড়াগুলির তো ডানা ছিল– একথা কি আপনি শোনেননি? আয়িশার (রা) এমন উপস্থিত জবাব শুনে রাসূল (সা) এমনভাবে একটু হেসে দেন যে, তাঁর দাঁত দেখা যায়।[২১]

এই ঘটনা দ্বারা আয়িশার (রা) স্বভাবগত উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা, ইতিহাস-ঐতিহ্যের জ্ঞান, এবং তীক্ষ্ণ মেধার অনুমান করা যায়।

সাধারণত শৈশবকালের কথা মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে যায়। কিন্তু 'আয়িশার (রা) ছোটবেলার সব কথাই স্মৃতিতে ছিল। হযরত রাসূলে কারীম (সা) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করেন তখন আয়িশার (রা) বয়স আট/নয় বছরের বেশী হবে না। কিন্তু হিজরাতের ঘটনার যত বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তা আর কোন সাহাবী দিতে পারেননি।[২২]

ইমাম বুখারী সূরা আল-কামার-এর তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। 'আয়িশা (রা) বলেন, যখন এই আয়াত :

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ

(سورة القمر- ٢٤)

মক্কায় নাযিল হয় তখন আমি এক ছোট্ট মেয়ে, খেলছিলাম।[২৩]

ছোটবেলায় হযরত আয়িশা (রা) মাঝে মাঝে মাকে ক্ষেপিয়ে তুলতেন। তিনিও মেয়েকে শাস্তি দিতেন। রাসূল (সা) এতে কষ্ট অনুভব করতেন। একবার তিনি উম্মু রূমানকে বলেন, আমার খাতিরে তাকে আর শাস্তি দিবেন না। একবার রাসূল (সা)

---

১৯. বুখারী ঃ কিতাবুল আদাব; বাবুল ইনবিসাত ইলান্নাস; মুসলিম ঃ ফাদায়িলুস সাহাবা; তাবাকাত-৮/৫৯, ৬৫, ৬৬।

২০. আবু দাউদ ঃ কিতাবুল আদাব

২১. মিশকাত ঃ আশরাতুন নিসা-১/৭৫; তাবাকাত-৮/৬২; আবু দাউদ ঃ কিতাবুল আদাব ঃ বাবুল লা'ব বিল-বানাত

২২. বুখারী ঃ বাবুল হিজরাহ

২৩. বুখারী ঃ কিতাবুত তাফসীর ঃ আল-কামার

আয়িশার পিতৃগৃহে এসে দেখেন, দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে আয়িশা কাঁদছেন। তিনি উম্মু রূমানকে বলেন, আপনি আমার কথায় গুরুত্ব দেননি। উম্মু রূমান বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ মেয়ে আমার বিরুদ্ধে তার বাপের কাছে লাগায়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যা কিছুই করুক না কেন, তাকে কষ্ট দিবেন না। আল্লামাহ্ সাইয়্যেদ সুলায়মান নাদবী 'মুসতাদরিকে হাকেম'-এর বরাত দিয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

রাসূলে কারীমের (সা) প্রথমা স্ত্রী হযরত খাদীজা বিন্‌ত খুওয়াইলিদ। তাঁকে বিয়ে করার সময় রাসূলে পাকের বয়স ছিল পঁচিশ এবং খাদীজার চল্লিশ। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে পঁচিশ বছর ঘর করার পর নুবুওয়াতের দশম বছর রমজান মাসে হিজরাতের তিন বছর পূর্বে খাদীজা (রা) ইনতিকাল করেন। তখন রাসূলুল্লাহর (সা) বয়স পঞ্চাশ এবং খাদীজার পঁয়ষট্টি।

সাওদার (রা) জীবনীতে আমরা উল্লেখ করেছি যে, খাদীজার (রা) ইনতিকালের পর রাসূলুল্লাহকে (সা) বিমর্ষ দেখে 'উসমান ইবন মাজ'উনের স্ত্রী খাওলা বিন্‌ত হাকীম বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) আপনি আবার বিয়ে করুন। রাসূল (সা) জানতে চাইলেন ঃ কাকে? খাওলা বললেন ঃ বিধবা ও কুমারী দুই রকম পাত্রীই আছে। যাকে আপনার পছন্দ হয় তাঁর বিষয়ে কথা বলা যেতে পারে। রাসূল (সা) আবার জানতে চাইলেন ঃ তারা কারা? খাওলা বললেন ঃ বিধবা পাত্রীটি সাওদা বিনত যাম'আ, আর কুমারী পাত্রীটি আবু বকরের মেয়ে 'আয়িশা। রাসূল (সা) বললেন ঃ ভালো। তুমি তার সম্পর্কে কথা বলো।[২৪]

হযরত খাওলা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সম্মতি পেয়ে প্রথমে আবু বকরের (রা) বাড়ী এসে প্রস্তাব দেন। জাহিলী আরবের রীতি ছিল, তারা আপন ভাইয়ের সন্তানদের যেমন বিয়ে করতো না, তেমনি সৎ ভাই, জ্ঞাতি ভাই বা পাতানো ভাইয়ের সন্তানদেরকেও বিয়ে করা বৈধ মনে করতো না। এ কারণে প্রস্তাবটি শুনে আবু বকর বললেন ঃ খাওলা! আয়িশা তো রাসূলুল্লাহর (সা) ভাতিজী। তার সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) বিয়ে হয় কেমন করে? খাওলা (রা) ফিরে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ আবু বকর আমার দ্বীনী ভাই। আর এ ধরনের ভাইদের সন্তানদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। আবু বকর (রা) প্রস্তাব মেনে নেন এবং খাওলাকে বলেন রাসূলুল্লাহকে (সা) নিয়ে আসতে।[২৫]

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে 'আয়িশার (রা) বিয়ের প্রস্তাব আসার আগে জুবাইর ইবন মুত'ইম ইবন আদীর সাথে তাঁর বিয়ের কথা হয়েছিল। এ কারণে তার কাছেও জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন ছিল। হযরত আবু বকর মুত'ইম ইবন 'আদীর কাছে যেয়ে বললেন ঃ তুমি তোমার ছেলের সাথে আয়িশার বিয়ের প্রস্তাব করেছিলে। এখন তোমাদের সিদ্ধান্ত

---

২৪. ইবন কাসীর ঃ আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা-১/৩১৭

২৫. বুখারী ঃ বাবু তাযবীজুস সিগার মিনাল কিবার; ইবন কাসীর-১/৩১৬, তাবাকাত-৮/৫৭,৫৯; জাহাবী ঃ তারীখ-১/১৬৫-১৬৬, আল-মুসনাদ-৬/২১০-২১১

কী, বল। মুত'ইম তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন। মুত'ইমের পরিবার তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। এ কারণে তাঁর স্ত্রী বললেন এ মেয়ে আমাদের ঘরে এলে আমাদের ছেলে ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে। আমার এ প্রস্তাবে মত নেই। তখন আবু বকর (রা) মুত'ইমের দিকে ফিরে বললেন ঃ তোমার স্ত্রী কী বলে? মুত'ইম বললেন ঃ সে যা বলেছে, আমারও মত তাই। তারপর ফিরে এসে খাওলাকে বললেন ঃ আপনি রাসূলুল্লাহকে (সা) নিয়ে আসুন। রাসূল (সা) এলেন এবং আবু বকর বিয়ে পড়িয়ে দিলেন।[২৬] বালাজুরী অবশ্য অন্য কারো সাথে আয়িশার বিয়ের প্রস্তাবের কথা সঠিক নয় বলে উল্লেখ করেছেন।[২৭]

আয়িশা (রা) ও সাওদার (রা) বিয়ে একই সময় হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) সাওদাকে বিয়ের পরই ঘরে তুলে নেন এবং শুধু তাঁকে নিয়ে তিন বছর ঘর করার পর আয়িশাকে (রা) ঘরে নিয়ে আসেন।[২৮]

এই বিয়ে অতি সাদামাটা ও আড়ম্বরহীনভাবে সম্পন্ন হয়। আতিয়্যা (রা) এই বিয়ের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে– আয়িশা অন্য মেয়েদের সাথে খেলছিলেন। তাঁর সেবিকা এসে তাঁকে নিয়ে যায় এবং আবু বকর (রা) এসে বিয়ে পড়িয়ে দেন।'

এই বিয়ে যে কত অনাড়ম্বর ও অনুষ্ঠানহীন অবস্থায় শেষ হয়েছিল তা অনুমান করা যায় খোদ আয়িশার (রা) একটি বর্ণনা দ্বারা। তিনি বলছেন ঃ যখন আমার বিয়ে হয়, আমি কিছুই জানতাম না। আমার বিয়ে হয়ে গেল। যখন মা আমাকে বাইরে যেতে বারণ করতে লাগলেন তখন বুঝলাম আমার বিয়ে হয়ে গেছে। তারপর মা আমাকে সবকিছু বুঝিয়ে দেন।[২৯]

আয়িশা (রা) বলেন ঃ বিয়ের সময় আমি এক ছোট্ট মেয়ে। 'হাওফ' নামক এক প্রকার পোশাক পরি। বিয়ের পর ছোট্ট হওয়া সত্ত্বেও আমার মধ্যে লজ্জা এসে যায়। উল্লেখ্য যে, 'হাওফ' হলো চামড়ার তৈরী পায়জামার মত এক ধরণের পোশাক, যা শিশুদের মাঝদেহ বরাবর পরা থাকে।

আয়িশাকে (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) কত দেন মোহর দান করেছিলেন, সে বিষয়ে মত পার্থক্য আছে। ইবন সা'দের বর্ণনাসমূহের মাধ্যমে জানা যায়, রাসূল (সা) দেন মোহর হিসাবে আয়িশাকে (রা) একটি ঘর দান করেন যার মূল্য ছিল পঞ্চাশ দিরহাম।[৩০] ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন চার শো দিরহামের কথা। ইবন সা'দের অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, যা খোদ আয়িশা থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ মোহর ছিল বারো উকিয়া

---

২৬. মুসনাদে আহমাদ-৬/২১০-২১১; জাহাবী ঃ তারীখ-১/১৬৫, ১৬৬ তাবাকাত-৮/৫৮; সিয়ারু আ'লাম আন নুবালা-২/১৪৯

২৭. আনসাবুল আশরাফ-১/৪০৯

২৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৪১

২৯. তাবাকাত-৮/৫৯-৬০

৩০. প্রাগুক্ত : ৮/৬০

ও এক নশ– যা পাঁচশো দিরহামের সমান।[৩১] সহীহ্ মুসলিমে আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীগণের মোহর সাধারণত পাঁচশো দিরহাম হতো।[৩২] মুসনাদে আহমাদে আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর মোহর ছিল পাঁচশো।

আয়িশাকে (রা) বিয়ে করার পূর্বেই রাসূলে কারীম (সা) এর সুসংবাদ লাভ করেছিলেন। একদিন স্বপ্নে দেখেন যে, এক ব্যক্তি কোন একটি জিনিস এক টুকরো রেশমে জড়িয়ে তাঁকে দেখিয়ে বলছেন, এটি আপনার। তিনি খুলে দেখেন তার মধ্যে আয়িশা (রা)।[৩৩]

আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তিন রাত আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখলাম। একজন ফিরিশতা রেশমের একটি খণ্ডে কিছু একটা মুড়ে এনে বললো, এ আপনার স্ত্রী। মাথার দিক থেকে আমি খুলে দেখলাম, তার মধ্যে তুমি। আমি বললাম, এ যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে হোক।[৩৪]

ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন আয়িশা (রা) বলেন ঃ জিবরীল তাঁর একটি প্রতিকৃতি সবুজ রেশমের একটি টুকরোয় জড়িয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে এসে বলেন ঃ ইনি হবেন দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার স্ত্রী।[৩৫]

আয়িশার (রা) বিয়ের সঠিক সময়কাল নিয়ে একটু মতভেদ আছে। আল্লামাহ্ বদরুদ্দীন আয়নী সহীহ্ আল-বুখারীর ভাষ্যে লিখেছেন ঃ আয়িশার (রা) বিয়ে হিজরাতের দুই বছর পূর্বে, আবার বলা হয়ে থাকে তিন বছর পূর্বে এবং একথাও বলা হয়েছে যে, দেড় বছর পূর্বে হয়েছিল'[৩৬] কিছু কিছু বর্ণনায় জানা যায়, খাদীজার (রা) ইনতিকালের তিন বছর পর রাসূললুল্লাহ (সা) আয়িশাকে (রা) বিয়ে করেন। কোন কোন সীরাত বিশেষজ্ঞ বলেন, যে বছর খাদীজার (রা) মৃত্যু হয় সেই বছর আয়িশার (রা) বিয়ে হয়।[৩৭]

সুলায়মান নাদবী বলেন ঃ খাদীজার (রা) ওফাতের তারিখ দ্বারা আয়িশার (রা) বিয়ের সঠিক তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু খাদীজার (রা) ওফাতের তারিখও সর্বসম্মত নয়। সেখানেও মতভেদ আছে। এ ক্ষেত্রে খোদ আয়িশার (রা) বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হতে পারতো। কিন্তু বুখারী ও মুসনাদে তাঁর থেকেও ভিন্ন দুইটি বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি বর্ণনায় এসেছে খাদীজার (রা) ওফাতের তিন বছর পর তাঁর বিয়ে হয়।[৩৮] অপর

---

৩১. প্রাগুক্ত-৮/৬৩; আনসাবুল আশরাফ-১/৪১৪ এক 'নশ' হলো অর্ধ 'উকিয়া'। এক 'উকিয়া' = ৪০ দিরহাম। সুতরাং বারো 'উকিয়া' ও এক নশ = ৫০০ দিরহাম। (আনসাবুল আশরাফ-১/৪১৪)

৩২. সহীহ্ মুসলিম ঃ কিতাবুন নিকাহ

৩৩. তাবাকাত-৮/৬০

৩৪. মুসনাদে আহমাদ-৬/৪১, ১২৮, ১৬১; ইমাম বুখারী বিভিন্ন অধ্যায়ে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিম-(২৪২৮) ফাদায়িলুস সাহাবা; ইবন কাসীর ঃ আস-সীরাহ্-১/৩১৫। সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৪০

৩৫. আত-তিরমিযী-(৩৮৮০) ঃ বাবু ফাদলি 'আয়িশা; ইবন কাসীর ঃ আস-সীরাহ-১/৩১৫

৩৬. 'উমদাতুল কারী-১/৪৫

৩৭. ইবন কাসীর-১/৩১৬

৩৮. বুখারী ঃ ফাদলু খাদীজা; মুসনাদ-৬/২৫৮; জাহাবী ঃ তারীখ-১/১৬৫

বর্ণনাটিতে খাদীজার (রা) ওফাতের বছরে বিয়ের কথা এসেছে।[৩৯]

অধিকাংশ গবেষকের সিদ্ধান্ত এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহের গরিষ্ঠ অংশ যা সমর্থন করে তা হলো, খাদীজা (রা) নুবুওয়াতের দশম বছরে হিজরাতের তিন বছর পূর্বে রমজান মাসে ইনতিকাল করেন এবং তার একমাস পরে শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (সা) আয়িশাকে (রা) বিয়ে করেন। তখন আয়িশার (রা) বয়স ছয় বছর। এই হিসাবে হিজরাত-পূর্ব তিন সনের শাওয়াল, মুতাবিক ৬২০ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে আয়িশার (রা) বিয়ে হয়। আল-ইসতী'য়াব গ্রন্থকার ইবন আবদিল বার এই মত সমর্থন করেছেন। মূলত বিয়ে হয়েছিল খাদীজার (রা) ওফাতের বছরেই এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তিন বছর পরে যখন নয় বছর বয়সে তাঁকে ঘরে তুলে নেন। আয়িশার (রা) একটি বর্ণনা যা ইবন সা'দ নকল করেছেন, তাতে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।[৪০]

বিয়ের পর আয়িশা (রা) প্রায় তিন বছর পিতৃগৃহে অবস্থান করেন। দুই বছর তিন মাস মক্কায় এবং সাত/আট মাস হিজরাতের পর মদীনায়।

মক্কার পৌত্তলিকদের জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা যখন সহ্যের সীমা ছেড়ে গেল, রাসূল (সা) তখন মদীনায় হিজরাতের সিদ্ধান্ত নিলেন। আয়িশা (রা) বলেন, রাসূল (সা) প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় আবু বকরের গৃহে আসতেন। একদিন অভ্যাসের বিপরীত চাদর দিয়ে মাথা-মুখ ঢেকে দুপুরের সময় উপস্থিত হন। আবু বকরের কাছে তখন তাঁর দুই মেয়ে আয়িশা ও আসমা বসা। রাসূল (সা) বললেন, আবু বকর! আপনার কাছে বসা লোকগুলিকে একটু সরিয়ে দিন, আমি কিছু কথা বলতে চাই। আবু বকর বললেন ঃ

ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখানে অন্য কেউ নেই। আপনারই ঘরের লোক। রাসূল (সা) আসেন এবং হিজরাতের সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করেন। 'আয়িশা ও আসমা–দুই বোন মিলে সফরের জিনিসপত্র গোছগাছ করেন। তারপর দুইজন মদীনার পথ ধরেন। তাঁরা তাঁদের পরিবার-পরিজনকে মক্কায় শত্রুদের মধ্যে ছেড়ে যান।[৪১]

মদীনায় একটু স্থির হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা থেকে পরিবার-পরিজনকে মদীনায় নেওয়ার জন্য যায়িদ ইবন হারিসা (রা) ও আবু রাফে'কে (রা) মক্কায় পাঠান। তাঁদেরকে দুইটি উট ও পাঁচশো দিরহাম দেন–যা আবু বকর (রা) রাসূলকে (সা) তাঁর প্রয়োজন পূরণের জন্য দিয়েছিলেন। আবু বকরও (রা) তাঁদের সাথে আবদুল্লাহ ইবন উরায়কাতকে দুই অথবা তিনটি উট দিয়ে পাঠান। তিনি মক্কায় অবস্থানরত পুত্র আবদুল্লাহকে বলে পাঠান যে, সে যেন আয়িশা, আসমা এবং তাঁদের মা উম্মু রূমানকে নিয়ে মদীনায় চলে আসে।

---

৩৯. বুখারী তাযবীজু 'আয়িশা; মুসনাদ-৬/১১৮; ইবন কাসীর-১/৩১৭; জাহাবী ঃ তারিখ-১/১৬৫

৪০. তাবাকাত-৮/৫৮,৫৯

৪১. হিজরাতের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন বুখারী ঃ বাবুল হিজরাহ-১/৫৫২; কানযুল 'উম্মাল-৮৩৩৫ হায়াতুস সাহাব-১/৩৩৭

এই সকল লোক যখন মক্কা থেকে যাত্রা করেন তখন তালহা ইবন আবদিল্লাহ হিজরাতের উদ্দেশ্যে তাঁদের সহযাত্রী হন। আবু রাফে' ও যায়িদ ইবন হারিসার সংগে ফাতিমা, উম্মু কুলসুম, সাওদা বিন্‌ত যাম'আ, উম্মু আয়মান ও উসামা ইবন যায়িদ এবং আবদুল্লাহ ইবন আবী বকরের সংগে উম্মু রূমান, আবদুল্লাহর দুই বোন-'আয়িশা ও আসমা ছিলেন।[৪২]

এই কাফেলা মক্কা থেকে যাত্রা করে যখন হিজাযের বনু কিনানার আবাসস্থল 'আল-বায়দ' পৌছে তখন আয়িশা (রা) ও তাঁর মা উম্মু রূমান (রা) যে উটের উপর আরোহী ছিলেন সেই উটটি তাঁদেকে নিয়ে দ্রুত গতিতে ছুটে পালালো। প্রতি মুহূর্তে তাঁরা আশংকা করতে থাকেন, এই বুঝি হাওদাসহ ছিটকে পড়ছেন। মেয়েদের যেমন স্বভাব, মার নিজের জানের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, কলিজার টুকরা আয়িশার (রা) জন্য অস্থির হয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দেন। অনেক দূর যাওয়ার পর উটটি ধরে বশে আনা হয়। সবাই নিরাপদে ছিলেন এবং নিরাপদেই মদীনায় পৌছেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তখন মসজিদে নববী ও তার আশে-পাশের ঘর-বাড়ী নির্মাণ করছিলেন। তারই একটি ঘরে সাওদা (রা) এবং রাসূলুল্লাহর (সা) কন্যাদের থাকার ব্যবস্থা হয়।[৪৩]

আয়িশা (রা) আপনজনদের সাথে মদীনার বনু হারেস ইবন খাযরাজের মহল্লায় অবতরণ করেন এবং সাত-আট মাস সেখানে মায়ের সাথে বসবাস করেন। মক্কা থেকে মদীনায় আগত অধিকাংশ মুহাজিরের নিকট মদীনার আবহাওয়া অনুকূল ছিল না। বহু নারী-পুরুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। আবু বকর (রা) ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হন। অল্প বয়সী মেয়ে আয়িশা (রা) পিতার সেবায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে পিতার অবস্থা জানালে তিনি আবু বকরের (রা) জন্য দু'আ করেন। আবু বকর (রা) সুস্থ হয়ে ওঠেন।

পিতাকে সুস্থ করে তোলার পর আয়িশা (রা) নিজেই শয্যা নিলেন। এবার পিতা মেয়ের সেবায় মনোযোগী হলেন। আবু বকর অসুস্থ মেয়ের শয্যার কাছে যেতেন এবং অত্যন্ত দরদের সাথে তাঁর মুখে মুখ ঘঁষতেন। অসুস্থতা এত মারাত্মক ছিল যে, আয়িশার (রা) মাথার প্রায় সব চুল পড়ে যায়।[৪৪]

বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত হওয়ার পর আবু বকর (রা), মতান্তরে উম্মু রূমান (রা) একদিন রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার স্ত্রীকে ঘরে তুলে নিচ্ছেন না কেন? বললেন ঃ এখন আমার হাতে মোহর আদায় করার মত অর্থ নেই। আবু বকর (রা) বললেন ঃ আমার অর্থ গ্রহণ করুন। আমি ধার দিচ্ছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বারো উকিয়া ও এক নশ (=পাঁচশো দিরহাম) আবু বকরের (রা) নিকট থেকে ধার নিয়ে আয়িশার (রা) নিকট পাঠিয়ে দেন।

---

৪২. আনসাবুল আশরাফ-১/২৬৯, ২৭০

৪৩. তাবাকাত-৮/৬২; বুখারী ঃ বাবুল হিজরাহ; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৫২; আল-ইসাবা-৪/৪৫০; হায়াতুস সাহাবা-১/৩৭০

৪৪. বুখারী ঃ বাবুল হিজরাহ; তাবাকাত-৮/৬৩

মদীনা ছিল যেন আয়িশার (রা) শ্বশুর বাড়ী। আনসারী মহিলারা নববধূকে বরণ করে নেওয়ার জন্য আবু বকরের গৃহে আসলেন। আয়িশা (রা) তখন বাড়ীর আঙ্গিনায় খেজুর গাছের তলায় অন্য মেয়েদের সাথে খেলছেন। মা উম্মু রূমান (রা) তাকে ডাক দিলেন। মায়ের ডাক কানে যেতেই হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে আসেন। মা মেয়ের হাত ধরে দরজা পর্যন্ত এনে হাত-মুখ ধুইয়ে কেশ বিন্যাস করে দেন। তারপর সেই কক্ষে নিয়ে যান যেখানে অতিথি মহিলারা তাঁর অপেক্ষায় বসে ছিলেন। নববধূ কক্ষে প্রবেশ করতেই মহিলারা বলে উঠলেন ঃ তোমার আগমন শুভ ও কল্যাণময় হোক। তাঁরা নববধূকে সাজালেন। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ (সা) উপস্থিত হলেন।[৪৫]

এক পেয়ালা দুধ ছাড়া সেই সময় রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে আর কিছুই উপস্থাপন করা হয়নি। আসমা বিন্‌ত ইয়াযীদ ছিলেন আয়িশার (রা) একজন খেলার সাথী। তিনি বলছেন, আমি ছিলাম আয়িশার বান্ধবী। আমি তাকে সাজিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থাপন করেছিলাম। আমার সাথে অন্যরাও ছিল। আমরা এক পেয়ালা দুধ ছাড়া সেই সময় রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে দেওয়ার মত আর কিছুই পাইনি। রাসূলুল্লাহ (সা) পেয়ালা থেকে সামান্য একটু দুধ মুখে দিয়ে আয়িশার দিকে এগিয়ে দেন। আয়িশা নিতে লজ্জা পাচ্ছে দেখে আমি তাকে বললাম ঃ 'রাসূলুল্লাহর দান ফিরিয়ে দিও না।' তখন সে অত্যন্ত লাজুক অবস্থায় গ্রহণ করে এবং সামান্য পান করে রেখে দিতে যায়। রাসূল (সা) তাকে বললেন ঃ তোমার সাথীদের দাও। আমরা বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ সময় আমাদের পান করার ইচ্ছা নেই। তিনি বললেন ঃ মিথ্যা বলবে না। মানুষের প্রতিটি মিথ্যা লেখা হয়। অপর একটি বর্ণনায় এসেছে ঃ ক্ষুধা ও মিথ্যা একত্র করো না। মিথ্যা লেখা হয়। এমন কি ছোট ছোট মিথ্যাও।[৪৬]

সহীহ বর্ণনা সমূহের ভিত্তিতে একথা জানা যায় যে, আয়িশার (রা) স্বামীগৃহে গমন হয় প্রথম হিজরীর শাওয়াল মাসে। আল্লামাহ আয়নী লিখেছেন, হিজরী দ্বিতীয় সনে বদর যুদ্ধের পর তিনি স্বামীগৃহে যান।[৪৭] এ ধরনের একটি কথা আয়িশা (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে দেখা যায়। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে হিজরাতের তিন বছর পূর্বে বিয়ে করেন এবং হিজরতের আঠারো মাসের মাথায় শাওয়াল মাসে আমার সাথে বাসর করেন। বিয়ের সময় আমি ছয় বছরের এবং বাসরের সময় নয় বছরের এক মেয়ে।[৪৮]

কিন্তু এ বর্ণনাসঠিক হতে পারে না। কারণ, এই বর্ণনার ভিত্তিতে আয়িশার (রা) তখন বয়স হবে দশ বছর। অথচ হাদীস ও ইতিহাসের সকল গ্রন্থ এ ব্যাপারে একমত যে, সেই সময় তাঁর বয়স ছিল নয় বছর।[৪৯]

---

৪৫. বুখারী ঃ বাবু তাযবীযু 'আয়িশা; মুসলিম ঃ কিতাবুন নিকাহ; তাবাকাত-৮/৬২; আনসাবুল আশরাফ-১/৪১০

৪৬. মুসনাদ-৬/৪৩৮,৪৫২-৪৫৩,৪৫৮; ইবন মাজা-(৩২৯৮); সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৭৩

৪৭. 'উমদাতুল কারী-১/৫৪

৪৮. আনসাবুল আশরাফ-১/৪১০

৪৯. আবু দাউদ-(৯৪৩৫) ঃ কিতাবুল আদাব; বুখারী ঃ ৭/২৭ বাবু তাযবীজুন নাবী আয়িশা; সিয়ারু আ'লাম আন নুবালা-২/১৪৮, ১৪৯

আয়িশার (রা) বিয়ে ও স্বামীগৃহে গমন উভয় কাজই সম্পন্ন হয় শাওয়াল মাসে। এ কারণে তিনি আজীবন এ ধরনের অনুষ্ঠান শাওয়াল মাসে করতে পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন ঃ আমার বিয়ে ও স্বামীগৃহে গমন– দুইটাই হয় শাওয়ালে। আর এ কারণে স্বামীর নিকট আমার চেয়ে অধিক ভাগ্যবতী আর কে ছিল?[৫০]

রাসূলে কারীম (সা) মসজিদে নববীর পাশে নির্মিত ছোট্ট একটি ঘরে আয়িশাকে এনে উঠান। আজ যেখানে রাসূল (সা) শুয়ে আছেন সেটাই আয়িশার (রা) ঘর। পরবর্তীকালে আয়িশা (রা) বলতেন ঃ এখন আমি যে ঘরে আছি, আমার এই ঘরে রাসূল (সা) আমাকে প্রথম এনে উঠান। তিনি এখানেই ওফাত পেয়েছেন। রাসূল (সা) ঘরের দরজা সোজাসুজি মসজিদের একটি দরজা বানিয়ে নেন।[৫১]

পূর্বের বর্ণনাসমূহ থেকে প্রত্যেকেই বুঝতে পারে, আয়িশার (রা) বিয়ে, স্বামীগৃহে গমন, তথা প্রতিটি অনুষ্ঠান কত আড়ম্বরহীন ও সাদামাটা ছিল। তাতে অতিরঞ্জিত প্রদর্শনী বা বাহুল্য ভাবের কিছু ছিল না।

আয়িশার (রা) বিয়ের মাধ্যমে তৎকালীন আরবের বহু কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিলোপ ঘটে। তারা সকল প্রকার ভাই, এমনকি মুখে বলা ভাইয়ের মেয়েকেও বিয়ে করা বৈধ মনে করতো না। এ কারণে খাওলার (রা) প্রস্তাব শুনে আবু বকর (রা) বলে ওঠেন ঃ এটা কি বৈধ? আয়িশা তো রাসূলুল্লাহর (সা) ভাতিজী। একথা রাসূলুল্লাহর (সা) কানে গেলে তিনি বললেন ঃ আবু বকর আমার ইসলামী ভাই। তার মেয়ের সাথে আমার বিয়ে বৈধ।

আর একটি কুপ্রথা হলো, শাওয়াল মাসে তারা বিয়ে-শাদী করতো না। অতীতে কোন এক শাওয়াল মাসে আরবে প্লেগ দেখা দেয়। এ কারণে তারা এ মাসটিকে অশুভ বলে বিশ্বাস করতো এবং এ মাসে তারা কোন বিয়ের অনুষ্ঠান করতো না।[৫২]

তৎকালীন আরবের কিছু লোকের এ বিশ্বাসও ছিল যে, এ মাসে নববধূকে ঘরে আনলে তাদের সম্পর্ক টেকে না। ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এমন বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে আয়িশার (রা) এ বিয়ে কুঠারাঘাত করে। নববধূকে ঘরে আনার অনুষ্ঠানটি হয় দিনের বেলায়। এটাও ছিল প্রচলিত প্রথার বিপরীত।[৫৩]

আরেকটি প্রথা ছিল, দুলহানের আগে আগে তারা আগুন জ্বালাতো। নব দম্পতির প্রথম দৃষ্টি বিনিময় হতো কোন মঞ্চে অথবা তাঁবুর অভ্যন্তরে। এই সকল কুপ্রথার মূলোৎপাটন ঘটে এই বিয়ের মাধ্যমে।

---

৫০. বুখারী ও মুসলিম ঃ কিতাবুন নিকাহ; ইবন মাজাহ-(১৯৯০) কিতাবুন নিকাহ; তাবাকাত-৮/৫৯; সিয়ারু আ'লাম আন নুবালা-২/১৬৪

৫১. তাবাকাত-৮/৬৩

৫২. প্রাগুক্ত-৮/৬১

৫৩. ইবন কাসীর ঃ আস-সীরাহ-১/৪১৬

## শিক্ষা-দীক্ষা

প্রাচীন আরবে যেখানে পুরুষদেরই লেখা-পড়ার কোন প্রচলন ছিল না সেখানে মেয়েদের তো কোন প্রশ্নই আসেনা। ইসলামের সূচনাকালে মক্কার গোটা কুরাইশ খান্দানে মাত্র ১৭ (সতেরো) ব্যক্তি লিখতে-পড়তে জানতো। তাদের মধ্যে একজন মাত্র মহিলা ছিলেন– শিফা বিন্‌ত আবদিল্লাহ।[৫৪] ইসলাম পড়া-লেখার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ায় খুব দ্রুত এর প্রসার ঘটে।

রাসূলুল্লাহর (সা) সহধর্মিণীগণের মধ্যে হাফসা (রা) ও উম্মু সালামা (রা) কিছু লেখাপড়া জানতেন। হযরত হাফসা (রা) খোদ রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে শিফা বিন্‌ত আবদিল্লাহর (রা) নিকট লিখতে ও পড়তে শেখেন।[৫৫] সে সময় আরো কিছু মহিলা সাহাবী লেখাপড়া শেখেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) একাধিক স্ত্রী গ্রহণ, বিশেষত 'আয়িশাকে (রা) অপরিণত বয়সে গ্রহণের মধ্যে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত ছিল। রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্যের বরকত যদিও অগণিত পুরুষকে সৌভাগ্যের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে দিচ্ছিল, তথাপি স্বাভাবিক কারণে সাধারণ মহিলারা এ সৌভাগ্য লাভে সক্ষম ছিল না। রাসূলুল্লাহর (সা) সহধর্মিণীদের মাধ্যমেই তাঁর সাহচর্যের ফয়েজ ও বরকতের রহস্য গোটা বিশ্বের নারী জাতির মধ্যে প্রচারিত ও প্রসারিত হওয়া সম্ভব ছিল।

একমাত্র 'আয়িশা সিদ্দীকা (রা) ছাড়া অন্য সকল আযওয়াজে মুতাহ্‌হারাত বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ের বাঁধনে আবদ্ধ হন। এদিক দিয়ে একমাত্র 'আয়িশা (রা) শুধুমাত্র নুবুওয়াতের ফয়েজ ও বরকত লাভে ধন্য হন। শৈশব ও কৈশোর বয়স হলো মানুষের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের প্রকৃত সময়। সৌভাগ্য বশত এ বয়সের পুরোটা সময় তাঁর নবীর (সা) একান্ত সান্নিধ্যে কাটে। ফলে তিনি এমন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেন যাতে বিশ্বের মানব জাতির অর্ধেক অংশের জন্য আলোক বর্তিকা হয়ে যান।

গোটা কুরাইশ খান্দানের মধ্যে কুষ্ঠি বিদ্যা ও কাব্যশাস্ত্রে আবু বকর (রা) ছিলেন সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তি। 'আয়িশা (রা) এমন পিতার তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন। ফলে বংশগতভাবে তাঁর মধ্যে এ দুইটি শাস্ত্রের প্রীতি ও পারদর্শিতা সৃষ্টি হয়।

হযরত আবু বকর (রা) নিজের সন্তানদের সুশিক্ষা ও আদব-আখলাক শিক্ষাদানের প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। ক্ষেত্র বিশেষে কঠোরতাও করতেন। হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে তার প্রমাণও পাওয়া যায়। একবার ছেলে আবদুর রহমানকে মারতে উদ্যত হন শুধু এই কারণে যে, মেহমানদের খাবার দিতে দেরী করেছিলেন। বিয়ের পরেও

---

৫৪. বালাজুরী ঃ ফুতুহুল বুলদান ঃ 'ফাসলুল খত' অধ্যায়

৫৫. সুনানু আবী দাউদ ঃ কিতাবুত তিব্ব

'আয়িশা (রা) নিজের কোন ভুল-ত্রুটির জন্য পিতাকে দারুণ ভয় করতেন।[৫৬] অনেক ক্ষেত্রে পিতা তাঁকে ভীষণ বকাঝকা করতেন। মাঝে মধ্যে গায়ে হাত তুলতেও দ্বিধা করতেন না।[৫৭] একবার রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে তাঁকে মারতে উদ্যত হন। রাসূল (সা) তাকে বাঁচিয়ে নেন।[৫৮] আর একবার রাসূলুল্লাহর (সা) উপস্থিতিতে 'আয়িশার (রা) পাঁজরে জোরে থাপ্পড় মারেন। রাসূল (সা) তখন বলে ওঠেন ঃ আবু বকর! আল্লাহ আপনাকে মাফ করুন! আমরা এমনটি চাইনি।[৫৯]

হযরত 'আয়িশার (রা) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের প্রকৃত সূচনা হয় স্বামীর ঘরে যাওয়ার পর। এ সময়ে তিনি পড়তে শেখেন। তিনি দেখে দেখে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি লিখতে জানতেন না।[৬০] হাদীসে এসেছে, তাঁর জন্য কুরআন লেখালেখির কাজ করতেন তাঁর দাস জাকওয়ান।[৬১] তবে কিছু বর্ণনায় এসেছে– 'অমুক চিঠির জবাবে তিনি একথা লেখেন।' সম্ভবত বর্ণনাকারীরা 'লিখিয়েছেন' কথাটির স্থলে 'লেখেন' বলে দিয়েছেন। সাধারণত এমনই হয়ে থাকে।

যাহোক, লেখা ও পড়া মানুষের জ্ঞানের বাহ্যিক মাপকাঠি। প্রকৃত জ্ঞানের মাপকাঠি তার থেকে অনেক উঁচু স্তরে। মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতার পূর্ণতা ও পবিত্রতা অর্জন, দীনের আবশ্যকীয় বিষয় ও শরীয়াতের গূঢ় রহস্য জানা এবং আল্লাহর কালাম ও আহকামে নববীর জ্ঞান লাভই হচ্ছে সর্বোত্তম শিক্ষা। হযরত 'আয়িশা (রা) ছিলেন এই সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার। তাছাড়া ইতিহাস, সাহিত্য ও চিকিৎসা বিদ্যায় ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান।

ইতিহাস ও সাহিত্যের জ্ঞান অর্জন করেন পিতার নিকট থেকে।[৬২] চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল ও স্থান থেকে যে সকল লোকজন ও প্রতিনিধিরা রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে আসতো তাদের নিকট থেকে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলিতে অধিকাংশ সময় অসুস্থ থাকতেন। আরবের চিকিৎসকরা যেখানে যে ব্যবস্থাপত্র ও ওষুধ দিতেন, 'আয়িশা (রা) স্মৃতিতে তা ধরে রাখতেন।

একদিন 'উরওয়া 'আয়িশাকে (রা) বললেন ঃ আমি আপনার ফিকাহ, কাব্য ও প্রাচীন আরবের ইতিহাসের জ্ঞান দেখে বিস্মিত হইনি। কারণ, এ জ্ঞান অর্জন আপনার জন্য সম্ভব। কিন্তু আপনার 'তিব্ব' বা চিকিৎসা বিদ্যার জ্ঞান দেখে বিস্মিত না হয়ে পারিনা। এ জ্ঞান আপনি কিভাবে ও কোথা থেকে অর্জন করেন? 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ 'উরওয়া! রাসূল (সা) তাঁর শেষ জীবনে অসুস্থ থাকতেন। আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাঁর

---

৫৬. সহীহ্ মুসলিম ঃ বাবুল কাসামে বায়নায যাওজাত
৫৭. বুখারী ঃ কিতাবুন নিকাহ; আল-মুওয়াত্তা-১/৭৪
৫৮. আবু দাউদ ঃ আল-আদাব ঃ বাবুল মাযাহ (৪৯৯৯)
৫৯. আনসাবুল আশরাফ-১/৪১৭
৬০. মুসনাদ ৬/৭৩
৬১. প্রাগুক্ত ৬/৭৪; তিরমিজী-১/৩৯৭
৬২. প্রাগুক্ত ৬/৬৭

কাছে লোক আসতো। তারা নানা রকম ব্যবস্থাপত্র ও ওষুধ দিত। আর আমি সেইভাবে চিকিৎসা করতাম। সেখান থেকেই এই জ্ঞান অর্জন করেছি। অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, উরওয়া প্রশ্ন করেন ঃ এই তিব্বের জ্ঞান আপনি কোথা থেকে অর্জন করেছেন? 'আয়িশা (রা) জবাব দেন ঃ আমি অথবা অন্য কোন লোক অসুস্থ হলে যে ওষুধ ও ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়, সেখান থেকে শিখেছি। তাছাড়া একজন আরেকজনকে যেসব রোগ ও ওষুধের কথা বলে আমি তাও মনে রাখি।[৬৩]

দীনী জ্ঞান অর্জনের তো কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। শরীয়াতের মহান শিক্ষক ঘরেই ছিলেন। রাত-দিন তাঁর সাহচর্য লাভে ধন্য হতেন। প্রতিদিন মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহর (সা) তা'লীম ও ইরশাদের মজলিস বসতো। মসজিদের গাঁ ঘেঁষেই ছিল হযরত 'আয়িশার (রা) হুজরা। এ কারণে রাসূল (সা) বাইরে লোকদের যে শিক্ষা দিতেন, 'আয়িশা (রা) ঘরে বসেই তাতে শরিক থাকতেন। কখনো কোন কথা দূরত্ব বা অন্য কোন কারণে বুঝতে না পারলে রাসূল (সা) ঘরে এলে জিজ্ঞেস করে বুঝে নিতেন।[৬৪] কখনো কখনো তিনি মসজিদের কাছাকাছি চলে যেতেন।[৬৫] তাছাড়া রাসূল (সা) মহিলাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সপ্তাহে একটি দিন তাদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করে নেন।[৬৬]

দিবা-রাত্র ইল্‌ম ও হিকমাত বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসংখ্য বিষয়ের আলোচনা তাঁর কানে আসতো। তাঁর নিজেরও অভ্যাস ছিল, প্রতিটি বিষয় দ্বিধাহীন চিত্তে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে উপস্থাপন করা। তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তিনি শান্ত হতেন না। একবার রাসূল (সা) বললেন ঃ مَنْ حُوْ سِبَ عُذِّبَ কিয়ামতের দিন যার হিসাব নেওয়া হবে, সে শাস্তি ভোগ করবে।

আয়িশা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তো বলেছেন–

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا - (الانشقاق)

অর্থাৎ, তার থেকে সহজ হিসাব নেওয়া হবে। রাসূল (সা) বললেন ঃ এ হলো আমলের উপস্থাপন। কিন্তু যার আমলের চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হবে তার ধ্বংস অনিবার্য।[৬৭]

একবার ওয়াজ-নসীহতের সময় রাসূল (সা) বললেন ঃ কিয়ামতের দিন সকল মানুষ নগ্ন অবস্থায় উঠবে। 'আয়িশার (রা) মনে খট্‌কা লাগলো। তিনি বলে উঠলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! নারী-পুরুষ এক সংগে উঠবে। তাহলে একে অন্যের প্রতি কি দৃষ্টি পড়বে না? রাসূল (সা) বললেন ঃ সময়টা হবে অতি ভয়ংকর। অর্থাৎ একজনের অন্যজনের

৬৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৮২-১৮৩
৬৪. মুসনাদ-৬/৭৭
৬৫. প্রাগুক্ত ৬/১৫৯
৬৬. বুখারী ঃ কিতাবুল ইল্‌ম
৬৭. প্রাগুক্ত

ব্যাপারে কোন খবরই থাকবে না।[৬৮]

একদিন 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) জিজ্ঞেস করলেন, কাফির-মুশরিকরা যে ভালো কাজ করে তার সাওয়াব তারা পাবে কিনা? আবদুল্লাহ ইবন জাদ'আন নামে মক্কায় একজন সৎ স্বভাব ও কোমল অন্তরের মুশরিক ছিল। সে ইসলাম-পূর্ব যুগে কুরাইশদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-ফাসাদ মীমাংসার উদ্দেশ্যে কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে একটি বৈঠকে সমবেত করে। তাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন। 'আয়িশা (রা) প্রশ্ন করেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবদুল্লাহ ইবন জাদ'আন জাহিলী যুগে মানুষের সাথে সদয় ব্যবহার করতো। দরিদ্র ও অনাহারক্লিষ্টদেরকে আহার করাতো। তার এ কাজ কি উপকারে আসবে না?" তিনি জবাব দিলেন ঃ না, 'আয়িশা। সে কোনদিন একথা বলেনি যে, হে আল্লাহ! কিয়ামতের দিন তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও।

জিহাদ ইসলামের একটি অন্যতম ফরজ। 'আয়িশার (রা) ধারণা ছিল, অন্য ফরজের ক্ষেত্রে যেমন নারী-পুরুষের কোন প্রভেদ নেই, তেমনি এ ক্ষেত্রেও তাই হবে। একদিন রাসূলুল্লাহকে (সা) প্রশ্ন করেই বসলেন । উত্তর পেলেন ঃ হজ্জ হলো নারীদের জিহাদ।[৬৯]

আর একদিন প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! জিহাদ হচ্ছে সর্বোত্তম আমল। আমরা নারীরা কি জিহাদ করবো না? বললেন ঃ না। তবে সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে হজ্জে মাবরূর।[৭০]

বিয়েতে বর-কনে উভয়ের সম্মতি থাকা শর্ত। কুমারী মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রে লজ্জায় মুখে সম্মতি প্রকাশ করে না। এ কারণে 'আয়িশা (রা) একদিন প্রশ্ন করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিয়েতে তো মেয়ের সম্মতি প্রয়োজন। রাসূল (সা) বললেন ঃ হ্যাঁ, প্রয়োজন। 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ মেয়েরা তো লজ্জায় চুপ থাকে। রাসূল (সা) বললেন, তার চুপ থাকাই সম্মতি।[৭১]

একদিন রাসূল (সা) তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের পর বিতর না পড়েই বিশ্রামের জন্য একটু শোয়ার ইচ্ছা করলেন। 'আয়িশা (রা) বলে উঠলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বিতর না পড়েই শুয়ে যাচ্ছেন? রাসূল (সা) বললেন ঃ আমার চোখ তো ঘুমায়, কিন্তু অন্তর ঘুমায়না।[৭২] বাহ্যত 'আয়িশার (রা) এ ধরনের প্রশ্ন বেয়াদবী বলে মনে হয়। কিন্তু তিনি সাহসিকতা না দেখালে উম্মাতে মুহাম্মাদী নুবুওয়াতের গূঢ় রহস্য থেকে অজ্ঞ থেকে যেত।

ইসলামে প্রতিবেশীর বহু অধিকারের কথা এসেছে। আর এই অধিকার দানের সুযোগ

---

৬৮. প্রাগুক্ত ঃ বাবু কায়ফাল হাশার

৬৯. প্রাগুক্ত ঃ বাবু জিহাদিন নিসা; তাবাকাত-৮/৭২

৭০. প্রাগুক্ত ঃ বাবু ফাদলিল হাজ্জ আল মাবরূর

৭১. মুসলিম ঃ বাবুন নিকাহ,

৭২. বুখারী ঃ বাবু ফাদলু মান কামা রামাদান

আসে বেশীর ভাগ মেয়েদেরই। কিন্তু প্রতিবেশী একাধিক হলে কাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে? তাই 'আয়িশা (রা) একদিন প্রশ্ন করলেন। রাসূল (সা) জবাব দিলেন ঃ যে প্রতিবেশীর দরজা তোমার ঘরের অধিক নিকটবর্তী, তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।[৭৩]

একবার রাসূল (সা) বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করে না, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন না। 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে কেউ তো মৃত্যুকে পছন্দ করে না? রাসূল (সা) বললেন ঃ আমার কথার এই অর্থ নয়। তার অর্থ হলো, মুমিন ব্যক্তি যখন আল্লাহর রহমত, রিজামন্দী এবং জান্নাতের অবস্থার কথা শোনে তখন তার অন্তর আল্লাহর জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। আল্লাহও তার আগমনের প্রতীক্ষায় থাকেন। আর কাফির ব্যক্তি যখন আল্লাহর আজাব ও অসন্তুষ্টির কথা শোনে তখন সে আল্লাহর সামনে যেতে অপছন্দ করে। আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।[৭৪]

একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করতে এলো। তিনি অনুমতি দিয়ে বললেন ঃ 'তাকে আসতে দাও। সে তার গোত্রের খুব খারাপ লোক।' লোকটি এসে বসলো। রাসূল (সা) অত্যন্ত ধৈর্য, মনযোগ ও আন্তরিকতা সহকারে তার সাথে কথা বললেন। 'আয়িশা (রা) খুব অবাক হলেন। লোকটি চলে গেলে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো লোকটিকে ভালো জানতেন না। কিন্তু সে যখন এলো, তার সাথে এমন আন্তরিকতা ও নম্রভাবে কথা বললেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ 'আয়িশা! সবচেয়ে খারাপ মানুষ ঐ ব্যক্তি যার ভয়ে মানুষ তার সাথে মেলামেশা ছেড়ে দেয়।

একবার এক ব্যক্তি এসে কিছু সাহায্য চাইলো। হযরত 'আয়িশার (রা) ইঙ্গিতে দাসী কিছু জিনিস নিয়ে দিতে চললেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ 'আয়িশা! গুনে গুনে দিবে না। তাহলে আল্লাহও তোমাকে গুনে গুনে দিবেন।[৭৫] আর একবার রাসূল (সা) বলেন ঃ 'আয়িশা! খোরমার ছোট্ট একটি টুকরাও যদি হয়, ভিক্ষুককে তাই দিয়ে জাহান্নাম থেকে বাঁচ। সেটি একজন ক্ষুধার্ত মানুষ খেলে তো কিছু হবে এবং তার পেট ভরবে। এর থেকে আর ভালো কি হতে পারে।

আর একবার রাসূল (সা) দু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ! আমাকে দরিদ্র অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখ, দরিদ্র অবস্থায় মৃত্যু দাও এবং কিয়ামতের দিন দরিদ্রদের সাথেই উঠাও। 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ কেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূল (সা) বললেন ঃ সম্পদহীনরা সম্পদশালীদের চেয়ে চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে। 'আয়িশা! কোন ভিক্ষুককে কিছু না দিয়ে ফিরিয়ে দিবে না। তা সে খোরমার একটি টুকরাই হোক না কেন। দরিদ্রদের ভালোবাসবে এবং তাদেরকে নিজের পাশে বসাবে।[৭৬]

---

৭৩. মুসনাদ-৬/১৭৫
৭৪. জামে' তিরমিজী ঃ কিতাবুল জানায়িজ
৭৫. আবূ দাউদ ঃ কিতাবুল আদাব
৭৬. তিরমিজী ঃ আবওয়াবুয যুহ্দ

হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহে হযরত 'আয়িশার (রা) এ জাতীয় অসংখ্য জিজ্ঞাসা ও তার জবাব বর্ণিত হয়েছে। মূলতঃ এগুলিই ছিল তাঁর নিত্যদিনের পাঠ। বিভিন্ন নৈতিক উপদেশ ছাড়াও নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, তথা দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য কথা রাসূলে পাক (সা) হযরত 'আয়িশাকে (রা) অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে শেখাতেন। 'আয়িশাও (রা) অতি আগ্রহ সহকারে শিখতেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তা আমল করতেন।

হযরত 'আয়িশার (রা) মধ্যে জানার আগ্রহ ছিল অতি তীব্র। যে সকল মুহূর্তে রাসূলুল্লাহর (সা) অসন্তুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো তখনও তিনি জিজ্ঞাসা করা থেকে বিরত থাকতেন না। মূলতঃ তিনি স্বামী হযরত রাসূলে পাকের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাই তাঁর কাছে এত খোলামেলা ও দুঃসাহসী হতে পারতেন। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) কোন কারণে স্ত্রীদের উপর বিরক্ত হয়ে অঙ্গীকার করেন যে, আগামী একমাস কোন স্ত্রীর কাছেই যাবেন না। উনত্রিশ দিন এই অঙ্গীকারের উপর অটল থাকেন। ঘটনাক্রমে সেই চন্দ্র মাসটি ছিল উনত্রিশ দিনের। রাসূল (সা) পরের মাসের প্রথম তারিখ অর্থাৎ ৩০তম দিনে 'আয়িশার (রা) নিকট যান। আপতঃদৃষ্টিতে 'আয়িশার (রা) উল্লসিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, তিনি প্রশ্ন করেছেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বলেছেন, একমাস আমাদের কাছে আসবেন না। একদিন আগে কিভাবে আসলেন? রাসূল (সা) বললেন ঃ 'আয়িশা! মাস উনত্রিশ দিনেও হয়।

## সংসার জীবন

হযরত 'আয়িশা (রা) পিতৃগৃহ থেকে বউ হয়ে যে ঘরে এসে ওঠেন তা কোন আলিশান অট্টালিকা ছিল না। মদীনার বনু নাজ্জার মহল্লার মসজিদে নববীর চারপাশে ছোট্ট ছোট্ট কিছু কাঁচা ঘর ছিল, তারই একটিতে তিনি এসে ওঠেন। ঘরটি ছিল মসজিদের পূর্ব দিকে। তার একটি দরজা ছিল পশ্চিম দিকে– মসজিদের ভিতরে। ফলে মসজিদ ঘরের আঙ্গিনায় পরিণত হয়। হযরত রাসূলে কারীম (সা) সেই দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতেন। তিনি যখন মসজিদে ই'তিকাফ করতেন, মাথাটি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেন, আর 'আয়িশা (রা) চুলে চিরুনী করে দিতেন।[৭৭] কখনো মসজিদে বসেই ঘরের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কোন কিছু 'আয়িশার (রা) নিকট থেকে চেয়ে নিতেন।[৭৮]

ঘরটির প্রশস্ততা ছিল ছয় হাতেরও বেশী। দেয়াল ছিল মাটির। খেজুর পাতা ও ডালের ছাদ ছিল। তার উপরে বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য কম্বল দেওয়া ছিল। এতটুকু উঁচু ছিল যে, একজন মানুষ দাঁড়ালে তার হাতে ছাদের নাগাল পাওয়া যেত। এক পাল্লার একটি দরজা ছিল; কিন্তু তা কখনো বন্ধ করার প্রয়োজন পড়েনি।[৭৯] পর্দার জন্য দরজায় একটি কম্বল

---

৭৭. বুখারী ঃ আল-ইতিকাফ; মুসনাদ-৬/২৩১
৭৮. বুখারী ঃ কিতাবুল হায়জ
৭৯. বুখারী ঃ বাবুল নিসা; তাবাকাত -৮/৭১

ঝুলানো থাকতো। এই ঘরের লাগোয়া আর একটি ঘর ছিল– যাকে 'মাশরাবা' বলা হতো। একবার রাসূল (সা) স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকা কালে এক মাস এখানেই কাটান।

ঘরে আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল– একটি খাট, একটি চাটাই, একটি বিছানা, একটি বালিশ, খোরমা-খেজুর রাখার দুইটি মটকা, পানির একটি পাত্র এবং পান করার একটি পেয়ালা। এর বেশী কিছু নয়। বিভিন্ন হাদীসে একাধিক স্থানে এইসব জিনিসের নাম এসেছে। যে ঘরটি ছিল দুনিয়া ও আখিরাতের সকল আলোর উৎস, সেই ঘরের বাসিন্দাদের রাতের বেলা একটি বাতি জ্বালানোর সামর্থ ছিল না। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ একাধারে প্রায় চল্লিশ রাত চলে যেত ঘরে কোন বাতি জ্বলতো না।

ঘরে সর্বসাকুল্যে দুইটি মানুষ– রাসূলুল্লাহ (সা) ও 'আয়িশা (রা)। কিছুদিন পর 'বুরায়রা' (রা) নাম্নী একজন দাসী যুক্ত হন।[৮০] যতদিন 'আয়িশা ও সাওদা– মাত্র দুই স্ত্রীই ছিলেন, রাসূল (সা) একদিন পর পর 'আয়িশার (রা) ঘরে রাত কাটাতেন। পরে আরো কয়েকজনকে স্ত্রীর মর্যাদা দান করলে এবং হযরত সাওদা (রা) স্বেচ্ছায় স্বীয় বারির দিনটি 'আয়িশাকে দান করলে প্রতি নয় দিনে দুই দিন 'আয়িশার (রা) ঘরে কাটাতেন।[৮১]

ঘর-গৃহস্থালীর গোছগাছ ও পরিপাটির বিশেষ কোন প্রয়োজন পড়তো না। খাদ্য খাবার তৈরী ও রান্নাবান্নার সুযোগ খুব কমই আসতো। হযরত 'আয়িশা (রা) নিজেই বলতেন ঃ কখনো একাধারে তিন দিন এমন যায়নি যখন নবী পরিবারের লোকেরা পেট ভরে খেয়েছেন।[৮২] তিনি আরো বলতেন ঃ মাসের পর মাস ঘরে আগুন জ্বলতো না।[৮৩] এ সময় খেজুর ও পানির উপরই কাটতো।[৮৪] খায়বার বিজয়ের পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের (পবিত্র সহধর্মিণীগণ) প্রত্যেকের জন্য বাৎসরিক ভাতা নির্ধারণ করে দেন।[৮৫] আবদুর রহমান আল-আ'রাজ মদীনায় তাঁর মজলিসে বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) 'আয়িশার (রা) জীবিকার জন্য খায়বারের ফসল থেকে আশি ওয়াসাক খেজুর এবং বিশ ওয়াসাক যব মতান্তরে গম দিতেন।[৮৬] কিন্তু তাঁর দানশীলতার কারণে এই পরিমাণ খাদ্য সারা বছরের জন্য কখনো যথেষ্ট ছিল না।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) সব সময় নবী-পরিবারে উপহার-উপঢৌকন পাঠাতেন। বিশেষ করে যেদিন রাসূল (সা) 'আয়িশার (রা) ঘরে অবস্থান করতেন, লোকেরা ইচ্ছা করেই

---

৮০. প্রাগুক্ত ঃ বাবু ইসতিয়ানুল সুকাতির; বাবুস সাদাকা; ও আল-ইফ্ক

৮১. তাবাকাত ঃ ৮/৬৫

৮২. বুখারী ঃ মায়ীশাতুন নাবী

৮৩. মুসনাদ ৬/২১৭, ২৩৭, বুখারীতে 'আল-আত'য়িমা' অধ্যায়ে এক মাসের বর্ণনা এসেছে

৮৪. বুখারী ঃ বাবু কায়ফাকানা 'আয়শুন নাবী

৮৫. আবু দাউদ ঃ হুকমু আরদি খায়বার

৮৬. তাবাকাত-৮/৬৯

সেই দিন বেশী করে হাদিয়া-তোহফা পাঠাতেন।[৮৭]

অনেক সময় এমন হতো যে, রাসূল (সা) বাইরে থেকে এসে জিজ্ঞেস করতেন ঃ 'আয়িশা! কিছু আছে কি? তিনি জবাব দিতেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিছুই নেই। তারপর সবাই মিলে রোযা রাখতেন।[৮৮] অনেক সময় কোন কোন আনসার পরিবার দুধ পাঠাতো। তাই পান করেই পরিতৃপ্ত থাকতেন।[৮৯] উম্মু সালামা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) সময় আমাদের অধিকাংশ দিনের খাবার ছিল দুধ।[৯০]

রাসূলুল্লাহর (সা) ঘর-গৃহস্থলীর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছিল হযরত বিলালের (রা) উপর। তিনি সারা বছরের খাদ্যশস্য বন্টন করতেন। প্রয়োজন পড়লে ধার-কর্জ করতেন।[৯১]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) যখন ওফাত পান তখন গোটা আরব ইসলামের ছায়াতলে এসে গেছে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রচুর অর্থ-সম্পদ এসে বায়তুল মালে জমা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও রাসূল (সা) যেদিন ওফাত পান সেদিন হযরত 'আয়িশার (রা) ঘরে একদিন চলার মতও খাবার ছিল না।

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালেও হযরত 'আয়িশার (রা) খায়বারে উৎপাদিত ফসল থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য পেতেন। খলীফা হযরত 'উমার (রা) সবার জন্য নগদ ভাতার প্রচলন করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীদের প্রত্যেকের জন্য বাৎসরিক দশহাজার দিরহাম নির্ধারণ করেন। কিন্তু 'আয়িশার (রা) জন্য নির্ধারণ করেন বারো হাজার। এর কারণ স্বরূপ তিনি বলতেন ঃ 'আয়িশা ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) প্রিয়তমা স্ত্রী।[৯২] একটি বর্ণনায় এসেছে, খলীফা 'উমার (রা) তাঁর সময়ে খায়বারে উৎপন্ন ফসলের অংশ অথবা ভূমি গ্রহণের এখতিয়ার দান করেন। হযরত 'আয়িশা (রা) তখন ভূমি গ্রহণ করেন।[৯৩]

অর্থ-সম্পদ যা কিছু তাঁর হাতে আসতো– গরীব-মিসকীনদের মধ্যে অকাতরে বিলিয়ে দিতেন। খলীফা হযরত 'উসমান (রা) থেকে নিয়ে আমীর মু'য়াবিয়া (রা) পর্যন্ত উপরে উল্লেখিত ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) ছিলেন হযরত 'আয়িশার (রা) ভাগ্নে– যিনি আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) পরে হিজাযের খলীফা হন। তিনি খালার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতেন। কিন্তু যেদিন বায়তুল মাল থেকে ভাতা না আসতো সেদিন তাঁর গৃহে অভুক্ত থাকার উপক্রম হতো।[৯৪]

স্বভাবগতভাবে হযরত 'আয়িশার (রা) তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বোধ থাকা সত্ত্বেও বয়স কম হওয়ার

---

৮৭. বুখারী ঃ ফাদলু 'আয়িশা
৮৮. মুসনাদ-৬/৪৯
৮৯. প্রাগুক্ত-৬/২৪৪
৯০. আনসাবুল আশরাফ-১/৫১৩
৯১. আবু দাউদ ঃ কবূলু হাদা ইয়াল মুশরিকীন
৯২. তাবাকাত-৮/৭৪; আল-মুসতাদরিক ঃ জিকরু 'আয়িশা।
৯৩. বুখারী ঃ বাবুল মুযারিয়া বিশ-শাতরে।
৯৪. প্রাগুক্ত বাবু মানাকিবি কুরাইশ।

কারণে মাঝে মধ্যে ভুল-ত্রুটি হয়ে যেত। ঘরে গম পিষে আটা বানিয়ে ঘুমিয়ে যেতেন, ছাগল এসে তা খেয়ে ফেলতো।[৯৫] একদিন তিনি নিজ হাতে আটা পিষে রুটি তৈরী করেন। তারপর রাসূলুল্লাহর (সা) আসার প্রতীক্ষায় থাকেন। সময়টি ছিল রাতের বেলা। এক সময় রাসূল (সা) আসলেন এবং নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। ঘুমে হযরত 'আয়িশার (রা) চোখ দুইটি বন্ধ হয়ে এলো। এই ফাঁকে প্রতিবেশীর একটি ছাগল ঘরে ঢুকে সবকিছু খেয়ে ফেললো। রাসূলুল্লাহর (সা) বয়স্কা স্ত্রীদের তুলনায় তিনি খাদ্য-খাবার ভালো পাকাতে পারতেন না।[৯৬]

## দাম্পত্য জীবন

রাসূলুল্লাহ (সা) ও 'আয়িশার (রা) যুগল জীবন এবং তাঁদের মধ্যের মধুর সম্পর্কের একটি চিত্র আমাদের সামনে থাকা দরকার। ইসলাম নারীকে না অতি পবিত্র মনে করে দেবীর আসনে বসিয়েছে, আর না তাকে কেবল পুরুষের ভোগের বস্তু বলে মনে করেছে। নারী সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক কালের পৃথিবীর মানুষের ধারণা মূলত এমনই। তাই কোন কালেই কোন সমাজে নারী সঠিক মর্যাদা লাভ করেনি। একমাত্র ইসলামই সঠিক মর্যাদা দিয়েছে। ইসলাম নারীর সর্বোত্তম যে পরিচিতি তুলে ধরেছে তা হচ্ছে, এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় বিশ্বে নারী হলো পুরুষের প্রশান্তি ও সান্ত্বনার উৎস। কুরআন ঘোষণা করেছে ঃ

وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ـ (الروم-٢١)

–আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আর্ রূম-২১)

আল্লাহ পাকের এই ঘোষণার বাস্তব চিত্র আমরা দেখতে পাই রাসূলুল্লাহ (সা) ও 'আয়িশার (রা) দাম্পত্য জীবনের মধ্যে। রাসূল (সা) বলেছেন।[৯৭]

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهٖ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِىْ ـ

–তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম। আমি আমার স্ত্রীদের নিকট তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম।

তাঁদের নয় বছরের দাম্পত্য জীবনে ছিল গভীর ভালোবাসা, পারস্পরিক সহমর্মিতা, সীমাহীন আবেগ ও নিষ্ঠা। কঠিন দারিদ্র, অনাহার, তথা সকল প্রতিকূল পরিবেশেও

৯৫. প্রাগুক্ত-আল-ইফ্ক।
৯৬. আবু দাউদ ঃ বাবু মান আফসাদা শায়য়ান।
৯৭. বুখারী ঃ বাবু হুসনুল মুয়াশারা।

তাঁদের এ মধুর সম্পর্কে একদিনের জন্যও ফাটল দেখা যায়নি। কোন রকম তিক্ততা ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়নি।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) 'আয়িশাকে (রা) গভীরভাবে ভালোবাসতেন। একথা গোটা সাহাবী সমাজের জানা ছিল। এ কারণে রাসূল (সা) যেদিন 'আয়িশার (রা) ঘরে কাটাতেন সেদিন তাঁরা বেশী বেশী হাদিয়া তোহফা পাঠাতেন। এতে অন্যান্য স্ত্রীরা ক্ষুব্ধ হতেন। তাঁরা চাইতেন রাসূল (সা) যেন লোকদের নির্দেশ দেন, তিনি যেদিন যেখানে থাকেন লোকেরা যেন সেখানেই যা কিছু পাঠাবার, পাঠায়। কিন্তু সে কথা বলার হিম্মত কারো হতো না। এই জন্য তাঁরা সবাই মিলে তাঁদের মনের কথা রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাসূলে পাকের কলিজার টুকরো ফাতিমাকে (রা) বেছে নেন। রাসূল (সা) ফাতিমার (রা) বক্তব্য শুনে বললেন, 'মা, আমি যা চাই, তুমি কি তা চাও না? ফাতিমা পিতার ইচ্ছা বুঝতে পারলেন। তিনি ফিরে এলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীরা আবার তাঁকে পাঠাতে চাইলেন; কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। অবশেষে তাঁরা হযরত উম্মু সালামাকে (রা) পাঠালেন। তিনি ছিলেন একজন বয়স্কা, বুদ্ধিমতী ও রসিক মহিলা। তিনি বেশ কায়দা করে তাঁদের মনের কথা রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন। রাসূল (সা) তাঁকে বললেন ঃ উম্মু সালামা! 'আয়িশার ব্যাপারে তোমরা আমাকে বিরক্ত করবেনা। কারণ 'আয়িশা ছাড়া আর কোন স্ত্রীর লেপের নীচে আমার উপর ওহী নাযিল হয়নি।[৯৮] ইমাম জাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) এই জবাব দ্বারা প্রতীয়মান হয়, অন্যদের তুলনায় 'আয়িশাকে (রা) সর্বাধিক ভালোবাসার অন্যতম কারণ হলো, আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহর নির্দেশেই তিনি 'আয়িশাকে (রা) এত ভালোবাসতেন।[৯৯]

হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা) 'জাতুস সালাসিল' যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে একদিন রাসূলুল্লাহকে (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ পৃথিবীতে আপনার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে? বললেন ঃ 'আয়িশা। তিনি আবার বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ আমার জিজ্ঞাসা পুরুষ সম্পর্কে। বললেন ঃ 'আয়িশার পিতা।[১০০]

একদিন 'উমার (রা) মেয়ে উম্মুল মুমিনীন হাফসাকে (রা) উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন ঃ তুমি 'আয়িশার সাথে পাল্লা দিতে যেও না। কারণ, সে তো রাসূলুল্লাহর (সা) প্রিয়তমা।[১০১]

একবার এক সফরে চলার পথে 'আয়িশার (রা) উটনীটি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে তাঁকে নিয়ে দৌড় দেয়। এতে রাসূলে পাক এতই অস্থির হয়ে পড়েন যে, তাঁর মুখ দিয়ে তখন উচ্চারিত হতে শোনা যায় ঃ 'ওয়া আরূসাহ!' হায়! আমার বধূ![১০২]

---

৯৮. বুখারী ঃ ফা'দলু 'আয়িশা; আল-হিবা; মুসলিম ঃ ফাদায়িল আস-সাহাবা (২৪৪১)।

৯৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৪৩

১০০. বুখারী ঃ ফাদায়িল আসহাবিল নাবী, গাযওয়াতু জাতিস সালাসিল; মুসলিম ঃ ফাদায়িলু আবী বকর (২৩৮৪); তাবাকাত-৮/৬৭; তিরমিজী (৩৮৮৫)।

১০১. বুখারী ঃ হুব্বুর রাজুলে বা'দা নিসায়িহি।

১০২. মুসনাদ-৬/২৩৮

হযরত রাসূলে কারীম (সা) অন্তিম রোগ শয্যায় বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন ঃ আজ কি বার? সবাই বুঝলো, তিনি 'আয়িশার বারির দিনটির অপেক্ষা করছেন। সুতরাং তাঁকে 'আয়িশার (রা) ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। ওফাত পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। 'আয়িশার (রা) রানের উপর মাথা রেখে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[১০৩] তেরো দিন রাসূল (সা) অসুস্থ ছিলেন। তার মধ্যে পাঁচ দিন অন্য স্ত্রীদের ঘরে এবং আট দিন 'আয়িশার (রা) ঘরে কাটান।

পরবর্তীকালে 'আয়িশা (রা) বলতেন ঃ রাসূল (সা) আমার ঘরে আমার বারির দিনে এবং আমারই বুকে ইনতিকাল করেন। জীবনের একেবারে অন্তিম মুহূর্তে আবদুর রহমান ইবন আবী বকর (রা) একটি কাঁচা মিসওয়াক হাতে করে রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখতে আসেন। রাসূল (সা) সেই মিসওয়াকটির দিকে বার বার তাকাতে লাগলেন। বুঝলাম, তিনি সেটা চাচ্ছেন। আমি সেটা নিয়ে ধুয়ে নিজে চিবিয়ে নরম করে রাসূলুল্লাহকে (সা) দিলাম। তিনি সেটা দিয়ে সুন্দর করে মিসওয়াক করলেন। তারপর আমাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য হাত বাড়ালেন, কিন্তু হাতটি পড়ে গেল। তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। সেই মহান আল্লাহর প্রশংসা যিনি তাঁর রাসূলের পার্থিব জীবনের শেষ মুহূর্তটিতে তাঁর ও আমার থুথু মিলিত করেছেন।[১০৪]

অনেকে মনে করে থাকে 'আয়িশার (রা) প্রতি রাসূলুল্লাহর (সা) এমন আবেগ ও মুগ্ধতার কারণ তাঁর রূপ-লাবণ্য। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। রাসূলে পাকের সহধর্মিণীদের মধ্যে জুওয়াইরিয়া, যায়নাব ও সাফিয়্যা (রা) ছিলেন সর্বাধিক সুন্দরী। তাঁদের সৌন্দর্য্যের কথা হাদীস, সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে বিদ্যমান। কিন্তু 'আয়িশার (রা) রূপ-লাবণ্যের কথা দুই একটি স্থান ব্যতিত তেমন কিছু উল্লেখ নেই। যেমন একবার 'উমার (রা) হাফসাকে (রা) উপদেশ দিতে গিয়ে তাঁর সম্পর্কে একটি মন্তব্য করেন। আর তা শুনে রাসূল (সা) একটু হেসে দেন।[১০৫] মূলতঃ 'উমারের এ মন্তব্য দ্বারা এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, 'আয়িশা (রা) হাফসার (রা) চেয়ে প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য।

আসল কথা রাসূল (সা) যা বলেছেন, তাই। তিনি বলেছেন ঃ বিয়ের জন্য কনের নির্বাচন চারটি গুণের ভিত্তিতে হতে পারে। ১. ধন-সম্পদ ২. রূপ-সৌন্দর্য্য, ৩. বংশ মর্যাদা ৪. দ্বীনদারী। তোমরা দীনদারীর সন্ধান করবে।[১০৬] এ কারণে যাঁর দ্বারা দ্বীনের বেশী খিদমাত হওয়া সম্ভব ছিল স্ত্রীদের মধ্যে তিনিই রাসূলুল্লাহর (সা) সর্বাধিক ভালোবাসার পাত্রী ছিলেন। 'আয়িশার (রা) সমঝ-বুঝ, চিন্তা-অনুধ্যান, হুকুম-আহকাম স্মৃতিতে ধারণ ক্ষমতা অন্য স্ত্রীদের তুলনায় অতিমাত্রায় বেশী ছিল। মূলতঃ এসব গুণই তাঁকে

---

১০৩. বুখারী ঃ বাবু মারদিন নাবী

১০৪. মুসনাদ ঃ ৬/৪৮, ২৭৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/১৮৯

১০৫. বুখারী ঃ বাবু মাওয়িজাতুর রাজুলে ইবনাতাহু

১০৬. প্রাগুক্ত ঃ কিতাবুন নিকাহ ঃ আল-আকফা ফিদ-দ্বীন। মুসলিম ও আবু দাউদ ঃ কিতাবুন নিকাহ।

স্বামীর প্রিয়তমা করে তুলেছিল। আল্লামাহ্ ইবন হাযাম *'আল-মিলাল ওয়ান নিহাল'* গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করে একথা প্রমাণ করেছেন। বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে রাসূলুল্লাহর (সা) এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে ঃ[১০৭]

كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ غَيْرَ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ وَاٰسِيَةَ اِمْرَأَةِ فِرْعَوْنَ وَاِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ -

–পুরুষদের মধ্যে কামালিয়াত বা পূর্ণতা অর্জন করেছেন অনেকে, কিন্তু নারীদের মধ্যে মারইয়াম বিন্‌ত ইমরান এবং ফির'আউনের স্ত্রী আসিয়া ছাড়া আর কেউ পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি। তবে গোটা নারী জাতির উপর 'আয়িশার মর্যাদা যাবতীয় খাদ্য সমগ্রীর উপর সারীদের মর্যাদার মত।

'আয়িশাকে (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) এত বেশী ভালোবাসার তাৎপর্য এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়। তাঁর মুগ্ধতা 'আয়িশার (রা) রূপ-যৌবন ও সৌন্দর্য্যে ছিল না; বরং তা ছিল তাঁর অন্তর্গত গুণাবলী ও পূর্ণতায়। আর এই অন্তর্গত গুণাবলীতে 'আয়িশার (রা) পরে স্থান ছিল উম্মু সালামার (রা)। এ কারণে বয়স্কা হওয়া সত্ত্বেও তিনিও রাসূলুল্লাহর (সা) গভীর ভালোবাসার পাত্রী ছিলেন। হযরত খাদীজা (রা) ষাট বছর বয়স লাভ করে ওফাত পান, অথচ তাঁর ভালোবাসা রাসূলুল্লাহর (সা) হৃদয়ের এত গভীরে ছিল যে, তাতে 'আয়িশাও (রা) ঈর্ষা পোষণ করতেন।[১০৮]

স্বামী রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি ছিল 'আয়িশার (রা) বুকভরা পবিত্র ভালোবাসা। সেই ভালোবাসায় অন্য কেউ ভাগের দাবীদার হলে তিনি কষ্ট পেতেন। কখনো রাতে 'আয়িশার (রা) ঘুম ভেঙ্গে গেলে পাশে স্বামীকে না পেলে অস্থির হয়ে পড়তেন। একদিন গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। পাশে স্বামীকে পেলেন না। রাতে ঘরে বাতিও জ্বলতো না। অন্ধকারে এদিক ওদিক হাতড়াতে লাগলেন। অবশেষে এক স্থানে স্বামীর কদম মুবারাক খুঁজে পেলেন। তিনি সিজদায় পড়ে আছেন।[১০৯]

আরো একবার একই অবস্থার অবতারণা হলো। 'আয়িশা (রা) মনে করলেন, তিনি হয়তো অন্য কোন স্ত্রীর ঘরে গেছেন। তিনি এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন। দেখলেন, স্বামী এক কোণে নীরবে তাসবীহ পাঠে নিমগ্ন আছেন। 'আয়িশা (রা) নিজের অমূলক ধারণার জন্য লজ্জিত হলেন। তিনি আপন মনে বলে উঠলেন ঃ 'আমার মা-বাবা উৎসর্গীত হোক! আমি কোন্ ধারণায় আছি, আর তিনি আছেন কোন্ অবস্থায়।'[১১০]

---

১০৭. বুখারী ঃ ফাদলু 'আয়িশা; মুসলিম ঃ ফাদায়িলু খাদীজা; তিরমিজী-(৩৮৮৭); আনসাবুল আশরাফ-১/৪১৩, তাবাকাত-৮/৭৯

১০৮. মুসলিম : বাবু ফাদায়িলু খাদীজা

১০৯. নাসাঈ ঃ বাবুল গায়রা; বাবুদ-দু'আ ফিস সুজুদ; মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ঃ বাব মা জা' ফিদ-দু'আ

১১০. নাসাঈ ঃ আল-গায়রা; আদ-দু'আ ফিস্-সুজুদ

অন্য এক রাতের ঘটনা। 'আয়িশা (রা) মধ্যরাতে জেগে উঠলেন। পাশে স্বামীকে না পেয়ে এখানে সেখানে খোঁজাখোঁজি করতে করতে কবরস্থানে পৌঁছে দেখলেন, তিনি দু'আ ও ইসতিগফারে নিমগ্ন। তিনি আবার নীরবে ফিরে আসলেন। সকালে একথা স্বামীকে জানালে তিনি বললেন ঃ হাঁ, রাতে আমার সামনে দিয়ে কোন একটা জিনিস যাচ্ছিল মনে হয়েছিল। তাহলে সে তুমিই হবে।'

একবার এক সফরে 'আয়িশা (রা) ও হাফসা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সফর সঙ্গিনী ছিলেন। রাতে চলার পথে রাসূল (সা) 'আয়িশার (রা) বাহনের পিঠে বসে তাঁর সাথে কথা বলতে বলতে চলতেন। একদিন 'আয়িশা ও হাফসা (রা) পরামর্শ করে উট বদল করে নিলেন। রাতে রাসূল (সা) যথারীতি 'আয়িশার (রা) উঠের পিঠে উঠে এলেন এবং হাফসার (রা) সাথে কথা বলতে বলতে পথ চললেন। এদিকে 'আয়িশা (রা) স্বামী সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে কাতর হয়ে পড়েন। পরবর্তী মানযিলে কাফেলা থামলে তিনি বাহনের পিঠ থেকে নেমে পড়েন এবং ঘাসের মধ্যে নিজের চরণ দুইখানি ডুবিয়ে দিয়ে আপন মনে বলতে থাকেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমি তো আর তাঁকে কিছু বলতে পারিনে। আপনি একটা বিচ্ছু অথবা সাপ পাঠিয়ে দিন, আমাকে দংশন করুক!'[১১১]

রাসূলুল্লাহর (সা) সহধর্মিণীগণের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মহিলা ছিলেন। কেউ কেউ ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ অভিজাত পরিবারের মেয়ে। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে এমন দীন-হীন অবস্থায় জীবন যাপন করতে গিয়ে তাঁদের ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। এ জন্য তাঁরা সমবেতভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট জীবন যাপনের মান বৃদ্ধির আবদার করতে থাকেন। এরই প্রেক্ষিতে পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল হয়। যাতে তাঁদেরকে এ চূড়ান্ত কথা বলে দেওয়া হয় যে, যাঁর ইচ্ছা স্বেচ্ছায় সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে যেতে পারেন অথবা এই দীন-হীন অবস্থা মেনে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে জীবন যাপন করতে পারেন। 'আয়িশা (রা) ছিলেন যেহেতু কম বয়স্কা, তাই রাসূল (সা) তাঁকে মা-বাবার সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত জানাতে বলেন। কিন্তু তিনি কারো সাথে পরামর্শ ছাড়াই সাথে সাথে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। বলেন ঃ 'আমি আল্লাহর রাসূলকেই চাই।' সবার আগেই তিনি এ সিদ্ধান্ত দেন এবং রাসূলুল্লাহকে (সা) অনুরোধ করে বলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এ সিদ্ধান্তের কথা আপনি অন্য কাউকে বলবেন না।'[১১২]

রাসূলে কারীম (সা) অনেক সময় 'আয়িশার (রা) রানের উপর মাথা রেখে শুয়ে যেতেন। একদিন রাসূল (সা) সেই অবস্থায় বিশ্রাম নিচ্ছেন, এমন সময় আবু বকর (রা) কোন এক কারণে মেয়ের উপর উত্তেজিত হয়ে তাঁর ঘরে ঢুকে পড়েন এবং তাঁর পার্শ্বদেশে ধাক্কা দেন। কিন্তু 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) আরামের ব্যাঘাত হতে পারে, তাই মোটেই নড়াচড়া করলেন না।[১১৩]

---

১১১. মুসলিম ঃ ফাদলু 'আয়িশা; বুখারী ঃ আল-কার'আ বাইনা আন-নিসা

১১২. বুখারী ঃ আল-ঈলা; তাবাকাত-৮/৭৯

১১৩. প্রাগুক্ত ঃ আত-তায়াম্মুস

রাসূলে কারীম (সা) যে সকল বস্ত্রে ইনতিকাল করেন, 'আয়িশা (রা) অতি যত্নের সাথে তা সংরক্ষণ করেন। একবার এক সাহাবীকে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) একটি চাদর ও কম্বল দেখিয়ে বলেন, এই কাপড়েই তিনি ইনতিকাল করেন।[১১৪]

রাসূলে পাকের গোটা জিন্দেগী মানবজাতির জন্য আদর্শস্বরূপ। এ কারণে একজন স্বামী তার স্ত্রীকে খুশী করার জন্য কেমন আচরণ করবে, আমরা তাও 'আয়িশা (রা) ও রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনে দেখতে পাই। আমরা কখনো কখনো রাসূলুল্লাহকে (সা) 'আয়িশার (রা) সাথে দারুণ উদার ও খোলামেলা দেখতে পাই। 'আয়িশার (রা) অতি তুচ্ছ কোন তামাশা বা খেলাধুলা দেখেও তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) একজন আনসারী মেয়েকে প্রতিপালন করেন। খুব সাদামাটা ও অনুষ্ঠানবিহীনভাবে তার বিয়ে হচ্ছিল। রাসূল (সা) ঘরে এসে বললেন ঃ 'আয়িশা! কোন গান-গীত তো নেই।[১১৫]

একবার ঈদের দিন কিছু হাবশী লোক নিযা হেলিয়ে দুলিয়ে পালোয়ানীর কসরত দেখাচ্ছিল। 'আয়িশা (রা) স্বামীর নিকট এই খেলা দেখার আবদার করলেন। রাসূল (সা) তাঁকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং 'আয়িশা (রা) সেই খেলা উপভোগ করলেন। যতক্ষণ 'আয়িশা (রা) ক্লান্ত হয়ে নিজেই সরে না গেলেন, রাসূল (সা) ততক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলেন।[১১৬]

একবার 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে একটু উঁচু গলায় কথা বলছিলেন। এমন সময় পিতা আবু বকর (রা) এসে উপস্থিত হলেন। তিনি মেয়ের এমন বেয়াদবী দেখে রেগে গেলেন এবং মারার জন্য হাত উঁচু করলেন। রাসূল (সা) দ্রুত মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে 'আয়িশাকে রক্ষা করলেন। আবু বকর (রা) চলে গেলে রাসূল (সা) 'আয়িশাকে বললেন ঃ বলতো, আমি তোমাকে কিভাবে বাঁচালাম?[১১৭]

একবার একটি মেয়েকে সংগে করে রাসূল (সা) 'আয়িশার (রা) নিকট এসে বললেন, তুমি এই মেয়েটিকে চেন? 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ না। রাসূল (সা) বললেন ঃ সে অমুকের দাসী। তুমি কি তার গান শুনতে চাও? 'আয়িশা (রা) শোনার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। দাসীটি দীর্ঘক্ষণ গান গাইলো। এক সময় রাসূল (সা) তার সম্পর্কে মন্তব্য করলেন ঃ শয়তান তার নাকের ছিদ্রে বাদ্য বাজায়। অর্থাৎ এ ধরনের গান রাসূলুল্লাহ (সা) অপছন্দ করেন।

'আয়িশাকে (রা) খুশী করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) মাঝে মধ্যে তাঁকে গল্পও শোনাতেন।[১১৮] আবার কখনো কখনো ধৈর্যসহকারে 'আয়িশার (রা) গল্পও শুনতেন।

---

১১৪. আবু দাউদ ঃ কিতাবুল লিবাস
১১৫. মুসনাদ-৬/২৬৯; বুখারী ঃ আন-নিকাহ অধ্যায়
১১৬. বুখারী ঃ বাবু হুসনুল মু'য়াশারা
১১৭. আবু দাউদ ঃ কিতাবুল আদাব ঃ মা জাআ' ফিল মিযাজ
১১৮. শামায়িলি তিরমিজী ঃ হাদীসু খুরাফা; মুসনাদ-৬/১৫৭

কিন্তু এমন ঘনিষ্ঠ ও আনন্দঘন মুহূর্তেও যদি আজানের ধ্বনি কানে আসতো, তিনি তক্ষুনি সোজা বেরিয়ে যেতেন, যেন কাকেও চেনেন না।[১১৯]

একবার এক সফরে 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সফরসঙ্গিনী ছিলেন। চলার পথে এক পর্যায়ে রাসূল (সা) সকল সঙ্গীকে আগে চলার নির্দেশ দিলেন। তারপর 'আয়িশাকে বললেন ঃ এসো, আমরা দৌড়াই। দেখি কে আগে যেতে পারে। 'আয়িশা (রা) ছিলেন হালকা পাতলা। তাই তিনি আগে চলে যান। তার কিছুকাল পরে এমন দৌড় প্রতিযোগিতার সুযোগ আরেকবার আসে। 'আয়িশা (রা) বলেন, তখন আমি মোটা হয়ে গিয়েছিলাম। তাই রাসূল (সা) আমার আগে চলে যান। তখন তিনি বলেন ঃ এ হচ্ছে ঐ দিনের বদলা।[১২০]

রাসূলে কারীমের (সা) 'আয়িশার (রা) সাথে যখন পানাহারের সুযোগ হতো তখন একই দস্তরখানে এক থালায় আহার করতেন। একবার পর্দার হুকুমের আগে তাঁরা এক সাথে আহার করছেন, এমন সময় 'উমার (রা) এসে উপস্থিত হলেন। রাসূল (সা) তাঁকে খেতে ডাকলেন এবং তিনজন একসাথে খেলেন।[১২১] পানাহারের মধ্যে প্রেম-প্রীতির অবস্থা এমন ছিল যে, 'আয়িশার (রা) চোষা হাঁড় রাসূল (সা) চুষতেন, গ্লাসে 'আয়িশা (রা) যেখানে মুখ লাগাতেন, রাসূল (সা) ঠিক সেখানেই মুখ লাগিয়ে পান করতেন।[১২২] রাতে যেহেতু ঘরে বাতি জ্বলতো না, তাই অন্ধকারে খেতে বসে মাঝে মাঝে উভয়ের হাত একই টুকরোর উপর গিয়ে পড়তো।[১২৩]

সীরাত ও হাদীসের গ্রন্থসমূহে রাসূলুল্লাহ (সা) ও 'আয়িশার (রা) প্রেম-প্রীতি ও মান-অভিমানের এক চমৎকার দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ইসলাম যে মানুষের স্বভাবগত নির্মল আবেগ-অনুভূতিকে অস্বীকার করেনি তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁদের আচরণের মধ্যে। কখনো কখনো তাঁদেরকে দেখা যায় সাধারণ মানুষের মত আবেগপ্রবণ। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, 'আয়িশা (রা) যেমন একজন নবীর স্ত্রী, তেমনি একজন নারীও বটে। আবার রাসূলুল্লাহ (সা) যেমন একজন নবী ও রাসূল তেমনি একজন স্বামীও বটে। সুতরাং স্বামী-স্ত্রী হিসেবে তাঁদের এমন বহু আচরণ ও মান-অভিমানের কথা ও ঘটনা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যা অতি চমকপ্রদ ও শিক্ষণীয়।

রাসূলে কারীম (সা) তাঁর পরলোকগত প্রথমা স্ত্রী খাদীজাকে (রা) প্রায়ই স্মরণ করতেন। একবার তিনি খাদীজার কথা আলোচনা করছেন, 'আয়িশা (রা) বলে উঠলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এই বৃদ্ধার কথা এত স্মরণ করেন কেন। আল্লাহ তো আপনাকে তাঁর চেয়ে ভালো স্ত্রী দান করেছেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহ আমাকে তাঁর থেকে

---

১১৯. বুখারী ঃ কায়ফা ইয়াকূনুর রাজুলু ফী আহলিহি।

১২০. আবু দাউদ ঃ বাবুস সাবাক

১২১. বুখারী ঃ আদাবুল মুফরাদ ঃ আকলুর রাজুলি মা'য়া ইমরাতিহি;

১২২. আবু দাউদ ঃ মুওয়াকালাতুল হায়েজে; মুসনাদ-৬/৬৪

১২৩. মুসনাদ-৬/২১৭

সন্তান দান করেছেন।[১২৪]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সা) একদিন খাদীজার (রা) প্রশংসা শুরু করলেন এবং দীর্ঘক্ষণ প্রশংসা করতে থাকলেন। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ এতে আমার অন্তর্দাহ হলো। বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি একজন কুরাইশ বৃদ্ধা, যার ঠোঁট লাল এবং যার মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে, এত দীর্ঘ সময় তার প্রশংসা করছেন। আল্লাহ তো তাঁর চেয়ে ভালো স্ত্রী দান করেছেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারার রং পাল্টে গেল। তিনি বললেন ঃ খাদীজা আমার এমন স্ত্রী ছিল যে, মানুষ যখন আমাকে নবী বলে মানতে অস্বীকার করে তখন সে আমার প্রতি ঈমান আনে, মানুষ যখন আমাকে মিথ্যাবাদী বলতে চেয়েছে তখন সে সত্যবাদী বলেছে এবং মানুষ যখন আমাকে সাহায্য করতে চায়নি তখন সে তার অর্থ-বিত্ত সহকারে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহ তার মাধ্যমেই আমাকে সন্তান দিয়েছেন। যখন অন্য স্ত্রীরা আমাকে সন্তান থেকে বঞ্চিত করেছে।[১২৫]

একবার 'আয়িশার (রা) মাথায় ব্যথা হলো। রাসূলুল্লাহর (সা) তখন অন্তিম রোগ লক্ষণ শুরু হতে চলেছে। তিনি 'আয়িশাকে (রা) বললেন ঃ তুমি যদি আমার সামনে মারা যেতে, আমি নিজ হাতে তোমাকে গোসল দিয়ে কাফন পরাতাম এবং তোমার জন্য দু'আ করতাম। 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার মরণ কামনা করছেন। যদি এমন হয় তাহলে আপনি তো এই ঘরে নতুন একজন স্ত্রীকে এনে উঠাবেন। রাসূল (সা) এ কথা শুনে মৃদু হেসে দেন।[১২৬]

'ইফ্‌ক' বা-চরিত্রে কলঙ্ক আরোপের ঘটনার পর যখন ওহী দ্বারা 'আয়িশার (রা) পবিত্রতা ঘোষিত হয় তখন তাঁর মা বললেন ঃ যাও, স্বামীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। 'আয়িশা (রা) ত্বরিৎ অভিমানের সুরে জবাব দিলেন ঃ আমি এক আল্লাহ ছাড়া– যিনি আমার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন, আর কারো প্রতি কৃতজ্ঞ নই।

একবার রাসূল (সা) বললেন ঃ 'আয়িশা! তুমি আমার প্রতি কখন খুশী বা অখুশী থাক, আমি তা বুঝতে পারি। 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ কিভাবে? বললেন ঃ অখুশী থাকলে কসম খাও 'ইবরাহীমের আল্লাহর কসম' বলে, আর খুশী থাকলে বল ঃ 'মুহাম্মাদের আল্লাহর কসম।'[১২৭]

## স্বামীর সেবা

হাদীসের গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন স্থানে 'আয়িশার (রা) স্বামী–সেবার কথা ছড়িয়ে আছে। এখানে আমরা তার থেকে কিছু তুলে ধরছি।

---

১২৪. বুখারী ঃ ফাদলু খাদীজা
১২৫. মুসনাদ-৬/১১৮, ১৫০
১২৬. বুখারী ঃ বাবুল মারদ; মুসনাদ-৬/২২৮
১২৭. বুখারী ঃ বাবু মা ইয়াজুযু মিনাল হিজরান; জাহাবী ঃ আত-তারীখ-২/২৯৮

ঘরে খাদেম থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজ হাতে সব কাজ করতেন। নিজ হাতে আটা পিষতেন, খাবার তৈরী করতেন, বিছানা পাততেন, ওজুর পানি এনে রাখতেন, স্বামীর কুরবানীর পশুর গলার রশি পাকাতেন, স্বামীর মাথায় চিরুনী করে দিতেন, দেহে আতর লাগিয়ে দিতেন, কাপড় ধুতেন, রাতে শোয়ার সময় মিসওয়াক ও পানি মাথার কাছে এনে রাখতেন, মিসওয়াক ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন একটি কম্বল গায়ে জড়িয়ে মসজিদে যান। একজন সাহাবী বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কম্বলে তো কোন ময়লার দাগ দেখা যাচ্ছে। সাথে সাথে তিনি কম্বলটি খুলে একজন খাদেমের হাতে 'আয়িশার (রা) নিকট পাঠিয়ে দেন। 'আয়িশা (রা) পানি আনিয়ে নিজ হাতে কম্বলটি ধুয়ে, শুকিয়ে আবার রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠিয়ে দেন।[১২৮]

কায়স আল-গিফারী (রা) ছিলেন আসহাবে সুফ্ফার' অন্যতম সদস্য। তিনি বর্ণনা করেছেন। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমরা সবাই আজ 'আয়িশার ঘরে চলো। তিনি আমাদেরকে সংগে করে ঘরে গিয়ে বললেন ঃ 'আয়িশা! আমাদের সকলকে আহার করাও। 'আয়িশা (রা) আমাদের সকলকে পাকানো খাবার খাওয়ালেন এবং দুধ ও পানি পান করালেন।[১২৯] সম্ভবত এটা হিজাবের হুকুম নাযিলের আগের ঘটনা।

'আয়িশা (রা) স্বামীর প্রিয়তমা স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও অতি আগ্রহভরে অন্যদের চেয়ে বেশী মাত্রায় স্বামীর সেবা করতেন। স্বামীর আরাম-আয়েশ ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি সর্বদা সজাগ থাকতেন। বার বার স্বামীর মিসওয়াকটি ধোয়ার প্রয়োজন পড়তো। এই কাজটির সুযোগ এককভাবে 'আয়িশাই (রা) লাভ করতেন।[১৩০]

## স্বামীর আনুগত্য ও অনুসরণ

ইসলামে স্ত্রীর অন্যতম গুণ হলো স্বামীর আনুগত্য ও অনুসরণ করা। 'আয়িশা (রা) স্বামী সাহচর্যের দীর্ঘ নয় বছরে তাঁর কোন নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ বা অমান্য করা তো দূরের কথা, ইশারা-ইঙ্গিতেও যদি তিনি কোন অপছন্দের কথা বুঝিয়েছেন, তাও 'আয়িশা (রা) সাথে সাথে পরিহার করেছেন। একবার তিনি অতি যত্ন সহকারে দরজায় একটি ছবিওয়ালা পর্দা টানালেন। রাসূল (সা) ঘরে ঢুকতে যাবেন, এমন সময় পর্দার প্রতি দৃষ্টি পড়লো। সাথে সাথে তাঁর চেহারা মুবারক বিবর্ণ হয়ে গেল। এ দৃশ্য দেখে 'আয়িশা (রা) সব কিছু বুঝে ফেললেন। তিনি বললেন ঃ আমায় ক্ষমা করুন! আমার অপরাধ কোথায় বলবেন কি? রাসূল (সা) বললেন ঃ যে ঘরে ছবি থাকে সেখানে ফিরিশতা প্রবেশ করে না। একথা শোনার পর 'আয়িশা (রা) পর্দাটি ছিঁড়ে ফেললেন।[১৩১]

---

১২৮. আবু দাউদ ঃ কিতাবুল বাররা মিনান নাজাসাহ্

১২৯. প্রাগুক্ত ঃ কিতাবুল আদাব

১৩০. প্রাগুক্ত ঃ কিতাবুত তাহারাহ্

১৩১. বুখারী ঃ বাবুত তাসবীর

স্বামীর জীবদ্দশায় বহু স্ত্রীই স্বামীর পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ করে থাকে। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর আয়িশা (রা) যে পরিমাণ স্বামীর আনুগত্য এবং হুকুম তামীল করেছেন, তার কোন তুলনা খুঁজে পাওয়া কঠিন। রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর তিনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। এ দীর্ঘ সময়ে স্বামীর প্রতিটি আদেশ ও ইচ্ছা তেমনিভাবে পালন ও পূরণ করেছেন যেমন তাঁর জীবনকালে করতেন।

রাসূলে কারীম (সা) 'আয়িশাকে (রা) দানশীলতা শিক্ষা দিয়েছিলেন। আমরণ তিনি এ গুণটি অতি নিষ্ঠার সাথে ধারণ করে থাকেন। একবার তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট জিহাদের অনুমতি চাইলেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ নারীদের জিহাদ হলো হজ্জ। এই বাণী শোনার পর থেকে এমন কঠোরতার সাথে আমল করতে থাকেন যে, তাঁর জীবনের খুব কম বছরই হজ্জ ছাড়া অতিবাহিত হয়েছে।[১৩২]

একবার এক ব্যক্তি কিছু কাপড় ও কিছু নগদ অর্থ 'আয়িশার (রা) নিকট পাঠালো। তিনি প্রথমে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ফেরত পাঠালেন। তারপর আবার লোকটিকে ডেকে এনে তা গ্রহণ করেন এবং বলেন ঃ আমার একটি কথা মনে এসে গেল।[১৩৩]

একবার 'আরাফাতের দিন 'আয়িশা (রা) রোযা রাখলেন। প্রচণ্ড গরমের কারণে মাথায় পানির ছিটা দিচ্ছিলেন। একজন রোযা ভেঙ্গে ফেলার পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন ঃ আমি যখন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে শুনেছি যে, আরাফাতের দিন রোযা রাখলে সারা বছরের পাপ মোচন হয়ে যায়, তখন তা কিভাবে ভাংতে পারি?[১৩৪]

রাসূলুল্লাহকে (সা) চাশতের নামায পড়তে দেখে সারা জীবন তিনি এই নামায পড়েছেন। তিনি বলতেন ঃ আমার পিতাও যদি কবর থেকে উঠে এসে আমাকে এ নামায পড়তে নিষেধ করেন, আমি তাঁর কথা মানবো না।[১৩৫] একবার এক মহিলা 'আয়িশাকে (রা) জিজ্ঞেস করলো ঃ মেহেন্দী লাগানো কেমন? জবাব দিলেন ঃ আমার প্রিয়তমের মেহেন্দীর রং খুব পছন্দ ছিল, তবে গন্ধ পছন্দ ছিল না। হারাম নয়। ইচ্ছা হলে তুমি লাগাতে পার।

## গৃহ অভ্যন্তরে স্বামী-স্ত্রীর দ্বীনি জীবন

'আয়িশার (রা) ঘরটি ছিল একজন নবীর আবাসস্থল। সেখানে বিত্ত-বৈভবের কোন ছোঁয়া ছিল না। পার্থিব ঐশ্বর্যের প্রতি তাঁদের কোন পরোয়াও ছিল না। 'আয়িশা (রা) বলেন রাসূলুল্লাহর (সা) অভ্যাস ছিল, যখন ঘরে আসতেন, একটু উঁচু গলায় নিম্নের কথাগুলি বার বার উচ্চারণ করতেন।[১৩৬]

لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا

---

১৩২. প্রাগুক্ত ঃ বাবু হজ্জিন নিসা

১৩৩. মুসনাদ-৬/২৫৭

১৩৪. প্রাগুক্ত-৬/১২৮

১৩৫. প্রাগুক্ত-৬/১৩৮

১৩৬. প্রাগুক্ত-৬/৫৫

وَلَا يَمْلَأُ فَمَهُ اِلَّا التُّرَابُ جَعَلْنَا الْمَالَ اِلَّا لِاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ .

'আদম সন্তানদের মালিকানায় যদি ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ দুইটি উপত্যকা হয়, তাহলে সে তৃতীয়টির লোভ করবে। তার লোভের মুখ শুধুমাত্র মাটিই ভরতে পারে। আল্লাহ বলেন, ধন-সম্পদ তো আমি নামায কায়েম এবং যাকাত দানের জন্য সৃষ্টি করেছি। যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, আল্লাহও তার দিকে ফিরে আসেন।'

মানুষের লোভের যে কোন শেষ নেই, এবং ধন-সম্পদ দানের মূল উদ্দেশ্য কি, তা স্মরণ করিয়ে দেওয়াই ছিল এর আসল লক্ষ্য।

রাসূলে কারীম (সা) 'ঈশার নামায আদায়ের পর ঘরে আসতেন। মিসওয়াক করে সাথে সাথে শয্যা নিতেন। মাঝ রাতে জেগে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন। রাতের শেষভাগে 'আয়িশাকে (রা) জাগিয়ে দিতেন। তিনি উঠে স্বামীর সাথে নামাযে অংশগ্রহণ করতেন। সবশেষে বিতর নামায আদায় করতেন। সুবহে সাদিক হওয়ার পর রাসূলে পাক (সা) ফজরের সুন্নাত আদায় করে কাত হয়ে একটু শুয়ে যেতেন এবং 'আয়িশার (রা) সাথে কিছু কথা-বার্তা বলতেন।[১৩৭] তারপর ফজরের ফরজ আদায়ের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হতেন। কখনো কখনো সারা রাত রাসূলুল্লাহ (সা) ও 'আয়িশা (রা) আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগীতে কাটিয়ে দিতেন। রাসূল (সা) ইমাম হতেন, 'আয়িশা (রা) হতেন মুক্তাদী। কুসূফ ও খুসূফ (সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ)-এর অবস্থায় রাসূল (সা) নামাযে দাঁড়ালে তিনিও দাঁড়িয়ে যেতেন। রাসূল (সা) মসজিদে জামা'য়াতের ইমামতি করতেন, আর তিনি ঘরে ইকতিদা করতেন।[১৩৮]

পাঞ্জেগানা নামায ও তাহাজ্জুদ ছাড়াও রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখে তিনি চাশতের নামাযও নিয়মিত পড়তেন। প্রায়ই রোযা রাখতেন। মাঝে মাঝে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এক সাথে রোযা পালন করতেন। রমজানের শেষ দশদিন রাসূল (সা) মসজিদে ই'তিকাফ করতেন। 'আয়িশাও (রা) এতে শরিক হতেন। মসজিদের আঙ্গিনায় তাঁবু টানিয়ে ঘিরে নিতেন। ফজর নামাযের পর রাসূল (সা) কিছু সময়ের জন্য সেখানে আসতেন।[১৩৯]

হিজরী ১১ সনে রাসূলুল্লাহর (সা) বিদায় হজ্জের সফরসঙ্গী হন। হজ্জ ও 'উমরার নিয়েত করেন। কিন্তু স্বাভাবিক নারী প্রকৃতির কারণে যথাসময়ে তাওয়াফ করতে পারলেন না। দারুণ কষ্ট পেলেন। কাঁদতে শুরু করলেন। রাসূল (সা) বাহির থেকে এসে কাঁদতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলেন এবং তাঁকে করণীয় মাসয়ালা বাতলে দিলেন। তিনি ভাই

---

১৩৭. বুখারী ঃ মান তাহাদ্দাসা বা'য়াদার রাক'য়াতাইনে; মুসলিম ঃ সালাতুল লাইলে।

১৩৮. বুখারী ঃ সালাতুল কুসূফ

১৩৯. প্রাগুক্ত ঃ বাবু ই'তিকাফ আন-নিসা

আবদুর রহমান ইবন আবী বকরকে (রা) সাথে নিয়ে অসমাপ্ত আবশ্যকীয় কাজ সমাপন করলেন।১৪০

আমাদের মত সাধারণ মানুষের মনে এমন প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, রাসূলে কারীম (সা) কি গৃহ অভ্যন্তরে আরাম ও বিশ্রামের সময় রিসালাতের দায়িত্ব পালনে একটু শিথিলতা (নাউজুবিল্লাহ) দেখাতেন? এমন ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। পূর্বেই আমরা 'আয়িশার (রা) মন্তব্য উল্লেখ করেছি– 'রাসূল (সা) আমাদের সাথে কথা বলতেন। আজানের ধ্বনি কানে যেতেই উঠে দাঁড়াতেন। তখন মনে হতো তিনি যেন আমাদের চেনেনই না।' 'আয়িশা (রা) খুব সাধ করে রাসূলুল্লাহকে (সা) খুশী করার জন্য ছবিওয়ালা পর্দা টানালেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সন্তুষ্টির পরিবর্তে বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

একবার 'আয়িশা (রা) এক ইহুদীকে– যে তাঁকে মৃত্যুর অভিশাপ দিয়েছিল, কঠোর ভাষায় প্রত্যুত্তর করেন। রাসূল (সা) সাথে সাথে বলেন ঃ 'আয়িশা! আল্লাহ অতি দয়াবান। তিনি দয়া ও কোমলতা পছন্দ করেন। আর একবার 'আয়িশা (রা) নিজ হাতে আটা পিষে রুটি বানিয়ে ঘুমিয়ে গেলেন। এই সুযোগে প্রতিবেশীর একটি ছাগল ঘরে ঢুকে সব খেয়ে ফেলে। 'আয়িশা (রা) দৌড়ে ছাগলটি ধরে কয়েক ঘা বসিয়ে দিতে গেলেন। রাসূল (সা) বাধা দিয়ে বললেন ঃ 'আয়িশা! প্রতিবেশীকে কষ্ট দিও না।

## সতীন ও তাদের সন্তানদের সাথে সম্পর্ক

আমাদের জানা মতে এ পৃথিবীতে একজন নারীর সবচেয়ে অসহনীয় বিষয় হলো সতীনের অস্তিত্ব। 'আয়িশার (রা) এক সাথে সতীন ছিল একজন থেকে নিয়ে আটজন পর্যন্ত। রাসূলুল্লাহর (সা) মহান সাহচর্যের দৌলতে তাঁদের সকলের হৃদয়ের যাবতীয় আবিলতা দূর হয়ে তা স্বচ্ছ আয়নায় পরিণত হয়। সতীন ও তাঁদের সন্তান-সন্তুতিদের সাথে 'আয়িশার (রা) জীবন যাপনের যে চিত্র আমরা পাই তা বিশ্বের নারী জাতির জন্য এক অতুলনীয় আদর্শ হয়ে আছে।

খাদীজা (রা) যদিও 'আয়িশার (রা) সময়ে বেঁচে ছিলেন না, তবে রাসূলে পাকের হৃদয় মাঝে তিনি সর্বদা জীবিত ছিলেন। তিনি 'আয়িশার (রা) কাছে সবসময় খাদীজার (রা) স্মৃতিচারণ করতেন। এ কারণে 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ 'আমি যে পরিমাণ খাদীজাকে ঈর্ষা করতাম, রাসূলুল্লাহর (সা) আর কোন স্ত্রীকে তেমন করতাম না। আর তা এই জন্য যে, রাসূল (সা) তাঁকে খুব বেশী স্মরণ করতেন।' অথচ খাদীজার (রা) ফজীলাত ও মর্যাদার কথা তিনি যত বেশী বর্ণনা করেছেন, অন্য কেউ তা করতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক খাদীজার (রা) নামে কুরবানী করা, খাদীজার বান্ধবীদের নিকট হাদীয়া-তোহফা পাঠানো, ইসলামের প্রথম পর্বে তাঁর যাবতীয় অবদান, যথা ঃ স্বামীকে সান্ত্বনা ও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দান, যাবতীয় উপায়-উপকরণ নিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ানো ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের কথা কিন্তু 'আয়িশাই (রা) এই উম্মাতকে জানিয়েছেন। আল্লাহ পাক

---

১৪০. প্রাগুক্ত ঃ কিতাবুল হজ্জ

যে, খাদীজাকে (রা) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, সে কথাটিও তিনি জানিয়েছেন।[১৪১] এতেই তাঁর হৃদয়ের স্বচ্ছতা ও প্রশস্ততার কথা অনুমান করা যায়।

সাওদার (রা) প্রশংসায় 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ 'একমাত্র সাওদা ছাড়া অন্য কোন নারীকে দেখে আমার মধ্যে এমন আগ্রহ সৃষ্টি হয়নি যে, তাঁর দেহে যদি আমার প্রাণটি হতো।' মায়মূনার (রা) মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ 'তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরহেযগার ছিলেন।'[১৪২] সাফিয়্যা (রা) চমৎকার খাবার তৈরী করতে পারতেন। তাঁর এই পারদর্শিতা তিনি স্বীকার করেন এইভাবে 'আমি তাঁর চেয়ে ভালো খাবার তৈরী করতে পারে এমন কাউকে দেখিনি।' সতীনদের সাথে তাঁর উঠা-বসা ও আচার-আচরণের অনেক কথা হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান আছে– যাতে তাঁর উদারতা, মহানুভবতা ও উন্নত নৈতিকতার চিত্র ফুটে উঠেছে।

'আয়িশার (রা) মধুর ব্যবহার ও আচরণ সকলকে খুশী করেছিল। আর তাই 'ইফ্‌ক (কলঙ্ক আরোপ)-এর ঘটনার সময়—যখন তাঁর দিশেহারা অবস্থা, তখন তাঁর অন্যতম সতীন যয়নাবকে (রা) রাসূল (সা) তাঁর চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জবাব দিয়েছিলেন ঃ 'আমি তো তাঁর মধ্যে শুধু ভালো ছাড়া কিছু জানিনে।'[১৪৩]

'আয়িশা (রা) নিঃসন্তান ছিলেন। তবে রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য স্ত্রীদের বেশ কয়েকজন সন্তান ছিলেন। তাঁদের সাথে 'আয়িশার (রা) সম্পর্ক ছিল আদর্শ মানের। যয়নাব, রুকাইয়্যা, উম্মু কুলসুম ও ফাতিমা— এই চার কন্যা ছিলেন খাদীজার (রা) সন্তান। আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) ঘরে আসার পূর্বে একমাত্র ফাতিমা (রা) ছাড়া অন্যদের বিয়ে হয়ে যায় এবং সবাই নিজ নিজ স্বামীর ঘরে চলে যান। হিজরী ৬ষ্ঠ সনে রুকাইয়্যা এবং হিঃ ৮ম ও ৯ম সনে যথাক্রমে যয়নাব ও উম্মু কুলসুম ইনতিকাল করেন। হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে তাঁদের সাথে 'আয়িশার (রা) তিক্ত সম্পর্কের একটি ঘটনাও পাওয়া যায় না। বরং এ সকল কন্যা সম্পর্কে 'আয়িশার (রা) যেসব মন্তব্য ও আচরণের কথা পাওয়া যায় তাতে তাঁদের সাথে তাঁর গভীর হৃদ্যতার কথা জানা যায়। যয়নাব, যিনি আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করেন, তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) এই বাণীটি 'আয়িশা বর্ণনা করেছেন ঃ 'সে আমার অতি ভালো মেয়ে ছিল, আমাকে ভালোবাসার কারণে যাকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে।' এই যয়নাবের মেয়ে উমামাকে রাসূল (সা) কী পরিমাণ স্নেহ ও আদর করতেন তা 'আয়িশাই (রা) বর্ণনা করেছেন।

'আয়িশা (রা) যখন স্বামীগৃহে আসেন তখন কুমারী মেয়ে ফাতিমা (রা) পিতার ঘরে। কিন্তু তিনি বয়সে 'আয়িশার চেয়ে পাঁচ অথবা ছয় বছরের বড়। এক বছর বা তার চেয়ে কিছু কম সময়ের জন্য এই মা-মেয়ে এক সাথে কাটান। হিজরী ২য় সনের মধ্যে আলীর (রা) সাথে এই মেয়ের বিয়ে হয়। এই বিয়ের উদ্যোগ আয়োজনে অন্য মা-দের

---

১৪১. প্রাগুক্ত ঃ ফাদায়িলু খাদীজা

১৪২. তাহজীবুত তাহজীব-১২/৪৫৩

১৪৩. বুখারী ঃ আল-ইফ্‌ক

সাথে 'আয়িশাও শরিক ছিলেন। শুধু তাই নয়, রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে তিনি বিশেষ গুরুত্বও প্রদান করেন। ঘর লেপেন, বিছানা তৈরী করেন, নিজের হাতে খেজুরের ছাল ধুনে বালিশ বানান, খেজুর ও মানাক্কা অতিথিদের সামনে পেশ করেন এবং কাঠের একটি আলনার মত তৈরী করেন পানির মশক ও কাপড় চোপড় টানানোর জন্য। 'আয়িশা (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ 'ফাতিমার বিয়ের মত এত চমৎকার বিয়ে আর দেখিনি।'[১৪৪]

ফাতিমার (রা) প্রশংসায় 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ আমি ফাতিমার চেয়ে একমাত্র তার পিতা ছাড়া আর কোন ভালো মানুষ কক্ষণো দেখিনি। একবার এক তাবে'ঈ 'আয়িশাকে (রা) প্রশ্ন করলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) সবচেয়ে প্রিয় কে ছিলেন? উত্তর দিলেন ঃ ফাতিমা। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) মত চাল-চলন, উঠা-বসায় মিলে যায় একমাত্র ফাতিমা ছাড়া আর কাউকে দেখিনি। ফাতিমা যখন তাঁর পিতার সাথে দেখা করতে আসতেন পিতা সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন। মেয়ের কপালে চুমু খেতেন এবং নিজের স্থানে বসাতেন। আবার পিতা তার ঘরে গেলে মেয়ে উঠে দাঁড়াতেন, পিতাকে চুমু দিতেন এবং নিজের স্থানে নিয়ে বসাতেন।[১৪৫]

স্বামীগৃহে ফাতিমা (রা) নিজ হাতে যাবতীয় কাজ করতে করতে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। একদিন পিতার কাছে এসেছিলেন একটি দাসী প্রাপ্তির আবেদন নিয়ে। ঘটনাক্রমে পিতার দেখা পেলেন না। মা 'আয়িশাকে এ ব্যাপারে কথা বলার দায়িত্ব দিয়ে তিনি ফিরে গেলেন।[১৪৬]

'আয়িশা বর্ণনা করেন। "একদিন আমরা সকল স্ত্রী রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে বসে আছি। এমন সময় ফাতিমা সামনের দিক থেকে আসলো। তার চলন ছিল অবিকল রাসূলুল্লাহর (সা) মত, একটুও পার্থক্য ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত আবেগের সাথে তাকে ডেকে পাশে বসালেন। তারপর চুপে চুপে তার কানে কিছু কথা বললেন। ফাতিমা কাঁদতে লাগলো। তার অস্থিরতা দেখে রাসূল (সা) কানে কানে আবার কিছু বললেন। এবার ফাতিমা হাসতে লাগলো। 'আয়িশা বলেন ঃ আমি বললাম ঃ ফাতিমা! রাসূল (সা) তাঁর স্ত্রীদের বাদ দিয়ে তোমার কাছে গোপন কথা বলেন, আর তুমি কাঁদছো? রাসূল (সা) উঠে গেলে আমি ফাতিমার নিকট বিষয়টি জানতে চাইলাম। সে বললো ঃ আমি আমার আব্বার গোপন কথা ফাঁস করবো না।

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর 'আয়িশা আবার একদিন বিষয়টি জানতে চান। ফাতিমা বলেন, আমার কান্নার কারণ হলো, তিনি আমাকে তাঁর মৃত্যুর কথা বলেছিলেন। হাসির কারণ হলো, তিনি আমাকে বলেন ঃ ফাতিমা! এ কি তোমার পছন্দ

---

১৪৪. ইবন মাজা-বাবুল ওলীমা

১৪৫. তিরমিজী-বাবুল মানাকিব

১৪৬. বুখারী ঃ কিতাবুল জিহাদ; বাবু 'আমলিল মারয়াতি ফী বায়তি যাওজিহা

নয় যে, তুমি সারা পৃথিবীর নারীদের নেত্রী হও?"[১৪৭]

উপরে উল্লেখিত এ সকল ঘটনা দ্বারা 'আয়িশার (রা) সাথে তাঁর সতীন-কন্যাদের কেমন মধুর সম্পর্ক ছিল তা বুঝা যায়। এ ধরনের আরো বহু ঘটনা হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান।

## যুদ্ধ-বিগ্রহ

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন। আনাস (রা) উহুদ যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ আমি 'আয়িশা ও উম্মু সুলাইমকে (রা) দেখলাম, তাঁরা কাঁধে করে মশক ভরে পানি এনে আহতদের মুখে ঢালছেন। পানি শেষ হয়ে গেলে আবার ভরে এনে ঢালছেন।[১৪৮] উহুদ যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স দশ এগারো বছরের বেশী হবে না। এই যুদ্ধে তিনি যোগদান করে আহতদের সেবা করেছেন।

ইমাম বুখারী বলেন, বনু মুসতালিক যুদ্ধই হলো আল-মুরাইসী' যুদ্ধ। এই যুদ্ধটি কোন সনে হয় সে সম্পর্কে অবশ্য সীরাত বিশেষজ্ঞদের একটু মতভেদ আছে। মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক বলেন, এটি হয় ষষ্ঠ হিজরীতে। মূসা ইবন 'উকবা বলেন, চতুর্থ হিজরীতে। আর 'উরওয়া বলেন, এটা পঞ্চম হিজরীর শা'বান মাসের ঘটনা।[১৪৯] আল-মুরাইসী হলো বনু মুসতালিক গোত্রের একটি ঝর্ণা। তাদের নেতা ছিল আল-হারেস ইবন আবী দাররার। সে তার নিজ গোত্র ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গোত্রের লোকদের রাসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সংগঠিত করে। রাসূলুল্লাহ (সা) এ খবর অবগত হয়ে তাদেরকে দমন করার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে একটি বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন। এই বাহিনীতে বিপুল সংখ্যক মুনাফিক (কপট মুসলমান) অংশগ্রহণ করে– যা অন্য কোন যুদ্ধে কখনো করেনি।[১৫০] অবশেষে আল-মুরাইসী-এর পাশে দুই বাহিনী মুখোমুখি হয়। এই অভিযানে মুনাফিকরা হযরত 'আয়িশাকে (রা) নিয়ে একটি কুৎসিত ষড়যন্ত্র পাকায়। ঘটনাটি আরো একটু বিস্তারিতভাবে তুলে ধরছি।

হিজরী ৫ম অথবা ৬ষ্ঠ সনের শা'বান মাসে নবী কারীম (সা) জানতে পারলেন যে, 'মুরাইসী'-এর পাশে বসবাসকারী লোকেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। এ কথা জানার পরপরই রাসূল (সা) এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে এই লোকদের দিকে যাত্রা করলেন। মুনাফিক-শ্রেষ্ঠ আবদুল্লাহ ইবন উবাই বিপুল সংখ্যক মুনাফিক সংগে নিয়ে এই যাত্রায় নবী কারীমের (সা) সংগে শরিক হলো। ইবন সা'দ বলেন, ইতিপূর্বে কোন যুদ্ধেই এত সংখ্যক মুনাফিক যোগদান করেনি। অভিযান শেষে এই মুনাফিকরা নানাভাবে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে। আল্লাহ পাকের রহমত ও রাসূলুল্লাহর (সা) দূরদৃষ্টি ও সুযোগ্য নেতৃত্বে আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের সকল

---

১৪৭. মুসলিম ঃ বাবুল ফাদায়িল; বুখারী ঃ মান না-জা বায়না ইয়াদাই আন-নাস।

১৪৮. সহীহ বুখারী ঃ গাযওয়াতু উহুদ, ইবন কাসীর ঃ আস-সীরাতু আন-নাবাবিয়্যাহ্-১/৫৬২

১৪৯. ইবন কাসীর-২/৪৭

১৫০. ইবন সা'দ তাবাকাত-২/৬৩; ইবন কাসীর-২/৪৭

চক্রান্ত ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হয়।

এই সফরেই তারা উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশাকে (রা) কেন্দ্র করে এক ষড়যন্ত্র পাকায়। তারা হযরত 'আয়িশার (রা) পবিত্র চরিত্রের উপর এক চরম অপমানকর মিথ্যা দোষারোপ করে বসে। মূল কাহিনীটি হযরত আয়িশার (রা) ভাষায় সহীহ বুখারীসহ বিভিন্ন হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ

'রাসূলে কারীমের (সা) নিয়ম ছিল যখন দূরে কোথাও বের হতেন, 'কুর'আ'র মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতেন, তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে কে তাঁর সঙ্গী হবেন। বনী আল-মুসতালিক যুদ্ধের সময় কুর'আ'য় আমার নামটি আসে। ফলে আমি তাঁর সফরসঙ্গী হই। ফিরে আসার সময় যখন আমরা মদীনার কাছাকাছি পৌঁছি, রাতের বেলা রাসূল (সা) এক মানযিলে তাঁবু গেড়ে অবস্থান করেন। রাতের শেষভাগে সেখান থেকে যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করা হয়। আমি ঘুম থেকে জেগে স্বাভাবিক প্রয়োজন সারার জন্য বাইরে গেলাম। ফিরে আসার সময় অবস্থানের কাছাকাছি স্থানে আসতেই মনে হলো যে, আমার গলার হারটি কোথাও পড়ে গেছে। আমি তা খুঁজতে লেগে গেলাম। ইতিমধ্যে কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেছে। নিয়ম ছিল যে, রওয়ানা হওয়ার সময় আমি আমার 'হাওদাজে' (উটের পিঠের পালকি) বসে যেতাম, তারপর চারজন লোক তা তুলে উটের পিঠের উপর বেঁধে দিত। এই সময় অভাব অনটনের কারণে আমরা মেয়েরা ছিলাম বড়ই হাল্কা-পাতলা। আমার 'হাওদাজ' উঠানোর সময় লোকেরা টেরই পেলনা যে, আমি ওর মধ্যে নেই। অজ্ঞাতসারে তারা 'হাওদাজ' উটের পিঠে বসিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল।

এদিকে আমি হার খুঁজে পেলাম এবং ফিরে এসে সেখানে কাউকে দেখতে পেলাম না। ফলে আমি আমার গায়ের চাদর দিয়ে সারা শরীর ঢেকে সেখানেই পড়ে থাকলাম। চিন্তা করলাম, সামনে গিয়ে যখন আমাকে দেখতে পাবে না, তখন তারা আমার তালাশে ফিরে আসবে। এই অবস্থায় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সকাল বেলা সাফওয়ান ইবন মু'য়াত্তাল আস-সুলামী যেখানে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, সেখানে উপস্থিত হলেন। আমাকে দেখেই তিনি চিনতে পারলেন। কারণ, পর্দার নির্দেশ নাযিল হওয়ার আগে তিনি আমাকে কয়েকবার দেখেছিলেন। আমাকে দেখে তিনি উট থামালেন এবং বিস্ময়ের সাথে তাঁর মুখে উচ্চারিত হলো– ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন! রাসূলুল্লাহর (সা) বেগম সাহেবা এখানে রয়ে গেছেন!

তাঁর কণ্ঠস্বর কানে যেতেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম এবং চাদর দ্বারা মুখ ঢেকে ফেললাম। তিনি আমার সংগে কোন কথাই বললেন না। নিজের উটটি এনে আমার সামনে বসিয়ে দিয়ে দূরে সরে দাঁড়ালেন। আমি উটের পিঠে উঠে বসলাম, আর তিনি লাগাম ধরে হেঁটে চললেন। প্রায় দুপুরের সময় আমরা কাফেলাকে ধরলাম– যখন তারা এক স্থানে সবেমাত্র থেমেছে। আর আমি যে পিছনে রয়ে গেছি, সে কথা তাদের কেউ জানতেও পারেনি। এই ঘটনার উপর মিথ্যা দোষারোপের এক পাহাড় রচনা করা হলো। যারা এই ব্যাপারে অগ্রণী ছিল, তাদের মধ্যে

আবদুল্লাহ ইবন উবাই ছিল সবার চেয়ে অগ্রসর। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে কি কি কথা বলা হচ্ছে, আমি তার কিছুই জানতে পারিনি।'

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, সাফওয়ানের উটের পিঠে সওয়ার হয়ে হযরত 'আয়িশা (রা) যে সময় সৈনিকদের তাঁবুতে উপস্থিত হলেন এবং তিনি পিছনে পড়ে ছিলেন বলে জানা গেল, তখন আবদুল্লাহ ইবন উবাই চিৎকার করে বলে উঠলো ঃ 'খোদার কসম! এই মহিলাটি নিজেকে বাঁচিয়ে আসতে পারেনি। দেখ, দেখ, তোমাদের নবীর স্ত্রী অপরের সংগে রাত কাটিয়েছে, আর এখন সে প্রকাশ্যভাবে তাকে সংগে নিয়ে চলে এসেছে।'

'আয়িশা (রা) বলেন ঃ "মদীনায় ফিরে আসার পর আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। প্রায় এক মাসকাল আমি শয্যাশায়ী হয়ে থাকলাম। শহরের সর্বত্র এই মিথ্যা দোষারোপের খবর উড়ে বেড়াতে লাগলো। নবী কারীমের (সা) কান পর্যন্ত পৌছাতে দেরী হলো না। কিন্তু আমি কিছুই জানতে পারলাম না। একটি খট্‌কা অবশ্য আমার মনে লাগছিলো। তা হলো, অসুস্থ অবস্থায় রাসূলে কারীম (সা) যে রকম লক্ষ্য দিতেন, এবার তিনি তেমন দিচ্ছেন না। তিনি ঘরে এসে ঘরের লোকদেরকে শুধু জিজ্ঞেস করতেন ঃ 'ও কেমন আছে'? আমার সংগে কোন কথা বলতেন না। এতে আমার মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল, কোন কিছু ঘটেছে হয়তো। শেষ পর্যন্ত তাঁর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে আমি আমার মায়ের নিকট চলে গেলাম। যাতে মা আমার সেবা-শুশ্রুষা ভালোভাবে করতে পারেন।

একদিন রাতের বেলা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ঘরের বাইরে গেলাম। তখনও পর্যন্ত আমাদের সব বাড়ীতে পায়খানা নির্মিত হয়নি। আমরা প্রাকৃতিক প্রয়োজনের জন্য বনে-জঙ্গলেই যেতাম। আমার সংগে মিসতাহ ইবন উসাসা'র মাও ছিলেন। তিনি ছিলেন আমার পিতার খালাতো বোন। তিনি পথ চলতে গিয়ে হোঁচট খান। তখন অকস্মাৎ তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়! 'ধ্বংস হোক মিসতাহ'। আমি বললাম ঃ আপনি কেমন মা? নিজের ছেলের ধ্বংস কামনা করেন! আর ছেলেও এমন, যে বদর যুদ্ধে যোগদান করেছিল। তিনি বললেন ঃ মেয়ে! তুমি কি কোন খবরই রাখো না? তারপর তিনি আমাকে সকল কাহিনী বললেন। মিথ্যাবাদীরা আমার সম্পর্কে কি কি বলে বেড়াচ্ছিল, তা সবই শোনালেন।"

উল্লেখ্য যে, মুনাফিকীন ছাড়াও মুষ্টিমেয় কিছু মুসলমান এই মিথ্যার অভিযানে শরিক হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে মিস্‌তাহ্ ইবন উসাসা, ইসলামের প্রখ্যাত কবি হাস্‌সান বিন সাবিত ও হযরত যয়নাব (রা) এর বোন হামনা বিন্‌ত জাহাশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আয়িশা (রা) বলেন ঃ এই কাহিনী শুনে আমার রক্ত যেন পানি হয়ে গেল। যে জন্য এসেছিলাম, সেই প্রয়োজনের কথাও ভুলে গেলাম। সোজা ঘরে ফিরে গেলাম এবং সারা রাত কেঁদে কাটালাম।

এদিকে আমার অনুপস্থিতিকালে রাসূলে কারীম (সা) আলী ও উসামা ইবন যায়িদকে

(রা) ডাকলেন এবং তাদের নিকট এই বিষয়ে পরামর্শ চাইলেন। উসামা (রা) আমার পক্ষে ভালো কথাই বললেন। বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার স্ত্রীর মধ্যে ভালো ছাড়া মন্দ কিছু কখনো দেখতে পাইনি। যা কিছু বলে বেড়ানো হচ্ছে, তা সবই মিথ্যা কথা, রচিত অভিযোগ মাত্র। আর আলী বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের সমাজে মেয়ে লোকের কোন অভাব নেই। আপনি এর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন। আর আসল ব্যাপার যদি জানতে চান, তাহলে দাসীকে ডেকে অবস্থা জেনে নিতে পারেন।

দাসীকে ডাকা হলো এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। সে বললো : 'আল্লাহর কসম যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, আমি তাঁর মধ্যে খারাপ কিছুই দেখিনি– যে সম্পর্কে আপত্তি করা যেতে পারে। দোষ শুধু এতটুকুই দেখেছি যে, আমি আটা মেখে রেখে যেতাম, আর বলতাম, একটু দেখবেন। কিন্তু তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন, আর তৈরী আটা ছাগল এসে খেয়ে যেত।'

সেইদিন নবী কারীম (সা) তাঁর এক ভাষণে বললেন ঃ 'হে মুসলমানরা, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে– আমার স্ত্রীর উপর মিথ্যা অভিযোগ তুলে আমাকে যে কষ্ট দিয়েছে– তার আক্রমণ হতে আমাকে বাঁচাতে পারে? আল্লাহর শপথ, আমি আমার স্ত্রীদের মধ্যে কোন দোষ দেখতে পাইনি, না সেই লোকটির মধ্যে যার সম্পর্কে এই অভিযোগ তোলা হয়েছে। আমার অনুপস্থিতির সময় সে তো কখনই আমার ঘরে আসেনি।' এই কথা শুনে হযরত উসাইদ ইবন হুদাইর, কোন কোন বর্ণনা মতে হযরত সা'দ ইবন মু'য়াজ (রা) দাঁড়িয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ। অভিযোগকারী যদি আমাদের বংশের লোক হয়ে থাকে, তাহলে আমরা তাকে হত্যা করবো। আর আমাদের ভাই খাযরাজ গোত্রের লোক হলে আপনি যা বলবেন, তাই করবো।' এই কথা শুনেই খাযরাজ গোত্র-প্রধান সা'দ ইবন 'উবাদা দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ 'তুমি মিথ্যা বলছো, তুমি কিছুতেই তাকে মারতে পারবে না। তুমি তাকে হত্যা করার কথা শুধু এইজন্য বলছো যে, সে খাযরাজ গোত্রের লোক। সে তোমাদের লোক হলে তুমি কখনই তাকে হত্যা করার কথা বলতে পারতে না।' জবাবে তাকে বলা হয়েছিল ঃ তুমি তো মুনাফিক, এই জন্য মুনাফিকদের সমর্থন দিচ্ছো।'

এই বাকবিতণ্ডায় মসজিদে নববীতে একটা হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের লোকেরা মসজিদেই লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু নবী কারীম (সা) তাদেরকে ঠাণ্ডা করেন এবং পরে মিম্বরের উপর হতে নেমে আসেন।

অন্তত একমাস কাল এই মিথ্যা দোষারোপের বানোয়াট কথা সমাজে উড়ে বেড়াতে লাগলো। নবী কারীম (সা) কঠিন মানসিক কষ্ট আবুব করতে থাকলেন। আমি কান্নাকাটি করতে লাগলাম। আমার পিতা-মাতা সীমাহীন দুশ্চিন্তায় ও উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত নবী কারীম (সা) একদিন আসলেন এবং আমার পাশে বসলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি একবারও আমার কাছে বসেননি। আবু বকর ও

উম্মু রূমান ('আয়িশার পিতা-মাতা) মনে করলেন, আজ হয়তো কোন সিদ্ধান্তমূলক কথা হয়ে যাবে। এই কারণে তাঁরাও নিকটে এসে বসলেন। নবী কারীম (সা) বললেন ঃ 'আয়িশা, তোমার সম্পর্কে এইসব কথা আমার কানে পৌঁছেছে। তুমি যদি নিষ্পাপ হয়ে থাক, তাহলে আশা করি আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা প্রকাশ ও প্রমাণ করে দেবেন। আর তুমি যদি বাস্তবিকই কোন প্রকার গুনাহে লিপ্ত হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহর নিকট তাওবা কর, ক্ষমা চাও। বান্দাহ যখন গুনাহ স্বীকার করে, তাওবা করে, তখন আল্লাহ মা'ফ করে দেন।

এই কথা শুনে আমার চোখের পানি শুকিয়ে গেল। আমি পিতাকে বললাম, 'আপনি রাসূলে কারীমের (সা) কথার জবাব দিন। তিনি বললেন ঃ 'মেয়ে! আমি কি বলবো তা বুঝতে পারছিনে।' আমি আমার মাকে বললাম, 'আপনিই কিছু বলুন।' তিনি বললেন ঃ 'আমি কি বলবো তা আমার বুঝে আসে না।' তখন আমি বললাম ঃ 'আপনাদের কানে একটা কথা এসেছে, অমনি তা মনের মধ্যে বসে গেছে। এখন আমি যদি বলি, আমি নির্দোষ– আল্লাহ সাক্ষী, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ– তবে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। আর যদি শুধু শুধুই এমন একটা কথা স্বীকার করে নিই যা আমি আদৌ করিনি– আল্লাহ জানেন যে, আমি কোন দোষের কাজ করিনি– তবে আপনারাও তা সত্য বলে মেনে নিবেন। আমি তখন হযরত ইয়াকুব (আ)-এর নামটি স্মরণ করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তা স্মরণে এলো না। শেষ পর্যন্ত আমি বললাম, এমন অবস্থায় আমি সেই কথা বলা ছাড়া আর কোন উপায় দেখি না, যা হযরত ইউসুফ (আ)-এর পিতা বলেছেন ঃ

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ -

(يوسف ١٨)

এই কথা বলে আমি অপরদিকে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম। আমি মনে মনে বললাম ঃ আল্লাহ আমার নির্দোষিতা সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত। তিনি নিশ্চয়ই প্রকৃত ব্যাপার লোকদের সামনে উন্মোচিত করে দিবেন। তবে আমার সপক্ষে 'ওহী' নাযিল হবে, আর তা কিয়ামত পর্যন্ত পড়া হবে, এমন ধারণা আমার মনে কখনো আসেনি। আমি মনে করেছিলাম, রাসূল (সা) কোন স্বপ্ন দেখবেন, আর তাতে আল্লাহ আমার নির্দোষিতা প্রকাশ করে দিবেন। এরই মধ্যে নবী কারীমের (সা) উপর 'ওহী' নাযিল হওয়াকালীন অবস্থা সৃষ্টি হলো। এমনকি তীব্র শীতের মধ্যে তাঁর চেহারা মুবারক হতে ঘামের ফোটা টপ টপ করে পড়তে লাগলো। এমন অবস্থা দেখে আমরা সবাই চুপ হয়ে গেলাম। আমি মনে মনে পূর্ণমাত্রায় নির্ভয় ছিলাম। কিন্তু আমার পিতা-মাতার অবস্থা ছিল বড়ই মর্মান্তিক। আল্লাহ কোন্ মহাসত্য উদঘাটন করেন, সেই চিন্তায় তাঁরা ছিলেন অস্থির, উদ্বিগ্ন। 'ওহী' কালীন অবস্থা শেষ হয়ে গেলে রাসূলে কারীমকে (সা) খুবই উৎফুল্ল দেখা গেল। তিনি হাসি সহকারে প্রথম যে কথাটি বললেন তা ছিল এই ঃ 'আয়িশা, তোমাকে সুসংবাদ। আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা ঘোষণা করে ওহী নাযিল করেছেন। অতঃপর তিনি

সূরা আন-নূর-এর ১১ নং আয়াত থেকে ২১ নং আয়াত পর্যন্ত পাঠ করে শুনালেন। আমার মা তখন আমাকে বললেন ঃ 'ওঠো, রাসূলুল্লাহর (সা) শুকরিয়া আদায় কর।' আমি বললাম ঃ 'আমি না উনার শুকরিয়া আদায় করবো, আর না আপনাদের দুইজনের। আমিতো আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমার নির্দোষিতা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন। আপনারা তো এই মিথ্যা অভিযোগকে অসত্য বলেও ঘোষণা করেননি।'[১৫১]

হযরত 'আয়িশার (রা) বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল, আল-কুরআনের ভাষায় তাকে 'আল-ইফ্ক' বলা হয়েছে। এই শব্দ দ্বারা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে এই অভিযোগের পরিপূর্ণ প্রতিবাদ করা হয়েছে। 'ইফ্ক' শব্দের অর্থ মূল কথাকে উল্টিয়ে দেওয়া, প্রকৃত সত্যের বিপরীত যা ইচ্ছা বলে দেওয়া। এই অর্থের দৃষ্টিতে এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও মনগড়া কথা– অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন অভিযোগ সম্পর্কে শব্দটি প্রয়োগ হলে তার অর্থ হয়, সুস্পষ্ট মিথ্যা অভিযোগ, মিথ্যা দোষারোপ।[১৫২]

হযরত 'আয়িশার (রা) নির্দোষিতা ঘোষণা করে কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার পর সুস্পষ্টভাবে মিথ্যা দোষারোপ করার অভিযোগে দুইজন পুরুষ ও একজন নারীর উপর 'হদ' (নির্ধারিত শাস্তি) জারি করা হয়। তাঁরা হলেন ঃ মিসতাহ ইবন উসাসা, কবি হাস্সান ইবন সাবিত ও হামনা বিন্ত জাহাশ (রা)।[১৫৩]

## তায়াম্মুমের আয়াত নাযিলের ঘটনা

আল্লাহ পাক হযরত আয়িশাকে (রা) উপলক্ষ করে মানবজাতিকে বহুবিধ কল্যাণের পথ দেখিয়েছেন। 'ইফ্ক'কে কেন্দ্র করে মানব সমাজকে যৌনাচার ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র রাখার জন্য অনেকগুলি বিধি-নিষেধ ও দণ্ডবিধি ঘোষণা করেছেন। তেমনি পাক-পবিত্র হওয়ার জন্য পানির বিকল্প হিসেবে তায়াম্মুমের সুযোগও তাঁকেই কেন্দ্র করে দান করেছেন। এখানে সে সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে মনে করি।

একবার আর এক সফরে 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে ছিলেন। ইবন সা'দের মতে, এটাও ছিল 'আল-মুরাইসী' যুদ্ধ-সফরের ঘটনা।[১৫৪] সেই একই হার এবারও তাঁর গলায় ছিল। কাফেলা যখন 'জাতুল জাইশ' অথবা আল-বায়দা নামক স্থানে পৌঁছে, তখন হারটি গলা থেকে আবার ছিঁড়ে কোথায় পড়ে যায়।[১৫৫] পূর্বের ঘটনায় তাঁর যথেষ্ট

---

১৫১. ঘটনাটি বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ সহীহ বুখারী ঃ কিতাবুশ শাহাদাত-৫/১৯৮,২০১; কিতাবুল জিহাদ-৭/৩৩৩,৩৩৫;কিতাবুত তাফসীর-৮/৩৪৩, ৩৬৭; সহীহ মুসলিম-(২৭৭০) কিতাবুত তাওবাহ্; ইবন হিশাম-২/২৯৭, ৩০৭; আনসাবুল আশরাফ-১ম খণ্ড; তাফহীমুল কুরআন ঃ সূরা আন-নূর; তিরমিযী-(৩১৭৯); আল-বিদায়া-৩/১৬০; তাফসীর ইবন কাসীর-৩/২৬৮, ২৭২, আস-সীরাহ-২/৫১-৫৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৫৩-১৫৯

১৫২. তাফহীমুল কুরআন ঃ সূরা আন-নূর, টীকা-৮

১৫৩. আবু দাউদ ঃ কিতাবুল হুদূদ (৪৪৭৪); ইবন মাজাহ ঃ আল-হুদূদ (২৫৬৭); আত-তিরমিযী) আত-তাফসীর (৩১৮১); সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৬১; আনসাবুল আশরাফ-১/৩৪৩

১৫৪. তাবাকাত-২/৬৩,৬৫

১৫৫. কোন কোন বর্ণনায় 'আস-সুলসুল' নামক স্থানের কথা এসেছে। আল-বিকরী বলেন ঃ 'আস-সুলসুল হলো জুলহুলায়ফার নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের নাম। (সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৬৯, ১৭০

জ্ঞান হয়েছিল। তাই এবার সাথে সাথে ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহকে (সা) অবহিত করেন। সময়টি ছিল প্রভাত হওয়ার কাছাকাছি। রাসূল (সা) যাত্রা বিরতির নির্দেশ দিলেন এবং এক ব্যক্তিকে হারটি খোঁজার জন্য দ্রুত পাঠিয়ে দিলেন! ঘটনাক্রমে সৈন্যরা যেখানে তাঁবু গেঁড়েছিল সেখানে বিন্দুমাত্র পানি ছিল না। এ দিকে ফজরের নামাযের সময় হয়ে গেল। লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে হযরত আবু বকরের (রা) নিকট ছুটে গিয়ে বললো, 'আয়িশা (রা) সৈন্য বাহিনীকে কী বিপদের মধ্যে ফেলে দিল। আবু বকর (রা) তখন সোজা 'আয়িশার (রা) কাছে দৌড়ে গেলেন। দেখলেন, রাসূল (সা) 'আয়িশার (রা) হাঁটুর উপর মাথা রেখে একটু আরাম করছেন। আবু বকর (রা) উত্তেজিত কণ্ঠে মেয়েকে বললেন, তুমি সব সময় মানুষের জন্য নতুন নতুন মুসীবত ডেকে আন। এ কথা বলে তিনি রাগে-ক্ষোভে মেয়ের পাঁজরে কয়েকটি খোঁচা মারেন। কিন্তু 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) আরামের ব্যাঘাত হবে ভেবে একটুও নড়লেন না।

এদিকে সকাল হলো। রাসূলুল্লাহ (সা) ঘুম থেকে জেগে সবকিছু অবগত হলেন। ইসলামী বিধি-বিধানের এ এক বৈশিষ্ট্য যে, সর্বদা তা উপযুক্ত সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে। ইসলামে এর আগে নামাযের জন্য ওজু ফরয ছিল। কিন্তু এই ঘটনার সময় পানি না পাওয়া গেলে কি করতে হবে, সে সম্পর্কে করণীয় কর্তব্য বলে দিয়ে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْعَلٰى سَفَرٍ اَوْجَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْلٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ - اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا - (سورة النساء-٤٣)

"আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাক কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি প্রস্রাব-পায়খানা থেকে এসে থাকে কিংবা নারী-গমন করে থাকে, কিন্তু পরে যদি পানি না পায়, তবে পাক-পবিত্র মাটি দ্বারা তা'য়াম্মুম করে নাও। তাতে তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতকে ঘষে নাও। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল।" (আন-নিসা ঃ ৪৩)

মূলত তা'য়াম্মুমের হুকুম একটি পুরস্কার বিশেষ– যা এ উম্মাতেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলার কতই না অনুগ্রহ যে, তিনি ওজু-গোসল প্রভৃতি পবিত্রতার নিমিত্ত এমন এক বস্তুকে পানির স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন, যার প্রাপ্তি পানি অপেক্ষাও সহজ। আর এ সহজ ব্যবস্থাটি পূর্ববর্তী কোন উম্মাতকে দান করা হয়নি, একমাত্র উম্মাতে মুহাম্মাদীকেই দান করা হয়েছে।

যা হোক, মুসলিম মুজাহিদদের আবেগ-উত্তেজনায় টগবগে দলটি—যারা তখন পানি না পাওয়ার জন্য নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত মনে করছিল, আল্লাহর এ রহমত লাভে ভীষণ

উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। হযরত উসাইদ ইবন হুদাইর– যিনি একজন বড় মাপের সাহাবী ছিলেন, আবেগ ভরে বলে উঠলেন ঃ 'ওহে আবু বকর সিদ্দীকের পরিবারবর্গ! ইসলামের এটাই আপনাদের প্রথম কল্যাণ নয়।'[১৫৬]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, উসাইদ ইবন হুদাইর 'আয়িশাকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ 'আল্লাহ আপনাকে ভালো প্রতিদান দিন! আপনার উপর যখনই কোন বিপদ এসেছে– যা আপনি পছন্দ করেন না, তখনই আল্লাহ তার মাধ্যমে আপনার ও মুসলমানদের জন্য কোন না কোন কল্যাণ দান করেছেন।'[১৫৭]

হযরত সিদ্দীকে আকবর-যিনি কিছুক্ষণ আগেই প্রিয়তমা কন্যাকে শিক্ষাদানের জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, গর্বের সাথে এখন তিনি সেই কন্যাকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ 'আমার কলিজার টুকরা! আমার জানা ছিল না যে, তুমি এতখানি কল্যাণময়ী। তোমার অসীলায় আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহকে এতখানি বরকত ও আসানী দান করেছেন।'[১৫৮]

উল্লেখ্য যে, 'আয়িশা (রা) এই হারটি বোন আসমার (রা) নিকট থেকে পরার জন্য ধার নিয়েছিলেন।[১৫৯] এরপর কাফেলা চলার জন্য যখন 'আয়িশার (রা) উটটি উঠানো হয় তখন সেই উটের নীচে হারটি পাওয়া যায়।[১৬০]

## ঈলা বা তাখঈর-এর ঘটনা

রাসূলে কারীম (সা) ও 'আয়িশার (রা) যুগল জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা অনেক। তারমধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দুইটি হলো ঃ তাহরীম ও ঈলা বা তাখঈর-এর ঘটনা। তাহরীম হলো মধু সংক্রান্ত সেই ঘটনা যা হযরত হাফসার (রা) জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে। অপর ঘটনাটির প্রতি পূর্বে কোথাও কোথাও ইঙ্গিত করা হলেও বিশদ আলোচনা হয়নি তাই এখানে বর্ণনা করা হলো।

এটা হিজরী ৯ম সন, মতান্তরে আহযাব ও বনু কুরাইজার সমসাময়িক কালের ঘটনা।[১৬১] তখন আরবের দূর-দূরান্তরে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে পড়েছিল। ইসলামের বাইতুল মালে প্রতিনিয়ত সম্পদ জমা হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও হযরত রাসূলে পাকের (সা) পরিবারের লোকেরা যে অভাব-অনটন ও মিতব্যয়িতার ভিতর দিয়ে চলছিলেন, তার কিছু ইঙ্গিত পূর্বেই এসে গেছে। খাইবার বিজয়ের পর যে পরিমাণ শস্যদানা ও খোরমা-খেজুর আযওয়াজে মুতাহহারাতের সারা বছরের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল, তা ছিল খুবই অপ্রতুল। তাছাড়া তাঁদের প্রত্যেকের ছিল অতিথি সেবার অভ্যাস ও দান-খায়রাতের

---

১৫৬. বুখারী ঃ কিতাবুত তায়াম্মুম; তাফসীর ইবন কাসীর-১/৫০৬; তাবাকাত-২/৬৫

১৫৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৭০

১৫৮. মুসনাদ-৬/২৭২; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৭১

১৫৯. তাফসীর ইবন কাসীর-১/৫০৬; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৬৯

১৬০. বুখারী ঃ আত-তায়াম্মুম, আত-তাহারাহ্, আত-তাফসীর; ইবন মাজাহ-(৫৬৮): মুসলিম-(৩৬৭, ১০৮); তাফসীর ইবন কাসীর-১/৫০৬

১৬১. তাফহীমুল কুরআন ঃ সূরা আল-আহযাব, টীকা-৪১

হাত। এ কারণে তাঁদের জীবন-যাপনের মান ছিল অতি নিম্ন পর্যায়ের। তাঁদের প্রতিটি দিন কাটতো অনাহার-অর্ধাহারে। রাসূলুল্লাহর (সা) বেগমদের মধ্যে আরবের অনেক বড় বড় গোত্র-প্রধানের মেয়েরা যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন শাহযাদীও। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ের আগে তাঁরা নিজের পিতৃগৃহে অথবা পূর্বের স্বামীর ঘরে অত্যন্ত বিলাসী জীবন যাপন করতেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে অর্থ-সম্পদের আধিক্য দেখে তাঁরা একযোগে তাঁদের জন্য নির্ধারিত বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধির দাবী জানান।

এ কথা 'উমারের (রা) কানে গেলে প্রথমে তিনি নিজের মেয়ে হাফসাকে (রা) এই বলে বুঝালেন যে, তুমি তোমার জীবিকার পরিমাণ বৃদ্ধির দাবী জানাচ্ছো। তোমার যা প্রয়োজন হয় আমার কাছেই চাইতে পার। তারপর হযরত 'উমার (রা) এক এক করে উম্মুল মুমিনীনদের প্রত্যেকের দরজায় যেয়ে তাদেরকে বুঝান। হযরত উম্মু সালামা বলেন ঃ 'উমার! আপনি তো প্রতিটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেই থাকেন, এখন রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীদের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করা আরম্ভ করলেন।' একথা শুনে 'উমার (রা) অপমাণিত হয়ে চুপ হয়ে গেলেন।'

একদিন আবু বকর ও 'উমার দুজন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে দেখলেন, রাসূলুল্লাহকে (সা) ঘিরে তাঁর স্ত্রীরা বসে আছেন এবং তাঁদের জীবিকার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য তাঁকে চাপাচাপি করছেন। উভয়ে নিজ নিজ মেয়ে– 'আয়িশা ও হাফসাকে মারতে উদ্যত হলেন। তখন তাঁরা এই অঙ্গীকার করে আপন আপন পিতার হাত থেকে রক্ষা পেলেন যে, আগামীতে তাঁরা আর জীবিকা বৃদ্ধির দাবী জানিয়ে রাসূলকে (সা) কষ্ট দেবেন না।

অন্য স্ত্রীরা তাঁদের দাবীর উপর অটল থাকলেন। ঘটনাক্রমে এই সময় রাসূল (সা) ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যান এবং পাঁজরে গাছের একটি মূলের সাথে ধ. ক্কা লেগে আহত হন।১৬২

হযরত 'আয়িশার (রা) হুজরা সংলগ্ন আর একটি ঘর ছিল যাকে 'আল-মাশরাবা বলা হতো। রাসূল (সা) সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, আগামী এক মাস কোন স্ত্রীর কাছেই যাবেন না। এই ঘটনাটি মুনাফিকরা প্রচার করে দেয় যে, রাসূল (সা) তাঁর সকল স্ত্রীকে তালাক দান করেছেন। একথা শুনে সাহাবা-ই-কিরাম মসজিদে সমবেত হন। ঘরে ঘরে একটা অস্থিরতার ভাব বিরাজ করতে থাকে। রাসূলুল্লাহর (সা) সহধর্মিণীরা কান্নাকাটি শুরু করে দেন। সাহাবীদের মধ্য থেকে কেউই রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে ঘটনাটির সত্যতা যাচাইয়ের সাহস করলেন না।

হযরত 'উমার (রা) খবর পেয়ে মসজিদে নববীতে এসে দেখলেন, সাহাবায়ে কিরাম বিমর্ষ অবস্থায় চুপচাপ বসে আছেন। তিনি রাসূলে পাকের (সা) সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়ে দুইবার কোন সাড়া পেলেন না। তৃতীয় বারের মাথায় অনুমতি পেয়ে ঘরে ঢুকে দেখেন, রাসূল (সা) একটি চৌকির উপর শুয়ে আছেন, তাঁর পবিত্র দেহে মোটা

১৬২. আবু দাউদ ঃ ইমামাতু মান সাল্লা কা'য়েদান

কম্বলের দাগ পড়ে গেছে। উমার (রা) ঘরের চার দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে দেখলেন, সেখানে কয়েকটি মাটির পাত্র ও শুকনো মশক ছাড়া আর কোন জিনিস নেই। এ অবস্থা দেখে 'উমারের (রা) চোখে অশ্রু নেমে এলো। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আপনার স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন? জবাব দিলেন ঃ না। 'উমার বললেন ঃ আমি কি এ সুসংবাদ মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করে দিব? রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতি পেয়ে 'উমার (রা) গলা ফাটিয়ে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে ওঠেন।

এই মাসটি ছিল ২৯ দিনের। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ 'আমি একটি একটি করে দিন গুনতাম। ২৯ দিন পূর্ণ হলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন।' রাসূলে কারীম (সা) সর্বপ্রথম 'আয়িশার (রা) ঘরে যান। তিনি আরজ করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো এক মাসের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আজ তো উনত্রিশ হলো। তিনি বললেন ঃ কোন মাস ২৯ দিনেও হয়।[১৬৩]

যেহেতু আযওয়াজে মুতাহ্হারাত জীবন-যাপনের মান বৃদ্ধির দাবীদার ছিলেন, অন্যদিকে নবী কারীম (সা) সহধর্মিণীদের সন্তুষ্টির জন্য পার্থিব ভোগ-বিলাস দ্বারা নিজেকে কলুষিত করতে পারেন না। এই জন্য আল্লাহ তা'য়ালা 'তাখঈর' এর আয়াত নাযিল করেন। 'তাখঈর' অর্থ এখতিয়ার ও স্বাধীনতা দান করা। অর্থাৎ স্ত্রীদের মধ্যে যাঁর ইচ্ছা দারিদ্র ও অভাব-অনটন মেনে নিয়ে আল্লাহর রাসূলের সাথে সংসার ধর্ম পালন করতে পারেন। আর যাঁর ইচ্ছা তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে পারেন। আয়াতটি নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا - وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا -
(الأحزاب-٢٩)

"হে নবী! তোমার স্ত্রীদের বল ঃ তোমরা যদি দুনিয়া ও তার চাকচিক্যই পেতে চাও তবে এসো, আমি তোমাদের কিছু দিয়ে ভালোভাবে বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ও পরকালের ঘর পেতে চাও, তবে জেনে রাখ তোমাদের মধ্যে যারা নেক্কার, তাদের জন্য আল্লাহ বিরাট পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।" (আল-আহযাব-২৯)

মুসলিম শরীফে উল্লেখিত হাদীসে হযরত জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ সেই সময়কার ঘটনা বর্ণনা করে বলেছেন যে, একদিন হযরত আবু বকর ও হযরত 'উমার (রা) নবী কারীমের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে দেখতে পেলেন যে, হযরতের পত্নীগণ তাঁর চারপাশে বসে

---

১৬৩. সহীহ মুসলিম ঃ বাবুল ঈলা

আছেন, আর রাসূলও (সা) চুপচাপ বসে আছেন। তিনি হযরত 'উমারকে (রা) লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'তোমরা দেখছো, এরা আমার চারপাশে বসে আছে; আসলে এরা আমার নিকট খরচের টাকা চাচ্ছে।' এই কথা শুনে উভয় সাহাবী নিজ নিজ কন্যাকে খুব করে শাসিয়ে দিলেন এবং তাঁদেরকে বললেন ঃ 'তোমরা রাসূলে কারীমকে কষ্ট দিচ্ছ এবং তাঁর নিকট এমন জিনিস চাচ্ছো যা তাঁর নিকট নেই।' অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, মারতে উদ্যত হলেন। রাসূল (সা) তাঁদেরকে থামালেন।[১৬৪] বস্তুত তখন নবী কারীম (সা) যে কতদূর আর্থিক অনটনের মধ্যে ছিলেন, তা উপরোক্ত ঘটনা হতে স্পষ্ট জানা যায়।

এই আয়াত যখন নাযিল হলো, তখন নবী কারীম (সা) সর্বপ্রথম হযরত 'আয়িশার (রা) সাথে কথা বললেন ঃ 'তোমাকে একটি কথা বলছি, খুব তাড়াতাড়ি করে জবাব দিও না। তোমার পিতা-মাতার মতামত জেনে নাও।' তারপর নবী কারীম (সা) তাঁকে উল্লেখিত আয়াতটি পাঠ করে শোনালেন এবং বললেন, আল্লাহর নিকট থেকে এই হুকুম এসেছে। সাথে সাথে হযরত 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ এই বিষয়ে আমার বাবা-মার নিকট কি জিজ্ঞেস করবো? আমি তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং পরকালের সাফল্যই চাই। 'আয়িশার (রা) এমন জবাবে রাসূলে কারীম (সা) দারুণ খুশী হলেন। তিনি বললেন ঃ বিষয়টি যেভাবে তোমার নিকট উপস্থাপন করেছি সেভাবে তোমার অন্য সতীনদের নিকটও করবো। 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ অনুগ্রহ করে আপনি আমার সিদ্ধান্তের কথাটি অন্য কাউকে জানাবেন না। কিন্তু রাসূল (সা) তাঁর সে অনুরোধ রাখেননি। তিনি যেভাবে 'আয়িশাকে কথাটি বলেছিলেন, ঠিক সেইভাবে তাঁর সতীনদেরকেও বলেন। সাথে সাথে এ কথাটিও বলে দেন যে, 'আয়িশা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল (সা) ও আখেরাতকে গ্রহণ করেছে।[১৬৫] তাঁদের প্রত্যেকেই 'আয়িশার মত (রা) একই জবাব দেন। সীরাতের গ্রন্থসমূহে এই ঘটনা 'তাখঈর' নামে অভিহিত হয়েছে। 'তাখঈর' অর্থ ইখতিয়ার দান করা। স্ত্রী স্বামীর সাথে থাকবে, নাকি তাঁর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে– এই দুইটির কোন একটি গ্রহণের সিদ্ধান্ত করার ইখতিয়ার স্ত্রীকে অর্পণ করা।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মাওদূদী (রহ) ইবনুল 'আরাবীর' আহকামুল কুরআনের সূত্রে বলেছেন ঃ 'তাখঈর'-এর আয়াত নাযিল হওয়ার সময় হযরত রাসূলে কারীমের (সা) চারজন বেগম বর্তমান ছিলেন। তাঁরা হলেন ঃ হযরত সাওদা (রা), হযরত 'আয়িশা (রা), হযরত হাফসা (রা) ও হযরত উম্মু সালামা (রা)।'[১৬৬] তবে আল্লামাহ ইবন কাসীর হযরত আকরামার (রা) সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, সেই সময় রাসূলুল্লাহর (সা) মোট নয়জন বেগম ছিলেন। পাঁচজন কুরাইশ খান্দানের– 'আয়িশা, হাফসা, উম্মু হাবীবা,

---

১৬৪. তাফসীর ইবন কাসীর-৩/৪৮১

১৬৫. তাবাকাত-৮/৬৯; সহীহ বুখারী ঃ কিতাবুত তাফসীর-সূরা আল-আহযাব; মুসলিম ঃ আল-ঈলা

১৬৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ সূরা আল আহযাব, টীকা-৪১

সাওদা ও উম্মু সালামা (রা) এবং অন্যরা হলেন– সাফিয়্যা, মাইমুনা, জুওয়াইরিয়া ও যয়নাব বিনত জাহাশ আল-আসাদিয়্যা (রা)।[১৬৭] ঘটনার সময়কাল নিয়ে মতভেদের কারণে এই পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে।

## স্বামীর ইনতিকাল

হযরত 'আয়িশার (রা) বয়স যখন আঠারো বছর তখন স্বামী রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেন। হিজরী ১১ সনের সফর মাসের পূর্বে কোন একদিন রাসূল (সা) 'আয়িশার (রা) ঘরে এসে দেখেন, তিনি মাথার যন্ত্রণায় আহ্ উহ্ করছেন। রাসূল (সা) তাঁর এ অবস্থা দেখে বললেন ঃ তুমি যদি আমার সামনে মারা যেতে, আমি তোমাকে নিজ হাতে গোসল দিয়ে কাফন-দাফন করতাম। 'আয়িশা (রা) সাথে সাথে প্রতিক্রিয়া জানালেন এভাবে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো একথা বলছেন এ জন্য যে, যাতে এই ঘরে অন্য একজন স্ত্রীকে এনে উঠাতে পারেন। একথা শুনে রাসূল (সা) নিজের মাথায় হাত রেখে বলে ওঠেন ঃ হায় আমার মাথা! বলা হয়েছে, মূলত তখন থেকেই রাসূলুল্লাহর (সা) মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়।[১৬৮] এরপর তিনি হযরত মায়মূনার (রা) ঘরে গিয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। এ অবস্থায়ও তিনি নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট স্ত্রীর ঘরে রাত কাটাতেন। কিন্তু প্রত্যেক দিনই জানতে চাইতেন, আগামী কাল তিনি কোথায় থাকবেন? স্ত্রীগণ বুঝতে পারলেন তিনি 'আয়িশার (রা) কাছেই থাকতে চাচ্ছেন। তাই তাঁরা সবাই অনুমতি দিলেন। সেই দিন থেকে পার্থিব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি 'আয়িশার (রা) ঘরে অবস্থান করেন।[১৬৯]

এখন কারো মনে এ প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, হযরত রাসূলে কারীম (সা) হযরত 'আয়িশার (রা) কাছে যাওয়ার জন্য এত ব্যাকুল ছিলেন কেন? তাঁকে অতিমাত্রায় ভালোবাসার কারণে?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তা নয়। মূলত আল্লাহ 'আয়িশাকে (রা) যে পরিমাণ বুদ্ধি, মেধা, স্মরণশক্তি, স্বভাবগত পূর্ণতা এবং চিন্তাশক্তি দান করেছিলেন তা অন্য কোন স্ত্রীর মধ্যে ছিল না। সুতরাং এমন ধারণা অমূলক নয় যে, রাসূলুল্লাহর (সা) উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলির যাবতীয় কথা, কাজ ও আচরণ যেন পূর্ণরূপে সংরক্ষিত থাকে। বাস্তবে তাই হয়েছে। রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাত সংক্রান্ত অধিকাংশ সহীহ বর্ণনা 'আয়িশার (রা) মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছেছে।

রাসূলুল্লাহর (সা) রোগের তীব্রতা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এক পর্যায়ে তিনি ইমামতির জন্য মসজিদে যেতে অক্ষম হয়ে পড়লেন। সহধর্মিণীগণ সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে শেখা কিছু দু'আ পড়ে তাঁরা ফুঁক দিচ্ছিলেন। হযরত 'আয়িশা (রা) কিছু দু'আ পড়ে ফুঁক দিয়েছিলেন।[১৭০]

---

১৬৭. তাফসীর ইবন কাসীর-৩/৪৮১

১৬৮. আনসাবুল আশরাফ-১/৫৪১-৫৪৫

১৬৯. প্রাগুক্ত-১/৫৪৫; বুখারী ঃ কিতাবুল জানায়েয।

১৭০. আনসাবুল আশরাফ-১/৫৫১

ফজরের নামাযে সমবেত মুসল্লীরা রাসূলুল্লাহর (সা) অপেক্ষায় বসে ছিলেন। তিনি কয়েকবার ওঠার চেষ্টা করতেই অচেতন হয়ে পড়ছিলেন। অবশেষে তিনি আবু বকরকে (রা) ইমামতি করার নির্দেশ দিলেন। 'আয়িশা (রা) বলেন, আমার ধারণা হলো, রাসূলুল্লাহর (সা) স্থলে যিনিই দাঁড়াবেন মানুষ তাঁকে অপাংক্তেয় ও অশুভ বলে মনে করবে। এজন্য আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আবু বকর একজন নরম দিলের মানুষ। তাঁর দ্বারা এ কাজ হবে না। তিনি কেঁদে ফেলবেন। অন্য কাউকে নির্দেশ দিন। কিন্তু তিনি দ্বিতীয়বার একই নির্দেশ দিলেন। তখন 'আয়িশা (রা) হাফসাকে (রা) অনুরোধ করলেন কথাটি আবার রাসূলুল্লাহকে (সা) বলার জন্য। হাফসা (রা) একই কথা রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন। রাসূলুল্লাহ (সা) মন্তব্য করলেন ঃ 'তোমরা সবাই ইউসুফের সঙ্গিনীদের মত। বলে দাও, আবু বকর ইমামতি করবেন।'[১৭১]

রাসূলুল্লাহ (সা) অসুস্থ হয়ে পড়ার পূর্বে কিছু নগদ অর্থ 'আয়িশার (রা) নিকট রেখে খরচ করতে ভুলে গিয়েছিলেন। এখন এই প্রবল রোগের মধ্যে সে কথা স্মরণ হলো। 'আয়িশাকে (রা) বললেন ঃ সেই দিরহামগুলি কোথায়? ওগুলি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে ফেল। মুহাম্মাদ কি বিরূপ ধারণা নিয়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হবে? তখনই সেই অর্থ দরিদ্র লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়।[১৭২]

এখন রাসূলুল্লাহর (সা) শেষ সময়। 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) মাথার কাছে বসা এবং তিনিও 'আয়িশার (রা) সিনার সাথে ঠেস দিয়ে বসে আছেন। 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সুস্থতার জন্য দু'আ করে চলেছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) হাত তাঁর হাতের মধ্যেই। হঠাৎ তিনি টান দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে উঠলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ وَالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى (আল্লাহুম্মা ওয়ার রাফীকিল আ'লা)

অর্থাৎ, আল্লাহ! আমি সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুকেই গ্রহণ করছি।[১৭৩]

'আয়িশা (রা) বলেন ঃ সুস্থ অবস্থায় তিনি বলতেন, প্রত্যেক নবীর মরণকালে দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের যে কোন একটি বেছে নেওয়ার ইখতিয়ার দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহর (সা) এই শব্দগুলি উচ্চারণের পর আমি বুঝে গেলাম যে, তিনি আমাদের থেকে দূরে থাকাকেই কবুল করেছেন।[১৭৪] তিনি আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আপনার তো বড় কষ্ট হচ্ছে। বললেন ঃ কষ্ট অনুপাতে প্রতিদানও আছে।

'আয়িশা (রা) হযরত রাসূলে কারীমকে (সা) সামলে নিয়ে বসে আছেন। হঠাৎ তাঁর দেহের ভার আবুব করলেন। চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন, তিনি আর নেই। আস্তে করে পবিত্র মাথাটি বালিশের উপর রেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।[১৭৫]

---

১৭১. প্রাগুক্ত-১/৫৫৬-৫৫৭; বুখারী : বাবুল হিজরাহ্

১৭২. মুসনাদ-৬/৪৯

১৭৩. প্রাগুক্ত-৬/১২৬

১৭৪. ইবন কাসীর : আস্-সীরাহ-২/৪৭২; আনসাব-১/৫৪৭, ৫৪৯,

১৭৫. মুসনাদ-৬/২৭৪

হযরত 'আয়িশার (রা) সবচেয়ে বড় সম্মান ও মর্যাদা এই যে, তাঁরই ঘরের মধ্যে, এক পাশে রাসূলে পাকের পবিত্র দেহ সমাহিত করা হয়।[১৭৬]

একবার হযরত 'আয়িশা (রা) স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর ঘরে একের পর এক তিনটি চাঁদ ছুটে এসে পড়ছে। তিনি এই স্বপ্নের কথা পিতা আবু বকর সিদ্দীককে (রা) বলেন। যখন রাসূলে কারীমকে (সা) তাঁর ঘরে দাফন করা হলো তখন আবু বকর (রা) মেয়েকে বললেন, সেই তিন চাঁদের একটি এই এবং সবচেয়ে ভালোটি।[১৭৭] পরবর্তী ঘটনা প্রমাণ করেছে যে, তাঁর স্বপ্নের দ্বিতীয় ও তৃতীয় চাঁদ ছিলেন আবু বকর (রা) ও উমার (রা)।

হযরত 'আয়িশা (রা) আঠারো বছর বয়সে বিধবা হন এবং এ অবস্থায় জীবনের আরো আটচল্লিশটি বছর অতিবাহিত করেন। যতদিন জীবিত ছিলেন, কবর পাকের পাশেই ছিলেন। প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহর (সা) কবরের পাশেই ঘুমোতেন। একদিন রাসূলুল্লাহকে (সা) স্বপ্নে দেখার পর সেখানে ঘুমোনো ছেড়ে দেন। হযরত 'উমারকে (রা) 'আয়িশার (রা) ঘরে দাফন করার পূর্ব পর্যন্ত হিজাব ছাড়া আসা-যাওয়া করতেন। কারণ, তখন সেখানে যে দুইজন শায়িত ছিলেন, তাঁদের একজন স্বামী এবং অপরজন পিতা। তাঁদের পাশে 'উমারকে (রা) দাফন করার পর বলতেন, এখন ওখানে যেতে গেলে হিজাবের প্রয়োজন হয়।

আল্লাহ পাক আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের (পবিত্র-সহধর্মিণীগণ) জন্য দ্বিতীয় বিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি ইচ্ছা করলো যে, রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর তাঁর কোন এক স্ত্রীকে বিয়ে করবে। এই হাদীসের বর্ণনা সূত্রের একজন বর্ণনাকারী সুফইয়ানকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো ঃ তিনি কি 'আয়িশা (রা)? সুফইয়ান বললেন ঃ বর্ণনাকারীরা তাই উল্লেখ করেছেন। সুদী বলেন ঃ যে ব্যক্তি এমন ইচ্ছা করেছিলেন, তিনি হলেন তালহা ইবন 'উবাইদিল্লাহ। এরই প্রেক্ষিতে নিম্নের এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ[১৭৮]

وَمَاكَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ اَبَدًا - اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا - (الاحزاب ٥٣)

'আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহর কাছে এটা গুরুতর অপরাধ।'[১৭৯]

---

১৭৬. বুখারী ঃ বাবু ওফাত আন-নাবয়্যি।
১৭৭. মুওয়াত্তা ইমাম মালিক; ইবন কাসীর ঃ আস-সীরাহ্-২/৪৯৫, আনসাব-১/৫৭১
১৭৮. তাফসীর ইবন কাসীর-৩/২৬৮
১৭৯. সূরা আল-আহযাব-৫৪

অপর আয়াতে আল্লাহ্ পাক আযওয়াজে মুতাহ্হারাতকে মুসলমানদের জননী বলে ঘোষণা দেন ঃ[১৮০]

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ـ

'নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা।'

মূলকথা হলো, আযওয়াজে মুতাহ্হারাত– যাঁরা তাঁদের জীবনের একটি অংশে মহানবীর (সা) জীবন সঙ্গিনী ছিলেন, তাঁদের বাকী জীবনটাও স্বামীর শিক্ষা ও কর্মের অনুশীলন এবং প্রচার-প্রসারে অতিবাহিত করবেন। তাঁরা মুসলমানদের মা। তাঁদের দায়িত্ব হবে সন্তানদের তালীম ও তারবিয়্যাত (শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ) দান করা। তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্বয়ং আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন এভাবে ঃ[১৮১]

'হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, তবে পর পুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না। ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে। তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে– প্রথম জাহিলী যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ্ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পুত-পবিত্র রাখতে। আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ব বিষয়ে খবর রাখেন।'

হযরত 'আয়িশার (রা) বাকী জীবন ছিল উপরে উদ্ধৃত আল্লাহর বাণীর বাস্তব ব্যাখ্যাস্বরূপ।

হযরত রাসূলে কারীমের ইনতিকালের পর উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) সম্মানিত পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খলীফা নির্বাচিত হলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) কাফন-দাফন ও খলীফা নির্বাচনের ঝুট-ঝামেলা থেকে মুক্ত হওয়ার কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহর (সা) বেগমগণ চাইলেন, হযরত উসমানকে (রা) তাঁদের পক্ষ থেকে খলীফার নিকট পাঠাবেন উত্তরাধিকারের বিষয়টি চূড়ান্ত করার জন্য। তখন 'আয়িশা (রা) তাঁদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, রাসূলে কারীম (সা) তাঁর জীবদ্দশায় বলেছিলেন, 'আমার কোন উত্তরাধিকারী থাকবে না। আমার পরিত্যক্ত সবকিছু সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে।'[১৮২] এ কথা শুনে সবাই চুপ হয়ে যান।

আসলে রাসূলে পাক (সা) বিষয়-সম্পত্তি এমন কী-ইবা রেখে গিয়েছিলেন, যা তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হতে পারতো? হাদীসে এসেছে, তিনি দিরহাম ও দীনার,

---

১৮০. প্রাগুক্ত-৬

১৮১. প্রাগুক্ত-৩০-৩৪

১৮২. বুখারী ঃ কিতাবুল ফারায়েজ; ইবন কাসীর ঃ আস-সীরাহ-২/৫০৮

চতুষ্পদ জন্তু, দাস-দাসী কিছুই মীরাস হিসেবে রেখে যাননি।[১৮৩]

তবে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল হিসেবে কয়েকটি বাগ-বাগিচা তিনি নিজের অধীনে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় তার আয় যে যে খাতে ব্যয় করতেন, খিলাফতে রাশেদাও তা একই অবস্থায় বহাল রাখেন। রাসূল (সা) বেগমগণের ব্যয় নির্বাহ করতেন এরই আয় থেকে, আবু বকরও তা বহাল রাখেন।[১৮৪]

## পিতৃবিয়োগ

হযরত আবু বকর মাত্র দুই বছর খিলাফত পরিচালনার সুযোগ পান। হিজরী তেরো সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর যখন অন্তিম দশা তখন মেয়ে 'আয়িশা পিতার শিয়রে বসা ছিলেন। এর আগে সুস্থ অবস্থায় তিনি মেয়েকে কিছু বিষয়-সম্পত্তি ভোগ-দখলের জন্য দিয়েছিলেন। এখন অন্য সন্তানদেরও বিষয়-সম্পত্তির প্রয়োজনের কথা মনে করে বললেন ঃ আমার কলিজার টুকরো মেয়ে! তুমি কি ঐ বিষয়-সম্পত্তি তোমার অন্য ভাইদের দিয়ে দিবে? মেয়ে বললেন ঃ অবশ্যই দিব। তারপর তিনি মেয়েকে জিজ্ঞেস করেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) কাফনে মোট কতখানা কাপড় ছিল? মেয়ে বললেন ঃ তিনখানা সাদা কাপড়। আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ তিনি কোন দিন ওফাত পান? বললেন ঃ সোমবার। আবার জিজ্ঞেস করলেন; আজ কি বার? বললেন ঃ সোমবার। বললেন ঃ তাহলে আজ রাতে আমাকেও যেতে হবে। তারপর তিনি নিজের চাদরটি দেখলেন। তাতে জাফরানের দাগ ছিল। বললেন ঃ এই কাপড়খানি ধুয়ে তার উপর আরো দুইখানি কাপড় দিয়ে আমাকে কাফন দিবে। মেয়ে বললেন ঃ এই কাপড় তো পুরানো। বললেন ঃ মৃতদের চেয়ে জীবিতদেরই নতুন কাপড়ের প্রয়োজন বেশী।[১৮৫]
সেই দিন রাতেই তিনি ওফাত পান। হযরত 'আয়িশার হুজরার মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে, একটু পায়ের দিকে সরিয়ে তাঁকে দাফন করা হয়। হযরত 'আয়িশার হুজরায় পতিত এটা হলো দ্বিতীয় চাঁদ। এত অল্প বয়সে স্বামী হারানোর মাত্র দুই বছরের মধ্যে তিনি পিতাকে হারালেন।

## খিলাফতে ফারুকী

হযরত ফারুকে আজমের (রা) খিলাফত কালটি ছিল সর্বদিক দিয়ে উৎকর্ষমণ্ডিত। তিনি প্রত্যেক মুসলমানের জন্য নগদ ভাতা নির্ধারণ করে দেন। একটি বর্ণনা মতে, তিনি 'আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের প্রত্যেকের জন্য বাৎসরিক বারো হাজার করে দিতেন।[১৮৬] অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, অন্য আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের প্রত্যেককে দশ হাজার এবং 'আয়িশাকে (রা) বারো হাজার দিতেন। এমন প্রাধান্য দানের কারণ উমার (রা) নিজেই বলে দিয়েছেন। 'আমি তাঁকে দুই হাজার এই জন্য বেশী দিই যে, তিনি ছিলেন

---

১৮৩. বুখারী ঃ কিতাবুল ওয়াসাইয়া
১৮৪. প্রাগুক্ত ঃ কিতাবুল ফারায়েজ
১৮৫. প্রাগুক্ত ঃ আবওয়াবুল জানায়েয
১৮৬. কিতাবুল খারাজ-২৫

রাসূলুল্লাহর (সা) সর্বাধিক প্রিয়পাত্রী।'

আযওয়াজে মুতাহ্‌হারাতের সংখ্যা অনুযায়ী খলীফা উমার (রা) নয়টি পিয়ালা তৈরী করান। যখন কোন জিনিস তাঁর হাতে আসতো, নয়টি ভিন্ন ভিন্ন পিয়ালায় সকলের নিকট পাঠাতেন। হাদিয়া-তোহফা বণ্টনের সময় এতখানি খেয়াল রাখতেন যে, কোন জন্তু জবেহ্ হলে তার মাথা থেকে পায়া পর্যন্ত তাঁদের নিকট পাঠাতেন।

ইরাক বিজয়ের এক পর্যায়ে মূল্যবান মোতি ভর্তি একটি কৌটা মুসলমানদের হাতে আসে। অন্যান্য মালে গনীমতের সাথে সেটিও খলীফার দরবারে পাঠানো হয়। এই মোতির বণ্টন সকলের জন্য দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। খলীফা 'উমার (রা) বললেন ঃ আপনারা সকলে অনুমতি দিলে এই মোতিগুলি আমি 'উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশার (রা) নিকট পাঠিয়ে দিতে পারি। কারণ, তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) সর্বাধিক প্রিয়পাত্রী। সকলে সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দিলেন। পাত্রটি 'আয়িশার (রা) নিকট পাঠানো হলো। তিনি সেটা খুলে দেখে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) পরে ইবন খাত্তাব আমার প্রতি অনেক বড় বড় অনুগ্রহ দেখিয়েছেন। হে আল্লাহ! আগামীতে তাঁর এমনসব অনুগ্রহ লাভের জন্য আমাকে জীবিত রেখো না।

খলীফা হযরত 'উমারের (রা) বাসনা ছিল, 'আয়িশার (রা) হুজরায় রাসূলুল্লাহর (সা) কদম মুবারকের কাছে দাফন হওয়ার। কিন্তু একথা বলতে পারছিলেন না। তাঁর কারণ, যদিও মাটির নীচে চলে গেলে শরীয়াতের দৃষ্টিতে পুরুষদের থেকে পর্দা করা জরুরী নয়, তবুও আদব ও শিষ্টাচারের দৃষ্টিতে দাফনের পরেও তিনি আয়িশার নিকট গায়ের মাহরামই মনে করতেন। একেবারে অন্তিম মুহূর্তে এসব চিন্তায় তিনি বড় পেরেশান ছিলেন। শেষমেষ ছেলেকে পাঠালেন এই বলে যে, 'উম্মুল মুমিনীনকে আমার সালাম পেশ করে বলবে, 'উমারের বাসনা হলো তাঁর দুই বন্ধুর পাশে দাফন হওয়ার।' 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ 'যদিও আমি ঐ স্থানটি নিজের জন্য রেখেছিলাম, তবে আমি সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছি।'

উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশার (রা) এই অনুমতি পাওয়ার পরেও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে 'উমার (রা) অসীয়াত করে গেলেন, আমার লাশবাহী খাটিয়া তাঁর দরজায় নিয়ে গিয়ে আবার অনুমতি চাইবে। যদি তিনি অনুমতি দান করেন তাহলে ভিতরে দাফন করবে। অন্যথায় দাফন করবে সাধারণ মুসলমানদের গোরস্তানে। খলীফার ইনতিকালের পর তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা হয়। 'আয়িশা (রা) দ্বিতীয়বার অনুমতি দান করেন এবং লাশ ভিতরে নিয়ে দাফন করা হয়।[১৮৭]

আর এভাবে তিনি হলেন হযরত 'আয়িশার (রা) স্বপ্নের তৃতীয় চাঁদ—যাঁর মাধ্যমে তাঁর স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়।

বিদ্রোহীদের হাতে খলীফা হযরত উসমানের (রা) শাহাদাত বরণ ইসলামের ইতিহাসের

---

১৮৭. বুখারী ঃ কিতাবুল জানায়েয

এক মর্মান্তিক ঘটনা। এরই প্রেক্ষিতে উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) সরাসরি তৎকালীন রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। আর তাঁরই প্রেক্ষাপটে ঘটে আর এক হৃদয়বিদারক ঘটনা— উটের যুদ্ধ। হযরত 'উসমানের (রা) শাহাদাত পরবর্তী ঘটনাবলীতে তাঁর এভাবে জড়িয়ে পড়া কতটুকু ঠিক বা বেঠিক ছিল, সে বিষয়ে আমরা কোন সিদ্ধান্তে যাবনা। আমরা শুধু বিশ্বাস করবো, তাঁর সকল কর্ম-প্রচেষ্টা নিবদ্ধ ছিল দ্বীন ও 'উম্মাহর কল্যাণের জন্য। ঐতিহাসিক এ সকল ঘটনা বুঝার জন্য একটু বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন।

হযরত 'উসমানের (রা) খিলাফতকাল প্রায় বারো বছর। এ সময়ের প্রথম অর্ধাংশে সকল প্রকার ঝামেলা ও হৈ-হাঙ্গামা মুক্ত শান্ত পরিবেশ বিরাজমান ছিল। তারপর ধীরে ধীরে জনগণের পক্ষ থেকে নানা রকম অভিযোগ উঠতে থাকে। হযরত 'আয়িশা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) 'উসমানকে উপদেশ দিয়েছিলেন, যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কখনও খিলাফতের জামা পরান তাহলে স্বেচ্ছায় তা যেন খুলে না ফেলেন।[১৮৮]

মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে হযরত 'আয়িশার (রা) খুবই গ্রহণযোগ্যতা ছিল। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা অনুযায়ী তিনি ছিলেন মুসলমানদের মা। হিজায, ইরাক, মিসর তথা খিলাফতের প্রতিটি অঞ্চলে তাঁকে মায়ের মত মানা হতো। লোকেরা তাঁর নিকট এসে নিজেদের নানা অভিযোগ ও অসুবিধার কথা বলতো, আর তিনি উপদেশ ও সান্ত্বনা দিতেন।

হযরত 'উসমানের (রা) খিলাফতের প্রথম পর্ব পর্যন্ত বড় মাপের প্রজ্ঞাবান সাহাবীরা জীবিত ছিলেন। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করা হতো। খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে যোগ্যতা অনুযায়ী তাঁদেরকে নিয়োগ দান করা হতো। পূর্ববর্তী দুই খলীফার সময়ে কারো কোন অভিযোগ ছিল না। সে সময় যাঁরা উচ্চাভিলাষী যুবক ছিলেন– যেমন আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর, মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর, মারওয়ান ইবন হাকাম, মুহাম্মাদ ইবন আবী হুজায়ফা, সাঈদ ইবন আল-আ'স প্রমুখ, তাঁরা বড়দের সাহায্য করতেন। খিলাফত এবং ইমারাতের কোন উঁচু পদ ছিল তাঁদের জন্য দুরাশা মাত্র।

আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর ছিলেন হযরত সিদ্দীকে আকবরের নাতী এবং রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফাতো ভাই ও হাওয়ারী যুবাইয়ের (রা) ছেলে। তিনি নিজেকে খিলাফতের একজন হকদার মনে করতেন।

মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর ছিলেন প্রথম খলীফা হযরত আবু বকরের ছোট ছেলে এবং উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশার (রা) বৈমাত্রেয় ভাই। এই মুহাম্মাদের মাকে আবু বকরের মৃত্যুর পর আলী (রা) বিয়ে করেন। এ কারণে আলীর (রা) নিকট লালিত-পালিত হন।[১৮৯] আর আলীও তাঁকে ছেলের মত দেখতেন।

---

১৮৮. মুসনাদ-৬/২৬৩
১৮৯. আল-ইসাবা-৩/২৭২

মুহাম্মাদ ইবন আবী হুজায়ফা বেড়ে ওঠেন হযরত উসমানের (রা) তত্ত্বাবধানে। বয়স হলে খলীফা উসমানের নিকট কোন একটি বড় পদের আশা করেন। খলীফা তাঁকে যোগ্য মনে না করায় তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে মদীনা ছেড়ে মিসর চলে যান।

মারওয়ান ও সা'ঈদ ইবন আ'স উভয়ে উমাইয়্যা বংশের দুই নব্য যুবক ছিলেন। উঁচু মর্যাদার অধিকারী মুহাজিরদের ইনতিকালের পর তাঁদের সন্তানরাও খিলাফতের নিকট বহু কিছু প্রাপ্তির আশা নিয়ে এগিয়ে আসেন। হযরত 'উসমান (রা) উমাইয়্যা খান্দানের লোক ছিলেন। তাই তিনি যখনই মারওয়ান ও সা'ঈদ ইবন আসের মত লোকদের উঁচুপদ দান করলেন, তখন কুরাইশ-খান্দানের অন্যসব উচ্চাভিলাষী যুবকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। এ কারণে মুহাম্মাদ ইবন-আবী বকর ও মুহাম্মাদ ইবন আবী হুজায়ফা 'উসমান বিরোধী বিক্ষোভে সবচেয়ে বেশী অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া এই সকল নওজোয়ানের মধ্যে উঁচু স্তরের সাহাবায়ে কিরামের মত সাম্য ও ন্যায়পরায়ণতা, সততা, আমানাতদারি, তাকওয়া ও খোদাভীতি ছিল না। এ কারণে, জনসাধারণ ও সৈনিকদের মধ্যে যাঁরা প্রথম স্তরের সাহাবীদেরকে দেখেছিলেন, তারা এই লোকদের নেতৃত্ব ও শাসনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, আরবরা ছিল চির স্বাধীন। মরু প্রকৃতিতে তারা স্বাধীন আবহাওয়ায় বেড়ে উঠতো। প্রত্যেকেই নিজ নিজ গোত্রের আনুগত্য করতো এবং নিজের গোত্রকে অন্য গোত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতো। ইসলামী সাম্যের আদর্শ তাদের সকল অভিজাত্য ভুলিয়ে দেয় এবং তাদেরকে একই স্তরে নামিয়ে আনে। প্রথম স্তরের সাহাবায়ে কিরাম ইসলামী সাম্যের শিক্ষা সমুন্নত রাখলেও তাঁদের পরবর্তী নতুন প্রজন্মের কর্মকর্তা ও পদাধিকারী ব্যক্তিরা যেমন তা ভুলে বসেন, তেমনি অন্যদেরকেও ভুলিয়ে দেন। তাঁরা প্রকাশ্যে নিজেদের মজলিস ও দরবারে নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতা ও গোত্রীয় আভিজাত্য প্রকাশ করতে শুরু করেন। অন্যান্য আরব গোত্রসমূহ তাঁদের এমন মনোভাব ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। তারা ছিল সম অধিকারের দাবীদার। অন্যদিকে নওমুসলিম অনারব গোষ্ঠী কুরাইশ বা বনু উমাইয়্যা কোন আরব গোত্রেরই শাসন সহ্য করতে পারছিল না। এই জন্য খিলাফতের অভ্যন্তরে যে কোন ধরনের হৈ-হাঙ্গামায় অতি উৎসাহের সাথে তারা অংশগ্রহণ করতো।

আরব-আজমের মিলনস্থলরূপে যে কয়টি শহর চিহ্নিত ছিল তার মধ্যে কুফা অন্যতম। ইসলামী খিলাফতের ফিত্‌নার সূচনা এই শহর থেকেই হয়। এটি ছিল আরব গোত্রসমূহের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। সা'ঈদ ইবনুল আ'স ছিলেন এই কূফার ওয়ালী। রাতের বেলা তাঁর দরবারে সকল গোত্রের সর্দারদের মাজমা বসতো। সাধারণত আরবদের যুদ্ধ বিগ্রহ ও আরব গোত্রসমূহের খান্দানী মর্যাদার তারতম্য বিষয়ে আলোচনা হতো। আর বিষয়টি এমন ছিল যে, কোন গোত্রই অন্য গোত্র থেকে মর্যাদায় খাটো মনে করতো না। অনেক সময় আলোচনা তর্ক-বিতর্ক ঝগড়া-ঝাটি ও মারামারিতে রূপ নিত। এ ক্ষেত্রে সা'ঈদ ইবন 'আসের মুখে নিজেকে কুরাইশ বংশজাত বলে গর্বের

সাথে প্রকাশ করা আগুনে তেল ঢালার মত কাজ করতো। তাঁর এমন কর্মপন্থায় গোত্রীয় নেতাদের অভিযোগ সৃষ্টি হয়। মূলত তা একটি ফিতনার রূপ ধারণ করে।

ঠিক এই সময়ে ইবন সাবা নামক এক ইহুদী মুসলমান হয়। ইহুদীদের নিয়ম হলো, শত্রু হিসেবে যদি শত্রুর ক্ষতি না করতে পারে তাহলে রূপ পাল্টে বন্ধু হয়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে শত্রুর সর্বনাশের চূড়ান্ত করে ছাড়ে। অতীতে খৃস্টধর্মের সাথে তারা এমন আচরণই করেছিল।

এই ইহুদীর সন্তান ইবন সাবা জনগণের মধ্যে এই কথা প্রচার করতে থাকে যে, হযরত আলী (রা) প্রকৃত পক্ষে খিলাফতের হকদার। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর খলীফা হওয়ার ব্যাপারে অসীয়াত করে গিয়েছিলেন। সর্বশক্তি দিয়ে সে তাঁর এই ভ্রান্তবিশ্বাস প্রচার করতে থাকে। খিলাফতের বিভিন্ন ছোটখাট রাজনৈতিক হৈ-চৈকে বাহানা বানিয়ে সে তার ষড়যন্ত্রের জালকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়। সে গোটা খিলাফত চষে ফেলে। কূফা, বসরা, মিসর তথা যেখানে বড় বড় সৈন্য ছাউনী ছিল সেখানে কিছু না কিছু বিপ্লবপন্থী সে তৈরী করে। সে মিসরকে এই বিপ্লবপন্থীদের কেন্দ্র বানিয়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা ব্যক্তিবর্গকে ঐক্যবদ্ধ করে ফেলে। ইতিহাসে এটাকে 'সাবায়ী' আন্দোলন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

খলীফা 'উসমানের (রা) সময়ে আফ্রিকাতেই অধিকাংশ যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছিল। একারণে সেনাবাহিনীর বৃহত্তর অংশ সেখানেই থাকতো। যুদ্ধে অংশগ্রহণের বাহানায় মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর ও মুহাম্মাদ ইবন আবী হুজায়ফা স্বাধীনভাবে সৈন্যদের সাথে মেলামেশার সুযোগ পেতেন এবং তাদের মধ্যে অসন্তোষের বীজ রোপণ করতেন। ফলে অল্প দিনের মধ্যে মিসর উসমান (রা) বিরোধী বিদ্রোহের কেন্দ্রে পরিণত হয়ে ওঠে। আর সেই সময় আবদুল্লাহ ইবন আবী সারাহ মিসরের ওয়ালী ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর, মুহাম্মাদ ইবন আবী হুজায়ফা ও অন্যরা আবদুল্লাহ ইবন আবী সারাহ ও খলীফা উসমানের (রা) বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আন্দোলন শুরু করে দিলেন। এভাবে তাঁরা মিসরে নতুন রাজনৈতিক দলের নেতা পরিণত হলেন।

হজ্জের মওসুম এসে গেল। পারস্পরিক যোগাযোগ ও সিদ্ধান্ত মুতাবিক কূফা, বসরা ও মিসর থেকে এক হাজার মানুষের একটি দল হজ্জের বাহানায় হিজাযের দিকে যাত্রা করলো এবং মদীনার কাছাকাছি এসে শিবির স্থাপন করলো। হযরত আলী (রা) ও অন্য বড় বড় সাহাবীরা তাদেরকে বুঝিয়ে ফিরিয়ে দিলেন। তারা কিছুদূর যেয়ে আবার ফিরে আসে এবং মিসরের গভর্ণরের নিকট লেখা একটি চিঠি দেখায়। তাতে মিসরের গভর্নরের প্রতি খলীফার নির্দেশ ছিল, মিসরী বিদ্রোহীদের নেতৃবৃন্দকে মিসর প্রত্যাবর্তনের পরপরই হত্যা অথবা বন্দী করার। বিদ্রোহীদের ধারণা মতে, এই পত্রখানি ছিল খলীফার সেক্রেটারী মারওয়ানের হাতের লেখা। এ কারণে তারা সমবেতভাবে খলীফা উসমানের (রা) বাড়ী ঘেরাও করে এবং খলীফার নিকট দুইটি প্রস্তাব পেশ করে। হয় তিনি মারওয়ানকে বিদ্রোহীদের হাতে অর্পণ করবেন অথবা তিনি নিজেই পদত্যাগ

করবেন। হযরত উসমান দুইটি প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করেন।

হযরত আয়িশা তখন মদীনায়। তিনি বৈমাত্রেয় ভাই মুহাম্মাদ ইবন আবী বকরকে ডেকে বুঝালেন এবং খলীফার বিরুদ্ধে এমন চরম সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকতে বললেন। কিন্তু তিনি বোনের কথায় কান দিলেন না।

মদীনায় যখন এমন একটি বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজমান, তখন হযরত 'আয়িশা (রা) প্রতিবছরের মত হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় চলে গেলেন। অবশ্য তিনি মুহাম্মাদ ইবন আবী বকরকেও সংগে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে রাজি করাতে পারেননি। তারপর কিছুদিন হযরত উসমান (রা) নিজ গৃহে অবরুদ্ধ থাকেন এবং অবশেষে বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত 'উসমান (রা) বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদাত বরণ করলেন। এখন একজন নতুন খলীফা নির্বাচনের পালা। স্বাভাবিক ভাবেই সকলের দৃষ্টি সেই চারজন জীবিত বিশিষ্ট সাহাবীর প্রতি পড়ার কথা, যাঁরা খলীফা হযরত উমারের (রা) মনোনীত ছয় সদস্যের খলীফা প্যানেলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। তারা হলেন ঃ তালহা, যুবাইর, সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস ও আলী (রা)। এ সময় সা'দ (রা) একেবারেই নিজেকে দূরে সরিয়ে মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে চলে যান। বসরার অধিবাসীরা তালহার (রা) পক্ষ অবলম্বনকারী ছিল। মিসরবাসীদের একাংশ ছিল যুবাইরের (রা) পক্ষে; কিন্তু অপর অংশ এবং বিপ্লবীদের গরিষ্ঠ অংশ ছিল আলীর (রা) পক্ষে। আলীর (রা) সমর্থকদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছিলেন আশতার নাখঈ, আম্মার ইবন ইয়াসির ও মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর (রা)। এমনিভাবে প্রত্যেক দল বা গোষ্ঠী নিজেদের পছন্দনীয় ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতে থাকে। দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমারের (রা) ছেলে আবদুল্লাহ ইবন উমার, তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানের (রা) ছেলে আবান ও প্রথম খলীফা হযরত আবু বকরের (রা) ছেলে আবদুর রহমানের নামটিও প্রস্তাবে আসে। দীর্ঘ আলোচনা, পর্যালোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর বিদ্রোহীদের চাপ ও মদীনাবাসীদের ইচ্ছায় হযরত আলীকে (রা) খলীফা নির্বাচন করা হয়।[১৯০]

মদীনায় যখন এ সকল ঘটনা ঘটছে তখন সিরিয়ায় হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা) স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছেন এবং মুহাম্মাদ ইবন আবী হুজায়ফা মিসরে স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে বসে আছেন। মদীনার পবিত্র ভূমিতে পবিত্র মাসে রাসূলুল্লাহর (সা) খলীফা এবং মুসলিম জাহানের ইমামের এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড সর্বশ্রেণীর মানুষের অন্তরে দারুণ ছাপ ফেলে। পূর্বে যাঁরা হযরত উসমানের (রা) কর্মপদ্ধতির সমালোচক ছিলেন, তারাও এহেন ঘৃণিত কাজের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। হযরত 'আয়িশাও (রা) এই শ্রেণীর লোকদের অন্যতম। এমন বাড়াবাড়ি তাঁদের কেউই চাননি। এই ঘটনার পূর্বে আশতার নাখঈ একদিন আয়িশাকে (রা) জিজ্ঞেস করেছিলেন, উসমানকে (রা) হত্যার ব্যাপারে আপনার মতামত কি? তিনি বলেছিলেন, আল্লাহর পানাহ্! আমি ইমামদের

---

১৯০. ইবনুল আসীর; আল-কামিল ফিত তারীখ-৩/১৯২

ইমামকে হত্যার কথা বলতে পারি? এতেই ফিতনাবাজ লোকেরা রটিয়ে দেয় যে, উসমান (রা) হত্যাকাণ্ডে 'আয়িশারও (রা) সমর্থন ছিল। তাছাড়া, মানুষের এমন ধারণার আরেকটি কারণ ছিল। তা হলো তাঁর ছোট সৎ ভাই মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর (রা) ছিলেন বিদ্রোহীদের অন্যতম নেতা।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি হযরত 'আয়িশা (রা) তাঁর ভাইকে উসমান (রা) বিরোধী হঠকারী কার্যক্রম থেকে বিরত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। হযরত আয়িশা (রা) পরবর্তীকালে একবার হযরত 'উসমানের (রা) আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি কখনও চাইনি যে 'উসমানের (রা) কোন রকম অসম্মান হোক। আমি যদি তা চেয়ে থাকি তাহলে আমারও যেন তেমন হয়। আমি কখনো চাইনি যে, তিনি নিহত হোন। যদি তা চেয়ে থাকি তাহলে আমারও যেন তাঁর মত পরিণতি হয়। হে 'উবাইদুল্লাহ ইবন আদী! (আদী ছিলেন আলীর রা. পক্ষে) একথা জানার পর কেউ যেন তোমাকে ধোঁকা দিতে না পারে। রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের কর্মকাণ্ডকে কেউ ততদিন অসম্মান করতে পারেনি যতদিন তাঁদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়নি। যে উসমানের সমালোচনা করেছে, সে এমন সব কথা বলেছে যা বলা উচিত ছিল না। তারা এমন সব কথা পাঠ করেছে, যা পাঠ করা উচিত ছিল না। এমনভাবে নামায পড়েছে, যা সঙ্গত ছিল না। আমরা তাদের কর্মকাণ্ডকে গভীরভাবে দেখেছি, তাতে বুঝেছি তা সাহাবীদের কর্মকাণ্ডের ধারে কাছেও ছিল না।' ইতিহাস ও সীরাতের গ্রন্থে হযরত আয়িশার (রা) এ জাতীয় এমন অনেক কথা পাওয়া যায়, যা দ্বারা বুঝা যায় উসমান (রা) হত্যার ব্যাপারে তার কোন রকম ভূমিকা ছিল না। তাঁর প্রতি যে দোষারোপ করা হয়েছিল তা ছিল বিদ্রোহীদের একটি অপপ্রচার মাত্র।

মদীনার এই মর্মবিদারী ঘটনায় তৎকালীন গোটা মুসলিম উম্মাহ্ শোকে কাতর হয়ে পড়ে। সাহাবায়ে কিরামের ছোট্ট একটি দল, যাঁরা নিজেদের দেহের রক্ত দিয়ে গড়া উদ্যান তছনছ হতে দেখছিলেন—স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁরা এর একটা দফারফা করার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন। এ দলটির নেতৃত্বে ছিলেন তিনজন মহান সাহাবী ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা, হযরত যুবাইর ও হযরত তালহা (রা)। হযরত তালহা (রা) ছিলেন কুরাইশ খান্দানের লোক এবং প্রথম খলীফা হযরত আবু বকরের (রা) কন্যার স্বামী, ইসলামের আদি পর্বের একজন মুসলমান এবং রাসূলুল্লাহর (সা) আমলে সংঘটিত সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদ। যুবাইর ইসলামের একজন বীর সৈনিক। রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফাতো ভাই এবং প্রথম খলীফার কন্যা হযরত আসমার (রা) স্বামী। উভয়ে ছিলেন দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমারের (রা) মনোনীত খলীফা প্যানেলের অন্যতম সদস্য।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মদীনায় যখন খলীফা 'উসমান (রা) বহিরাগত বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ তখন হযরত 'আয়িশা (রা) প্রতি বছরের অভ্যাসমত হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় চলে যান। হজ্জ শেষ করে মদীনায় ফিরছিলেন, এমন সময় খলীফা

'উসমানের (রা) শাহাদাতের খবর পেলেন। সামনে কিছুদূর অগ্রসর হতেই হযরত তালহা ও যুবাইরের (রা) সাক্ষাৎ পেলেন। তাঁরা খলীফা হযরত আলীর (রা) অনুমতি নিয়ে মদীনা থেকে বেরিয়ে মক্কার দিকে যাচ্ছেন। তাঁরা তখন হযরত 'আয়িশার (রা) নিকট মদীনার আইন-শৃঙ্খলার যে চিত্র তুলে ধরেছিলেন তাবারী সহ বিভিন্ন প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তার কিছু অংশ নিম্নরূপ ঃ[১৯১]

'আমরা মদীনা থেকে বেদুইন ও সাধারণ মানুষের হাত থেকে কোন রকম পালিয়ে এসেছি। আমরা জনগণকে এমন অবস্থায় ছেড়ে এসেছি যে, তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তারা যেমন সত্যকে চিনতে পারছে না, তেমনি মিথ্যাকেও অস্বীকার করতে সক্ষম হচ্ছে না। নিজেদেরকে রক্ষাও করতে পারছেনা।'

হযরত 'আয়িশা (রা) বললেন, এখন আমাদের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ করা উচিত। এ সময় তিনি নিম্নের এ চরণটি আবৃত্তি করেন ঃ

وَلَوْ اَنَّ قَوْمِىْ طَاوَعَتْنِىْ سُرَاتُهُمْ + لاَنَقَذْتُهُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَوِالْخَبَلِ -

–যদি আমার কাওমের নেতারা আমার আনুগত্য করতো তাহলে অবশ্যই আমি তাদেরকে এ বিপদ থেকে বাঁচাতে পারতাম।

তিনি আবার মক্কায় ফিরে গেলেন। খলীফার শাহাদাতের খবর মক্কায় ছড়িয়ে পড়লে চতুর্দিক থেকে মানুষ তাঁর কাছে ছুটে আসতে লাগলো। 'উমরা বিন্‌ত 'আবদির রহমান থেকে বর্ণিত হয়েছে। সে সময় উম্মুল মুমিনীন বলেন ঃ[১৯২] সেই কাওমের (সম্প্রদায়) মত অন্য কোন কাওম নেই যারা নিম্নোক্ত আয়াতের হুকুমকে প্রত্যাখ্যান করে ঃ[১৯৩]

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرَى فَقَاتِلُوْا الَّتِىْ تَبْغِ حَتَّى تَفِيْئَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوْا -

–যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অত ঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দেবে এবং ইনসাফ করবে।

হজ্জের মওসুম ছিল। ঘোষণার সাথে সাথে হারাম শরীফ থেকেই কয়েকশো মানুষ সাড়া

---

১৯১. প্রাগুক্ত-৩/২০৮

১৯২. মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ ঃ বাবুত তাফসীর।

১৯৩. সূরা আল-হুজুরাত-৯

দিল। আবদুল্লাহ ইবন 'আমের বসরা থেকে প্রচুর নগদ অর্থ নিয়ে এসে 'আয়িশার (রা) সাথে যোগ দিল। ই'য়ালা ইবন মুনাইয়্যা ইয়ামন থেকে সাত শো উট ও ছয় লাখ দিরহাম এনে 'আয়িশার (রা) হাতে দিল।[১৯৪] এই বাহিনী কোন্ দিকে যাত্রা করবে তা ঠিক করার জন্য হযরত 'আয়িশার (রা) আবাস গৃহে পরামর্শ বৈঠক বসলো। আয়িশার (রা) মত ছিল মদীনার দিকে যাত্রা করার। কারণ সাবায়ী ও বিদ্রোহীরা সেখানেই অবস্থান করছিল। সেদিন তাঁর এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে ইসলামী উম্মার ইতিহাস হয়তো অন্যরকম হতো। কিন্তু তাঁরা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, উসমানের (রা) রক্তের বদলা গ্রহণের জন্য বসরা ও কূফা থেকে— যেখানে হযরত তালহা ও যুবাইরের (রা) প্রচুর সমর্থক ছিল, সামরিক সাহায্য নেওয়া হবে। অত ঃপর এই কাফেলা মক্কা থেকে বসরার দিকে যাত্রা করে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) তখন মক্কায়। তাঁকেও বসরার দিকে যাওয়ার অনুরোধ করা হলো। 'আমি মদীনার মানুষ, মদীনাবাসীরা যা করে, আমি তাই করবো'— একথা বলে তিনি এই কাফেলার সাথে বসরার দিকে চলতে অস্বীকৃতি জানালেন। অন্যান্য উম্মাহাতুল মুমিনীন— যাঁরা 'আয়িশার (রা) সাথে মদীনায় ফেরার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, কেউ এই কাফেলার সাথে বসরার দিকে গেলেন না। একমাত্র হাফসা (রা) যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) বারণ করায় তিনিও আর গেলেন না। তবে অন্যান্য উম্মাহাতুল মুমিনীন ও মক্কার সাধারণ মানুষ 'জাতুল ইরাক' পর্যন্ত বসরাগামী কাফেলাকে এগিয়ে দেন। তাঁরা সেদিন ইসলামের এমন দুর্দিন দেখে এমন কান্নাকাটি ও মাতম করেছিলেন যে আর কোনদিন তেমন দেখা যায়নি। এ কারণে ইতিহাসে এ দিনটিকে 'ইয়াউমুন নাহীব' বা কান্নার দিন বলা হয়।[১৯৫]

উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) একটি উটের উপর সওয়ার হয়ে কাফেলার সাথে বসরার দিকে চললেন। ইতিহাসের এক মস্তবড় ট্রাজেডির সাক্ষী এই উটের একটু পরিচয় দেওয়া এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে মনে করি। এই উটটি উম্মুল মুমিনীনকে কে দিয়েছিল, সে সম্পর্কে দুই ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। ই'য়ালা ইবন মুনাইয়্যা আশি দীনার দিয়ে খরিদ করে তাঁকে দেন। উটটির নাম ছিল 'আল-আসকার'। মতান্তরে উটটি ছিল 'উরাইনা' গোত্রের এক ব্যক্তির। উরায়নী গোত্রের সেই লোকটি বর্ণনা করেছে ঃ[১৯৬] 'আমি একটি উটে চড়ে চলছি। এমন সময় এক অশ্বারোহী এসে আমাকে বললো ঃ তুমি কি তোমার এ উটটি বেচবে? বললাম ঃ হ্যাঁ, বেচতে পারি। লোকটি বললো ঃ কত দাম? বললাম ঃ এক হাজার দিরহাম। বললো ঃ তুমি কি পাগল? বললাম ঃ কেন? আল্লাহর কসম! এর উপর সোয়ার হয়ে আমি যাকেই ধরতে চেয়েছি, সফল হয়েছি। আর এর পিঠে থাকা অবস্থায় কেউ আমাকে ধরতে পারেনি। সে বললো ঃ তুমি যদি জানতে, উটটি আমি কার জন্য কিনতে চাই। এটা আমি কিনতে চাই উম্মুল মুমিনীন

---

১৯৪. আল-কামিল ৩/২০৭

১৯৫. প্রাগুক্ত-২০৮,২০৯

১৯৬. প্রাগুক্ত-210

'আয়িশার (রা) জন্য। বললাম ঃ তাহলে আমি বিনা মূল্যেই দিলাম। সে বললো ঃ তা হয় না, তুমি বরং আমার সাথে কাফেলার কাছে চলো, আমরা তোমাকে একটি মাদী উট ও অনেক দিরহাম দিব। আমি তার সাথে কাফেলার কাছে গেলাম। তারা আমাকে বিনিময়ে একটি মাদী উট ও চার মতান্তরে ছয় শো দিরহাম দিল।' এই উরানী লোকটিকে পথ প্রদর্শক হিসেবে কাফেলার সাথে নেওয়া হয়।

কাফেলার যাত্রাপথে মানুষ যখন শুনতে পেল, এই বাহিনীর পুরোধা উম্মুল মুমিনীন, তখন বহু লোক অত্যন্ত আবেগ ও উৎসাহের সাথে যোগদান করলো। এভাবে এক মানযিল পথ অতিক্রম করতে না করতে তিন হাজারের একটি বাহিনী তৈরী হয়ে গেল। হযরত উসমানের (রা) গোত্র বনু উমাইয়্যার যুবকদের ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টির জন্য এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর কি হতে পারতো? সে সময়ের পরিস্থিতি তাদের এত প্রতিকূল ছিল যে, চতুর্দিক থেকে তাড়া খেয়ে তারা পালিয়ে মক্কার হারামে এসে জড় হচ্ছিল। হযরত আয়িশার (রা) ঘোষণা ছিল তাদের জন্য এক মহা সুযোগ। তাঁরা সকলে তাঁর বাহিনীর মধ্যে ঢুকে গেল।

বনু উমাইয়্যার সাঈদ ইবনুল 'আস ও মারওয়ান ইবনুল হাকামও কাফেলার সাথে বের হলেন। 'মাররুজ জাহ্রান' মতান্তরে 'জাতু ইরাক' পৌঁছে সাঈদ ইবনুল 'আস তাঁর দলীয় লোকদের বললেন ঃ 'তোমরা যদি উসমান (রা) হত্যার বদলা নিতে চাও তাহলে আগে এই লোকদের হত্যা কর। তাঁর ইঙ্গিত ছিল তালহা, যুবাইর, প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতি। কারণ বনু উমাইয়্যাদের মধ্যে সাধারণভাবে এ ধারণা প্রচলিত ছিল যে, 'উসমানের (রা) হত্যাকারী কেবল তারাই নয় যারা তাকে হত্যা করেছে অথবা তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বাইরে থেকে এসেছে, বরং ঐ সকল ব্যক্তির সকলে তাঁর হত্যাকারীদের মধ্যে পরিগণিত যাঁরা বিভিন্ন সময়ে হযরত উসমানের (রা) কর্মপদ্ধতির সমালোচনা করেছেন এবং তারাও যাঁরা হাঙ্গামার সময় মদীনায় ছিলেন, কিন্তু তাঁকে রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেননি। মারওয়ান বললেন ঃ 'আমরা তাঁদের (তালহা, যুবাইর ও আলী রা.) একজনকে আরেকজনের বিরুদ্ধে লড়াবো। যাঁর পরাজয় হবে, তিনি এমনিই শেষ হয়ে যাবেন। আর যিনি জয়ী হবেন, এত দুর্বল হয়ে পড়বেন যে, অতি সহজেই আমরা তাঁকে কাবু করে ফেলতে পারবো।'[১৯৭]

আসলে বনু উমাইয়্যাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল হযরত আয়িশার (রা) আপোষ-মীমাংসার আহ্বান ও আন্তরিক চেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়া। শুধু তাই নয়, আয়িশার নেতৃত্বে তৃতীয় আরেকটি শক্তির উত্থান হচ্ছে দেখে তাদের অনেকে এই বাহিনীর মধ্যে নানাভাবে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। তারা প্রশ্ন তোলে আলীকে (রা) পরাভূত করার পর তালহা ও যুবাইরের মধ্যে কে খলীফা হবেন? হযরত 'আয়িশা (রা) জানতে পেরে এ প্রপাগাণ্ডা থামিয়ে দেন। তারপর আরেকটি প্রশ্ন তোলা হয়— খিলাফতের ফায়সালা না হয় পরে হবে, কিন্তু এ মুহূর্তে নামাযের ইমাম হবেন কে? হযরত আয়িশা (রা) তালহা ও

---

১৯৭. তাবাকাত-৫/৩৪-৩৫; তারীখে ইবন খালদুন-২/১৫৫; আল-কামিল–৩/২০৯,

যুবাইরের (রা) ছেলেদের নামাযের ইমামতির জন্য একদিন করে নির্ধারণ করে দিয়ে এ ফিতনাও থামিয়ে দেন।

চলার পথে 'হাওয়াব'[১৯৮] নামক জলাশয়ের নিকট পৌছলে এই বিশাল কাফেলা দেখে সেখানকার কুকুর হাঁকডাক আরম্ভ করে দেয়। আয়িশা (রা) জিজ্ঞেস করেন স্থানটির নাম কি? বলা হলো, 'হাওয়াব'। তখন তাঁর স্মরণ হয় রাসূলুল্লাহর (সা) একটি বাণী, একবার তিনি বেগমদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন ঃ 'আল্লাহ্ জানেন তোমাদের মধ্যে কাকে দেখে 'হাওয়াবের' কুকুরগুলি ডাকবে।' এই ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ হতেই হযরত আয়িশা (রা) ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। একদিন একরাত কাফেলা এখানে থেমে থাকে।[১৯৯] অবশেষে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে পঞ্চাশ ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, এটা হাওয়াব নয়। তখন তিনি নিশ্চিন্ত হন। তাছাড়া হযরত যুবাইর তখন বলেন ঃ আপনি ফিরে যাবেন। কিন্তু হতে পারে আল্লাহ তা'য়ালা আপনার দ্বারা এই বিবাদ মীমাংসা করে দেবেন।[২০০] কোন কোন বর্ণনায় কথাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ 'তাঁর (আয়িশার রা.) সঙ্গীদের কেউ কেউ বললেন, পিছনে না ফিরে সামনে অগ্রসর হোন। লোকেরা যখন আপনাকে দেখতে পাবে তখন আল্লাহ্ তাদের মধ্যে একটা মীমাংসা করে দেবেন। সামনে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় আছেন, তখন তাঁকে বলা হলো, আপনি দ্রুত চলুন, পিছন থেকে আলীর (রা) বাহিনী আসছে। এই সকল বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় হযরত আয়িশার (রা) বসরার দিকে চলার উদ্দেশ্য ছিল কেবল ইসলাহ্ ও মীমাংসা।

## কূফা

মক্কা মু'য়াজ্জামা, মদীনা মুনাওয়ারা ও বসরার পরে আরবের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল কূফা। হযরত আবু মূসা আল আশয়ারী (রা) ছিলেন তথাকার ওয়ালী। উভয় পক্ষের প্রতিনিধিরা তাঁর কাছে নিজেদের দাবীর যৌক্তিকতা তুলে ধরে তার সমর্থন কামনা করছিল। মহান সাহাবী হযরত আবু মূসা (রা) এই বিবাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিজের প্রভাবের দ্বারা ও খুতবার মাধ্যমে এর থেকে দূরে থাকার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানালেন। হযরত আয়িশা (রা) কূফার নেতৃবৃন্দের নামে পৃথক পৃথক চিঠি পাঠালেন। এদিকে হযরত আলীর (রা) পক্ষ থেকে হযরত 'আম্মার ইবন ইয়াসির ও ইমাম আল-হাসান (রা) কূফায় পৌঁছলেন। হযরত 'আম্মার (রা) কূফার জামে মসজিদে প্রদত্ত এক ভাষণে তৎকালীন ঘটনাবলী স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। সেই ভাষণে তিনি হযরত আয়িশার (রা) সম্মান ও মর্যাদা বর্ণনার পরে বলেন, এ সব কিছু সঠিক। কিন্তু আল্লাহ্ এ ব্যাপারে তাঁর পরীক্ষা নিচ্ছেন। 'আম্মারের (রা) এ ভাষণ কূফাবাসীদের উপর দারুণ

---

১৯৮. 'আল-হাওয়াব' বসরাগামী পথে আরবের একটি জলাশয়। ইয়াকুত, আল-হামাবী তাঁর 'মু'জামুল বুলদান' গ্রন্থে একথা বলেছেন। আর 'উবাইদ আল-বিক্‌রী তাঁর 'মু'জামু মা ইসতা'জামা' গ্রন্থে বলেছেন ঃ 'আল-হাওয়াব হলো মক্কাগামী পথে বসরার অদূরে অবস্থিত একটি জলাশয়। কুদায়া গোত্রের কালব ইবন ওয়াবরীর কন্যা আল-হাওয়াব-এর নামে নামকরণ করা হয়েছে

১৯৯. আল-কামিল-৩/২১০

২০০. মুসনাদে আহমাদ-৬/৯৭

প্রভাব ফেলে। কয়েক হাজার মুসলমান তাঁর আবেদনে সাড়া দেন। তা সত্ত্বেও কূফাবাসীর মনে এই দ্বিধা ও সংকোচ কাজ করতে থাকে যে, একদিকে রাসূলুল্লাহর (সা) বেগম উম্মুল মুমিনীন, আর অন্যদিকে রাসূলুল্লাহর (সা) কন্যার স্বামী এবং চাচাতো ভাই—এই দুই জনের কার সাথে যাওয়া যেতে পারে।

এ দিকে হযরত 'আয়িশা (রা) বসরার সন্নিকটে পৌঁছে লোক মারফত শহরের আরব নেতৃবৃন্দের প্রত্যেকের নিকট চিঠি পাঠালেন। পরে বসরা পৌঁছে কোন কোন নেতার গৃহেও গেলেন। শহরের একজন নেতা তাঁর আহবানে সাড়া দিচ্ছিলেন না। তিনি নিজে তার গৃহে যেয়ে তাকে বুঝানোর চেষ্টা করেন। সে বললো ঃ 'আমার মায়ের কথা না মানতে পেরে আমার লজ্জা হচ্ছে।'২০১

হযরত আলীর (রা) পক্ষ থেকে তখন বসরার ওয়ালী ছিলেন 'উসমান ইবন হুনাইফ। তিনি প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য ইমরান ইবন হুসাইন ও আবুল আসওয়াদকে পাঠালেন। তাঁরা হযরত আয়িশার (রা) নিকট উপস্থিত হয়ে ওয়ালীর পক্ষ থেকে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চান। 'আয়িশা (রা) তাঁদেরকে বলেন, 'আল্লাহর কসম' আমার মত ব্যক্তিরা কোন কথা গোপন রেখে ঘর থেকে বের হতে পারে না। আর না কোন মা প্রকৃত ঘটনা তার সন্তানদের কাছে লুকাতে পারে।' তারপর তিনি তাদের সামনে মদীনার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন এবং উসমান (রা) হত্যাকারীদের শাস্তিদান ও উম্মাতের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা দিয়েছে তা মিটিয়ে ফেলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সব শেষে তিনি বলেন ঃ২০২ 'তোমাদেরকে ভালো কাজের আদেশ করা এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা আমার কাজ।' তারপর তিনি পাঠ করেন ঃ২০৩

لَاخَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِنْ نَجْوَا هُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَ قَةٍأَوْ مَعْرُوْفٍ أَوْاِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ -

–তাদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শ ভালো নয়; কিন্তু যে সলা-পরামর্শ দান-খয়রাত করতে কিংবা সৎকাজ করতে কিংবা মানুষের মধ্যে সন্ধিস্থাপন কল্পে করতো, তা স্বতন্ত্র।

এই দুই ব্যক্তি হযরত 'আয়িশার (রা) নিকট থেকে উঠে হযরত তালহা ও যুবাইরের (রা) কাছে যান। তাঁদের থেকে বিদায় নিয়ে আবার হযরত আয়িশার (রা) নিকট যান। তখন তিনি বলেন ঃ আবুল আসওয়াদ, তোমার প্রবৃত্তি যেন তোমাকে দোযখের দিকে নিয়ে না যায়। তারপর তাদেরকে এ আয়াতটি পাঠ করে শোনান ঃ২০৪

كُوْنُوْا قَوَّا مِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ -

–তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে।

---

২০১. আল-বিদায়া-৬/২১২; আল-হাকেম-৩/১২০; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা–২/১৭৭

২০২. আল কামিল-৩/২১১

২০৩. সূরা আন-নিসা-১১৪

২০৪. সূরা আল মায়িদা–৮

'আয়িশার (রা) বক্তব্যের প্রভাব এই হলো যে, প্রতিনিধিদ্বয়ের একজন সদস্য— 'ইমরান নিজেকে এই বিবাদ থেকে দূরে সরিয়ে নিলেন এবং বসরার ওয়ালীকেও তাঁর মত করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তিনি বিরত হলেন না; বরং বসরায় হযরত আলীর (রা) পক্ষে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। এদিকে তালহা, যুবাইর ও 'আয়িশা (রা) বক্তৃতা-ভাষণের মাধ্যমে বসরার জনগণকে তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাতে থাকলেন। একদিন এক সমাবেশে তালহা ও যুবাইর (রা) বক্তৃতা করার পর শ্রোতাদের মধ্যে দ্বিধা-সংশয় লক্ষ্য করে হযরত আয়িশা (রা) অত্যন্ত ধীর-স্থীর ও গম্ভীর গলায় হামদ ও না'ত পেশ করার পর নিম্নোক্ত ভাষণটি দান করেন ঃ[২০৫]

'জনগণ উসমানের (রা) কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করতো, তাঁর কর্মকর্তা কর্মচারীদের দোষ-ত্রুটি প্রচার করতো। মানুষ মদীনায় এসে আমাদের কাছে পরামর্শ ও উপদেশ চাইতো। আমরা তাদেরকে সন্ধি ও আপোষ-মীমাংসার যে উপদেশ দিতাম তারা তা মেনে নিত। উসমানের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ ছিল, আমরা সে বিষয়ে গভীরভাবে খতিয়ে দেখে তাঁকে একজন নিষ্পাপ পরহেযগার ও সত্যবাদী ব্যক্তি হিসেবে পেতাম। আর শোরগোলকারীদেরকে দেখতাম তারা পাপাচারী ও ধোঁকাবাজ। তাদের অন্তরে ছিল এক কথা, আর মুখে ভিন্ন কথা। তাদের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পেল তখন তারা বিনা কারণে এবং বিনা দোষে উসমানের (রা) গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। অত ঃপর যে রক্ত প্রবাহিত করা বৈধ ছিল না, তা তারা করেছে, যে ধন-সম্পদ লুটপাট করা সঙ্গত ছিল না, তা করেছে, আর যে পবিত্র ভূমির মর্যাদা রক্ষা করা তাদের উপর ফরজ ছিল, তারা তার অমর্যাদা ও অসম্মান করেছে। সাবধান! এখন যে কাজ করতে হবে এবং যার বিরোধিতা করা উচিত হবে না, তাহলো 'উসমানের (রা) হত্যাকারীদের গ্রেফতার করা এবং শক্তভাবে আল্লাহর হুকুম ও বিধান বলবৎ করা। আল্লাহ বলেছেন ঃ[২০৬]

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ -

-আপনি কি তাদের দেখেছেন, যারা কিতাবের কিছু অংশ পেয়েছে— আল্লাহর কিতাবের প্রতি তাদের আহ্বান করা হয়েছিলো যাতে তাদের মধ্যে মীমাংসা করা যায়। অত ঃপর তাদের মধ্যে একদল তা অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

ইবন 'আবদি রাব্বিহি আল-আন্দালুসী হযরত 'আয়িশার (রা) এ সময়ের একটি ভাষণ তাঁর গ্রন্থে সংকলন করেছেন, যা ভাষা ও বাকশৈলীর দিক দিয়ে অতি চমৎকার। এখানে

---

২০৫. আল-কামিল ৩/২১৩
২০৬. সূরা আলে ইমরান-২৩

তাঁর অনুবাদ দেওয়া হলো ঃ২০৭

'ওহে জনমণ্ডলী! চুপ করুন! চুপ করুন! আপনাদের উপর আমার মায়ের দাবী আছে। আপনাদেরকে উপদেশ দানেরও অধিকার আমার আছে। একমাত্র খোদা-দ্রোহী মানুষ ছাড়া কেউ আমার প্রতি কোন প্রকার দোষারোপ করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সা) আমার বুকে মাথা রেখে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। আমি তাঁর প্রিয়তমা বেগমদের অন্যতম। আল্লাহ পাক অন্য মানুষ থেকে আমাকে সর্বভাবে সংরক্ষণ করেছেন। আমার সত্তা দ্বারা মুমিন ও মুনাফিকের পরিচয় নির্ণিত হয়েছে এবং আমাকে উপলক্ষ্য করে আল্লাহ আপনাদের জন্য তায়াম্মুমের বিধান দান করেছেন।

আমার পিতা এ পৃথিবীর তৃতীয় মুসলমান এবং ছাওর পর্বতের গুহায় দুইজনের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি। তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি 'সিদ্দীক' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় এবং তাঁর গলায় খিলাফতের মালা পরিয়ে ইনতিকাল করেছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর যখন ইসলামের রশি দুলতে থাকে তখন আমার পিতাই তা শক্ত হাতে মুট করে ধরেন। তিনিই নিফাক (কপটতা)-এর লাগাম টেনে ধরেন, ধর্মত্যাগের ঝর্ণা শুকিয়ে ফেলেন এবং ইহুদীদের আগুনে ফুঁ দেওয়া বন্ধ করে দেন। আমরা সেই সময় চোখ বন্ধ করে ধোঁকাবাজি, বিশ্বাসহীনতা ও ফিতনা-ফাসাদের প্রতীক্ষায় ছিলাম।... হাঁ, এখন আমি মানুষের প্রশ্নের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছি। কারণ, আমি বাহিনী নিয়ে বের হয়েছি। আমার এ বের হওয়ার উদ্দেশ্য পাপ ও ফিত্‌নার অনুসন্ধান নয়— যা আমি নিশ্চিহ্ন করতে চাই, যা কিছু আমি বলছি সত্য ও ন্যায়ের সাথে বলছি। আমার ওজর-আপত্তি তুলে ধরা এবং আপনাদেরকে জ্ঞাত করানোর জন্য বলছি। আল্লাহ পাক নবী মুহাম্মাদের (সা) উপর দরূদ ও সালাম নাযিল করুন।'

জনগণ নীরবে মনোযোগ সহকারে তাঁর ভাষণ শুনছিল। তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ প্রতিপক্ষের লোকদের অন্তরেও তীরের ফলার মত গেঁথে যাচ্ছিল। তাদের অনেকে স্বপক্ষ ত্যাগ করে আয়িশার (রা) সেনাক্যাম্পে এসে যোগ দেয়।

বসরায় পৌঁছে হযরত আয়িশা (রা) কূফার ওয়ালী এবং কূফা ও বসরার আশে পাশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট তাঁর এভাবে আগমনের উদ্দেশ্য ও তাদের করণীয় কর্তব্য বর্ণনা করে চিঠি লেখেন। উল্লেখ্য যে, আলী (রা) ও আয়িশা (রা) চূড়ান্ত পর্যায়ের মুখোমুখি— যাকে 'উটের যুদ্ধ' বলা হয়— হওয়ার আগে উভয় পক্ষের লোকদের মধ্যে ছোটখাট অনেক সংঘর্ষ হয় এবং তাতে বহু লোক হতাহত হয়। অবশেষে বসরায় 'আয়িশার (রা) কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ দিকে হযরত আলী (রা) হযরত মুয়াবিয়াকে (রা) নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মদীনা থেকে সিরিয়া যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমন সময় বসরার এই সমাবেশের কথা অবগত হয়ে

---

২০৭. আল-'ইকদুল ফারীদ-৪/১২৮-১২৯, ৩১৪-৩১৫; আহমাদ আবু তাহির ঃ বালাগাতুন নিসা-৭

এর একটা বিহিত ব্যবস্থা করার জন্য সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু বহু সংখ্যক সাহাবী এবং তাদের অনুগামী লোকেরা যারা মুসলমানদের এই গৃহযুদ্ধকে একটি ফিত্‌না বা পরীক্ষা বলে মনে করছিলেন, এ যাত্রায় আলীর (রা) সহগামী হতে রাজি হলেন না।[২০৮] হিজরী ৩৬ সনের রবীউস সানী মাসে হযরত আলী (রা) মদীনা থেকে বসরার দিকে যাত্রা করেন।[২০৯] সেদিন বহু সাহাবীর আলীর (রা) পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন না করার ফল এই হলো যে, সেই 'উসমান (রা) হত্যাকারীরা— যাদেরকে দূরে ঠেলে দেওয়ার জন্য আলী (রা) সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন, তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনীর মধ্যে ঢুকে গেল। যা একদিকে যেমন তাঁর দুর্নামের কারণ হয়ে দাঁড়ালো, তেমনি নানা সমস্যারও।

বসরা শহরের অদূরে যেদিন উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশা (রা) এবং আমীরুল মুমিনীন আলীর বাহিনীদ্বয় পরস্পর মুখোমুখি হয়, সেদিন মুসলিম উম্মাহর প্রতি সহানুভূতিশীল মানুষের বিরাট একটি দল আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালালেন ঈমানদার লোকদের এই দুইটি দলকে সংঘাত-সংঘর্ষ থেকে বিরত রাখার জন্য। তাঁদের চেষ্টায় আপোষ মীমাংসার কথাবার্তা পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একদিকে আলীর (রা) বাহিনীতে উসমান (রা) হত্যাকরীরা বিদ্যমান ছিল— যারা বুঝেছিল, যদি আপোষ-মীমাংসা হয়ে যায় তাহলে তাদের রক্ষা নেই, অন্যদিকে উম্মুল মুমিনীনের বাহিনীতে সেই লোকেরা ছিল, যারা দুইটি দলকে লড়িয়ে উভয়কে দুর্বল করে ফেলতে চাচ্ছিল। এ কারণে সৎ লোকেরা যে যুদ্ধটিকে ঠেকাতে আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন, উভয় পক্ষের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা অপশক্তি ষড়যন্ত্রমূলকভাবে শেষ পর্যন্ত তা বাধিয়ে দিল এবং উটের যুদ্ধ হয়েই গেল।[২১০]

## উটের যুদ্ধ

হযরত আলী (রা) মদীনা থেকে মাত্র সাত শো লোক সংগে করে যাত্রা করেছিলেন। কূফা থেকে আরো সাতহাজার লোক যোগ দেয়। একটি ছোট্ট বাহিনী নিয়ে তিনি বসরায় পৌঁছেন। উভয় বাহিনী রণক্ষেত্রে মুখোমুখি হলো। আরবের প্রতিটি গোত্রের লোক সেদিন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। মুদার গোত্রের এক ভাগ অন্য ভাগের সামনে দাঁড়ায়। এমনিভাবে আযদ সহ অন্য সকল গোত্রও—একাংশ আরেক অংশের বিপক্ষে দাঁড়ায়। সত্যিই সে এক মর্মবিদারী দৃশ্য। সে দিন উভয় দলের, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, প্রতিটি সদস্য ছিলেন সত্যের সিপাহী। প্রত্যেকে দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন যে তারা সত্যের উপর আছেন। কেউই নিজের অবস্থান থেকে বিন্দু মাত্র সরতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কূফার কোন কোন গোত্রের নেতারা তাদের স্বগোত্রীয় বসরী নেতাদের মসজিদে যান এবং তাঁদেরকে এই ঝগড়া থেকে দূরত্ব বজায় রাখার আহ্বান জানান। কিন্তু তাঁরা জবাব

---

২০৮. অল-বিদায়া–৭/২৩৩
২০৯. আল-কামিল-৩/২১৩
২১০. আল বিদায়া-৭/২৩৭

দেয় ঃ 'আমরা কি উম্মুল মুমিনীনকে একাকী ছেড়ে দেব?'

তা সত্ত্বেও উভয় পক্ষের লোকদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ব্যাপারটি যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াবে না। একটা নিষ্পত্তি শেষ পর্যন্ত হয়ে যাবে। একজন গোত্রীয় নেতা হযরত আলীর (রা) নিকট যেয়ে একটা আপোষ-মীমাংসায় পৌঁছার জন্য তাকিদ দিলেন। তিনি তো প্রথম থেকেই রাজি ছিলেন। আলীর (রা) নিকট থেকে উঠে উক্ত নেতা তালহা, যুবাইর ও আয়িশার (রা) নিকট গেলেন। তিনি উম্মুল মুমিনীনকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'উম্মুল মুমিনীন! এই কর্মকাণ্ডে আপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? বললেন ঃ উসমানের (রা) হত্যাকারীদের শাস্তি দান এবং আপোষ-মীমাংসার আহ্বান। গোত্রীয় নেতা বললেন ঃ উম্মুল মুমিনীন! একটু ভেবে দেখুন তো, পাঁচ শো মানুষের শাস্তির জন্য পাঁচ হাজার মানুষের রক্ত ঝরিয়েছেন এবং পাঁচ হাজারের জন্য আপনাকে হাজার হাজার মানুষের রক্ত ঝরাতে হবে। এ কেমন ইসলাহ্ ও সংশোধন হলো?' লোকটির বক্তব্য এত স্পষ্ট ও শক্তিশালী ছিল যে, উম্মুল মুমিনীন নিরুত্তর হয়ে গেলেন। তিনি আপোষ করতে রাজি হলেন এবং সবাই মিলে সিদ্ধান্তে এসে গেলেন।[২১১]

এখন উভয় পক্ষ নিশ্চিন্ত। যুদ্ধ-বিগ্রহের চিন্তা তাদের অন্তর থেকে দূর হয়ে গেল। সবকিছু ঠিকঠাক মত নিষ্পত্তির ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ থাকলো না। কিন্তু উভয় পক্ষের মধ্যে বিদ্যমান দুষ্কৃতিকারীরা দেখলো, যদি আপোষ-মীমাংসা হয়ে যায় তাহলে তাদের বিপদের অন্ত নেই। তাছাড়া তাদের বহু বছরের পরিকল্পনা ও চেষ্টা সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তারা তখন সক্রিয় হয়ে উঠলো। সাবায়ী দলের বিরাট একটি সংখ্যা আলীর (রা) পক্ষে ছিল। আলাপ-আলোচনার পর উভয় দলের লোকেরা যখন রাতের শেষ প্রহরে ঘুমিয়ে ছিল তখন এই সাবায়ীরা আক্রমণ করে বসলো। এই কিছু সংখ্যক পাপাত্মা হঠাৎ করে চতুর্দিকে আগুন জ্বালিয়ে দিল। ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে প্রত্যেকে নিজের অস্ত্রটি হাতে তুলে নিল। প্রত্যেক গ্রুপ ও দলের নেতারা বিশ্বাস করলো, প্রতিপক্ষ তাদের নিদ্রার সুযোগে চুক্তি ভঙ্গ করে আক্রমণ করে বসেছে। হযরত আলী (রা) লোকদের থামাতে প্রাণপণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন।

সকাল পর্যন্ত এ হৈ হাঙ্গামা চলতে থাকে। হৈ চৈ শুনে হযরত আয়িশা (রা) জিজ্ঞেস করেন ঃ কি হয়েছে? জানতে পারলেন, লোকেরা যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। বসরার কাজী কা'ব ইবন সুওয়ার হযরত আয়িশার (রা) নিকট এসে বললেন, আপনি উটের পিঠে চড়ে চলুন। হতে পারে লোকেরা আপনার মাধ্যমে সন্ধি করে নেবে।[২১২] তিনি লোহার তৈরী হাওদা উটের পিঠে বেঁধে তাঁর মধ্যে বসে সৈন্যবাহিনীর মাঝ বরাবর চলে আসেন। এদিকে হযরত আলী (রা) তাঁর প্রতিপক্ষ হযরত তালহা ও হযরত যুবাইরকে ডেকে আনেন। এই তিন মহান সাহাবী ঘোড়ার উপর বসা অবস্থায় কিছুক্ষণ এক স্থানে অবস্থান করেন। বদর-উহুদের সহযোদ্ধাত্রয়ীর আজ এমন অবস্থান! সত্যি সে এক পীড়াদায়ক

---

২১১. তাবারী-৬/৩১৮২
২১২. প্রাগুক্ত-৬/৩১৮৮

দৃশ্য। আলী (রা) তাঁদের দুইজনকে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁদেরও স্মরণ হলো। সাথে সাথে যুবাইর (রা) যুদ্ধের ইচ্ছা অন্তর থেকে মুছে ফেলেন। ছেলে আবদুল্লাহ পাশেই ছিলেন। তিনি পিতাকে ভীরু, কাপুরুষ বলে তিরস্কার করেন। যুবাইর জবাব দেন, লোকে জানে আমি ভীরু নই। তবে আলী (রা) আমাকে একটি কথা স্মরণ করে দিয়েছে, যা আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি। আমি শপথ করছি, তাঁর বিরুদ্ধে আমি আর লড়বো না।[২১৩]

তিনি ঘোড়ার লাগামে টান দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে রণক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে মদীনার দিকে যাত্রা করেন। ইবন জুরমূয নামক এক সাবায়ী তাকে অনুসরণ করে এবং পথিমধ্যে সে নামাযে সিজদারত অবস্থায় তরবারির এক আঘাতে তাঁর দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

হযরত তালহাও (রা) রণক্ষেত্র থেকে সরে পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি উমাইয়্যা গোত্রের মারওয়ানের দৃষ্টিতে পড়ে যান। সে বুঝেছিল, যদি তালহা জীবিত ফেরে তাহলে উমাইয়্যা খান্দানের প্রতিষ্ঠা কঠিন হবে। সে তাঁকে তাক করে একটি বিষাক্ত তীর ছোড়ে। তীরটি তাঁর পায়ে বেধে। কোনভাবেই রক্ত পড়া বন্ধ করা গেল না। এই আঘাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। এদিকে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) কা'ব ইবন সুওয়ারকে ডেকে তাঁর হাতে নিজের কুরআনের কপিটি দিয়ে বলেন, যাও এটি দেখিয়ে মানুষকে আপোষ-মীমাংসার আহ্বান জানাও। তিনি কুরআন খুলে উভয় দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলেন। দুষ্কৃতিকারীরা দূর থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে তীর ছোঁড়ে। ফলে তিনিও শাহাদাত বরণ করেন।

দুপুর হয়ে গেল। আক্রমণ ছিল অতর্কিত। হযরত আয়িশার (রা) বাহিনীর অধিনায়করা শেষ পর্যন্ত এই ফিতনা থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে নিলেন। একারণে তাঁর বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়লো। এই যুদ্ধের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, উভয় পক্ষের গরিষ্ঠ অংশের বিশ্বাস ছিল, প্রতিপক্ষ আমাদের মুসলিম ভাই। এ কারণে, প্রত্যেকে তার প্রতিপক্ষের হাত পা বা অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আঘাত করার চেষ্টা করছিল। সবাই চেষ্টা করছিল যাতে মাথা ও বুকে আঘাত না লাগে। উদ্দেশ্য; হাত-পা কাটা গেলেও যাতে জীবনে বেঁচে থাকে। তারা আন্তরিকভাবে কামনা করছিল, যুদ্ধ বন্ধ হোক। রণক্ষেত্রের বিভিন্ন স্থানে সৈনিকদের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হাত-পায়ের স্তূপ হয়ে গিয়েছিল।

সাবায়ীদের বাসনা ছিল, 'আয়িশাকে (রা) হাতের মুঠোয় পেলে চরমভাবে অবমাননা করা হবে। সুতরাং হযরত তালহা ও যুবাইরের (রা) শাহাদাতের পর কূফাবাসীরা তাঁর উপর আক্রমণের লক্ষ্যে এগিয়ে আসে।[২১৪] হযরত আয়িশার (রা) বাহিনীর লোকেরাও চতুর্দিক থেকে গুটিয়ে এসে তাঁকে কেন্দ্র করে একটি বেষ্টনী রচনা করে ফেলে। মুসলিম উম্মার মায়ের সম্মান ও মর্যাদার হিফাজতের জন্য আরবের বিভিন্ন অঞ্চল ও

---

২১৩. আজ-জাহাবী ঃ তারীখুল ইসলাম-২/১৫০
২১৪. তারাবী-৬/৩১৯৩

গোত্রের হাজার হাজার সন্তান সেদিন প্রতিপক্ষের নিক্ষিপ্ত অগণিত তীর-বর্শার সামনে বুক টান করে দাঁড়িয়ে যায়। উম্মুল মুমিনীনের উটটি একই স্থানে দাঁড়িয়ে ছিল। চতুর্দিক থেকে নিক্ষিপ্ত তীর-বর্শা এসে আঘাত করছিল তাঁর বর্ম আচ্ছাদিত হাওদায়। সন্তানেরা ডানে-বামে, সামনে-পিছন থেকে আক্রমণ প্রতিহত করে চলছিল। তখন তাদের অনেকের মুখে এ দুইটি চরণ উচ্চারিত হচ্ছিল ঃ[২১৫]

يَا أُمَّنَا يَا خَيْرَ أُمٍّ نَعْلَمُ + أَمَا تَرَيْنَ كَمْ شُجَاعٍ يُكْلَمُ

وَتَخْتَلِي هَامَتُهُ وَالْمِعْصَمُ -

–হে আমাদের মা, হে আমাদের সেই মা— যাঁকে আমরা সর্বোত্তম বলে জানি! আপনি কি দেখছেন না, কত বীর সন্তানকে আহত করা হচ্ছে এবং তাদের হাত ও মাথা কাটা যাচ্ছে?

এখন চতুর্দিক থেকে এ আওয়ায উঠতে লাগলো যে, যতক্ষণ না উম্মুল মুমিনীনের উটটি আঘাত করে বসিয়ে দেওয়া যাবে, এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান হবে না। বনু দাব্বা উটের চতুর্দিকে একটা বেষ্টনী করে রেখেছিল। কেউ উটের দিকে এগোনোর চেষ্টা করলেই তাকে তারা জীবিত ছেড়ে দিচ্ছিল না। তারা তখন একটা আবেগ ও উত্তেজনাপূর্ণ সংগীত গেয়ে চলছিল। তার তিনটি শ্লোক নিম্নরূপ ঃ[২১৬]

نَحْنُ بَنُو ضَبَّةَ أَصْحَابُ الْجَمَلِ + اَلْمَوْتُ أَحْلَى عِنْدَنَا مِنَ الْعَسَلِ

نَحْنُ بَنُو الْمَوْتِ إِذَا الْمَوْتُ نَزَلْ + نَنْعِي ابْنَ عَفَّانَ بِأَطْرَافِ الأَسَلْ

رُدُّوْا عَلَيْنَا شَيْخَنَا ثُمَّ بَجَلْ -

–'আমরা দাব্বার সন্তান, এই উটের রক্ষক। মৃত্যু আমাদের নিকট মধুর চেয়ে মিষ্টি।

–আমরা মৃত্যুর সন্তান–মৃত্যু যখন আসে। আমরা 'আফফানের ছেলে 'উসমানের মৃত্যুর ঘোষণা নিযার ফলার সাহায্যে করি।

–তোমরা আমাদের নেতাকে ফিরিয়ে দাও, তাহলে তোমাদের সাথে কোন দ্বন্দ্ব নেই।'

আবেগ ও উত্তেজনা এমন প্রবল ছিল যে, বনু দাব্বার একজন একজন করে এগিয়ে গিয়ে উটের লাগাম ধরছিল, প্রতিপক্ষের আঘাতে তার হাত বিচ্ছিন্ন হলে অন্য একজন ছুটে এসে লাগামটি মুঠ করে ধরছিল। এ ভাবে একই স্থানে উটের লাগাম ধরা অবস্থায় ৭০ (সত্তর) ব্যক্তির হাত বিচ্ছিন্ন হয়।[২১৭] এমনিভাবে উম্মুল মুমিনীনের প্রতিপক্ষের যে কোন হাত সে দিন উটের লাগামের প্রতি বাড়ানো হয়েছিল, তা আর আস্ত ফিরিয়ে নিতে পারেনি। হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা) নিকটেই দাঁড়ানো ছিলেন। তিনি বলেন ঃ

---

২১৫. আল-কামিল-৩/২৫০

২১৬. ইবনুল আসীর ঃ আল-কামিল ফিত-তারীখ-৩/২৪৯

২১৭. শাজারাতুজ জাহাব-১/৪৩

কর্তিত হাত যেন তখন বাতাসে উড়ছিল। এ দৃশ্য দেখে হযরত 'আলী (রা) ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে আসেন। আশতার আন-নাখঈ, আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের কাছে পৌঁছে গেলেন। দুইজনই ছিলেন সাহসী বীর পুরুষ। উভয়ের মধ্যে অসির যুদ্ধ শুরু হলো। দুইজন আহত হলেন। এ অবস্থায় একে অপরকে জড়িয়ে ধরলেন। ইবন যুবাইর (রা) চেঁচিয়ে বলে উঠলেন ঃ[২১৮]

اُقْتُلُوْنِىْ وَمَالِكًا، اُقْتُلُوْا مَالِكًا مَعِىْ -

অর্থাৎ, মালিক ও আমাকে মেরে ফেল। আমার সাথে মালিককেও হত্যা কর।

পরবর্তীকালে আশতার নাখ'ঈ বলতেন ঃ লোকেরা আমাকে মালিক নামে জানতো না, তাই সে দিন রক্ষা পেয়েছিলাম। অন্যথায় আমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলতো।

বনু দাব্বার কিছু লোক আলীর (রা) পক্ষেও ছিলেন। তাঁরা দেখলেন উট যদি তাঁদের দৃষ্টির আড়ালে না আনা যায় তাহলে যেভাবে লোক মারা যাচ্ছে তাতে তাঁদের গোত্র নির্মূল হয়ে যাবে। এমন চিন্তা মাথায় আসার পর দাব্বা গোত্রের 'বুজাইর ইবন দালজা' নামক এক ব্যক্তি পিছন দিক থেকে এসে উটের পায়ে তরবারির এমন আঘাত হানেন যে, উট হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ে। আর সাথে সাথে উটকে কেন্দ্র করে 'আয়িশার (রা) পক্ষে যাঁরা লড়ছিলেন, তারা সরে গেলেন। আলীর (রা) নির্দেশে 'আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) ও মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর ছুটে গিয়ে হাওদাটি ধরে ফেলেন। হাওদা সোজা করে মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর (রা) হাওদার অভ্যন্তরে হাত ঢুকিয়ে দেখতে যান যে, বোন 'আয়িশা (রা) কোন রকম আঘাত পেয়েছেন কিনা। হাত দেখেই 'আয়িশা (রা) গর্জে ওঠেন ঃ এ কোন মাল'উনের (অভিশপ্ত) হাত? মুহাম্মাদ জবাব দেন ঃ বোন! আপনার ভাই মুহাম্মাদ। আপনি কোন আঘাত পাননি তো? 'আয়িশা বলেন ঃ না, তুমি মুহাম্মাদ (প্রশংসিত) নও, তুমি মুজাম্মাম (নিন্দিত)। অন্য একটি বর্ণনা মতে 'আয়িশা প্রশ্ন করেন ঃ কে? মুহাম্মাদ বলেন ঃ আপনার অনুগত ভাই। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ তুমি অনুগত নও, বরং অবাধ্য। মুহাম্মাদ প্রশ্ন করেন ঃ বোন! আপনি কি কোন আঘাত পেয়েছেন? আয়িশা (রা) জবাব দেন ঃ তাতে তোমার কি ?

এরই মধ্যে হযরত আলী (রা) উটের কাছে এসে হাজির হলেন। তিনি জানতে চাইলেন ঃ আম্মা, আপনি কেমন আছেন? আয়িশা (রা) বললেন ঃ ভালো আছি। আলী (রা) বললেন ঃ আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। 'আয়িশা বললেন ঃ আল্লাহ আপনাকেও ক্ষমা করুন।[২১৯]

হযরত 'আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) কাছেই ছিলেন। তিনি বললেন ঃ মা, আপনার সন্তানদের এ লড়াই কেমন দেখলেন? 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ আমি তোমার মা নই। 'আম্মার (রা) বললেন ঃ আপনার পছন্দ না হলেও আপনি আমার মা। 'আয়িশা (রা)

---

২১৮. আল-কামিল-৩/২৫১
২১৯. প্রাগুক্ত-৩/২৫৪

বললেন ঃ বিজয়ী হয়েছো বলে গর্ব করছো। যেভাবে বদলা নিয়েছো তাই সংগে নিয়ে এসেছো। জেনে রাখ, যাদের আচরণ এমন হয় তারা কখনও বিজয়ী হতে পারে না।

'আউন ইবন দুরাইয়া আল-মাজাশি' নামক এক ব্যক্তি এসে হাওদার মধ্যে উঁকি মারতে থাকে। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ সরে যাও। তোমার উপর আল্লাহর অভিশাপ। লোকটি বলে ঃ আমি শুধু হুমায়রাকে এক নজর দেখতে চাই। হযরত আয়িশা (রা) তখন লোকটির প্রতি অভিশাপ দিয়ে বলেন ঃ 'আল্লাহ্ তোমার আবরু-ইজ্জত উন্মুক্ত করুন, তোমার হাত বিচ্ছিন্ন করুন এবং তোমার লজ্জাস্থান প্রকাশ করুন।' পরে লোকটি বসরায় নিহত হয়। তার সকল জিনিসপত্র লুণ্ঠিত হয়। হাত-পা কর্তিত ও উলঙ্গ অবস্থায় আয্দ গোত্রের একটি বিরান ভূমিতে তার লাশটি পাওয়া যায়।[২২০]

হযরত আলী (রা) মুহাম্মাদ ইবন আবী বকরের নেতৃত্বে উম্মুল মুমিনীনকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে তাঁরই পক্ষাবলম্বনকারী বসরার এক নেতা— আবদুল্লাহ্ ইবন খালাফ আল-খুযা'ঈ-এর গৃহে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। হযরত 'আয়িশার (রা) বাহিনীর আহত সৈনিকরা সেই বাড়ীর ঘর ও বাইরের প্রতিটি স্থানে আশ্রয় নিয়েছিল। অত ঃপর হযরত আলী (রা), হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) ও আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উম্মুল মুমিনীনের সাথে সাক্ষাৎ করতে সেখানে যান। হযরত আলী (রা) উম্মুল মুমিনীনকে সালাম করেন এবং কিছুক্ষণ তাঁর পাশে অবস্থান করেন। হযরত আলী (রা) জানতেন যে, এই বাড়ীতে প্রতিপক্ষের আহত সৈনিকরা আশ্রয় গ্রহণ করেছে। কিন্তু তিনি সে বিষয়ে কোন কথা উচ্চারণ করলেন না।[২২১]

উম্মুল মুমিনীন কয়েকদিন বসরায় অবস্থান করেন। তারপর হযরত আলী (রা) যথাযোগ্য মর্যাদায় ও সম্মানের সাথে মুহাম্মাদ ইবনে আবী বকরের (রা) তত্ত্বাবধানে চল্লিশজন সম্ভ্রান্ত বসরী মহিলা সমভিব্যাহারে তাঁর হিজাযে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। বারো হাজার দিরহামও সাথে দিয়ে দেন।[২২২] হযরত আলী (রা) সহ অসংখ্য সাধারণ মুসলমান বহুদূর পর্যন্ত তাঁদেরকে এগিয়ে দেন। ইমাম হাসান (রা) বহু মাইল পথ সেই কাফেলার সাথে চলেন। হিজরী ৩৬ সনের ১লা রজব শনিবার উম্মুল মুমিনীন বসরা থেকে যাত্রা করেন।[২২৩] যাত্রাকালে জনগণকে তিনি বলেন ঃ 'আল্লাহর কসম, একজন নারীর তার জামাইদের সাথে যে রকম সম্পর্ক থাকে, তাছাড়া অন্য কোন বিদ্বেষমূলক সম্পর্ক তাঁর (আলী) ও আমার মধ্যে অতীতে ছিল না। আমার জানা মতে তিনি সৎলোকদের একজন।' জবাবে আলী (রা) বলেন ঃ 'ওহে জনমণ্ডলী! তিনি সত্য বলেছেন। আমার ও তাঁর মাঝে কোন রেষারেষি নেই। তিনি আপনাদের নবীর স্ত্রী— দুনিয়া ও আখিরাতে।'[২২৪]

---

২২০. প্রাগুক্ত-৩/২৫৫
২২১. প্রাগুক্ত
২২২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৭৮
২২৩. আল-কামিল-৩/২৫৮
২২৪. প্রাগুক্ত-৩/২৫৯; তারীখুল উম্মাহ আল-ইসলামিয়্যা-২/৫৭-৫৮

হযরত 'আয়িশা (রা) বসরা থেকে সোজা মক্কা মুকাররামায় চলে যান। পরবর্তী হজ্জ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। তারপর মদীনায় ফিরে যান এবং আজীবন সেখানেই বসবাস করেন। পরিশুদ্ধির যে পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করেন, সারা জীবন তার জন্য আফসোস করেছেন।[২২৫] ইবন সা'দ বর্ণনা করেছেন, হযরত 'আয়িশা (রা) বলতেন ঃ হায়, যদি আমি বৃক্ষ হতাম, হায়, যদি আমি পাথর হতাম, হায়, যদি আমি কিছুই না হতাম।[২২৬] এই কথা দ্বারা তাঁর আফসোসের পরিমাণ অনুমান করা যায়।

একবার বসরার অধিবাসী এক ব্যক্তি 'আয়িশার (রা) সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে। 'আয়িশা (রা) তাকে প্রশ্ন করেন ঃ তুমি কি আমাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলে? লোকটি জবাব দিল ঃ হাঁ। 'আয়িশা (রা) প্রশ্ন করেন ঃ তুমি কি সেই ব্যক্তিকে চেন, যে সেদিন এই চরণটি আবৃত্তি করেছিল ঃ يَا أُمَّنَا يَا خَيْرَ أُمٍّ نَعْلَمُ -

লোকটি বললো ঃ সে তো আমার ভাই। বর্ণনাকারী বলেছেন যে, এরপর হযরত 'আয়িশা (রা) এত কাঁদলেন যে, আমার মনে হলো এ কান্না যেন আর থামবে না। ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন, মৃত্যুর সময় তিনি অসীয়াত করেন যে, আমাকে রাসূলুল্লাহর (সা) কবরের পাশে দাফন করবে না। বাকী' গোরস্তানে রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য স্ত্রীদের সাথে দাফন করবে।[২২৭] ইবন সা'দ বর্ণনা করেছেন। 'আয়িশা (রা) মৃত্যুর সময় বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) পরে একটি নতুন কাজ করেছি। সুতরাং তোমরা আমাকে রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীদের সাথে দাফন করবে।[২২৮] একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যখন আয়াত[২২৯] وَقَرْنَ فِى بُيُوْتِكُنَّ -

(তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে) তিলাওয়াত করতেন তখন এত কাঁদতেন যে, চোখের পানিতে আঁচল ভিজে যেত।[২৩০] উটের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হযরত 'আয়িশা (রা) আল-কা'কা' ইবন 'আমরকে বলেছিলেন ঃ 'আল্লাহর কসম! আমি যদি আজকের এদিনটির আরো বিশ বছর পূর্বে মারা যেতাম, তাহলে কতনা ভালো হতো।' আর সে কথা শুনে আলীও (রা) ঠিক একই রকম মন্তব্য করেছিলেন।[২৩১]

হিজরী ৩৬ সনের ১০ই জামাদি-উস-সানী বৃহস্পতিবার ভোর থেকে আসর পর্যন্ত উটের যুদ্ধ হয়।[২৩২] এ যুদ্ধে আহতের সংখ্যা অগণিত। নিহতের সংখ্যা কত, সে ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতভেদ আছে। ইবনুল ইমাদ-আল-হাম্বলী তাঁর 'শাজারাতুজ জাহাব' গ্রন্থে তেত্রিশ হাজার, মতান্তরে সতেরো হাজার উল্লেখ করেছেন। তবে ইবনুল

---

২২৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৭৭
২২৬. তাবাকাত-৮/৭৪, ৭৫, ৭৬; আজ-জাহাবী; তারীখ-২/২৯৮
২২৭. বুখারী ঃ কিতাবুল জানায়িয,
২২৮. তাবাকাত-৮/৭৪
২২৯. সূরা আল-আহযাব-৩৩
২৩০. তাবাকাত-৮/৮১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৭৭
২৩১. আল-কামিল-৩/২৫৪
২৩২. শাজারাতুজ জাহাব-১/৪৩

আসীরসহ অধিকাংশ ঐতিহাসিক দশহাজার উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে অর্ধেক আলীর (রা) ও অর্ধেক 'আয়িশার (রা) পক্ষের। ইবনুল আসীর আরো উল্লেখ করেছেন একমাত্র বনু দাব্বার এক হাজার লোক নিহত হয় এবং উটের পাশেই শুধু বনী 'আদীর সত্তর (৭০) ব্যক্তির লাশ পাওয়া যায়।[২৩৩] এই যুদ্ধে ইসলামের এমন অনেক বীর পুরুষ শাহাদাত বরণ করেন, যাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ হাতে গড়ে তোলেন এবং যারা ছিলেন ইসলামের অতি পরীক্ষিত সন্তান। তালহা (রা), যুবাইর (রা) প্রমুখ তাঁদের অন্যতম। তাঁদের মৃত্যুতে মুসলিম উম্মার অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল।

রণক্ষেত্রে হযরত 'আয়িশার (রা) উট বসে যাওয়ার পর হযরত আলী (রা) একজন ঘোষককে এই ঘোষণা দানের নির্দেশ দেন ঃ 'কেউ কোন পলায়নকারীকে ধাওয়া করবে না, কোন আহত সৈনিকের মালামাল লুট করবে না এবং কোন সৈনিক কোন গৃহে প্রবেশ করবে না। বিশেষতঃ নারীদের ব্যাপারে তিনি নির্দেশ দেন এভাবে ঃ[২৩৪]

ولا تهتكنّ سترا ولا تدخلن داراولا تهيجن إمرأة بأذى وإن شتمن أعراضكم سفهن أمراءكم وصلحاءكم، فان النساء ضعيفات، ولقد كنا نؤمر بالكف عنهن وهن مشر كات، فكيف إذهن مسلمات؟

–'তোমরা অবশ্যই কারো ইজ্জত-আবরু উন্মুক্ত করবে না, কোন গৃহে প্রবেশ করবে না, কোন নারীর উপর চড়াও হবে না–যদিও সে তোমাদের মান-মর্যাদা, তোমাদের নেতা ও সৎ লোকদের নিয়ে উপহাস ও গালিগালাজ করে। নারীদের উপর হাত তুলতে (রাসূলুল্লাহর সা. সময়) আমাদেরকে নিষেধ করা হতো— যখন সেই নারীরা ছিল মুশরিক। তাহলে এখন এই মুসলিম নারীদের উপর হাত তোলা যায় কিভাবে?'

যুদ্ধ শেষে আলী (রা) ময়দানে পড়ে থাকা লাশের মধ্যে ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন এবং পরিচিত লাশের কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর পক্ষের হোক বা 'আয়িশার (রা) পক্ষের—দুঃখ প্রকাশ করছিলেন। তারপর উভয় পক্ষের সকল লাশ একস্থানে জমা করার নির্দেশ দিলেন। তিনি ইমাম হয়ে সকলের জানাযার নামায পড়ালেন এবং বড় বড় কবর খুঁড়ে এক সাথে অনেকের দাফনের ব্যবস্থা করলেন। তিনি হযরত তালহা ইবন 'উবাইদুল্লাহর (রা) লাশের কাছে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করেন ঃ

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

তারপর বলেন ঃ 'আল্লাহর কসম! কোন কুরাইশকে এভাবে পড়ে থাকা আমি পছন্দ করতাম না।' তারপর তিনি সৈনিকদের পরিত্যক্ত জিনিস সংগ্রহ করে বসরার মসজিদে জমা করার নির্দেশ দেন এবং ঘোষণা করেন যে, 'শুধু অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া প্রত্যেকেই নিজ

২৩৩. আল-কামিল-৩/২৫৫, ২৫৬
২৩৪. প্রাগুক্ত-৩/২৫৭

নিজ জিনিস সেখান থেকে নিয়ে যেতে পারে। অস্ত্র-শস্ত্র কোষাগারে জমা হবে।'[২৩৫]

যুদ্ধের পরে হযরত আয়িশা (রা) উভয় দলের কে কে নিহত হয়েছে তা জানতে চাইতেন। যখন বলা হতো অমুক নিহত হয়েছে, বলতেন— يَرْحَمُهُ اللّٰهُ ـ (আল্লাহ তার প্রতি করুণা বর্ষণ করুন!)। এই যুদ্ধে নিহতদের সম্পর্কে হযরত আলী বলতেন ঃ[২৩৬]

إِنِّىْ لاَرْجُوْ اَنْ لاَ يَكُوْنَ اَحَدُ نَقِىٌّ قَلْبُهُ لِلّٰهِ مِنْ هٰؤُلاَءِ اِلاَّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ ـ

–'আমি অবশ্যই আশা করি এই লোকদের মধ্যে যার অন্তর আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ ছিল তারা সবাই জান্নাতে যাবে।'

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, কিছু বিকৃতমনা মানুষের ধারণা, উটের যুদ্ধের মূল কারণ হলো, আলীর (রা) প্রতি হযরত 'আয়িশার (রা) একটি পুরানো ক্ষোভ ও বিদ্বেষ। ইফ্‌কের ঘটনায় আলী (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) বলেছিলেন, 'আপনি ইচ্ছা করলে তাঁকে পরিত্যাগ করতে পারেন'। মূলত ঃ তখন থেকেই হযরত 'আয়িশা (রা) আলীর (রা) প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন। আর তারই পরিণতি এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। কিন্তু আমাদের সামনে হাদীস ও ইতিহাসের যে সকল তথ্য রয়েছে, তাতে এমন ধারণা পোষণের কোন অবকাশ নেই। এটা সম্পূর্ণ অমূলক ধারণা। ইতিহাসে এমন বহু তথ্য রয়েছে যাতে বিপরীত চিত্রটিই ফুটে ওঠে। দীর্ঘ হয়ে যাবে বিধায় এখানে আমরা তা উল্লেখ করলাম না। ইতিহাসের সকল তথ্য পর্যালোচনা করলে এই প্রত্যয় জন্মে যে, উটের যুদ্ধটি একটি আকস্মিক ঘটনা। মুষ্টিমেয় ষড়যন্ত্রকারী ছাড়া উভয় পক্ষের সকলেই ছিলেন সম্পূর্ণ নিরপরাধ। সংঘাত ও সংঘর্ষের উদ্দেশ্যে 'আয়িশা (রা) যেমন বসরায় যাননি, তেমনি 'আলীও (রা) এমনটি আশা করেননি।এক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র পূর্ণমাত্রায় সফল হয়েছে।

হযরত আলীর (রা) খিলাফতের সময়কাল ছিল মাত্র চার বছর। তারপর হযরত আমীর মু'য়াবিয়া খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী বিশ বছর যাবত গোটা ইসলামী দুনিয়ার একক শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর খিলাফতকাল শেষ হওয়ার দুই বছর পূর্বে হযরত 'আয়িশা (রা) ইনতিকাল করেন। হযরত মুয়াবিয়ার (রা) শাসনকালে তিনি জীবনের আঠারোটি বছর অতিবাহিত করেন। দুই একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া এই দীর্ঘ সময় সম্পূর্ণ নীরবে অতিবাহিত করেন।

একবার হযরত মু'য়াবিয়া (রা) মদীনায় আসেন এবং হযরত 'আয়িশার (রা) সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। 'আয়িশা (রা) তাঁকে বলেন, তুমি এমন নিশ্চিন্ত মনে একাকী আমার ঘরে এসে গেলে? এও তো সম্ভব ছিল যে, আমি কোন ঘাতককে দাঁড় করিয়ে রাখতাম এবং

---

২৩৫. প্রাগুক্ত-৩/২৫৫

২৩৬. প্রাগুক্ত-৩/২৫৭-২৫৮

তুমি ঢোকার সাথে সাথে তোমার কল্লা কেটে ফেলতো। আমীর মু'য়াবিয়া (রা) বললেন, এটা দারুল আমান (নিরাপত্তার গৃহ), এখানে আপনি এমন কাজ করতে পারতেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ঈমান অতর্কিত হত্যার শিকল। তারপর হযরত মু'য়াবিয়া (রা) প্রশ্ন করেন, আপনার সাথে আমার আচরণ কেমন হচ্ছে? বললেন ঃ ভালো। তারপর মু'য়াবিয়া (রা) বলেন, তাহলে আমার ও বনু হাশিমের ব্যাপারটি ছেড়ে দিন, আল্লাহর দরবারে বুঝাপড়া হবে।[২৩৭]

হুজর ইবনে 'আদী (রা) একজন উঁচুস্তরের সাহাবী, কূফায় 'আলীর (রা) পক্ষাবলম্বন-কারীদের একজন অন্যতম নেতা। কিছু লোকের সাক্ষের ভিত্তিতে কূফার গভর্ণর আরো কিছু লোকের সাথে তাঁকে গ্রেফতার করে দামেশ্‌কে পাঠিয়ে দেন। হুজর ছিলেন কিন্দা গোত্রের লোক। তৎকালীন কূফা ছিল আরবের বড় বড় গোত্রের কেন্দ্রস্থল। সেখানে কিন্দা গোত্রের লোকদেরও বসবাস ছিল। কিন্তু কোন ব্যক্তিই হুজরকে রক্ষার জন্য এগিয়ে এলো না। অথচ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সেই সময় হুজরের (রা) যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। তবে তাঁর গ্রেফতারির খবরটি খিলাফতের প্রত্যেকটি অঞ্চলের প্রতিটি মানুষকে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করে। আরবের বিভিন্ন গোত্রের বহু নেতা তাঁর মুক্তির জন্য সুপারিশ করে, কিন্তু তা সবই প্রত্যাখ্যাত হয়। এ খবর মদীনায় 'আয়িশার (রা) নিকট পৌঁছালে তিনি সুপারিশের উদ্দেশ্যে একজন দূত পাঠান। দুঃখের বিষয় দূত পৌঁছার পূর্বেই হুজরের (রা) মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়ে যায়।[২৩৮]

পরে হযরত মু'য়াবিয়া (রা) যখন মদীনায় এসে হযরত 'আয়িশার (রা) সাথে সাক্ষাত করেন, তখন তিনি সর্বপ্রথম হুজরের (রা) বিষয়টি উঠান। তিনি বলেন ঃ 'মু'য়াবিয়া! হুজরের ব্যাপারে তোমার ধৈর্য ও বিচক্ষণতা কোথায় ছিল। তাঁকে হত্যার ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে ভয় করনি।' মু'য়াবিয়া জবাব দিলেন ঃ 'তার ব্যাপারে আমার কোন অপরাধ নেই। অপরাধ তাদের যারা তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে।' অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত মুয়াবিয়া (রা) বলেন, 'উম্মুল মুমিনীন! কোন সঠিক সিদ্ধান্ত দানকারী ব্যক্তি আমার কাছে ছিল না।'[২৩৯] প্রখ্যাত তাবে'ঈ হযরত মাসরূক (রহ) বর্ণনা করেন, হযরত 'আয়িশা (রা) বলতেন ঃ আল্লাহর কসম! মুয়াবিয়া যদি বুঝতো কূফায় সাহস ও আত্মমর্যাদাবোধের কিছু অবশিষ্ট আছে তাহলে কখনও তাদের সামনে থেকে হুজরকে ধরে নিয়ে গিয়ে এভাবে শামে হত্যা করতো না। কিন্তু কলিজা চিবানো হিন্দার[২৪০] এই ছেলে ভালো করেই বুঝে গেছে, এখন সেই সব লোক চলে গেছেন। আল্লাহর কসম!

---

২৩৭. মুসনাদে আহমাদ-৪/৯২

২৩৮. তাবারী-৭/১৪৫

২৩৯. প্রাগুক্ত-৭/১১৬, ১৪৫

২৪০. হযরত মু'য়াবিয়ার (রা) মা হিন্দা। উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা হযরত হামযা (রা) শাহাদাত বরণ করলে এই হিন্দা তাঁর বুক চিরে কলিজা বের করে চিবিয়ে ছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন

কূফা ছিল সাহসী ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন আরব নেতাদের আবাসভূমি। লাবীদ (রা) যথার্থই বলেছেন ঃ[২৪১]

ذَهَبَ الذين يعاش فى أكنافهم + وبقيت فى خلف كجلد الاجرب

لا ينفعون ولا يرجى خيرهم + ويعاب قائلهم وإن لم يتغب -

—সেই সব লোক চলে গেছেন— যাদের ছায়াতলে জীবন যাপন করা যায়। এখন এমন উত্তরাধিকারীদের আশ্রয়ে আছি যারা চর্মরোগগ্রস্ত উটের চর্মের মত।

—তারা না কারো উপকারে আসে, আর না তাদের কাছে ভালো কিছু আশা করা যায়। তাদের সাথে যারা কথা বলে তাদের কেবল দোষ খোঁজা হয়।

ইরাক ও মিসরের কিছু লোক হযরত উসমানের (রা) নিন্দা মন্দ করতো, তেমনিভাবে শামের অধিবাসীরা হযরত আলীর (রা) শানে অশোভন কথা বলতো। আবার খারেজীরা উভয়কে খারাপ বলে জানতো। এ সকল দল ও উপদলের অবস্থা হযরত 'আয়িশা (রা) জানতে পেরে বলেন, কুরআনে আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের জন্য রহমত ও মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করতে বলেছেন, আর এই লোকেরা তাঁদেরকে গালি দেয়।[২৪২]

খারেজীরা হযরত আলীর (রা) দল থেকে পৃথক হয়ে সর্বপ্রথম 'হারূর' নামক স্থানে সমবেত হয়। একারণে তাদেরকে 'হারূরিয়্যা' বলা হয়। একবার এক মহিলা হযরত 'আয়িশার (রা) নিকট এসে প্রশ্ন করলো ঃ আচ্ছা, মেয়েদের বিশেষ কিছু দিনের রোযার মত নামায কেন কাজা করতে হবে না? 'আয়িশা (রা) অত্যন্ত রাগের সাথে বললেন ঃ 'তুমি কি হারূরিয়্যা'![২৪৩] একথা দ্বারা হারূরিয়্যাদের প্রতি তাঁর ঘৃণার অভিব্যক্তি ঘটেছে।

একবার হযরত মু'য়াবিয়া (রা) হযরত আয়িশাকে (রা) একটি চিঠি লিখলেন। চিঠিতে অনুরোধ করলেন তাঁকে কিছু উপদেশ দানের জন্যে। হযরত আয়িশা (রা) জবাবে লিখলেন ঃ 'সালামুন আলাইকুম! অত ঃপর আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মানুষের সন্তুষ্টির পরোয়া না করে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে, আল্লাহ্ তাকে মানুষের অসন্তুষ্টির পরিণতি থেকে রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি চাইবে, আল্লাহ তাকে মানুষের হাতে ছেড়ে দেবেন। ওয়াস্ সালামু আলাইকা।'[২৪৪]

হযরত মু'য়াবিয়া (রা) জীবনের শেষ পর্যায়ে ছেলে ইয়াযিদকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যেতে চান। তাঁর পক্ষ থেকে মারওয়ান তখন মদীনার গভর্ণর। মসজিদে জনসমাবেশে

---

২৪১. তাবারী-৭/১৪৬
২৪২. সহীহ্ মুসলিম ঃ কিতাবুত তাফসীর
২৪৩. সহীহ্ বুখারী ঃ কিতাবুল হায়জ
২৪৪. তিরমিজী-আবওয়াবুয যুহ্দ।

তিনি ইয়াযিদের নাম উত্থাপন করেন। হযরত 'আয়িশার (রা) ভাই আবদুর রহমান ইবন আবী বকর (রা) উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেন। সাথে সাথে মারওয়ান তাঁকে গ্রেফতার করতে চাইলেন। আবদুর রহমান দৌড়ে বোন 'আয়িশার (রা) ঘরে ঢুকে যান। মারওয়ান ভিতরে ঢোকার সাহস করলেন না। তিনি ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন, এতো সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে কুরআনের এ আয়াতঃ

وَالَّذِىْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَا -

—'আর যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বলে ধিক্ তোমাদেরকে।'

পর্দার অন্তরাল থেকে হযরত 'আয়িশা (রা) বলে ওঠেন, আমার নির্দোষিতা ঘোষণার আয়াত ছাড়া আমাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ আর কোন আয়াত নাযিল করেননি।[২৪৫] এই প্রতিবাদ দ্বারা বুঝা যায়, তাঁরা ভাই-বোন ইয়াযিদের মনোনয়ন সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেননি।

হিজরী ৪৯ সনে হযরত আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালে হযরত ইমাম হাসান (রা) মদীনায় ইনতিকাল করেন। হযরত 'আয়িশার (রা) হুজরায় ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা), আবু বকর (রা) ও 'উমার ফারুককে (রা) দাফন করা হয়েছে। সেখানে এক কোণে একটি কবর হতে পারে এমন কিছু স্থান খালি ছিল। মৃত্যুর পূর্বে হযরত হাসান (রা) ছোট ভাই হযরত ইমাম হুসাইনকে (রা) অসীয়াত করে যান যে, ঐ শূন্য স্থানে তাঁকে দাফন করবে। তাতে যদি কেউ বাধা দেয় তাহলে সংঘাত-সংঘর্ষে যাবে না। সাধারণ মুসলমানদের গোরস্তানে দাফন করবে। হযরত ইমাম হুসাইন যখন বড় ভাইয়ের অসীয়াত বাস্তবায়ন করতে চাইলেন, হযরত 'আয়িশা (রা) খুশী মনে অনুমতি দিলেন। হযরত মু'য়াবিয়ার (রা) পক্ষ থেকে সে সময় সা'ঈদ ইবনুল আসী মদীনার গভর্ণর ছিলেন, তিনিও কোন বাধা দিলেন না। কিন্তু মারওয়ান ইবন হাকাম তাঁর কিছু সহযোগীকে নিয়ে শক্তভাবে বাধা দিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল, যখন হযরত উসমানকে (রা) বিদ্রোহীরা এখানে দাফন করতে দেয়নি তখন আর কেউ অনুমতি পেতে পারেনা। হযরত ইমাম হুসাইনের (রা) পক্ষে বনু হাশিম এবং মারওয়ানের পক্ষে বনু উমাইয়্যা অস্ত্রহাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয় এলো। আরেকটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের উপক্রম হলো। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা চালালেন। তিনি মারওয়ানকে বললেন, নাতি যদি তার নানার পাশে দাফন হওয়ার ইচ্ছে করে তাতে তুমি নাক গলাতে যাবে কেন। অন্যদিকে ইমাম হুসাইনকে (রা) বললেন, মরহুম ইমামের এটাও অসীয়াত ছিল, যদি বাধা আসে তাহলে সংঘাত-সংঘর্ষে যাবে না। যাই হোক, হযরত ইমাম হুসাইন (রা) ধৈর্য ধারণ করেন এবং ভাইয়ের লাশ 'জান্নাতুল বাকী'তে তাঁদের মা হযরত ফাতিমাতুয যাহরার (রা) কবরের পাশে দাফন করেন।[২৪৬] এ সম্পর্কে ইবন আবদিল বার তাঁর 'আল-ইসতি'য়াব' গ্রন্থে,ইবনুল আসীর 'উসুদুল গাবা' গ্রন্থে এবং আল্লামা সুয়ুতী 'তারীখুল খুলাফা' গ্রন্থে একই ভাষায় একটি

২৪৫. বুখারী-তাফসীর, সূরা আহকাফ .

২৪৬. আল-কামিল-৩/৩৮৩

বর্ণনা নকল করেছেন। এই বর্ণনাটি এমন এক ব্যক্তির যিনি ইমামের ওফাতের সময় তাঁর কাছে ছিলেন। বর্ণনাটি এখানে উপস্থাপন করা হলো ঃ[২৪৭]

–ইমাম হাসান (রা) বলছেন, 'আমি আয়িশার (রা) কাছে আবেদন করেছিলাম, আমাকে আপনার ঘরে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে দাফন হওয়ার সুযোগ দিবেন। তিনি অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি জানিনে, এ অনুমতি তিনি লজ্জায় পড়ে দিয়েছিলেন কিনা। আমার মৃত্যুর পর তাঁর কাছে আবার অনুমতি চাইবে। যদি তিনি হৃষ্টচিত্তে অনুমতি দেন তাহলে দাফন করবে। আমার মনে হচ্ছে, লোকেরা তোমাকে বাধা দেবে। যদি তারা সত্যিই এমন করে তাহলে এই ব্যাপার নিয়ে তাদের সাথে সংঘাত-সংঘর্ষে যাবেনা। আমাকে বাকী' গোরস্তানে দাফন করবে। হযরত হাসান (রা) ইনতিকাল করার পর হযরত হুসাইন (রা) হযরত 'আয়িশার (রা) নিকট অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন, হাঁ, আমি সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দিচ্ছি। ব্যাপারটি মারওয়ানের কানে গেলে বললেন ঃ হুসাইন ও আয়িশা দুইজনই মিথ্যা বলছে। হাসানকে কখনো সেখানে দাফন করা যেতে পারে না। উসমানকে তারা গোরস্তানে পর্যন্ত দাফন করতে দেয়নি। আর এখন তারা হাসানকে 'আয়িশার ঘরে দাফন করতে চায়।'

## ওফাত

হযরত 'আয়িশা (রা) হিজরী ৫৮ সনের ১৭ রমজান মুতাবিক ১৩ জুন ৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে ৬৬ বছর বয়সে মদীনায় ইনতিকাল করেন। তখন হযরত আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালের শেষ পর্যায়। মৃত্যুর পূর্বে কিছুকাল রোগগ্রস্ত অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন। অসংখ্য মানুষ সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে দরজায় ভিড় করতো। কেউ কুশল জিজ্ঞেস করলে বলতেন, ভালো আছি।[২৪৮] এ সময় একদিন হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) সাক্ষাতের অনুমতি চান। হযরত 'আয়িশা (রা) এ কথা চিন্তা করে তাঁকে সাক্ষাৎ দানে ইতস্তত ঃ করতে থাকেন যে, তিনি হয়তো এসেই তাঁর প্রশংসা শুরু করে দেবেন। কিন্তু বোনের ছেলেরা তাঁকে বুঝান যে, আপনি হচ্ছেন উম্মুল মুমিনীন, আর তিনি হচ্ছেন ইবন আব্বাস। আপনাকে সালাম এবং বিদায় জানাতে এসেছেন। তখন বললেন, তোমরা যদি চাও, ডেকে আন। হযরত ইবন আব্বাসকে (রা) ডাকা হলো। উম্মুল মুমিনীনের ধারণা সত্য হলো। ইবন আব্বাস (রা) বসার সাথে সাথে বলতে শুরু করলেন, 'সেই আদিকাল থেকেই আপনার নাম উম্মুল মুমিনীন ছিল। আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) প্রিয়তমা স্ত্রী। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিলিত হওয়ার জন্য আপনার দেহ থেকে প্রাণটি বের হয়ে যাওয়ার সময়টুকু শুধু অপেক্ষা। যে রাতে আপনার হারটি হারিয়ে যায়, রাসূল (সা) পানি তালাশ করেন এবং লোকেরা পানি পেলনা, তখন আপনারই কারণে আল্লাহ তা'য়ালা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেছেন। আপনার নির্দোষিতা ও দোষ মুক্তির কথা জিবরীল আমীন (আ) আসমান থেকে নিয়ে এসেছেন। এসব আয়াত কিয়ামত

২৪৭. আল-ইসতী'য়াব (আল-ইসাবার পার্শ্বটীকা)-১/৩৭৭
২৪৮. তাবাকাত-৮/৭১

পর্যন্ত প্রতিটি মসজিদে পাঠ করা হবে। এতটুকু শোনার পর তিনি বলেন ঃ ইবন আব্বাস, আমাকে আপনি এই প্রশংসা থেকে মাফ করুন। আমার তো এটাই পছন্দ ছিল যে, আমার যদি অস্তিত্বই না হতো।[২৪৯]

মৃত্যুর পূর্বে অসীয়াত করে যান যে, আমাকে জান্নাতুল বাকীতে রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য স্ত্রীদের সাথে দাফন করবে। মৃত্যু যদি রাতের বেলায় হয় তাহলে রাতেই দাফন করে দিবে। তাঁর ওফাত হয় রাতে বিতর নামাযের পরে। সুতরাং তখনই তাঁকে অসীয়াত মত জান্নাতুল বাকী'তে দাফন করা হয়। তাঁর ওফাতের খবর ছড়িয়ে পড়লে মদীনায় কান্নার রোল পড়ে যায়। আনসাররা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। জানাযায় এত লোকের সমাগম হয় যে, রাতের বেলা এত জনসমাগম পূর্বে আর কখনও দেখা যায়নি বলে লোকেরা বর্ণনা করেছে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, মহিলাদের ভিড় দেখে ঈদের দিন বলে মনে হচ্ছিল। হযরত উম্মু সালামা কান্নার আওয়ায শুনে বলেন ঃ 'আয়িশার (রা) জন্য জান্নাত অপরিহার্য। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) সর্বাধিক প্রিয় স্ত্রী।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) ছিলেন তখন মদীনার গভর্ণর। তিনি জানাযার নামায পড়ান। কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর (রা), আবদুল্লাহ ইবন আবদির রহমান ইবন আবী বকর, আবদুল্লাহ ইবন আতীক, 'উরওয়া ইবন যুবাইর (রা) এবং আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা)— ভাই ও বোনের এই ছেলেরা তাঁকে কবরে নামান। তাঁর অন্তিম অসীয়াত অনুযায়ী জান্নাতুল বাকী, গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়।[২৫০]

উম্মুল মুমিনীনের ইনতিকালে প্রতিটি মুসলমান গভীরভাবে শোকাভিভূত হন। প্রখ্যাত তাবে'ঈ হযরত মাসরূক (রহ) বলেন, আমার যদি একটি কথা স্মরণ না হতো, আমি উম্মুল মুমিনীনের জন্য মাতমের মাজমা বসাতাম। উবাইদ ইবন 'উমাইর এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করেন, হযরত আয়িশার (রা) মৃত্যুতে কারা দু ঃখ পান? লোকটি জবাব দেয়, তিনি যাদের মা ছিলেন তারা সবাই দু ঃখ পায়। এ সকল কথা ইবন সা'দ বর্ণনা করেছেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত 'আয়িশা (রা) কোন সন্তান জন্মদান করেননি। বোন হযরত আসমার (রা) ছেলে হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরকে (রা) নিজের ছেলের মত লালন-পালন করেন। আবদুল্লাহও মায়ের মত খালাকে ভালোবাসতেন। হিজরাতের পরে মদীনায় মুহাজিরদের ঘরে সর্বপ্রথম এই আবদুল্লাহর জন্ম। মদীনার কাফির-মুনাফিকরা বলাবলি করতো যে, মুসলিম নারীরা মদীনায় এসে বন্ধ্যা হয়ে গেছে। এমনি এক সময়ে তাঁর জন্ম হলে মুসলমানদের মধ্যে খুশীর জোয়ার বয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) খেজুর চিবিয়ে নিজ হাতে তার গালে দিয়ে 'তাহনীক' করেন। এই আবদুল্লাহকে হযরত আয়িশা (রা) ছেলে হিসেবে মানুষ করেন। এক আনসারী মেয়েকে লালন-পালন করে তিনি বিয়ে দেন বলে হাদীসে উল্লেখ আছে।[২৫১] তাছাড়া মাসরূক ইবনে আজদা',

---

২৪৯. প্রাগুক্ত-৮/৫২
২৫০. প্রাগুক্ত-৮/৫৪
২৫১. মুসনাদ-৬/২৬৯

'উমরা বিন্ত আয়িশা বিন্ত তালহা, 'উমরা বিন্ত 'আবদির রহমান আনসারিয়্যা, আসমা বিন্ত আবদির রহমান ইবন আবী বকর, 'উরওয়া ইবন যুবাইর, কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ও তাঁর ভাই, আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযিদ ও আরো অনেক ছেলে-মেয়ে তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হয়। মুহাম্মাদ ইবন আবী বকরের (রা) মেয়েদেরকে তিনিই লালন-পালন করে বিয়ে-শাদী দেন।[২৫২]

## দৈহিক আকৃতি ও পোশাক-পরিচ্ছদ

হযরত 'আয়িশা (রা) ছিলেন খুব দ্রুত বেড়ে ওঠা মেয়েদের একজন। নয়-দশ বছর বয়সে তিনি বেশ বেড়ে উঠেছিলেন।[২৫৩] ছোটবেলায় একেবারেই হালকা-পাতলা ছিলেন। কিছু বয়স হলে শরীর কিছুটা ভারী হয়ে যায়।[২৫৪] গায়ের বর্ণ ছিল সাদা-লালের মিশ্রণ। উজ্জ্বল চেহারা ও সৌন্দর্যের অধিকারিণী ছিলেন। এ কারণে আল-হুমায়রা বলা হতো।[২৫৫]

মিতব্যয়িতা ও অল্পেতুষ্টির কারণে মাত্র এক জোড়া পরিধেয় বস্ত্র রাখতেন। তাই একখানা ধুয়ে অন্যখানা পরতেন।[২৫৬] একটি জামা ছিল, যার মূল্য পাঁচ দিরহামের মত হবে। কিন্তু তা সেই আমলে এত মূল্যবান ছিল যে, বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠানে কনেকে সাজানোর জন্যে চেয়ে নেওয়া হতো।[২৫৭] কখনো কখনো জাফরান দিয়ে রং করা কাপড় পরতেন, আবার মাঝে মধ্যে অলঙ্কারও পরতেন। ইয়ামনের তৈরী সাদা-কালো মোতির একটি বিশেষ ধরনের হার গলায় পরতেন। আঙ্গুলে সোনার আংটি পরতেন।[২৫৮] কাসিম ইবন মুহাম্মাদ বর্ণনা করেন, 'আমি হযরত 'আয়িশাকে (রা) ইহরাম অবস্থায় সোনার আংটি এবং হলুদ বর্ণের পোশাক পরতে দেখেছি।' মাঝে মাঝে একটি রেশমী চাদরও ব্যবহার করতেন। পরে সেটি আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরকে দান করেন।[২৫৯]

পোশাকের ব্যাপারে শরীয়াতের বিধিবিধানের প্রতি অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। একবার ভাতিজী হাফসা বিন্ত আবদির রহমান মাথায় একটি পাতলা ওড়না দিয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন। তিনি সেটা নিয়ে ফেঁড়ে ফেলেন এবং বলেন, তুমি জাননা, আল্লাহ তা'য়ালা সূরা নূর-এ কি বলেছেন। তারপর একটা পুরু ওড়না আনিয়ে তাকে দেন।[২৬০] একবার তিনি এক বাড়ীতে মেহমান হিসেবে অবস্থান করেন। গৃহকর্তার বাড়ন্ত বয়সের দুইটি মেয়ে ছিল। তিনি দেখলেন, চাদর ছাড়াই তারা নামায পড়ছে।

---

২৫২. মুওয়াত্তা ইমাম মালিক-যাকাতুল হুলা; কিতাবুত তালাক
২৫৩. বুখারী ঃ বাবু তাযবীজু আয়িশা (রা)
২৫৪. প্রাগুক্ত ঃ আল-ইফক; আবু দাউদ-বাবুস সাবাক
২৫৫. দেখুন ঃ মুসনাদ-৬/১৩৮; বুখারী ঃ ইফক, ঈলা
২৫৬. বুখারী ঃ বাবু হাল তুসাল্লি আল-মারয়াতু ফী সাওবিন হাদাত ফীহে
২৫৭. প্রাগুক্ত ঃ বাবুল ইসতি'য়ারা লিল আরূস
২৫৮. প্রাগুক্ত ঃ বাবু মা ইয়ালবাসুল মুহ্‌রিন মিনাস সিয়াব; বাবুত তায়াম্মুম, ইফক, বাবু খাতামিন নিসা
২৫৯. তাবাকাত-৮/৪৮
২৬০. প্রাগুক্ত-৮/৫০

তিনি তাকিদ দিয়ে বললেন, ভবিষ্যতে আর কোন মেয়ে যেন চাদর ছাড়া নামায না পড়ে।২৬১

## অভ্যাস ও চারিত্রিক গুণাবলী

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশার (রা) শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত সময়কাল এমন এক পবিত্র ব্যক্তি-সত্তার সাহচর্যে কাটে, এই ধরাধামে যাঁর আগমন ঘটেছিল মহোত্তম নৈতিকতার পূর্ণতা বিধানের জন্য। এই সাহচর্য তাঁকে নৈতিকতার এমন আদর্শ স্তরে পৌঁছে দেয় যা আধ্যাত্মিক উন্নতির চূড়ান্ত পর্যায় বলে বিবেচিত। সুতরাং তাঁর নৈতিকতার মান ছিল অতি উঁচুতে। তাঁর হৃদয় ছিল অতি প্রশস্ত। তাছাড়া তিনি ছিলেন দানশীল, মিতব্যয়ী, ইবাদাতকারিণী এবং দয়াময়ী।

নারী ও অল্পেতুষ্টি— এ যেন পরস্পরবিরোধী দুইটি বিষয়। হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমি দোযখে সবচেয়ে বেশী মহিলাদেরকে দেখেছি। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলো। বললেন, স্বামীদের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা এর কারণ। তবে হযরত আয়িশার (রা) সত্তায় এই দুইটি গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি তাঁর বৈবাহিক জীবন প্রচণ্ড অভাব ও দারিদ্রের মধ্যে অতিবাহিত করেছেন, কিন্তু কখনো অভিযোগের একটি বর্ণও জিহ্বায় আনেননি। সুন্দর সুন্দর পোশাক, মূল্যবান অলঙ্কার, আলীশান ইমারাত, মুখরোচক খাদ্য সামগ্রী—এর কোন কিছুই তিনি স্বামীর ঘরে পাননি। অথচ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন যে, গণীমাতের অর্থ-সম্পদ প্লাবনের মত একদিকে আসছে আর অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও তা থেকে কিছু পাওয়ার বিন্দুমাত্র লোভ ও ইচ্ছা কখনো তাঁকে পেয়ে বসেনি। রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পরে একবার তিনি খাবার আনতে বলেন। তারপর বলেন, কখনো আমি পেট ভরে খাইনে। যাতে আমার কান্না না পায়। তাঁর এক শাগরিদ জিজ্ঞেস করলো, কেন? বললেন, আমার সেই অবস্থার কথা মনে পড়ে যায়, যে অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যান। আল্লাহর কসম! দিনে দুইবার কখনো তিনি পেট ভরে রুটি ও গোশত খাননি!

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে সন্তান থেকে মাহরুম করেছিলেন। তবে তিনি সাধারণ মুসলমানদের সন্তানদেরকে, বিশেষত ঃ ইয়াতীমদেরকে এনে প্রতিপালন করতেন। তাদেরকে শিক্ষা দিতেন এবং তাদের বিয়ে-শাদী দেওয়ার দায়িত্বও পালন করতেন।

স্বামী রাসূলুল্লাহর (সা) পূর্ণমাত্রায় আনুগত্য করা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টাই ছিল হযরত 'আয়িশার (রা) প্রতি মহূর্তের চিন্তা ও কাজ। তাঁর চেহারা সামান্য মলিন ও বিমর্ষ দেখলে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন। রাসূলুল্লাহর (সা) আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি এত যত্নবান ছিলেন যে তাঁদের কোন কথা উপেক্ষা করতেন না। একবার বোনের ছেলে আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর খালার সীমাহীন দানশীলতা দেখে শংকিত হয়ে পড়েন এবং

---

২৬১. মুসনাদ-৬/৭৯৬

বলেন, এখন তাঁর হাত থামানো দরকার। এ কথায় হযরত 'আয়িশা (রা) এতই রেগে যান যে, আবদুল্লাহর সাথে কথা না বলার কসম করে বসেন। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহর (সা) মাতুল গোত্রের লোকেরা সুপারিশ করলো তখন তিনি আর প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না।[২৬২] রাসূলুল্লাহর (সা) বন্ধুদেরকেও তিনি অতি সমাদর ও সম্মান করতেন এবং তাঁদের কোন কথাও উপেক্ষা করতেন না। যথাসম্ভব কারো কোন হাদিয়া-তোহফা ফিরিয়ে দিতেন না।

মুহাম্মাদ ইবন আশ'য়াস (রা) ছিলেন একজন সাহাবী।একবার তিনি হযরত 'আয়িশাকে (রা) একটি পোস্তীন (চামড়ার তৈরী জামা) হাদিয়া দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং বলেন, এটি গরম, আপনি পরবেন। হযরত 'আয়িশা (রা) গ্রহণ করতে রাজি হন এবং প্রায়ই সেটি পরতেন।[২৬৩]

আয়াতে হিজাব নাযিলের পর থেকে কঠোরভাবে পর্দা পালন করতেন। ইসহাক নামে একজন অন্ধ তাবেঈ ছিলেন। একবার তিনি এলেন দেখা করতে। হযরত 'আয়িশা (রা) পর্দা করলেন। ইসহাক বললেন, আপনি আমার থেকে পর্দা করছেন! আমি তো আপনাকে দেখতে পাইনে। তিনি বললেন, তুমি আমাকে দেখতে পাওনা তাতে কি হয়েছে, আমি তো তোমাকে দেখতে পাচ্ছি।[২৬৪] একবার হজ্জের সময় অন্য মহিলারা বললেন, উম্মুল মুমিনীন! চলুন, হাজারে আসওয়াদে চুমু দেবেন। বললেন ঃ তোমরা যেতে পার। আমি পুরুষদের ভিড়ের মধ্যে যেতে পারিনে।[২৬৫] কখনও দিনের বেলায় তাওয়াফের প্রয়োজন হলে কা'বার চত্বর থেকে পুরুষদের সরিয়ে দেওয়া হতো।[২৬৬] শরীয়াতে মৃতদের থেকে পর্দার হুকুম নেই। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারেও অতিমাত্রায় সতর্ক ছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে 'উমারকে (রা) দাফন করার পর, সেখানে পর্দা ছাড়া যেতেন না।

হযরত 'আয়িশা (রা) কক্ষণো কারো গীবত করতেন না বা কারো সম্পর্কে কোন অশোভন উক্তিও না। তাঁর বহু কথা হাদীসের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তার একটিতেও কোন মানুষের প্রতি খারাপ উক্তি বা কারো সম্মানহানি ঘটে এমন একটি কথাও পাওয়া যায় না। সতীনের নিন্দামন্দ করা নারীদের অনেকেরই স্বভাব। কিন্তু তিনি সতীনদের কেমন উদারচিত্তে প্রশংসা করতেন তা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কবি হযরত হাস্‌সান ইবন সাবিত (রা), যিনি ইফ্‌ক-এর ঘটনায় জড়িয়ে হযরত 'আয়িশার (রা) দু ঃখকে শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তিনিও হযরত 'আয়িশার (রা) মজলিসে আসতেন এবং তিনি খুব হৃষ্টচিত্তে তাঁকে বসার অনুমতি দিতেন। একদিন হযরত হাস্‌সান (রা) এসে তাঁর শানে রচিত একটি কাসীদা শুনাতে শুরু করেন। যার একটি

---

২৬২. বুখারী ঃ মানকিবু কুরাইশ

২৬৩. তাবাকাত-৮/৪৯

২৬৪. প্রাগুক্ত

২৬৫. বুখারী ঃ কিতাবুল হাজ্জ, তাওয়াফুন নিসা

২৬৬. মুসনাদ-৬/১১৭

শ্লোকের অর্থ ছিল এরূপ ঃ

'তিনি পূত ঃপবিত্র নারীদের প্রতি কোন দোষারোপ করেন না'।

শ্লোকটি শুনতেই হযরত 'আয়িশার (রা) বহু পূর্বের সেই ইফ্ক-এর ঘটনা স্মরণ হলো। তারপর তিনি শুধু এতটুকু মন্তব্য করলেন যে, 'কিন্তু আপনি এমন নন।'[২৬৭] হযরত 'আয়িশার (রা) প্রিয়জনদের অনেকে তাঁর দরবারে হযরত হাস্‌সানের (রা) এভাবে উপস্থিতি সহজে মেনে নিতে পারতেন না। তাঁরা অনেক সময় হাস্‌সানকে (রা) কটু কথা শুনাতে চাইতেন কিন্তু হযরত 'আয়িশা (রা) অত্যন্ত শক্তভাবে নিষেধ করতেন। হযরত মাসরূক (রহ) বলেন, 'একবার আমি উম্মুল মুমিনীনকে বললাম, আপনি এভাবে তাঁকে আপনার কাছে আসার অনুমতি দেন কেন? বললেন, এখন সে অন্ধ হয়ে গেছে। আর অন্ধত্বের চেয়ে বড় শাস্তি আর কি হতে পারে। তাছাড়া সে রাসূলুল্লাহর (সা) পক্ষ থেকে মককার পৌত্তলিক কবিদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের জবাব দিত।'[২৬৮]

একবার এক ব্যক্তির আলোচনা চলছিল। প্রসঙ্গক্রমে হযরত আয়িশা (রা) সেই ব্যক্তি সম্পর্কে ভালো ধারণা প্রকাশ করলেন না। লোকেরা বললো ঃ উম্মুল মুমিনীন! সেই ব্যক্তি তো মারা গেছে। একথা শুনতেই তিনি তার মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করতে শুরু করলেন। লোকেরা তখন বললো, আপনি তো এইমাত্র তাকে ভালো বলেন নি, আর এখন তার মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করছেন! জবাবে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা মৃতদের সম্পর্কে শুধু ভালো কথাই বলবে।[২৬৯]

অহংকারের লেশমাত্র তাঁর মধ্যে ছিল না। নিজেকে অতি সাধারণ ও তুচ্ছ মনে করতেন। কেউ তাঁর মুখের উপর প্রশংসা করুক তা তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। এ প্রসঙ্গে অন্তিম শয্যায় হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসের (রা) সাথে তাঁর আচরণটি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয়ী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ ছিল পূর্ণমাত্রায়। তাই স্বামী রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর কোন কোন আচরণ প্রেয়সীর মান-অভিমানের রূপ নিত। যেমন, ইফ্ক-এর ঘটনায় যখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর নির্দোষ বিষয়ক আয়াত পাঠ করে শোনান এবং মা বলেন, মেয়ে, স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। তখন তিনি যে জবাব দেন, তাতে একদিকে যেমন প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি প্রিয়তমের নিকট অভিমানের এক চমৎকার দৃশ্য ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন, 'আমি শুধু আমার পরোয়ারদিগারের শুকরিয়া আদায় করবো, অন্য কারো নয়— যিনি আমাকে আমার নির্দোষিতা ও পবিত্রতার ঘোষণা দিয়ে সম্মানিত করেছেন।[২৭০] তাছাড়া আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, যখন তিনি স্বামীর প্রতি ক্ষুব্ধ হতেন তখন তাঁর নাম নিয়ে কসম খাওয়া ছেড়ে দিতেন। এ সবই ছিল প্রেয়সীর

---

২৬৭. সহীহ বুখারী ঃ বাবু হাদীসিল ইফ্ক; তাফসীর সূরা নূর

২৬৮. প্রাগুক্ত। আল-ইফ্ক; মানকিবু হাস্‌সান, সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৬১

২৬৯. মুসনাদে তায়ালীসী; মুসনাদে 'আয়িশা

২৭০. সহীহ বুখারী ঃ আল-ইফ্ক

মান-অভিমানের এক অনুপম দৃশ্য।

আমরা তাঁর আত্মমর্যাদাবোধের চূড়ান্ত রূপ দেখতে পাই অপর একটি ঘটনায়। যে আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরকে (রা) তিনি মাতৃস্নেহে লালন পালন করেন, আর তিনিও খালা 'আয়িশাকে (রা) মায়ের মত সম্মান ও সেবা করতেন। তিনি খালার সীমাহীন দানের হাত দেখে একবার মন্তব্য করে বসেন, এখন তাঁর হাতে বাঁধা দেওয়া উচিত। তাঁর এমন মন্তব্যে হযরত আয়িশার (রা) আত্মসম্মান বোধ আহত হয়। তিনি কসম খেয়ে বসেন, ভাগ্নের কোন জিনিসই আর স্পর্শ করবেন না। ভাগ্নে আবদুল্লাহ (রা) পড়ে গেলেন মহা বিপদে। অবশেষে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সুপারিশ ও মধ্যস্থতায় তিনি সদয় হন।[২৭১]

হযরত 'আয়িশার (রা) মধ্যে প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ ও ব্যক্তিত্বের সাথে সাথে তীক্ষ্ণ ন্যায়বোধও ছিল। একবার মিসরের এক ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। তিনি লোকটির নিকট জানতে চাইলেন, যুদ্ধের ময়দানে তথাকার তৎকালীন শাসকদের আচরণ তাদের সাথে কেমন হয়ে থাকে। লোকটি জবাবে বললেন, প্রতিবাদ করার মত তেমন কোন আচরণ তাঁদের দৃষ্টিতে পড়েনা। কারো উট মারা গেলে তিনি তাকে অন্য একটি উট দেন, কারো চাকর না থাকলে চাকর দেন, কারো খরচের অর্থের প্রয়োজন হলে তার সে প্রয়োজন পূরণ করেন। তাঁর এ জবাব শুনে হযরত আয়িশা (রা) বলেন, মিসরবাসীরা আমার ভাই মুহাম্মদ ইবন আবী বকরের সাথে যত খারাপ আচরণ করুক না কেন, তাদের সেই খারাপ আচরণ তোমাদের কাছে আমাকে এ সত্য কথাটি বলতে বিরত রাখতে পারে না যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার এই ঘরের মধ্যেই দু'আ করেছিলেন– 'হে আল্লাহ! যে আমার উম্মাতের উপর কঠোরতা করে তুমিও তার উপর কঠোরতা কর, আর যে সদয় হবে, তুমিও তার প্রতি সদয় হও।'[২৭২]

হযরত আয়িশা (রা) ছিলেন দানের ক্ষেত্রে খুবই দরাজহস্ত। অন্তরটাও ছিল অতি উদার ও প্রশস্ত। বোন হযরত আসমাও (রা) ছিলেন খুবই দানশীল। দুই বোনের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল দানশীলতা। আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা) বলেন, তাঁদের দুইজনের চেয়ে বড় দানশীল ব্যক্তি আর কাকেও দেখিনি। তবে দুইজনের মধ্যে পার্থক্য এই ছিল যে, হযরত আয়িশা (রা) অল্প অল্প করে জমা করতেন। যখন কিছু জমা হয়ে যেত, তখন সব এক সাথে বিলিয়ে দিতেন। আর হযরত আসমার (রা) অবস্থা ছিল, হাতে কিছু এলে জমা করে রাখতেন না, সাথে সাথে বিলিয়ে দিতেন।[২৭৩] অধিকাংশ সময় তিনি ঋণগ্রস্ত থাকতেন। বিভিন্ন জনের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতেন। লোকেরা যখন বলতো, আপনার এত ঋণ করার প্রয়োজন কি? তিনি বলতেন, ঋণ পরিশোধের যার ইচ্ছা থাকে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। আমি আল্লাহর এই সাহায্য তালাশ করি।[২৭৪]

তিনি দান-খয়রাতের ব্যাপারে কম-বেশীর চিন্তা করতেন না। হাতে যা কিছুই থাকতো

২৭১. প্রাগুক্ত ঃ মানাকিবু কুরাইশ

২৭২. সহীহ মুসলিম ঃ বাবু ফাদীলাতিল আল-আদিল

২৭৩. বুখারী আদাবুল মুফরাদ-বাবু সাখাওয়াতুন নাফ্স

২৭৪. মুসনাদে ইমাম আহমাদ-৬/৯৯

তাই দিয়ে দিতেন। একবার এক মহিলা ছোট ছোট দুই বাচ্চা কোলে করে এসে কিছু সাহায্য চায়। ঘটনাক্রমে সেই সময় তাদেরকে দেওয়ার মত ঘরে কিছুই ছিল না। খুঁজে-খুঁজে একটি মাত্র খেজুর পেলেন। সেটি দুই ভাগ করে বাচ্চা দুইটির হাতে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ঘরে এলে তাঁকে ঘটনাটি শুনালেন।[২৭৫] আর একবার এক ভিক্ষুক এসে সাহায্য চাইলো। হযরত আয়িশার (রা) সামনেই ছিল কিছু আঙ্গুরের দানা। সেখান থেকে তিনি একটি দানা নিয়ে ভিক্ষুকের হাতে তুলে দেন। ভিক্ষুক দানাটির দিকে এমনভাবে তাকিয়ে দেখতে থাকে যে, একটি দানা কি কেউ কারো হাতে দেয়! তখন তিনি ভিক্ষুককে লক্ষ্য করে বলেন, দেখ, এই একটি দানার মধ্যে কত দানা রয়েছে।[২৭৬] মূলত তিনি সূরা যিলযাল- এর এই আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেন ঃ

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি একটি অণু পরিমাণ নেক কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।

হযরত 'উরওয়া (রা) বর্ণনা করেন, একবার হযরত আয়িশা (রা) তাঁর সামনে পুরো সত্তর হাজার দিরহাম এক সাথে আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিয়ে চাদরের কোণা ঝেড়ে ফেলেন।[২৭৭] হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা) একবার এক লাখ দিরহাম হযরত আয়িশার (রা) নিকট পাঠালেন। সন্ধ্যা হতে হতে একটি পয়সাও থাকলো না। সবই গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। ঘটনাক্রমে সেদিন তিনি রোযা ছিলেন। দাসী বললো, ইফতারীর খাদ্য-সামগ্রী কেনার জন্য কিছু রেখে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। বললেন ঃ একথা যদি আগে স্মরণ করিয়ে দিতে। এ রকম ঘটনা আরো আছে। একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা) বড় বড় দুইটি থলিতে ভরে এক লাখ দিরহাম পাঠালেন। তিনি সবগুলি একটি খাঞ্চায় ঢেলে বিলাতে শুরু করেন। সেদিনও তিনি রোযা রেখেছিলেন। সন্ধ্যার সময় দাসীকে ইফতারী আনতে বলেন। দাসী বলেন, উম্মুল মুমিনীন! এই অর্থ দিয়ে কিছু গোশত ইফতারের জন্য আনাতে পারতেন না? বললেন, এখন তিরস্কার করো না। তখন কেন স্মরণ করে দাওনি?[২৭৮] একদিন তিনি রোযা আছেন। ঘরে একটি রুটি ছাড়া কিছুই নেই। এমন সময় এক মহিলা ভিক্ষুক এসে কিছু খাবার চায়। তিনি দাসীকে বলেন রুটিটি তাকে দিয়ে দিতে। দাসী বলেন, রুটি দিয়ে দিলে সন্ধ্যায় ইফতার করবেন কি দিয়ে? বললেন, এখন রুটিটি দিয়ে দাও তো, তারপর দেখা যাবে। সন্ধ্যার সময় কেউ একজন খাসীর গোশ্ত পাঠালো। তিনি দাসীকে বললেন, এই দেখ, তোমার রুটির চেয়েও ভালো জিনিস আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন।[২৭৯] নিজের থাকার ঘরটি তিনি আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) নিকট বিক্রি করে যে অর্থ পান তা

---

২৭৫. আদাবুল মুফরাদ ঃ বাবু মান ই'উলা ইয়াতীমান

২৭৬. মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ঃ বাবুত তারগীব ফিস-সাদাকা

২৭৭. তাবাকাত-৮/৬৭

২৭৮. প্রাগুক্ত-৮/৬৭; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৮৭

২৭৯. মুওয়াত্তা ঃ বাবুত তারগীব ফিস-সাদাকা

সবই আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেন।[২৮০]

স্বভাবগতভাবেই হযরত আয়িশা (রা) ছিলেন নির্ভীক ও সাহসী। তাঁর জীবনের বহু ঘটনায় এ সাহসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাতে ঘুম থেকে জেগে একা একাই কবরস্তানে চলে যেতেন।[২৮১] যুদ্ধের ময়দানে এসে দাঁড়িয়ে যেতেন। উহুদ যুদ্ধে যখন মুসলিম বাহিনীতে অস্থিরতা বিরাজমান তখন তিনি পিঠে করে মশকভর্তি পানি নিয়ে আহত সৈনিকদের পান করিয়েছেন।[২৮২] খন্দক যুদ্ধের সময় যখন পৌত্তলিক বাহিনী চতুর্দিক থেকে মদীনা ঘিরে রেখেছিল এবং নগরীর ভিতর থেকে ইহুদীদের আক্রমণের আশঙ্কা ছিল তখনও তিনি নির্ভীক চিত্তে কিল্লা থেকে বেরিয়ে এসে মুসলিম মুজাহিদদের যুদ্ধ কৌশল প্রত্যক্ষ করতেন।[২৮৩] একবার তো তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট জিহাদে গমনের অনুমতি চেয়েই বসেন; কিন্তু অনুমতি পাননি।[২৮৪] উটের যুদ্ধে তিনি যে দক্ষতার সাথে সৈন্য পরিচালনা করেন, তাতে তার স্বভাবগত সাহসিকতার চমৎকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

হযরত 'আয়িশার (রা) অন্তরে ছিল তীব্র আল্লাহ-ভীতি। অন্তরটিও ছিল অতি কোমল। খুব তাড়াতাড়ি কাঁদতে শুরু করতেন। বিদায় হজ্জের সময় যখন নারী প্রকৃতির কারণে হজ্জের কিছু আনুষ্ঠানিতা পালন করতে পারলেন না তখন নিজের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করে আকুলভাবে কান্না শুরু করেন। পরে রাসূলুল্লাহর (সা) সান্ত্বনায় স্থির হন।[২৮৫] একবার তো দাজ্জালের ভয়ে অস্থির হয়ে কাঁদতে থাকেন।[২৮৬] পরবর্তী জীবনে যখনই উটের যুদ্ধের কথা স্মরণ হতো, অস্থির হয়ে কাঁদতেন।

একবার কোন একটি কথার উপর কসম করে বসেন। পরে মানুষের পীড়াপীড়িতে কসম ভাংতে বাধ্য হন এবং কাফ্ফারা হিসেবে ৪০টি দাস মুক্ত করেন। কিন্তু বিষয়টি তাঁর হৃদয়ে এত গভীর ছাপ ফেলে যে, যখনই স্মরণ হতো চোখের পানি মুছতে মুছতে আঁচল ভিজে যেত।[২৮৭] আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ইফ্কের ঘটনায় তিনি মুনাফিকদের দোষারোপের কথা জানতে পেরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। পিতামাতার সান্ত্বনা দান সত্ত্বেও চোখের পানি বন্ধ হচ্ছিল না।

একবার এক দরিদ্র মহিলা তার দুইটি ছোট্ট শিশু সন্তান নিয়ে কিছু সাহায্যের আশায় হযরত আয়িশার (রা) নিকট আসে। তখন ঘরে তেমন কিছু ছিল না। তিনি তিনটি খেজুর মহিলার হাতে দেন। মহিলা একটি করে খেজুর তার দুই সন্তানের হাতে এবং

---

২৮০. তাবাকাত : জিকরু হুজুরাত উম্মাহাতিল মু'মিনীন
২৮১. বুখারী : বাবু যিয়ারাতুল কুবুর
২৮২. প্রাগুক্ত : বাবু জিকরু উহুদ।
২৮৩. মুসনাদ : ৬/৯৯
২৮৪. বুখারী : বাবু হাজ্জিন নিসা,
২৮৫. প্রাগুক্ত : কিতাবুল হাজ্জ,
২৮৬. মুসনাদ : ৬/৭৫
২৮৭. বুখারী : বাবুল হিজরাতু

একটি নিজের মুখে দেয়। সন্তান দুইটি নিজেদের খেজুর খেয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকাতে থাকে। তখন মহিলা নিজের মুখ থেকে খেজুরটি বের করে দুই ভাগ করে দুই সন্তানের মুখে দেয়। নিজে কিছুই খেল না। তিনি মাতৃস্নেহের এমন দুঃখজনক দৃশ্য এবং তার অসহায় অবস্থা দেখে ভীষণ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে।[২৮৮]

রাত-দিনের বেশীর ভাগ সময় ইবাদাতে নিমগ্ন থাকতেন। চাশতের নামায নিয়মিত পড়তেন। বলতেন, আমার আব্বাও যদি কবর থেকে উঠে এসে এ নামায পড়তে বারণ করেন তবুও আমি ছাড়বো না।[২৮৯] রাতে ঘুম থেকে জেগে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পরও এই নামাযের এত পাবন্দ ছিলেন যে, সকাল সকাল উঠে ফজরের নামাযের পূর্বে পড়ে নিতেন। একদিন তিনি এ নামায আদায় করছেন, এমন সময় ভাতিজা কাসেম এসে উপস্থিত হন। তিনি প্রশ্ন করেন ঃ ফুফু এ আপনি কোন নামায পড়ছেন? বললেন ঃ রাতে আমি পড়তে পারিনি; কিন্তু এখন আমি ছেড়ে দিতে পারিনে।[২৯০]

তিনি বছরের অধিকাংশ সময় রোযা রাখতেন। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তিনি সর্বদা রোযা অবস্থায় থাকতেন।[২৯১] একবার গরমকালে আরাফাতের দিনে রোযা রাখেন। গরম ও সূর্যের তাপ এত তীব্র ছিল যে, মাথায় পানির ছিটে দেওয়া হচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে তাঁর ভাই আবদুর রহমান (রা) বলেন, এই প্রচণ্ড গরমে রোযা রাখার এত কি দরকার। ইফতার করে ফেলুন। বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শুনেছি যে, আরাফাতের দিনে রোযা রাখলে সারা বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তারপরেও আমি রোযা ভেঙ্গে ফেলবো?[২৯২]

অত্যন্ত কঠোরভাবে হজ্জের পাবন্দ ছিলেন। এমন বছর খুব কমই যেত, যাতে তিনি হজ্জ আদায় করতেন না। খলীফা হযরত উমার (রা) তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে হযরত উসমান (রা) ও আবদুর রহমান ইবন আওফকে (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সহধর্মিণীদের সাথে হজ্জে পাঠান।[২৯৩] হজ্জের সময় তাঁদের অবস্থানের স্থানসমূহ নির্দিষ্ট ছিল। প্রথমে ওয়াদিনামির-এর শেষ প্রান্তে অবস্থান করতেন। সেখানে যখন মানুষের ভিড় হতে লাগলো তখন তার থেকে একটু দূরে আরাফ নামক স্থানে তাবু স্থাপন করাতেন। কোনবার 'জাবালে সাবীর'-এর পাদদেশে অবস্থান নিতেন। আরাফাতের দিন রোযা

---

২৮৮. মুসতাদারিকে হাকেম-২০৬
২৮৯. মুসনাদ-৬/১৩৮
২৯০. দারুকুতনী ঃ কিতাবুস সালাত
২৯১. তাবাকাত-৩/৭৭
২৯২. মুসনাদ-৬/১২৮,
২৯৩. বুখারী ঃ বাবু হাজ্জিন নিসা

রাখতেন। মানুষ যখন আরাফা ছেড়ে চলতে শুরু করতো, তখন তিনি ইফতার করতেন।[২৯৪]

দাস-দাসীদের প্রতি খুবই সদয় ছিলেন। তিনি সুযোগ পেলেই নানা অজুহাতে দাস মুক্ত করতেন। একবার তো একটি মাত্র কসমের কাফ্‌ফারায় চল্লিশজন দাস মুক্ত করে দেন। তাঁর মুক্ত করা দাস-দাসীর সংখ্যা সর্বমোট ৬৭ (সাতষট্টি) জন।[২৯৫] তামীম গোত্রের একটি দাসী ছিল তাঁর। রাসূলুল্লাহর (সা) মুখে তিনি শুনতে পান যে, এই গোত্রটি হযরত ইসমাঈলের (আ) বংশধর। রাসূলুল্লাহর (সা) ইঙ্গিতে তিনি দাসীটিকে মুক্ত করে দেন। মদীনায় বুরায়রা নাম্নী এক দাসী ছিলেন। তিনি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে মুক্তি লাভের ব্যাপারে তাঁর মনিবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন। তারপর তিনি মানুষের কাছে সাহায্য চাইতে থাকেন। সেকথা হযরত আয়িশার (রা) কানে গেলে তিনি একাই সব অর্থ পরিশোধ করে তাঁকে মুক্ত করে দেন। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। লোকেরা বলতে লাগলো, কেউ হয়তো জাদু-টোনা করেছে। তিনি এক দাসীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জাদু করেছো? সে স্বীকার করলো। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন ঃ কেন? দাসীটি বললো ঃ যাতে আপনি তাড়াতাড়ি মারা যান, আর আমি মুক্ত হই। হযরত আয়িশা (রা) নির্দেশ দেন ঃ তাকে একটি মন্দ লোকের নিকট বিক্রী করে সেই অর্থ দিয়ে একটি দাস ক্রয় করে মুক্ত করে দাও। তাঁর এ নির্দেশ কার্যকরী করা হয়।[২৯৬] মুসতাদরিকে হাকেম-এর আত-তিব্ব অধ্যায়ে এসেছে যে, দাসীকে এ শাস্তি তিনি দিয়েছিলেন তার শরীয়াতবিরোধী কাজের জন্য।

দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের সাহায্য তাদের মর্যাদা অনুযায়ী করা উচিত। হযরত আয়িশা (রা) সর্বদা এদিকে দৃষ্টি রাখতেন। একবার একজন সাধারণ ভিক্ষুক তাঁর নিকট আসলো। তিনি তাকে এক টুকরো রুটি দিয়ে বিদায় করলেন। তারপর একটু ভালো কাপড় চোপড় পরা একজন ভিক্ষুক আসলো। তাকে দেখে একজন মর্যাদাবান মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। তিনি লোকটিকে বসিয়ে আহার করিয়ে বিদায় দেন। উপস্থিত লোকেরা দুইজন ভিক্ষুকের সাথে দুই রকম আচরণের কারণ জানতে চাইলো। বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মানুষের সাথে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করা উচিত।[২৯৭]

শরীয়াতের অতি সাধারণ আদেশ-নিষেধের প্রতি অত্যাধিক গুরুত্ব দিতেন। ছোট ছোট নিষিদ্ধ কাজও এড়িয়ে চলতেন। পথ চলতে যদি ঘন্টাধ্বনি শোনা যেত, সাথে সাথে থেমে যেতেন, যাতে কানে না যায়।[২৯৮] তাঁর একটি বাড়ীতে একজন ভাড়াটিয়া ছিল। সে দাবা খেলতো। তিনি তাকে বলে দেন, যদি এ কাজ থেকে বিরত না হও, ঘর থেকে

---

২৯৪. মুওয়াত্তা ঃ সিয়ারু ইওমি 'আরাফা
২৯৫. আমীর ইসমাঈল ঃ শারহু বুলুগিল মুরাম-কিতাবুল 'ইতক
২৯৬. মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ ঃ বাবুল ইত্‌ক
২৯৭. আবু দাউদ ঃ কিতাবুল আদাব
২৯৮. মুসনাদ-৬/১৫২

বের করে দেব।[২৯৯]

আয়িশা বিনৃত তালহা বলেন ঃ একটি জিন বার বার হযরত আয়িশার (রা) ঘরে প্রবেশ করতো। তিনি তাকে এভাবে ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করতে থাকেন। এমন কি তাকে হত্যার হুমকি দেন। তবুও সে আসতে থাকে। একদিন তিনি লোহার একটি দণ্ড দিয়ে জিনটিকে আঘাত করে হত্যা করেন। এরপর তিনি স্বপ্নে দেখেন, কেউ একজন তাঁকে বলছেন, আপনি অমুককে হত্যা করেছেন, অথচ তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আপনি যখন পর্দা অবস্থায় থাকতেন তখন ছাড়া তিনি তো আপনার ঘরে ঢুকতেন না। তিনি যেতেন আপনার নিকট থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস শোনার জন্য। হযরত আয়িশা (রা) তাঁর এই স্বপ্নের কথা পিতাকে বললেন।' তিনি তাঁকে দিয়াত (রক্তপণ) হিসেবে বারো হাজার দিরহাম সাদাকা করে দেওয়ার জন্য বলেন। ইমাম জাহাবী এ ঘটনা তাঁর *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে এই ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, জিনটি সাপের রূপ ধরে আসতো এবং তার দিয়াত হিসেবে হযরত আয়িশা (রা) একটি দাস মুক্ত করেন।

## হযরত 'আয়িশার (রা) স্থান ও মর্যাদা

সহীহ মুসলিমের 'আল-ফাদায়িল অধ্যায়ে এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি বিরাট জিনিস রেখে যাচ্ছি ঃ আল্লাহর কিতাব এবং আহলি বায়ত (আমার পরিবার-পরিজন)। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, রাসূলুল্লাহর (সা) এ বাণীর তাৎপর্য হলো, যদিও কিতাবুল্লাহ তার সহজ-সরল ভাষা ও বর্ণনার জন্য সহজেই বোধগম্য এবং বাস্তবায়নযোগ্য তবুও সর্বদাই দুনিয়াতে এমন সব মানুষের প্রয়োজন থাকবে যারা তার রহস্যসমূহ উদঘাটন করতে পারেন এবং তার ইলমী ও আমলী ব্যাখ্যা দিতে পারেন। রাসূলুল্লাহর (সা) পরে এমন ব্যক্তিদের আহলে বায়তের মধ্যে তালাশ করা উচিত।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) হযরত আয়িশা (রা) সম্পর্কে যে সকল মন্তব্য ও বাণী রেখে গেছেন, আয়িশাও (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচার্য ও শিক্ষায় যে ভাবে নিজেকে যোগ্য করে তুলেছেন, সর্বোপরি তিনি স্বীয় স্বভাবগত তীক্ষ্ণ মেধা ও যোগ্যতা দ্বারা নিজেকে যেভাবে শানিত করেছেন, তাতে আহলি বায়তের মধ্যে তাঁর যে এক বিশেষ মর্যাদার আসন ছিল, সে ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। এরই ভিত্তিতে বলা যেতে পারে, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং ইসলামী হুকুম-আহকামের শিক্ষাদান তাঁর চেয়ে ভালো আর কে করতে পারতেন? লোকেরা তো কেবল বাইরের নবীকে প্রত্যক্ষ করতেন, অভ্যন্তরের নবী থাকতেন তাদের দৃষ্টির আড়ালে। পক্ষান্তরে হযরত আয়িশা (রা) বাহির ও গৃহাভ্যন্তর—সর্ব অবস্থার নবীকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করতেন। আর একারণেই আল্লাহর নবী বলেছেন ঃ[৩০০]

---

২৯৯. আদাবুল মুফরাদ,-২৩২

৩০০. বুখারী, তিরমিযী ঃ মানাকিবু আয়িশা (রা)

فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ-

–নারী জাতির উপর 'আয়িশার (রা) মর্যাদা তেমন, যেমন সকল খাদ্য-সামগ্রীর উপর সারীদের মর্যাদা।

রাসূলুল্লাহ (সা) সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে আয়িশাকে (রা) স্ত্রী হিসেবে লাভের সুসংবাদ পান। তাঁর বিছানা ছাড়া আর কোন স্ত্রীর বিছানায় রাসূল (সা) ওহী লাভ করেননি। মহান ফিরিশতা জিবরীল আমীন তাঁকে সালাম পেশ করেছেন। তিনি দুইবার জিবরীলকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে আয়াত নাযিল করেছেন। আর তিনিই যে আখিরাতের জীবনে রাসূলে পাকের স্ত্রী হবেন, সেকথাও রাসূল (সা) জানিয়ে গেছেন। এ সকল কথা সহীহ্ বুখারীর আয়িশার সম্মান ও মর্যাদা অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আয়িশা (রা) বলতেন, আমি গর্বের জন্য নয়, বরং বাস্তব কথাই বলছি। আর তা হলো, আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যা আর কাকেও দান করেননি। (১) ফিরিশতা রাসূলুল্লাহকে (সা) স্বপ্নের মধ্যে আমার ছবি দেখিয়েছেন, (২) আমার সাত বছর বয়সে রাসূল (সা) আমাকে বিয়ে করেছেন, (৩) নয় বছর বয়সে আমি স্বামীগৃহে গমন করেছি, (৪) আমিই ছিলাম রাসূলুল্লাহর (সা) একমাত্র কুমারী স্ত্রী, (৫) যখন তিনি আমার বিছানায় থাকতেন তখনও তাঁর উপর ওহী নাযিল হতো, (৬) আমি ছিলাম রাসূলুল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় স্ত্রী, (৭) আমার নির্দোষিতা ঘোষণা করে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে, (৮) জিবরীলকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি, (৯) রাসূল (সা) আমার কোলে মাথা রেখে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেছেন, (১০) আমি তাঁর খলীফা ও তাঁর সিদ্দীকের কন্যা, (১১) আমাকে পবিত্র করে সৃষ্টি করা হয়েছে, (১২) আমার মাগফিরাত এবং জান্নাতে আমাকে উত্তম জীবিকা দানের অঙ্গিকার করা হয়েছে, (১৩) রাসূলুল্লাহর (সা) পার্থিব জীবনের সর্বশেষ মুহূর্তে আমার মুখের লালা তাঁর লালার সাথে মিলেছে, (১৪) আমারই ঘরে তাঁর কবর দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের আরো গৌরব ও মর্যাদার কথা তিনি নিজেও যেমন বলেছেন, তেমনি আরো বহু সাহাবী বর্ণনা করেছেন। হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে যা ছড়িয়ে আছে।[৩০১]

হযরত 'আয়িশার (রা) এত সব মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য দেখে কোন কোন আলিম মনে করেছেন, তিনি তাঁর পিতা আবু বকর (রা) থেকেও উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। ইমাম জাহাবী বলেন, 'তাঁদের একথা গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা প্রত্যেকটি জিনিসের বিশেষ বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। আমরা বরং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, দুনিয়া ও আখিরাতে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রী। এর চেয়ে বড় গর্বের বিষয় তাঁর জন্য আর কিছু কি আছে? তা সত্ত্বেও হযরত খাদীজার এমন বৈশিষ্ট্য আছে যা কেউ অর্জন

---

৩০১. দেখুন ঃ সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা ঃ ৩/১৪০-১৪১, ১৪৬-১৪৭/১৯১; তাবাকাত ঃ ৩/৬৮

করতে পারেনি। হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি, অনেকগুলি কারণে তাঁর চেয়ে খাদীজার মর্যাদা অনেক বেশী।'[৩০২]

হযরত 'আয়িশা সিদ্দীকার (রা) সীরাতে মুবারাকার প্রতি যখন আমরা একটা বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক দৃষ্টিপাত করি তখন কেবল সকল মহিলা সাহাবী নয়, বরং অনেক বড় বড় পুরুষ সাহাবীদেরও তুলনায় তাঁর মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যটি পরিপূর্ণরূপে পাই তা হলো, তিনি জন্ম ও স্বভাবগতভাবে চিন্তা ও অনুধ্যানশীল মেধা ও মস্তিষ্ক লাভ করেছিলেন। দ্বীনের তাৎপর্য বিষয়ে গভীর জ্ঞান, ইজতিহাদের ক্ষমতা ও শক্তি, সমালোচনা ও পর্যালোচনার রীতি-পদ্ধতি, ঘটনাবলীর যথাযথ উপলব্ধি, গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং শুদ্ধ ও সঠিক সিদ্ধান্ত ও মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর স্থান ছিল অতি উচ্চে।

তিনি যে সব কথা বলতেন, যেসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিতেন, তা হতো বিলকুল প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির অনুকূলে। তাঁর এমন কোন বর্ণনা খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য হবে যা সমর্থনের জন্য মানুষের বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাকে নানা রকম তাবীল বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। একথা অবশ্য সত্য যে, রাসূলুল্লাহর (সা) অতি নিকটের মানুষ হওয়ার সুবাদে তিনি তাঁর যাবতীয় কথা ও কাজ অধ্যয়নের খুব চমৎকার সুযোগ লাভ করেছিলেন। কিন্তু যখন আমরা দেখি যে, তিনি ছাড়া আরও অনেক ব্যক্তি এমন ছিলেন যাঁদের নৈকট্য তাঁর চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না তখন আমাদের সামনে হযরত 'আয়িশার (রা) মেধা ও মননের শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঘুরে ফিরে সেই একই কথা আসে, রাসূলুল্লাহর (সা) মুখনিঃসৃত বাণী 'আয়িশা (রা) ছাড়া আরো অনেকে শুনতেন, কিন্তু তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌছতেন এবং তার প্রকৃত প্রাণসত্তা তাঁর মেধা ও মস্তিষ্ক যতটুকু অনুধাবন করতে সক্ষম হতো, অন্যরা তা পারতো না।

উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) দারসগাহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মেধাবী শিক্ষার্থী। তাঁর জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতা ছিল অতুলনীয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তৎকালীন সকল নারী অথবা সকল উম্মাহাতুল মুমিনীন (রাসূলুল্লাহর সহধর্মিণীগণ, যাঁরা বিশ্বের সকল বিশ্বাসীদের মাতা), অথবা সাহাবীদের একটি অংশের উপরই ছিল না, বরং কতিপয় বিশিষ্ট সাহাবী ছাড়া সকল সাহাবীর উপরই ছিল। হযরত আবু মূসা আল-আশ'য়ারী (রা) বলেন ঃ[৩০৩]

مَا اَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلاَّوَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا ـ

–আমরা মুহাম্মাদ (সা)-এর সাহাবীরা কক্ষণো এমন কোন কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হইনি, যে বিষয়ে আমরা 'আয়িশার (রা) নিকট জানতে চেয়েছি এবং সে সম্পর্কে কোন

৩০২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৩/১৪০

৩০৩. জামে তিরমিজী মানাকিবু 'আয়িশা (রা); সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৭৯; তাজকিরাতুল হুফফাজ-১/২৮; আল-ইসাবা-৪/৩৬০

জ্ঞান আমরা তাঁর কাছে পাইনি।

হযরত আবু মূসা আল-আশ'য়ারী (রা) একজন অতি উঁচু মর্যাদার সাহাবী। তাঁর উপরোক্ত মন্তব্য দ্বারা হযরত 'আয়িশার (রা) জ্ঞানের পরিধিও বিস্তৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। প্রখ্যাত তাবে'ঈ হযরত 'আতা ইবন আবী রাবাহ—যিনি বহু সাহাবীর ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, বলেন ঃ৩০৪

كَانَتْ عَائِشَةُ أَفْقَهُ النَّاسِ وَأَعْلَمُ النَّاسِ وَأَحْسَنُ النَّاسِ رَأيًا فِى الْعَامَّةِ:

–হযরত 'আয়িশা (রা) ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ, সবচেয়ে বেশী জানা ব্যক্তি এবং আম জনতার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর মতামতের অধিকারিনী।

তাবে'ঈদের ইমাম বলে খ্যাত হযরত ইমাম যুহ্‌রী—যিনি একাধিক অতি মর্যাদাবান সাহাবীর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন, বলেন ঃ৩০৫

"كانت عائشة أعلم الناس يسئلها الأكابرأصحاب رسول الله صلى الله عليه رسلم "

–হযরত 'আয়িশা (রা) মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় 'আলিম ছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) অনেক বড় বড় সাহাবী তাঁর কাছে জানতে চাইতেন।

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফের (রা) সুযোগ্য পুত্র আবু সালামা যিনি একজন অতি উঁচু স্তরের তাবে'ঈ ছিলেন, বলেন ঃ৩০৬

مارأيت أحدا أعلم بسنن رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا أفقه فى رأى ان احتيج ألى رأيه ولا اعلم بآية فيما نزلت ولا فريضة من عائشة -

–রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাতের জ্ঞান, প্রয়োজনে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দান, আয়াতের শানে নুযুল এবং ফরজ বিষয়সমূহে আমি 'আয়িশা (রা) অপেক্ষা অধিকতর পারদর্শী ও সুচিন্তিত মতামতের অধিকারী আর কাউকে দেখিনি।

হযরত আমীর মু'য়াবিয়া (রা) একদিন দরবারের এক ব্যক্তির কাছে জানতে চাইলেন, আচ্ছা, আপনি বলুন তো, বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড় 'আলিম কে? লোকটি বললো ঃ আমীরুল মমিনীন! আপনি। আমীর মু'য়াবিয়া (রা) বললেন ঃ না। আমি কসম দিচ্ছি, আপনি সত্য কথাটি বলুন। তখন লোকটি বললো ঃ যদি তাই হয়, তাহলে 'আয়িশা (রা)।

---

৩০৪. আল-মুসতাদরিক-৪/১১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৮৫

৩০৫. মুসনাদ-৬/৪৫০

৩০৬. আল-মুসতাদরিক-৪/১১

হযরত 'উরওয়া ইবন যুবাইর (রা) বলেন ঃ৩০৭

ما رأيت أحدا اعلم بالحلال والحرام، والعلم والشعر والطب من عائشة أم المؤمنين"

–আমি হালাল-হারাম, জ্ঞান, কবিত্ব ও চিকিৎসা বিদ্যায় উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশা (রা) অপেক্ষা অধিকতর পারদর্শী অন্য কাউকে দেখিনি।

অপর একটি বর্ণনায় হযরত 'উরওয়ার কথাগুলি এভাবে এসেছে ঃ৩০৮

ما رأيت أحدا اعلم بالقران ولا بفريضة ولا بحلال ولا بفقه ولا بشعرولا بطب ولا بحديث العرب ولا نسب من عائشة"

–কুরআন, ফারায়েজ, হালাল-হারাম, ফিকাহ, কাব্য, চিকিৎসা, আরবের ইতিহাস ও নসব বিদ্যায় আমি 'আয়িশার (রা) চেয়ে বড় আলিম আর কাউকে দেখিনি।

প্রখ্যাত তাবে'ঈ হযরত মাসরূক (র)—যিনি হযরত 'আয়িশার (রা) তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন, একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হলো ঃ উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশা (রা) কি ফারায়েজ শাস্ত্র জানতেন? তিনি জবাব দিলেন ঃ৩০৯

أى والذى نفسى بيده لقد رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسئلونها عن الفرائض" -

–সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন! আমি বড় বড় সাহাবীদেরকে তাঁর নিকট ফারায়েজ বিষয়ে প্রশ্ন করতে দেখেছি।

রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস ও সুন্নাতের হিফাজত ও প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য বেগমগণও করেছেন। তবে তাঁদের কেউই হযরত 'আয়িশার (রা) স্তরে পৌঁছতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে মাহমূদ ইবন লাবীদ মন্তব্য করেছেন ঃ৩১০

"كان أزواج النبى صلى الله عليه وسلم يحفظن من حديث النبى صلى الله عليه وسلم كثيرا ولا مثلا لعائشة وأم سلمة" -

–রাসূলুল্লাহর (সা) বেগমগণ বহু হাদীস স্মৃতিতে ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু কেউ 'আয়িশা (রা) ও উম্মু সালামার (রা) সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেননি।

এ ব্যাপারে ইমাম যুহরী (র) সাক্ষ্য দিচ্ছেন ঃ৩১১

---

৩০৭. যারকানী-৩/২২৭; তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২৮
৩০৮. তাবাকাত-৮/৭৭
৩০৯. আল-মুসতাদরিক-৪/১১; আল-ইসাবা-৪/৩৬০
৩১০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৮৫; তাবাকাত-৮/৭৬
৩১১. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৮৫

لو جمع علم الناس كلهم وعلم أزواج النبى صلى الله عليه وسلم فكانت عائشة أوسعهم علما ـ

–যদি সকল মানুষ ও রাসূলুল্লাহর (রা) বেগমদের ইল্‌ম (জ্ঞান) একত্র করা যেত তাহলে তাদের মধ্যে 'আয়িশার (রা) ইল্‌ম বা জ্ঞান অধিকতর প্রশস্ত ও বিস্তৃত হতো।

অপর একটি বর্ণনা মতে ইমাম যুহরী বলেন ঃ[৩১২] গোটা নারী জাতির ইল্‌ম (জ্ঞান) এবং 'আয়িশার (রা) ইল্‌ম যদি একত্র করা যেত তাহলে 'আয়িশার (রা) ইল্‌মই শ্রেষ্ঠ হতো।'

উপরের বর্ণনাসমূহের প্রেক্ষিতে 'আল্লামা জাহাবী বলেন ঃ[৩১৩] 'তিনি ছিলেন বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার।' তিনি আরো বলেন ঃ[৩১৪] 'উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে, সার্বিকভাবে মহিলাদের মধ্যে তাঁর চেয়ে বড় জ্ঞানী ব্যক্তি নেই।'

কোন কোন মুহাদ্দিস 'আয়িশার (রা) ফজীলাত বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি হাদীস বর্ণনা করেন ঃ[৩১৫]

خُذُوْا شَطْرَ دِيْنِكُمْ عَنْ حُمَيْرَاءَ ـ

–তোমাদের দ্বীনের একটি অংশ তোমরা হুমায়রা হতে গ্রহণ কর।

ইল্‌ম ও ইজতিহাদ বা জ্ঞান ও গবেষণায় হযরত 'আয়িশা (রা) কেবল মহিলাদের মধ্যেই নন, বরং পুরুষদের মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করতে সক্ষম হন। কুরআন, সুন্নাহ, ফিকাহ ও আহকাম বিষয়ক জ্ঞানে তাঁর স্থান ও মর্যাদা এত উর্ধে যে 'উমার (রা), আলী (রা), আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা), আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) প্রমুখের সাথে তাঁর নামটি নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করা যায়। এখানে সংক্ষেপে আমরা বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতা সম্পর্কে একটি আলোচনা উপস্থাপন করছি।

### আল-কুরআন

আমরা জানি পবিত্র কুরআন দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে নাযিল হয়। হযরত 'আয়িশা (রা) নুযূলে কুরআনের চতুর্দশ বছরে মাত্র নয় বছর বয়সে রাসূলুল্লাহর ঘরে আসেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর সহ-অবস্থানের সময়কাল দশ বছরের উর্ধে নয়। নুযূলে কুরআনের বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত হয় তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি ও বয়োপ্রাপ্তির পূর্বে। কিন্তু এমন অসাধারণ মেধা ও মননের অধিকারী সত্তা তাঁর শৈশবকালকেও বৃথা যেতে দেয়নি। মক্কায় রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন সময় হযরত সিদ্দীকে আকবরের (রা) গৃহে

---

৩১২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৪০

৩১৩. তাজকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/২৮

৩১৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৪০

৩১৫. এই হাদীসটি ইবনুল আসীর 'আন-নিহায়া' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। সাইয়্যেদ সুলায়মান নাদবী বলেছেন, হাদীসটির সনদ প্রমাণিত নয় এবং এটি 'মাওজু' (বানোয়াট) হাদীসের মধ্যে পরিগণিত। তা সত্ত্বেও অর্থগত দিক দিয়ে এটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কার সন্দেহ থাকতে পারে? (সীরাতে 'আয়িশা (রা)-১৭৩)

আসতেন। সিদ্দীকে আকবরও (রা) নিজ গৃহে একটি মসজিদ বানিয়েছিলেন। সেখানে বসে তিনি অত্যন্ত বিনয় ও ভয়-বিহ্বল চিত্তে কুরআন পাক তিলাওয়াত করতেন।[৩১৬]

হযরত 'আয়িশার (রা) অস্বাভাবিক স্মৃতিশক্তির জন্য এ সকল পরিবেশ ও অবস্থা থেকে কোন ফায়দা লাভ না করাটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তাই আমরা তাঁকে সূরা 'আল-কামার'-এর ৩য় আয়াত–

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهٰى وَأَمَرُّ -

সম্পর্কে বলতে শুনি ঃ

لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلْعَم بِمَكَّةَ وَإِنِّى لَجَارِيَةٌ الْعَبُ

–আয়াতটি মক্কায় মুহাম্মাদের (সা) উপর নাযিল হয়। আমি তখন একটি ছোট্ট মেয়ে, খেলা করি।[৩১৭]

ইফ্ক (বানোয়াট দোষারোপ)-এর ঘটনা যখন ঘটে তখন হযরত 'আয়িশার (রা) বয়স ১৩/১৪ বছর হবে। তখন পর্যন্ত কুরআনের খুব বেশী অংশ হিফ্জ করেননি। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ[৩১৮]

أَنَاجَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السَّنِّ لاَ اَقْرَاُ مِنَ الْقُرْاٰنِ كَثِيْرًا -

–সেই সময় আমি একটি কম বয়সী মেয়ে, খুব বেশী কুরআন পড়িনি।' কিন্তু তা সত্ত্বেও তখনই কুরআনের উদ্ধৃতি পেশ করতেন।

আবূ ইউনুস নামে হযরত 'আয়িশার (রা) একটি দাস ছিল। সে লেখাপড়া জানতো। তিনি এই আবু ইউনুসকে দিয়ে নিজের জন্য কুরআন লিখিয়েছিলেন।[৩১৯]

অনারবদের সাথে মেলামেশার কারণে কুরআন পাঠে তারতম্য সবচেয়ে বেশী দেখা দেয় ইরাকে।

একবার ইরাক থেকে এক ব্যক্তি হযরত 'আয়িশার (রা) সাথে দেখা করতে আসে। সে বলে, উম্মুল মুমিনীন! আমাকে আপনার কুরআনটি একটু দেখান। হযরত 'আয়িশা (রা) কারণ জানতে চাইলে সে বললো, আমাদের ওখানে লোকেরা এখনো পর্যন্ত কুরআন পাঠে কোন ক্রমধারা অনুসরণ করেনা। আমি চাই, আমার কুরআনটি আপনার কুরআনের অনুরূপ সাজিয়ে নিই। তিনি বললেন, সূরাসমূহের বিন্যাস আগে-পিছে হওয়াতে কোন ক্ষতি নেই। তারপর নিজের কুরআনটি বের করে প্রত্যেক সূরার আয়াতসমূহ প্রথম থেকে পাঠ করে লিখিয়ে দেন।[৩২০]

---

৩১৬. সহীহ আল-বুখারী ঃ বাবুল হিজরাহ
৩১৭. প্রাগুক্ত ঃ তাফসীর সূরা আল-কামার; বাবু তা'লীফ আল-কুরআন
৩১৮. প্রাগুক্ত ঃ আল-ইফ্ক
৩১৯. মুসনাদ ঃ ৬/৭৩
৩২০. সহীহ আল-বুখারী ঃ বাবু জাম'ইল কুরআন; বাবু তা'লীফ আল-কুরআন

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বৈবাহিক জীবনে হযরত 'আয়িশার অভ্যাস ছিল, যদি কোন আয়াতের অর্থ বোধগম্য না হতো, স্বামী রাসূলুল্লাহকে (সা) প্রশ্ন করে জেনে নিতেন। সহীহ্ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহর (রা) নিকট বহু আয়াত সম্পর্কে তাঁর প্রশ্নের কথা বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) বেগমগণ উম্মাহাতুল মুমিনীনের প্রতি নির্দেশ ছিল ঃ৩২১

"وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ" -

–হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে।

তাঁরা এই নির্দেশ অনুযায়ী নিজ নিজ যোগ্যতা ও সাধ্যমত 'আমল করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাজ্জুদের নামাযে অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে এবং বিনয় ও বিনম্র চিত্তে কুরআনের বড় বড় সূরা তিলাওয়াত করতেন। সেইসব নামাযে হযরত 'আয়িশাও (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) পিছনে ইকতাদা করতেন।৩২২ একমাত্র হযরত 'আয়িশা (রা) ছাড়া আর কোন বেগমের বিছানায় কুরআনের নুযূল হয়নি। এমতাস্থায় নাযিলকৃত আয়াতের প্রথম ধ্বনিটি তাঁর কানেই যেত। তিনি বলছেন ঃ 'সূরা আল-বাকারা ও সূরা আন-নিসা যখন নাযিল হয় তখন আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছেই ছিলাম।'৩২৩

মোটকথা, এ সকল পরিবেশ ও অবস্থার কারণে হযরত 'আয়িশা (রা) কুরআনের প্রতিটি আয়াতের পাঠ পদ্ধতি, ভাব ও তাৎপর্য এবং হুকুম-আহকাম বের করার পন্থা-পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেন। এ কারণে, কোন বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে সর্বপ্রথম তিনি কুরআন পাকের প্রতি দৃষ্টি দিতেন। আকায়েদ, ফিকাহ, আহকাম ছাড়াও রাসূলুল্লাহর (সা) সীরাত ও আখলাক– যা মূলত ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত, সবকিছুই তিনি কুরআন পাক দ্বারা বুঝার চেষ্টা করতেন। একবার কিছু লোক তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলো। তারা বললো ঃ উম্মুল মুমিনীন! আপনি আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহর (সা) কিছু আখলাকের কথা বর্ণনা করুন! তিনি বললেন ঃ তোমরা কি কুরআন পড় না? তাঁর আখলাক হলো আল-কুরআন। তারা আবার প্রশ্ন করলো ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) রাত্রিকালীন ইবাদাতের পদ্ধতি কেমন ছিল? বললেন ঃ তোমরা কি সূরা 'মুয্যাম্মিল' পড়নি?৩২৪

সহীহ্ সনদে সাহাবায়ে কিরাম থেকে কুরআন কারীমের তাফসীর খুব কমই বর্ণিত হয়েছে। যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে হযরত 'আয়িশার (রা) তাফসীরমূলক বর্ণনা একেবারে কম নয়। এখানে তার কয়েকটি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো ঃ

---

৩২১. সূরা আল-আহযাব-৩৪

৩২২. মুসনাদ-৬/৯২

৩২৩. সহীহ আল-বুখারী ঃ বাবু তা'লীফ আল-কুরআন

৩২৪. আবূ দাউদ ঃ কিয়ামুল লাইল; মুসনাদ-৬/৫৪

সাফা ও মারওয়ার পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে দৌড়ানো হজ্জের একটি অন্যতম প্রধান কাজ। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে নিম্নের আয়াতটি এসেছে ঃ[৩২৫]

إِنَّ الصَّفَاوَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِاللّٰهِ-فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا"

–নি ঃসন্দেহে 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহ তা'য়ালার নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কা'বাঘরে হজ্জ বা উমরা করে, তাদের পক্ষে এ দুইটির তাওয়াফ করাতে কোন দোষ নেই।

একদিন 'উরওয়া বললেন ঃ খালাআম্মা! এই আয়াতের অর্থ তো এটাই যে, কেউ যদি সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ না করে তা হলেও কোন দোষ নেই। 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ ভাগ্নে! তুমি ঠিক বলোনি। যদি আয়াতটির অর্থ তাই হতো যা তুমি বুঝেছো, তাহলে আল্লাহ্ এভাবে বলতেন ঃ

لَا جُنَاحَ اَنْ لَّا يُطَّوَّفَ بِهِمَا-

–অর্থাৎ ওদের তাওয়াফ না করাতে কোন দোষ নেই। মূলত আয়াতটি আনসারদের শানে নাযিল হয়েছে। মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা ইসলাম-পূর্ব জীবনে 'মানাত' দেবীর উপাসনা করতো। মানাতের মূর্তি ছিল কুদাইদ-এর কাছে 'মুশাল্লাল' পাহাড়ে। এ কারণে তারা সাফা-মারওয়ার তাওয়াফকে খারাপ মনে করতো। ইসলাম গ্রহণের পর তারা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট জিজ্ঞেস করে, ইসলামের পূর্বে আমরা এমন করতাম, এখন এর বিধান কি? এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ বলেন, সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ কর, এতে দোষের কিছু নেই। এরপর তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করেছেন। এখন তা ত্যাগ করার অধিকার কারো নেই।[৩২৬]

হযরত 'আয়িশার (রা) এই তাফসীর দ্বারা যে মূলনীতিটা বেরিয়ে আসে তা হলো, কুরআন বুঝতে হলে আরবদের বাকবিধি ও ব্যবহৃত শব্দের অর্থের ভিত্তিতে বুঝতে হবে।

সূরা ইউসূফের ১১০তম আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

حتى اذااستيئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوآ جاءهم نصرنا"

–অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হলেন এবং লোকে ভাবলো যে, রাসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হয়েছে তখন তাদের নিকট আমার সাহায্য আসলো।

হযরত 'উরওয়া হযরত 'আয়িশাকে (রা) প্রশ্ন করলেন– كُذِبُوْا

---

৩২৫. সূরা আল-বাকারা-১৫৮

৩২৬. সহীহ আল-বুখারী ঃ তাফসীর সূরা আল-বাকারা; বাবু উজ্জুর আস-সাফা ওয়া আল-মারওয়া

(অর্থাৎ রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে) হবে, না كُذِّبُوْا (অর্থাৎ তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে) হবে? 'আয়িশা (রা) বললেন- كُذِّبُوْا (মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে) হবে। 'উরওয়া বললেন ঃ রাসূলগণের তো দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে এবং তাঁদের স্বজাতির লোকেরা তাঁদেরকে নবুওয়াতের দাবীকে মিথ্যা বলেছে তখন ظَنُّوْا। অর্থাৎ তাঁরা ধারণা বা অনুমান করলো- কথাটির তাৎপর্য কি? একারণে كُذِبُوْا। (তাদেরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে) হওয়াই শুদ্ধ হবে।[৩২৭] হযরত 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ মা'য়াজ আলাহ্! আল্লাহর নবী-রাসূলগণ কি আল্লাহ সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করতে পারেন যে, তাদেরকে সাহায্যের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে? হযরত 'উরওয়া তখন জানতে চাইলেন ঃ তাহলে আয়াতটির অর্থ কি হবে? বললেন ঃ কথাটি বলা হয়েছে রাসূলদের অনুসারীদের সম্পর্কে। যখন তারা ঈমান আনলো, তাঁদের নবুওয়াতকে সত্য বলে স্বীকার করলো তখন স্বজাতির লোকেরা তাদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন চালালো। সেই সময় আল্লাহর সাহায্য আসতে বিলম্ব হচ্ছে বলে তারা এরূপ মনে করলো। এমন কি রাসূলগণ স্বজাতির অস্বীকারকারীদের ঈমানের ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেলেন। তাঁদের ধারণা হলো আল্লাহর সাহায্যের এই বিলম্বের কারণে ঈমানদারগণ আমাদের মিথ্যাবাদী বলে না দেয়। এমন সময় হঠাৎ আল্লাহর সাহায্য এসে যায়।[৩২৮]

স্ত্রীর যদি স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে সে ক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশ হলো ঃ[৩২৯]

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا أَوْاِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ-

-কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে তবে তারা আপোষ-নিষ্পত্তি করতে চাইলে কোন দোষ নেই, এবং আপোষ-নিষ্পত্তিই শ্রেয়।

অসন্তুষ্টি দূর করার জন্য আপোষ-মীমাংসা করে নেওয়া তো একটি সাধারণ ব্যাপার। এর জন্য আল্লাহ্ পাকের এক বিশেষ হুকুম নাযিলের কি প্রয়োজন ছিল? হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন, এ আয়াত সেই স্ত্রীর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যার স্বামী তার কাছে তেমন আসে না। অথবা স্ত্রীর বয়স বেশী হওয়ার কারণে স্বামীকে তৃপ্ত করতে সক্ষম নয়। এমন বিশেষ অবস্থায় স্ত্রী যদি তালাক নিতে না চায় এবং স্ত্রী অবস্থায় থেকে স্বামীর নিকট প্রাপ্য নিজের অধিকার ছেড়ে দেয়, তাহলে এমন আপোষ-নিষ্পত্তি খারাপ নয়। বরং বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার চেয়ে তা উত্তম।[৩৩০]

---

৩২৭. প্রসিদ্ধ কিরআত (পাঠ) كُذِبُوْا , হযরত ইবন আব্বাস ও (রা) এই কিরআত বর্ণনা করেছেন

৩২৮. সহীহ্ বুখারী ঃ তাফসীর সূরা ইউসুফ

৩২৯. সূরা আন-নিসা-১২৮

৩৩০. মুসনাদ-৫/২০৬

আল্লাহ্ তা'য়ালা সূরা আল-বাকারার ২৩৮তম আয়াতে বলেছেন ঃ

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى -

—তোমরা সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে।

'মধ্যবর্তী নামায' বলতে কি বুঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হযরত যায়িদ ইবন সাবিত (রা) ও হযরত 'উসামার (রা) মতে, মধ্যবর্তী নামায হলো জুহরের নামায। কোন কোন সাহাবীর মতে ফজরের নামায। হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন, মধ্যবর্তী নামায বলতে আসরের নামায বুঝানো হয়েছে। তিনি নিজের এই তাফসীরের উপর এতখানি দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন যে, নিজের মাসহাফখানির পার্শ্বটীকায় وصلوة العصر কথাটি লিখিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত 'আয়িশার (রা) দাস আবু ইউনুস বলেন, তিনি আমাকে একখানি কুরআন লেখার নির্দেশ দিয়ে বলেন, যখন এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছবে, আমাকে জানাবে। আমি যখন এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম, তখন তিনি والصلوة الوسطى-এর পরে وصلوة العصر কথাটি লেখান।

তারপর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে এমনই শুনেছি।[৩৩১]

মূলত صلوة العصر কুরআনের আয়াত নয়, বরং والصلوة الوسطى -এর তাফসীর।

সূরা আল-বাকারার ২৮৪তম আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

وَإِنْ تُبْدُوْا مَافِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ"

—তোমরা তোমাদের মনে যা কিছু আছে তা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। তারপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দিবেন।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় মানুষের অন্তরে মুহূর্তের জন্য যে সকল ভাব ও কল্পনার উদয় হয়, আল্লাহ তার সবকিছুরই হিসাব নিবেন। কিন্তু অনিচ্ছাকৃত যে সকল ওস্ওসা এবং কল্পনার উদয় হয় তারও পাকড়াও যদি আল্লাহ করেন তাহলে মানুষের পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভব হবে। হযরত আলী (রা) ও ইবন আব্বাস (রা) বলেন, এ আয়াতের হুকুম একই সূরার ২৮৬তম আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে।[৩৩২] আয়াতটির অর্থ নিম্নরূপ ঃ

'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে।'

---

৩৩১. তিরমিজী ঃ উক্ত আয়াতের তাফসীর; সহীহ বুখারী ঃ উক্ত আয়াতের তাফসীর

৩৩২. তিরমিজী ঃ উক্ত আয়াতের তাফসীর

হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'উমারও (রা) উপরোক্ত মত পোষণ করেন।[৩৩৩] কোন এক ব্যক্তি হযরত 'আয়িশার (রা) নিকট উপরোক্ত আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করে। সাথে সাথে সে সূরা আন-নিসার ১২৩তম আয়াতটি পেশ করে। আয়াতটির অর্থ ঃ 'যে কেউ মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি পাবে'।

প্রশ্নকারীর বক্তব্য ছিল, এই যদি অবস্থা হয় তাহলে আল্লাহর মাগফিরাত ও রহমত বান্দা কিভাবে লাভ করবে এবং সে মুক্তির আশাই বা কেমন করে করবে? হযরত 'আয়িশা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এ আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করার পর সর্বপ্রথম তুমিই আমার কাছে প্রশ্ন করেছো। আল্লাহর বাণী সত্য। তবে আল্লাহ তা'য়ালা তার বান্দাদের ছোট ছোট ভুল-ত্রুটি নানা রকম মুসীবত ও বিপদের বিনিময়ে ক্ষমা করে দেন। একজন মুমিন ব্যক্তি যখন অসুস্থ হয় অথবা তার উপর কোন বিপদ আসে, এমন কি পকেটে কোন জিনিস রেখে ভুলে যায় এবং তা তালাশ করতে করতে অস্থির হয়ে পড়ে– এর সবকিছুই তার মাগফিরাত ও রহমত লাভের কারণ ও বাহানা হয়ে দাঁড়ায়। তারপর অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, সোনা আগুনে পুড়ে যেমন নিখাঁদ হয়ে যায় তেমনি মুমিন ব্যক্তিও পাক-সাফ হয়ে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।[৩৩৪]

সূরা আন্-নিসার ষষ্ঠ আয়াতে ইয়াতীমের মাল সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ـ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

–যারা সচ্ছল তারা অবশ্যই ইয়াতীমের মাল খরচ করা থেকে বিরত থাকবে। আর যে অভাবগ্রস্ত সে সঙ্গত পরিমাণ খেতে পারে।

এ আয়াতের নির্দেশ ইয়াতীমের ওলীদের সম্পর্কে। হযরত ইবন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, উল্লেখিত আয়াতের হুকুম নিম্নোক্ত সূরা নিসার ১০ম আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে ঃ[৩৩৫]

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ـ

–যারা ইয়াতীমের অর্থসম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে।

কিন্তু পরবর্তী আয়াতে তো তাদের জন্য শাস্তির কথা বলা হয়েছে যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল খায়। এ কারণে হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন, যে আয়াতে খাওয়ার অনুমতি আছে সেটি সেইসব লোকদের জন্য যারা ইয়াতীমের বিষয়-সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য দেখা-শোনা করে। এমন ওলী যদি সচ্ছল হয় তাহলে তার বিনিময় গ্রহণ করা উচিত নয়। আর যদি দরিদ্র হয় তাহলে তার মর্যাদা অনুযায়ী কিছু গ্রহণ করতে পারে।[৩৩৬] মূলত হযরত 'আয়িশার (রা) এ তাফসীরের ভিত্তিতে দুইটি আয়াতের অর্থে

৩৩৩. সহীহ বুখারী ঃ উক্ত আয়াতের তাফসীর; তাফসীর অধ্যায়
৩৩৪. তিরমিজী ঃ উক্ত আয়াতের তাফসীর
৩৩৫. ইমাম আন-নাওয়াবী ঃ শারহু মুসলিম; কিতাবুত তাফসীর
৩৩৬. সহীহ বুখারী ঃ উক্ত আয়াতের তাফসীর; তাফসীর অধ্যায়

কোন বিরোধ থাকে না।

উপরে উদ্ধৃত আয়াতসমূহের মত আরো বহু আয়াতের তাফসীর হযরত 'আয়িশা (রা) থেকে হাদীস ও তাফসীর গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

## আল-হাদীস

রাসূলুল্লাহর (সা) বাস্তব সত্তাই হচ্ছে মূলত ইল্‌মে হাদীসের বিষয়বস্তু। এই কারণে যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) সবচেয়ে বেশী নৈকট্য লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন, এ শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞানও সবচেয়ে বেশী। ভাগ্যগুণে হযরত 'আয়িশা (রা) আবার এ সুযোগটি পেয়েছিলেন। হিজরাতের তিন বছর পূর্বে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ে হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতিদিন তাঁর পিতার গৃহে আসতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) হিজরাতের পরে অবশ্য ছয় মাসের জন্য স্বামীর দীদার থেকে মাহরূম থাকেন। মদীনায় আসার অল্প কিছুদিন পর স্বামীর ঘরে চলে যান, তারপর থেকে আর বিচ্ছিন্ন হননি। তাঁর শৈশব জীবনেই ইসলামের প্রথম পর্বটি অতিবাহিত হয়। কিন্তু তাহলে কি হবে, তাঁর স্বভাবগত মেধা ও স্মৃতিশক্তি সেই ক্ষতি পুষিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহর (সা) বেগমদের মধ্যে একমাত্র হযরত সাওদা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সহঅবস্থানের ব্যাপারে হযরত 'আয়িশা (রা) অপেক্ষা কয়েক মাস বেশী সময় লাভ করেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে একদিকে যেমন বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, অনুধাবন ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে পার্থক্য ছিল, অন্যদিকে তেমনি সাওদা (রা) ছিলেন বয়োবৃদ্ধা। তাঁর দৈহিক ও মানসিক শক্তি ক্ষয়িষ্ণু হতে চলেছিল। রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের কয়েক বছর পূর্বেই তিনি স্বামী সেবায় অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন। অপর দিকে হযরত 'আয়িশা (রা) ছিলেন উঠতি বয়সের এক নারী। সেই বয়সে দিন দিন তাঁর বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার উন্নতি ঘটছিল। রাসূলুল্লাহর (সা) পার্থিব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সেবার সুযোগ লাভ করেন। এই কারণে রাসূলুল্লাহর (সা) সার্বিক অবস্থা এবং শরীয়াতের যাবতীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে তাঁর অবগতি ছিল সবার চেয়ে বেশী।

হযরত সাওদা (রা) ছাড়া অন্য বেগমগণ হযরত 'আয়িশার (রা) পরে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ের বাঁধনে আবদ্ধ হন। যেহেতু হযরত সাওদা (রা) বার্ধক্যের কারণে নিজের বারির দিনটি হযরত 'আয়িশাকে (রা) দান করেন, তাই অন্যরা যখন প্রতি আট দিনে একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) একান্ত সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেতেন তখন হযরত 'আয়িশা (রা) পেতেন দুইদিন। আর যে মসজিদ ছিল আল্লাহর রাসূলের (সা) গণশিক্ষাকেন্দ্র, সৌভাগ্যক্রমে হযরত 'আয়িশার (রা) ঘরটি ছিল তারই সাথে। এই সকল কারণে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস ও জীবনধারা সম্পর্কে অবগতির ব্যাপারে বেগমগণের কেউই হযরত 'আয়িশার (রা) সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেননি।

হয়রত 'আয়িশার (রা) বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এত বেশী যে, রাসূলুল্লাহর (সা) বেগমগণ তথা সকল মহিলা সাহাবীদের শুধু নন, হাতেগোণা চার-পাঁচজন পুরুষ সাহাবী ছাড়া আর কেউই তাঁর সমকক্ষতার দাবী করতে পারেন না। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত 'উমার (রা), হযরত 'উসমান (রা), হযরত আলী (রা) প্রমুখের মত বড় বড়

সাহাবীরা তাঁদের দীর্ঘ সুহবত বা সাহচর্য, তীক্ষ্ম বোধ ও মেধা শক্তি ইত্যাদি কারণে 'আয়িশা (রা) থেকে মর্যাদার দিক দিয়ে অনেক উর্ধে ছিলেন। তবে একজন স্ত্রী স্বাভাবিকভাবে স্বামী সম্পর্কে এক মাসে যতটুকু জ্ঞান লাভ করতে পারে, আত্মীয়-বন্ধুরা বহু বছরেও তা পারে না। অন্যদিকে উল্লেখিত উঁচু স্তরের সাহাবীরা রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর পরই খিলাফতের গুরু দায়িত্ব পালনে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাই তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বর্ণনার সময় ও সুযোগ খুব কমই পেয়েছেন। তারপরেও তাঁদের বর্ণিত হাদীস যা সংরক্ষিত আছে তা বিচার ও বিধি-বিধান সংক্রান্ত। সেগুলিই আমাদের ফিকাহ শাস্ত্রের ভিত্তি। মূলত হাদীস বর্ণনার মূল দায়িত্ব পালন করেছেন যাঁরা খিলাফত পরিচালনার দায়িত্ব থেকে মুক্ত ছিলেন।

তাছাড়া ঐসকল উঁচু মর্যাদার সাহাবীর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এত কম হওয়ার আরো একটি কারণ আছে। তাঁদের যুগ ছিল পূর্ণভাবে সাহাবীদের যুগ। সে সময় একজনের অন্যজনের নিকট রাসূলুল্লাহর (সা) বাণী বা কর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করার খুব কমই প্রয়োজন পড়তো। সুতরাং হাদীস বর্ণনার সুযোগও হতো অতি অল্প। যাঁরা রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখেননি বা রাসূলুল্লাহর (সা) যুগ লাভ করেননি সেই পরবর্তী প্রজন্ম হলেন তাবে'ঈন। মূলত তাঁদের যুগ শুরু হয় রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের বিশ-পঁচিশ বছর পরে। তাঁরাই রাসূলুল্লাহর (সা) জীবন সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইতেন। কিন্তু তখন ঐসব উঁচু স্তরের সাহাবী দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। অন্যদিকে অল্পবয়সী সাহাবীরা তখন জীবনের মধ্য অথবা শেষ স্তরে এসে পৌছেছেন। তাঁরাই রাসূলুল্লাহর (সা) জীবন ও কর্ম সম্পর্কে তাবে'ঈদের জানার তৃষ্ণা মিটিয়েছেন। এ কারণে অধিকসংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে যে সকল সাহাবীর নাম হাদীসের গ্রন্থসমূহে দেখা যায় তাঁরা প্রায় সকলে রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের সময়ের কম বয়সী সাহাবী।

যে সকল সাহাবীর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এক হাজারের উর্ধে তাঁরা হলেন মাত্র সাতজন। নিম্নে তাঁদের নাম ও বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা উল্লেখ করা হলো ঃ

| | | |
|---|---|---|
| ১. | হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) | ৫৩৬৪ |
| ২. | হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) | ২৬৬০ |
| ৩. | হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) | ২৬৩০ |
| ৪. | হযরত জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা) | ২৫৪০ |
| ৫. | হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) | ২৬৮৬ |
| ৬. | হযরত 'আয়িশা সিদ্দীকা (রা) | ২২১০ |
| ৭. | হযরত আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) | ২২৭০ |

উপরে উল্লেখিত নামের পাশের সংখ্যা অনুযায়ী হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে হযরত 'আয়িশার (রা) স্থান সপ্তম। অবশ্য এই তালিকাটি সর্বজনগ্রাহ্য নয়। অনেকের মতে হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) ছাড়া আর কেউ হযরত 'আয়িশার (রা) চেয়ে বেশী হাদীস বর্ণনা করেননি। তাঁদের মতে অধিক হাদীস

বর্ণনাকারী হিসেবে হযরত 'আয়িশার (রা) স্থান তৃতীয়।[৩৩৭]

অধিক হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে যাঁদের নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের অধিকাংশ উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশার (রা) ইনতিকালের পরেও জীবিত ছিলেন। সুতরাং তাঁদের বর্ণনার ধারাবাহিকতা আরো কিছুকাল অব্যাহত ছিল। পুরুষদের তুলনায় হযরত 'আয়িশার (রা) অতিরিক্ত কিছু বাধ্যবাধকতা ছিল। যেমন তিনি ছিলেন একজন পর্দানশীন নারী। পুরুষ বর্ণনাকারীদের মত প্রতিটি মজলিসে উপস্থিত থাকতে পারতেন না এবং শিক্ষার্থীরা ইচ্ছা করলেই যখন তখন তাঁর কাছে যেতে পারতো না। অন্যদের মত তিনি তৎকালীন ইসলামী খিলাফতের বড় বড় শহরসমূহে যাওয়ার সুযোগও পাননি। পুরুষ বর্ণনাকারীদের মত তিনি যদি সকল সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে সমর্থ হতেন তাহলে তাঁরই স্থান হতো সবার উপরে।

পূর্বের আলোচনা থেকে জানা গেছে, হযরত 'আয়িশার (রা) সর্বমোট বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা দুই হাজার দুইশো দশ (২২১০)। তার মধ্যে সহীহাইন-বুখারী ও মুসলিমে ২৮৬টি হাদীস সংকলিত হয়েছে। ১৭৪টি মুত্তাফাক আলাইহি, ৫৪টি শুধু বুখারীতে এবং ৬৯টি মুসলিমে এককভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই হিসেবে বুখারীতে সর্বমোট ২২৮টি এবং মুসলিমে ২৪৩টি হাদীস এসেছে।[৩৩৮] এছাড়া হযরত 'আয়িশার (রা) অন্য হাদীসগুলি বিভিন্ন গ্রন্থে সনদ সহকারে সংকলিত হয়েছে। ইমাম আহমাদের (রা) মুসনাদের ৬ষ্ঠ খণ্ডে (মিসর) হযরত 'আয়িশার (রা) বর্ণিত সকল হাদীস সংকলিত হয়েছে।

ইসলামী উম্মার নিকট হযরত 'আয়িশার (রা) যে উঁচু মর্যাদা ও বিরাট সম্মান তা তাঁর অধিক হাদীস বর্ণনার জন্য নয়, বরং হাদীসের গভীর ও সূক্ষ্ম তাৎপর্য এবং মূল ভাবধারা অনুধাবনই প্রধান কারণ। সাহাবীদের মধ্যে অনেকেই এমন আছেন যাঁদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা খুবই অল্প। কিন্তু তাঁরা উঁচু স্তরের ফকীহ সাহাবীদের অন্তর্গত। যাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) বাণীর মূল তাৎপর্য অনুধাবন না করে যা কিছু শুনেছেন তাই বর্ণনা করে দিয়েছেন, তাঁদের বর্ণনার সংখ্যাই বেশী। আমরা দেখতে পাই যে সকল সাহাবী বেশী হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ তাঁদের মধ্যে কেবল হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) ও হযরত 'আয়িশা (রা) ফকীহ ও মুজতাহিদ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। কথিত আছে শরীয়াতের যাবতীয় আহকামের এক চতুর্থাংশ তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাই আল্লামা জাহাবী বলেছেন ঃ[৩৩৯]

كَانَ فُقَهَاءُ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلْعَمَ يَرْجِعُوْنَ إِلَيْهَا تَفَقَّهُ بِهَا جَمَاعَةٌ -

–রাসূলুল্লাহর (সা) ফকীহ (গভীর জ্ঞানসম্পন্ন) সাহাবীরা তাঁর কাছ থেকে জানতেন।

---

৩৩৭. ইমাম আস-সাখাবী ঃ ফাতহুল মুগীস শারহু আলফিয়াতিল হাদীস, পৃ. ৩৭১। আল্লামা সাইয়্যেদ সুলায়মান নাদবী তাঁর 'সীরাতে 'আয়িশা (রা)' গ্রন্থের ১৮৮ পৃষ্ঠায় তালিকাটি উল্লেখ করেছেন

৩৩৮. নিয়াম ফতেহপুরী ঃ সাহাবিয়াত, পৃ. ৬৩; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৩৯

৩৩৯. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২৭

একদল লোক তাঁর নিকট থেকেই দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন।

বর্ণনার আধিক্যের সাথে সাথে দ্বীনের তাৎপর্যের গভীর উপলব্ধি এবং হুকুম-আহকাম বের করার প্রবল এক ক্ষমতা হযরত 'আয়িশার (রা) মধ্যে ছিল। তাঁর বর্ণনাসমূহের এ এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, আহকাম ও ঘটনাবলী বর্ণনার সাথে সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর কারণও বলে দিয়েছেন। সেই বিশেষ হুকুমটি যে কারণে দান করা হয়েছে তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। তাঁর বর্ণনার বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য এখানে অন্যান্য রাবীর (বর্ণনাকারী) বর্ণনার সাথে একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

জুম'আর দিন গোসল করা সম্পর্কে সহীহ বুখারীতে[৩৪০] হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা), হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) ও হযরত 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা এসেছে। এখানে তিনজনের বর্ণনার নমুনা দেয়া হলো। হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'উমার বলেন ঃ

سمعت رسول الله صلعم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل -

–আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি, তোমাদের যে ব্যক্তি জুম'আয় আসে, সে যেন অবশ্যই গোসল করে আসে।

হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ

ان رسول الله صلعم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم -

–রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ প্রত্যেক বালিগ ব্যক্তির উপর জুম'আর দিনের গোসল ওয়াজিব।

একই বিষয়ে হযরত আয়িশার (রা) বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

قالت كان الناس ينتابون من منازلهم والعو الى فيأتون فى الغبار تصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم انسان منهم وهو عندى فقال النبى صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا-

–মানুষ নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে এবং মদীনার বাইরের বসতি থেকে আসতো। তারা ধুলো-বালির মধ্য দিয়ে আসতো। এতে তারা ঘামে ও ধুলো-বালিতে একাকার হয়ে যেত। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) আমার নিকট অবস্থান করছেন, এমন সময় তাদেরই এক ব্যক্তি তাঁর কাছে আসে। তখন নবী (সা) বলেন ঃ তোমরা যদি এই দিনটিতে গোসল করতে তাহলে ভালো হতো।

---

৩৪০. সহীহ আল-বুখারী ঃ কিতাবুল জুম'আ

হযরত আয়িশার (রা) অন্য একটি বর্ণনা এভাবে এসেছে ঃ

كان الناس مهنة انفسهم كانوا اذاراحوا الى الجمعة راحوا فى هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم -

–লোকেরা নিজ হাতে কাজ করতো। যখন তারা জুম'আর নামাযে যেত তখন সেই অবস্থায় চলে যেত। তখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা যদি গোসল করতে তাহলে ভালো হতো।

আমরা উপরের একই বিষয়ের তিনটি বর্ণনা লক্ষ্য করলাম। কি কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) জুম'আর দিনে গোসলের নির্দেশ দেন, তা হযরত আয়িশার (রা) স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন– যা অন্য দুইটি বর্ণনায় নেই।

একবার হযরত রাসূলে কারীম (সা) নির্দেশ দিলেন, কুরবানীর গোশ্‌ত তিন দিনের মধ্যে খেয়ে শেষ করতে হবে। তিন দিনের বেশী রাখা যাবেনা। হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) ও হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) সহ আরো অনেক সাহাবী এই নির্দেশকে চিরস্থায়ী বলে মনে করতেন।[৩৪১] তাঁদের অনেকে এ ধরনের কথাই লোকদের বলতেন। কিন্তু হযরত 'আয়িশা (রা) এটাকে চিরস্থায়ী বা অকাট্য নির্দেশ বলে মনে করতেন না। তিনি এটাকে একটা সাময়িক নির্দেশ বলে বিশ্বাস করতেন। বিষয়টি তিনি বর্ণনা করছেন এভাবে ঃ[৩৪২]

الضحية كنا نملح منها فتقدم به الى النبى صلعم بالمدينة فقال لا تأكلوا الا ثلاثة ايام وليست بعزيمة ولكن اراد ان يطعم منه والله اعلم -

–আমরা কুরবানীর গোশত লবণ দিয়ে রেখে দিতাম। মদীনায় আমরা ঐ গোশত রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে খাওয়ার জন্য উপস্থাপন করতাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা এই গোশত তিনদিন ছাড়া খাবে না। এটা কোন চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা ছিল না। বরং তিনি চেয়েছেন মানুষ যেন এই গোশত থেকে কিছু অন্যদেরকেও খেতে দেয়।

হযরত 'আয়িশার (রা) অন্য একটি হাদীস যা ইমাম তিরমিজী বর্ণনা করেছেন, তাতে তিনি এই নিষেধাজ্ঞার প্রকৃত কারণ বলে দিয়েছেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো ঃ উম্মুল মুমিনীন! কুরবানীর গোশত তিন দিনের বেশী খাওয়া কি নিষেধ? তিনি বললেন ঃ

لاولكن قل من كان يضحى من الناس فاحب ان يطعم من لم يكن يضحى -

---

৩৪১. বুখারী ও তিরমিজী ঃ কিতাবুল আদাহী

৩৪২. বুখারী ঃ কিতাবুল আদাহী

–না। তবে সেই সময় কুরবানী করার লোক কম ছিল। এজন্য তিনি চান, যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদেরকেও যেন ঐ গোশত খেতে দেয়।

ইমাম আহমাদ হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ ৩৪৩

لا ولكن لم يكن يضحى منهم الا قليل ففعل ذالك ليطعم من ضحى من لم يضح -

–এটা সঠিক নয় যে, কুরবানীর গোশত তিন দিন পর খাওয়া যাবে না। বরং সেই সময় খুব কম লোক কুরবানী করতে পারতো। এ কারণে তিনি এই নির্দেশ দেন যে, যারা কুরবানী করবে তারা যেন তাদেরকে গোশত খেতে দেয় যারা কুরবানী করতে পারেনি।

ইমাম মুসলিম এই হাদীসটি একটি তথ্যের আকারে বর্ণনা করেছেন। যেমন, একবছর মদীনার আশে-পাশে এবং গ্রাম এলাকায় অভাব দেখা দেয়। সেবার তিনি এই হুকুম দেন। পরের বছর যখন অভাব থাকলো না তখন ঐ হুকুম রহিত করেন। হযরত সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকেও এ ধরনের একটি বর্ণনা আছে।৩৪৪

কা'বা ঘরের এক দিকের দেওয়ালের পরে কিছু জায়গা ছেড়ে দেওয়া আছে, যাকে 'হাতীম' বলে। তাওয়াফের সময় 'হাতীমকে' বেষ্টনীর মধ্যে নিয়েই তাওয়াফ করতে হয়। মানুষের অন্তরে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, যেটি কা'বার অংশ নয়, সেটিও তাওয়াফ করতে হবে কেন? হয়তো অনেক সাহাবী রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এই প্রশ্নের উত্তর চেয়ে থাকবেন। কিন্তু হাদীসের গ্রন্থসমূহে তাঁদের থেকে তেমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। আমরা হযরত আয়িশার (রা) বর্ণনা থেকে এই প্রশ্নের উত্তর পাই। তিনি বলেন, আমি প্রশ্ন করি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই দেওয়ালও কি কা'বা ঘরের অন্তর্গত? বললেন ঃ হাঁ! বললাম! তাহলে নির্মাণের সময় লোকেরা এটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে নিলনা কেন? বললেন ঃ তোমার স্বজাতির হাতে পুঁজি ছিল না। তাই এটুকু বাদ দেয়। আবার প্রশ্ন করলাম! তা কা'বার দরজা এত উঁচুতে কেন? বললেন ঃ এজন্য যে, সে যাকে ইচ্ছা ভিতরে যেতে দেবে, আর যাকে ইচ্ছা বাধা দেবে।

হযরত ইবন 'উমার (রা) বলেন, 'আয়িশার (রা) বর্ণনা সঠিক হলে বুঝা যায় রাসূল (সা) সেদিকের স্তম্ভ দুইটি এই কারণে চুমো দেননি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, রাসূল (সা) যখন জানতেন যে, কা'বা ঘর তার মূলভিত্তির উপর সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত নেই, তখন হযরত ইবরাহীমের (আ) শরীয়াতের পুনরুজ্জীবনকারী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব ছিলো এটাকে ভেঙ্গে নতুনভাবে নির্মাণ করা। বিষয়টি ইবরাহীমের (আ) উত্তরাধিকারী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) জানা থাকার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তাই তিনি হযরত 'আয়িশার (রা) প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন ঃ আয়িশা! তোমার কাওম যদি তাদের কুফরীর সময়কালের

---

৩৪৩. মুসনাদ ঃ ৬/১০২

৩৪৪. সহীহ মুসলিম ঃ কিতাবুজ জাবায়িহ,

নিকটবর্তী না হতো তাহলে আমি কা'বাকে ভেঙ্গে আবার ইবরাহীমের মূল ভিত্তির উপর নির্মাণ করাতাম।[৩৪৫] যেহেতু সাধারণ আরববাসী সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছে, এমতাবস্থায় নতুন করে কা'বা গৃহ নির্মাণ করলে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারতো, এই আশংকায় তা করা হয়নি। এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, অধিকতর কোন কল্যাণের ভিত্তিতে যদি শরীয়াতের কোন কাজের বাস্তবায়নে বিলম্ব করা হয় তাহলে তা তিরস্কারযোগ্য হবে না। তবে শর্ত হচ্ছে সেই কাজটির বাস্তবায়ন যদি শরীয়াত তাৎক্ষণিকভাবে দাবী না করে।

হযরত 'আয়িশার (রা) এই বর্ণনার ভিত্তিতে তাঁর ভাগ্নে হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা) স্বীয় খিলাফতকালে কা'বা ঘর বাড়িয়ে ইবরাহীমের (আ) মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত ইবন যুবাইরের শাহাদাতের পর খলীফা আবদুল মালিক যখন পুনরায় মক্কার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন তখন তিনি এ ধারণার ভিত্তিতে যে, আবদুল্লাহ (রা) একাজ তাঁর নিজের ইজতিহাদ থেকে করেছেন, ভেঙ্গে ফেলেন এবং পূর্বের মত তৈরী করেন। কিন্তু তিনি যখন জানতে পারলেন 'আবদুল্লাহ (রা) নিজের ইজতিহাদ থেকে নয়; বরং উম্মুল মুমিনীনের এ বর্ণনার ভিত্তিতে করেছেন, তখন তিনি নিজের এই কাজের জন্য ভীষণ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন।[৩৪৬]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর তাঁকে কোথায় দাফন করা হবে তা নিয়ে বিশিষ্ট সাহাবীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত আবু বকর (রা) তখন বলেন, নবীরা যেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সেখানেই দাফন করা হয়। এ কারণে রাসূলে কারীমকে (সা) 'আয়িশার (রা) ঘরে, যেখানে মৃত্যুবরণ করেন, দাফন করা হয়। কিন্তু এর আসল কারণ হযরত 'আয়িশার (রা) বর্ণনায় পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ[৩৪৭]

قال رسول الله صلعم فى مرضه الذى لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياءهم مساجد، لو لا ذلك ابرز قبره غير انه خشى ان يتخذ مسجدا،

–রাসূলুল্লাহ (সা) অন্তিম রোগশয্যায় বলেন, আল্লাহ ইহুদী ও নাসারাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করুন। তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে উপাসনালয় বানিয়ে নিয়েছে। আয়িশা (রা) বলেন, যদি এমন আশঙ্কা না থাকতো তাহলে রাসূলুল্লাহর (সা) কবরখানা মাঠেই হতো। কিন্তু তিনি কবরকে মসজিদ বানানোর ব্যাপারে শঙ্কাবোধ করেন।

মূলত ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) এই শঙ্কা প্রকাশের কারণেই তাঁকে শেষ নি ঃশ্বাস ত্যাগের স্থলেই দাফন করা হয়।

---

৩৪৫. প্রাগুক্ত ঃ বাবু নাকদ আল-কা'বা। বিভিন্ন গ্রন্থেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে

৩৪৬. প্রাগুক্ত ঃ নাকদ আল-কাবা; মুসনাদ ৬/২৪৭, ২৫৩

৩৪৭. বুখারী ঃ কিতাবুল জানায়িয; মুসনাদ ৬/১২১

এমনি ভাবে হিজরাতের একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যাও বুখারী বর্ণিত 'আয়িশার (রা) একটি হাদীস থেকে পাওয়া যায়। সাধারণভাবে হিজরাত বলতে মানুষ বুঝতো নিজের জন্মস্থান ত্যাগ করে মদীনায় এসে বসবাস করা। কিন্তু তিনি বলেন, এখন আর হিজরাত নেই। হিজরাত তো তখন ছিল যখন মানুষ নিজেদের দ্বীন-ধর্মকে বাঁচানোর জন্য প্রাণের ভয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট ছুটে আসতো। এখন তো আর সে অবস্থা নেই। সুতরাং প্রকৃত হিজরাতও হবে না। একারণে ইবন উমার (রা) বলতেন ঃ মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরাত নেই।

মুহাদ্দিসীন ও জারাহ ও তা'দীল (সমালোচনা ও মূল্যায়ন) শাস্ত্রবিদদের মতে হযরত 'আয়িশার (রা) বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি তুলনামূলকভাবে খুব কম। এর বিশেষ কারণও আছে। সাধারণ সাহাবীরা হয়তো একবার রাসূলুল্লাহর (সা) কোন কথা শুনতেন বা কোন কাজ করতে দেখতেন, তারপর হুবহু সেই কথা বা কাজের বর্ণনা অন্যদের নিকট দিতেন। এক্ষেত্রে হযরত 'আয়িশার (রা) রীতি ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন কথা বা ঘটনা ভালোমত বুঝতে পারতেন, অন্যের নিকট বর্ণনা করতেন না। রাসূলুল্লাহর (সা) কোন কথা বা আচরণ বুঝতে অক্ষম হলে তিনি বারবার প্রশ্ন করে তা বুঝে নিতেন। হাদীসের গ্রন্থসমূহে তাঁর এ ধরনের বহু জিজ্ঞাসা বর্ণিত হয়েছে।[৩৪৮] কিন্তু অন্যরা এ সুযোগ খুব কমই পেতেন।

যে সকল হাদীস তিনি সরাসরি শোনেননি, বরং অন্যদের মাধ্যমে শুনেছেন, সেগুলির বর্ণনার ক্ষেত্রে দারুণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। চূড়ান্ত রকমের যাচাই-বাছাই, বিচার-বিশ্লেষণ ও খোঁজ-খবর নেওয়ার পর পূর্ণ আস্থা হলে তখন বর্ণনা করতেন। একবার প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল আ'স (রা) তাঁকে একটি হাদীস শোনালেন। একবছর পর তিনি যখন আসলেন তখন হযরত 'আয়িশা (রা) এক ব্যক্তিকে তাঁর নিকট পাঠালেন সেই হাদীসটি আবার শুনে আসার জন্য। আবদুল্লাহ (রা) কোন রকম কম-বেশী ছাড়াই পূর্বের মত হাদীসটি হুবহু বর্ণনা করেন। লোকটি ফিরে এসে হাদীসটি আয়িশাকে (রা) শোনান। তিনি তখন মন্তব্য করেন, আল্লাহর কসম, ইবন 'আমরের কথা স্মরণ আছে।[৩৪৯]

এই মূলনীতির ভিত্তিতে তিনি যদি কারও নিকট থেকে কোন বর্ণনা গ্রহণ করতেন, আর কেউ যদি সেটি শোনার ইচ্ছা নিয়ে তাঁর কাছে আসতো, তাঁকে মূল বর্ণনাকারীর নিকট পাঠিয়ে দিতেন। আসল উদ্দেশ্য হতো হাদীসটির বর্ণনা সূত্রের মাঝখানের মাধ্যম যতখানি সম্ভব কমিয়ে দেওয়া এবং 'আলী সনদে রূপান্তরিত করা। যেমন, রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে আসরের নামায আদায়ের পর ঘরে এসে সুন্নাত নামায আদায় করতেন। অথচ চূড়ান্ত নির্দেশ ছিল আসরের পরে আর কোন নামায নেই। কিছু লোক হযরত

৩৪৮. প্রাগুক্ত ঃ কিতাবুল ইলম
৩৪৯. প্রাগুক্ত ঃ ওয়াফদু বনী তামীম

'আয়িশার (রা) নিকট এক ব্যক্তিকে পাঠালো একথা জানার জন্য যে, তাঁর সূত্রে যে এই হাদীস বর্ণিত হচ্ছে, এর বাস্তবতা কতটুকু? তিনি বললেন, তোমরা উম্মু সালামার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর। হাদীসটির আসল রাবী বা বর্ণনাকারী তিনিই।[৩৫০] আর একবার এক ব্যক্তি তাঁকে মোযার উপর মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলেন ঃ আলীর (রা) কাছে যাও। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সফরে সংগে থাকতেন।[৩৫১]

হযরত 'আয়িশা (রা) নিজের বর্ণনাসমূহকে যে কোন রকমের ভুল-ভ্রান্তি থেকে যেমন মুক্ত রেখেছেন, তেমনিভাবে বহুক্ষেত্রে অন্যদের বর্ণনাসমূহও সংশোধন করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর সমকালীনদের বর্ণনাসমূহের অতি তুচ্ছ ত্রুটি-বিচ্যুতিও অত্যন্ত কঠোরভাবে পাকড়াও করতেন এবং সংশোধন করে দিতেন। মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় যা 'ইদরাক' নামে পরিচিত।

হযরত 'আয়িশা (রা) বিশ্বাস করতেন, কোন বর্ণনা আল্লাহর কালামের বিরোধী হলে তা সঠিক নয়। পরবর্তীকালে হাদীস শাস্ত্র বিশারদরা এটাকে হাদীস যাচাই-বাছায়ের একটি অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই মূলনীতির ভিত্তিতে হযরত 'আয়িশার (রা) অন্যদের অনেক বর্ণনা সঠিক বলে মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। আর নিজের জ্ঞান অনুযায়ী সেই সব বর্ণনার প্রকৃত রহস্য ও ভাব বর্ণনা করেছেন। যেমন ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) এবং আরও কতিপয় সাহাবী বর্ণনা করেছেন ঃ

ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه -

অর্থাৎ, পরিবারের লোকদের কান্নার জন্য মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয়।'

হযরত আয়িশাকে (রা) যখন এই বর্ণনাটি শোনানো হলো তখন তিনি তা মানতে অস্বীকার করলেন। বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এমন কথা কক্ষনো বলেননি। ঘটনা হলো, একদিন রাসূল (সা) এক ইহুদীর লাশের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, দেখলেন তার আত্মীয় স্বজনরা চিল্লাপাল্লা ও মাতম করতে আরম্ভ করেছে। তখন তিনি বলেন ঃ এরা কান্নাকাটি করছে আর তার উপর শাস্তি হচ্ছে। আয়িশার (রা) বক্তব্যের মর্ম হলো, শাস্তির কারণ কান্নাকাটি করা নয়। অর্থাৎ এরা মাতম করছে, আর ওদিকে মৃতব্যক্তির উপর অতীত কৃতকর্মের জন্য শাস্তি হচ্ছে। কারণ, কান্নাকাটি করা তো অন্যের কর্ম। আর অন্যের কর্মফল মৃত ব্যক্তি কেন ভোগ করবে? তাই তিনি বলেন, তোমাদের জন্য কুরআনই যথেষ্ট। আল্লাহ বলেছেন ঃ[৩৫২] وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ -

কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না।

---

৩৫০. প্রাগুক্ত ঃ বাবু মাইউজকারু মিন জাম্মির রায়

৩৫১. প্রাগুক্ত ঃ আল-মাসহু 'আলাল খুফফাইন

৩৫২. সূরা আল-আন'আম-১৬৪; সূরা বনী ইসরাইল-১৫

বর্ণনাকারী ইবন আবী মুলাইকা বলেন, হযরত ইবন উমার (রা) হযরত 'আয়িশার (রা) এমন বর্ণনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা যখন শুনলেন তখন কোন উত্তর দিতে পারেননি।

ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ গ্রন্থের 'আল-জানায়িয' অধ্যায়ে পৃথক একটি অনুচ্ছেদে হযরত 'আয়িশার (রা) ও ইবন উমারের (রা) বর্ণনা দুইটির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, কান্নাকাটি ও মাতম করা যদি মৃত ব্যক্তির জীবিত অবস্থার অভ্যাস থেকে থাকে, আর সে যদি জীবদ্দশায় আপনজনদেরকে এমন কাজ থেকে বিরত থাকার কথা না বলে থাকে তাহলে তাদের মাতমের আযাব তার উপর হবে। কারণ, তাদের শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব সে তাঁর জীবদ্দশায় পালন করেনি।[৩৫৩] আল্লাহ বলেন ঃ[৩৫৪]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا -

-হে ঈমানদার ব্যক্তিরা! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।

আর জীবদ্দশায় পরিবার-পরিজনকে যথাযথ শিক্ষাদান সত্ত্বেও যদি তারা মৃত ব্যক্তির জন্য মাতম করতে থাকে তা হলে সে ক্ষেত্রে 'আয়িশার (রা) মতই সঠিক। কারণ আল্লাহ তো বলেছেন, 'কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না।' তিনি আরো বলেছেন ঃ[৩৫৫]

وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى -

-কেউ যদি তার গুরুভার বহন করতে অন্যকে আহবান করে কেউ তা বহন করবে না- যদি সে নিকটবর্তী আত্মীয়ও হয়।

প্রখ্যাত ইমাম ও মুহাদ্দিস হযরত আবদুল্লাহ ইবন মুবারাকও ইমাম বুখারীর মত বলেছেন।[৩৫৬] তবে কেউ কেউ ইমাম বুখারীর সামঞ্জস্য চেষ্টার প্রতি প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন এ ভাবে- কেউ যদি জীবদ্দশায় পরিবার-পরিজনের সঠিক শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব পালন না করে থাকে, তাহলে মৃত্যুর পর সে দায়িত্ব পালন না করার অপরাধের শাস্তি ভোগ করবে। জীবিতদের অপরাধের শাস্তি ভোগ করবে কেন? মুজতাহিদদের মধ্যে ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবু হানীফা (র) এই মাসয়ালায় হযরত 'আয়িশার (রা) মতের অনুসারী।[৩৫৭]

---

৩৫৩. সহীহ বুখারী ও মুসলিম ঃ কিতাবুল জানায়িয

৩৫৪. সূরা আত-তাহরীম-১০

৩৫৫. সূরা ফাতির-১৮

৩৫৬. জামে তিরমিজী-কিতাবুল জানায়িয

৩৫৭. উল্লেখ থাকে যে, প্রিয়জনদের মৃত্যুতে স্বাভাবিক কান্না পেলে, চোখ থেকে পানি ঝরলে তাতে কোন পাপ নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও পুত্র হযরত কাসিমের মৃত্যুতে কেঁদেছিলেন। মূলতঃ চিল্লাচিল্লি করা, মাতম করা, দেহের পোশাক-পরিচ্ছদ টেনে ছিঁড়ে ফেলা, বুকে-মুখে কিল-থাপ্পড় মারা, মুখে শরীয়াত বিরোধী কথা উচ্চারণ করা ইত্যাদি নিষিদ্ধ। কান্নারও নানা প্রকার আছে। যে কান্নায় শরীয়াত বিরোধী আচরণ প্রকাশ পায়, তা নিষিদ্ধ। অন্যথায় স্বাভাবিক কান্না অথবা চোখ থেকে পানি পড়াতে কোন নিষেধ নেই এবং তাতে কোন পাপও নেই

হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) দুইবার আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনকে দেখেছেন। হযরত মাসরূক (র) হযরত 'আয়িশাকে (রা) প্রশ্ন করলেন ঃ আম্মা! মুহাম্মাদ (সা) কি আল্লাহকে দেখেছেন? 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ তুমি এমন একটি কথা বলেছো যা শুনে আমার দেহের প্রতিটি লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে। যে তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহকে দেখেছেন সে মিথ্যা বলে। তারপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ৩৫৮

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ-

-দৃষ্টিসমূহ তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না, অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে বেষ্টন করতে পারেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, সুবিজ্ঞ।

তারপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ৩৫৯

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ اَوْيُرْسِلَ رَسُوْلاً -

-কোন মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ঃ কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা তিনি কোন দূত পাঠাবেন।

আরো কিছু হাদীসে হযরত 'আয়িশার (রা) বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। সহীহ মুসলিমে সংকলিত একটি হাদীস থেকে জানা যায় রাসূল (সা) বলেছেন, তিনি তো নূর বা জ্যোতি। তাঁকে আমি কিভাবে দেখতে পারি।

মুত'আ যা একটি নির্দিষ্ট সময় সীমা পর্যন্ত বিয়ে জাহিলী যুগ এবং ইসলামের সূচনাকাল থেকে ৭ম হিজরী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। খায়বার বিজয়ের সময় এ জাতীয় বিয়ে হারাম ঘোষিত হয়। এরপর হযরত ইবন আব্বাস (রা) সহ আরো কিছু লোক এই বিয়ে জায়েয আছে বলে মনে করতেন। কিন্তু সাহাবীদের গরিষ্ঠ অংশ হারাম বলে বিশ্বাস করতেন। হযরত আয়িশার (রা) এক ছাত্র একদিন এই মুত'আ বিয়ের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন করে। হযরত আয়িশা (রা) তার জবাব হাদীস দ্বারা দেননি। তিনি বলেন, আমার ও তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব আছে। তারপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ৩৬০

وَالَّذِيْنَ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ -

-এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত

---

৩৫৮. সূরা আল-আন'আম-১০৩

৩৫৯. সূরা আশ-শুরা-৫১। ইমাম বুখারী সূরা আন নাজমের তাফসীরে হযরত আয়িশার (রা) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। দেখুন ঃ কিতাবুত তাফসীর

৩৬০. সূরা আল-মুমিনূন-৫-৬

দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না।

এ কারণে এই দুই পদ্ধতি ছাড়া আর কোন পদ্ধতি জায়েয নেই। উল্লেখ্য যে, মুত'আর মাধ্যমে লাভ করা নারী স্ত্রী বা দাসী কোনটিই নয়।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, অবৈধ ছেলে তিনজনের মধ্যে (পিতা-মাতা ও সন্তান) নিকৃষ্টতর।

একথা হযরত 'আয়িশার (রা) কানে গেলে বলেন, এ সঠিক নয়। ঘটনা হলো, একজন মুনাফিক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) নিন্দামন্দ করতো। লোকেরা একদিন বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকটি জারজ সন্তানও। তখন রাসূল (সা) মন্তব্য করেন ঃ সে তিনজনের মধ্যে অধিকতর নিকৃষ্ট। অর্থাৎ তার মা-বাবা তো শুধু অপকর্ম করেছে ঃ কিন্তু তারা আল্লাহর রাসূলের নিন্দামন্দ করেনি। আর তাদের সেই অপকর্মের ফসল এই সন্তান আল্লাহর রাসূলের নিন্দামন্দ করে। সুতরাং সে তাদের থেকেও খারাপ। 'আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) এই মন্তব্য ছিল এক বিশেষ ঘটনার জন্য, সবার জন্য নয়। কারণ আল্লাহ তো বলেছেন ঃ 'কেউ অপরের বোঝা বহন করবেনা।' অর্থাৎ অপরাধ মা-বাবার। সন্তান তার জন্য দায়ী হবে কেন?

বদর যুদ্ধে যে সকল কাফির নিহত হয়, তাদেরকে বদরেই একত্রে মাটি চাপা দেওয়া হয়। রাসূল (সা) সেখানে দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ[৩৬১]

فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا -

–তোমরা কি তোমাদের প্রতিপালকের ওয়াদা সত্য পেয়েছো? সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি মৃতদেরকে সম্বোধন করছেন? ইবন উমার পিতা 'উমার (রা) থেকে এবং আনাস ইবন মালিক আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণনা করে[illegible]বাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

مَا اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لَّا يُجِيْبُوْنَ -

তোমরা তাদের চেয়ে বেশী শুনতে পাওনা। তবে তারা জবাব দিতে পারে না।

হযরত আয়িশাকে (রা) যখন এই বর্ণনার কথা বলা হলো, তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একথা নয়, বরং এই বলেছেন ঃ

اِنَّهُمْ لَيَعْلَمُوْنَ الْاٰنَ اَنْ كُنْتُ اَقُوْلُ لَهُمْ حَقٌّ -

–এখন তারা নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছে যে, আমি তাদেরকে যা কিছু বলতাম তা সবই সত্য।

---

৩৬১. সূরা আল-আ'রাফ-৪৪

তারপর হযরত আয়িশা (রা) কুরআনের এই আয়াত দুইটি পাঠ করেন ঃ[৩৬২]

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ - وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ -

–'আপনি আহ্বান শোনাতে পারবেন না মৃতদেরকে'

'আপনি কবরে, শায়িতদেরকে শুনাতে সক্ষম নন।'

পরবর্তীকালে মুহাদ্দিসগণ হযরত 'আয়িশার (রা) যুক্তি-প্রমাণ মেনে নিয়ে দুইটি বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন। প্রখ্যাত তাবেঈ হযরত কাতাদা (র) বলেন ঃ বদরে নিহতদের কিছু সময়ের জন্য আল্লাহ জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) একটি মুজিযা হিসেবে তাদেরকে সেই সময়ের জন্য শ্রবণশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কোন কোন বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যে বর্ণনা পার্থক্য দেখা যায়, তার ভিত্তি অনেকটা তাদের বুঝার পার্থক্য।

আল্লাহ প্রদত্ত এই বুঝ শক্তি ও মেধা আবার হযরত আয়িশা (রা) অনেকের চেয়ে বেশী পরিমাণে লাভ করেছিলেন। তাঁর এই অতুলনীয় বোধশক্তি ও অনুধাবন ক্ষমতা তিনি কাজে লাগান হাদীস বর্ণনা ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে। এখানে আমরা এমন কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি যাতে তাঁর তীক্ষ্ণ বোধ ও বুদ্ধির ছাপ ফুটে উঠেছে।

হযরত আবু সা'ঈদ খুদরীর (রা) জীবনসন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে নতুন কাপড় চেয়ে নিয়ে পরেন। এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'একজন মুসলমান যে লিবাসে (পোশাকে) মারা যায় তাকে সেই লিবাসেই উঠানো হয়।' একথা হযরত আয়িশা (রা) জানতে পেরে বলেন, আল্লাহ আবু সা'ঈদের উপর রহমত বর্ষণ করুন। 'লিবাস' বলতে রাসূলুল্লাহ (সা) বুঝাতে চেয়েছেন মানুষের 'আমল বা কর্ম। অন্যথায় রাসূল (সা) তো স্পষ্টভাবে বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষ খালি গা, খালি পা ও খালি মাথায় উঠবে।[৩৬৩]

ইসলামের নির্দেশ হলো, তালাকপ্রাপ্তা নারী স্বামীর ঘরেই ইদ্দত পালন করবে। এই নির্দেশের বিরোধী ফাতিমা নাম্নী একজন মহিলা সাহাবী তাঁর নিজের জীবনের একটি ঘটনা বর্ণনা করতেন। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে ইদ্দত পালনকালীন সময়ে স্বামীর ঘর থেকে অন্যত্র যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে বহু সাহাবীর সামনে প্রমাণ হিসেবে নিজের এই ঘটনা উপস্থাপন করেন। অনেকে তাঁর এ বর্ণনা গ্রহণ করেন, তবে বেশীর ভাগ সাহাবী তা মানতে অস্বীকার করেন। ঘটনাক্রমে মারওয়ান যখন মদীনার গভর্ণর তখন এই ধরনের একটি মোকদ্দমা দায়ের হয়। এক পক্ষ ফাতিমার বর্ণনাকে প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করায়। এ কথা হযরত আয়িশা (রা) জানতে

---

৩৬২. সূরা আন-নামল-৮০; সূরা ফাতির–২২

৩৬৩. আবূ দাউদ কিতাবুল জানায়িয। খালি গায়ে উঠার হাদীসটি হযরত আয়িশার (রা) থেকে বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে

পেরে ফাতিমাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন। তিনি বলেন, ফাতিমার এই ঘটনা বর্ণনাতে কোন কল্যাণ নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) ইদ্দত পালনকালীন সময়ে তাকে স্বামীর গৃহ থেকে অন্যত্র যাওয়ার অনুমতি অবশ্যই দিয়েছিলেন। কিন্তু তা এই কারণে যে, তার স্বামীর বাড়ীটি ছিল একটি অনিরাপদ ও ভীতিকর স্থানে।[৩৬৪]

একাধিক সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, ছাগলের বাহুর গোশত রাসূলুল্লাহর (সা) অধিক পছন্দ ছিল। হযরত ইবন মাসউদ (রা) বলেন, নবীর (সা) কাছে বাহুর গোশ্‌তই বেশী পসন্দনীয় ছিল। বাহুর গোশ্‌তেই বিষ প্রয়োগ করে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।

আবূ উবায়েদও বলেন ঃ নবী (সা) বাহুর গোশতই বেশী পছন্দ করতেন। কিন্তু এ ব্যাপারে হযরত আয়িশা (রা) বলেন ঃ[৩৬৫]

ما كان الذراع احب اللحم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم الا غبا وكان يعجل اليها لانها اعجلها نضجا -

–রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বাহুর গোশ্‌তই অধিক প্রিয় ছিল তা নয়, বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, অনেক দিন পর পর তিনি গোশ্‌ত খাওয়ার সুযোগ পেতেন। তাই তাঁকে বাহুর গোশ্‌ত পরিবেশন করা হতো। কেননা বাহুর গোশ্‌ত দ্রুত সিদ্ধ হয় এবং গলে যায়।

কোন ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘদিনের কোন অতি ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু যত বেশীই জানুক না কেন, একজন স্ত্রী তার চেয়ে অনেক বেশীই জেনে থাকে। রাসূলুল্লাহর (সা) মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত গোটা দেহ ছিল প্রতিটি মুহূর্তের জন্য একটি দৃষ্টান্ত ও আদর্শ স্বরূপ। এ কারণে তাঁর জীবনের প্রতিটি সময়ের প্রতিটি কর্ম আইন ও বিধানের মর্যাদা লাভ করেছে। সুতরাং বলা চলে, তাঁর বেগমগণ তাঁর সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে জানার যে সুযোগ লাভ করেন তা অন্যদের জন্য ছিল অসম্ভব। কিছু কিছু মাসয়ালা এমন আছে, দেখা যায় অন্য সাহাবায়ে কিরাম সেখানে নিজ নিজ ইজতিহাদ অথবা কোন বর্ণনার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, কিন্তু হযরত আয়িশার (রা) নিজের একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আজ পর্যন্ত ঐ সব মাসয়ালায় তাঁরই কথা প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হয়ে আসছে। পাঠকদের অবগতির জন্য এখানে সে রকম কয়েকটি মাসয়ালা উল্লেখ করা হলো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) ফাতওয়া দিতেন, গোসলের সময় মেয়েদের চুলের খোপা খুলে চুল ভিজানো জরুরী। হযরত আয়িশা (রা) একথা শুনে বললেন, তিনি মহিলাদেরকে একথা কেন বলে দেন না যে, তারা যেন তাদের খোপা কেটে ফেলে। আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে গোসল করতাম এবং চুল খুলতাম না।[৩৬৬]

---

৩৬৪. সহীহ বুখারী ও জামে তিরমিজী ঃ কিতাবুত তালাক

৩৬৫. শামায়েলে তিরমিজী-১৬১, ১৬২, ১৬৩

৩৬৬. সহীহ মুসলিম ও সুনানে নাসাঈ

হযরত ইবন 'উমার (রা) বলতেন, অজু অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দিলে অজু ভেঙ্গে যায়। একথা আয়িশা (রা) শুনে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) চুমু খাওয়ার পর অজু করতেন না। একথা বলে তিনি মৃদু হেসে দেন।[৩৬৭]

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করতেন, নামায আদায়কারী পুরুষের সামনে দিয়ে যদি নারী, গাধা অথবা কুকুর যায়, তাহলে পুরুষের নামায নষ্ট হয়ে যায়। হযরত 'আয়িশা (রা) একথা শুনে রেগে যান। তিনি বলেন, আমরা, নারীদেরকে তোমরা গাধা ও কুকুরের সমান করে দিয়েছো। আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকতাম, আর তিনি নামাযে দাঁড়ানো থাকতেন। যখন সিজদায় যেতেন, হাত দিয়ে টোকা দিতেন। আমি পা গুটিয়ে নিতাম। তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আবার পা ছড়িয়ে দিতাম।[৩৬৮] আবার কখনো প্রয়োজন হলে নিজেকে গুটিয়ে সামনে দিয়ে চলে যেতাম।[৩৬৯]

হযরত আবু হুরাইরা (রা) একদিন ওয়াজ করতে গিয়ে বর্ণনা করেন, রোযার দিনে কারো যদি সকালে গোসল করার প্রয়োজন দেখা দেয় সে যেন সেদিন রোযা না রাখে। লোকেরা হযরত আয়িশা (রা) ও হযরত উম্মু সালামার (রা) নিকট গিয়ে একথার সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাইলো। আয়িশা (রা) বললেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) কর্ম পদ্ধতি এর বিপরীত ছিল। লোকেরা আবার আবু হুরাইরার (রা) নিকট গিয়ে সতর্ক করলো। অবশেষে তিনি তাঁর পূর্বের ফাতওয়া প্রত্যাহার করেন।[৩৭০]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) ফাতওয়া দিতেন যে, কেউ যদি হজ্জ না করে, শুধু মাত্র কুরবানীর পশু মক্কার হারামে পাঠিয়ে দেয়, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই পশু সেখানে জবেহ হবে তার উপর সেই সকল শর্ত আপতিত হবে যা একজন হাজীর উপর হয়। একথা শুনে হযরত আয়িশা (রা) বলেন, আমি নিজের হাতে রাসূলুল্লাহর (সা) কুরবানীর পশুর রশি পাকিয়েছি, তিনি নিজ হাতে সেই রশি কুরবানীর পশুর গলায় পরিয়েছেন। তারপর আমার পিতা সেগুলি নিয়ে মক্কায় গেছেন। তা সত্ত্বেও সব কিছু হালাল ছিল। কোন হালাল জিনিসই কুরবানী পর্যন্ত হারাম হয়নি।[৩৭১]

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, হযরত আয়িশা (রা) অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তির অধিকারিনী ছিলেন। মূলত ঃ স্মৃতিশক্তি আল্লাহ পাকের এক অনুগ্রহ। তিনি পূর্ণমাত্রায় এ অনুগ্রহ লাভে ধন্য হন। ছোট বেলায় খেলতে খেলতে কুরআনের যে সব আয়াত কানে এসেছে, সারা জীবন তা স্মৃতিতে ধরে রেখেছেন। হাদীস শাস্ত্রের নির্ভরতা তো এই স্মৃতি ও মুখস্থ শক্তির উপরে। নুবুওয়াতী সময়কালের প্রতিদিনের ঘটনা মনে রাখা, প্রতিনিয়ত তা হুবহু বর্ণনা করা, রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে যে শব্দাবলী যে ভাবে শুনেছেন তা

---

৩৬৭. সহীহ বুখারী
৩৬৮. ঘর অপ্রশস্ত হওয়ার কারণে এমন করতেন
৩৬৯. সহীহ বুখারীঃ বাবুত তাতাও'উ খালফাল মারয়াতি; বাবু মান লা ইয়াকতা'উস সালাতা শাইউন; বাবুস সারীর
৩৭০. সহীহ মুসলিম ও মুওয়াত্তা। কিতাবুস সাওম
৩৭১. সহীহ বুখারী ঃ কিতাবুল হাজ্জ

সেই ভাবে অন্যের কাছে পৌঁছানো একজন সফল মুহাদ্দিসের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ও কর্তব্য। হযরত আয়িশা (রা) তাঁর সমকালীনদের যে ভুলত্রুটি ধরেছেন এবং তাঁদের যে সমালোচনা করেছেন, তাতে তাঁদের মধ্যের মুখস্থ শক্তির পার্থক্য ও বিভিন্নতা বিশেষভাবে কাজ করেছে। এখানে এমন কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো যা দ্বারা তাঁর প্রখর স্মৃতিশক্তির প্রমাণ পাওয়া যাবে।

হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা) ইনতিকাল করলেন। হযরত আয়িশা (রা) চাইলেন, লাশ মসজিদে আনা হোক, তাহলে তিনিও জানাযায় শরীক হতে পারবেন। লোকেরা প্রতিবাদ করলো। হযরত 'আয়িশা (রা) বললেন, লোকেরা কত তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) সুহাইল ইবন বায়দার (রা) জানাযার নামায মসজিদেই পড়েছিলেন।৩৭২

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারকে (রা) লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) কতবার 'উমরা আদায় করেছেন? জবাব দিলেন ঃ চারবার। তারমধ্যে একটি ছিল রজব মাসে। হযরত 'উরওয়া (রা) চেঁচিয়ে বলে উঠলেন ঃ খালা আম্মা! এ কি বলছে আপনি কি শুনছেন না? তিনি জানতে চাইলেন ঃ সে কি বলে? উরওয়া বললেন ঃ তিনি বলেন, রাসূল (সা) চারটি 'উমরা করেছেন, যার একটি রজব মাসে। তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহ আবু আবদির রহমানের (ইবন উমারের উপনাম) উপর রহম করুন। রাসূল (সা) এমন কোন উমরা করেননি যাতে আমি শরীক থাকিনি। রজবে তিনি কোন উমরা করেননি।৩৭৩

মুহাদ্দিসীন কিরাম, হাদীস বর্ণনার দিক দিয়ে সাহাবা-ই কিরামকে পাঁচটি স্তরে ভাগ করেছেন এবং প্রায় প্রতিটি স্তরে পুরুষ সাহাবীদের সাথে মহিলা সাহাবীরাও আছেন। ১ম স্তর ঃ যে সকল সাহাবীর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা একহাজার অথবা তার উর্ধে। হযরত আয়িশা (রা) এই স্তরের অন্তর্গত। ২য় স্তর ঃ যে সকল সাহাবীর বর্ণনা পাঁচ শো অথবা তাঁর উর্ধে, কিন্তু এক হাজারের কম। এই স্তরে কোন মহিলা সাহাবী নেই। ৩য় স্তর ঃ যে সকল সাহাবীর বর্ণনা এক শো অথবা তার উর্ধে; কিন্তু পাঁচ শো'র কম। হযরত উম্মু সালামা (রা) এই স্তরের অন্তর্গত। ৪র্থ স্তর ঃ যে সকল সাহাবীর বর্ণনা সংখ্যা চল্লিশ থেকে একশো' পর্যন্ত। এই স্তরে বেশীর ভাগ মহিলা সাহাবী। যেমন উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা), উম্মে আতিয়্যা (রা), উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা), আসমা বিন্‌ত আবী বকর (রা), উম্মু হানী (রা), প্রমুখ। ৫ম স্তর ঃ যে সকল সাহাবীর বর্ণনাসংখ্যা চল্লিশ অথবা তার কম। এই স্তরের সদস্যরা অধিকাংশ মহিলা। যেমন ঃ হযরত উম্মে কায়স (রা), হযরত ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রা), হযরত রাবী বিন্‌ত মাসউদ (রা), হযরত সুবরা বিনত সাফওয়ান (রা), হযরত কুলসুম বিন্‌ত হুসাইন গিফারী (রা), হযরত জাদা বিন্‌ত ওয়াহাব (রা) প্রমুখ।

---

৩৭২. সহীহ মুসলিম ঃ কিতাবুস জানায়িয

৩৭৩. সহীহ বুখারী ঃ বাবুল 'উমরা,

উপরে এই স্তরগুলির আলোচনা দ্বারা আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হাদীস শাস্ত্রে হযরত আশিয়ার (রা) মর্যাদা বা স্থান কোথায়। আমরা দেখতে পেলাম তাঁর স্থান সর্বোচ্চ স্তরে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া পিতা হযরত আবু বকর (রা), 'উমার (রা), ফাতিমা (রা), সা'দ (রা), হামযা ইবন আমর আল-আসলামী (রা) এবং জুজামা বিন্‌ত ওয়াহাব (রা)-এর সূত্রেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে হযরত আয়িশা (রা) থেকে যাঁরা হাদীস শুনেছেন এবং হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের সংখ্যা অনেক। তাঁদের মধ্যে সাহাবী ও তাবেঈ উভয় শ্রেণীর লোক আছেন। আল্লামা জাহাবী প্রায় দুই শো লোকের নাম উল্লেখ করার পর বলেছেন, এছাড়া আরো অনেকে।[৩৭৪]

সাহাবীদের বর্ণনা ও হাদীসের লেখা-লেখি ও গ্রন্থাবদ্ধের কাজ হিজরী প্রথম শতকের মাঝামাঝি শুরু হয়ে যায়। এ শতকের প্রান্তসীমায় উমাইয়্যা খলীফা হযরত 'উমার ইবন আবদিল আযীয (র) খিলাফতের মসনদে আসীন হন। তাঁর সময়ে মদীনার কাজী ছিলেন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আবু বকর ইবন 'আমর ইবন হাযাম আল আনসারী। কুরআন-হাদীসে তিনি এক বিশাল পাণ্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর এই পাণ্ডিত্যের পিছনে তাঁর খালা হযরত 'উমরার অবদান ছিল সবচেয়ে বেশী। এই 'উমরা ছিলেন হযরত 'আয়িশার (রা) ছাত্রী ও তাঁর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত। খলীফা 'উমার ইবন আবদিল আযীয, আবু বকর-কে নির্দেশ দেন, তিনি যেন 'উমরার বর্ণনাসমূহ লিখে তাঁর কাছে পাঠান।

## ইল্‌মে ফিকাহ্‌ ও কিয়াস

আল-কুরআন ও আল-হাদীস বা আস-সুন্নাহ হলো দলিল ও প্রমাণ, আর ফিকাহ হলো তার সিদ্ধান্ত ও ফলাফল। কুরআন ও হাদীসের উপর ভিত্তি করে যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, তাই হলো ফিকাহ ও কিয়াস। এই ইলমে ফিকাহ্‌ ও কিয়াসে হযরত 'আয়িশা (রা) যে কি পরিমাণ পারদর্শী ছিলেন তা পূর্বের আল-কুরআন ও আল-হাদীসে তাঁর পারদর্শিতার আলোচনা থেকে কিছুটা স্পষ্ট হয়ে গেছে। এখানে ফিকাহ ও কিয়াসে তাঁর উসূল বা নীতিমালা কি ছিলো সে সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা করা হলো।

রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনকালে তিনি নিজেই ছিলেন যাবতীয় ফাতওয়া ও সিদ্ধান্তের কেন্দ্রবিন্দু। কোন সমস্যার উদ্ভব হলে তিনিই তার সমাধান বলে দিতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর উঁচু স্তরের সাহাবীগণ, যাঁরা শরীয়াত ও আহকামে ইসলামীর গভীর তাৎপর্য বিষয়ে দক্ষ ছিলেন, তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত 'উমারের (রা) সামনে যখন কোন নতুন সমস্যার উদ্ভব হতো তখন তিনি 'আলিম সাহাবীদেরকে একত্র করে তাঁদের নিকট সিদ্ধান্ত চাইতেন। তাঁদের মধ্যে

---

৩৭৪ সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৭৭

কারো কাছে যদি বিশেষ কোন হাদীস থাকতো তিনি তা বর্ণনা করতেন। অন্যথায় কুরআন ও হাদীসের অন্য কোন হুকুমের উপর কিয়াস বা অনুমান করে সিদ্ধান্ত দিতেন। খিলাফতে রাশেদার তৃতীয় খলীফা পর্যন্ত এই ফিকাহ একাডেমী ছিল মদীনাকেন্দ্রিক। হযরত 'উসমানের (রা) খিলাফতকালে অরাজকতা ও অশান্তি মাথাচাড়া দেয় এবং বহু মানুষ মদীনা ছেড়ে মক্কা, তায়িফ, দিমাশক, বসরা প্রভৃতি স্থানে আবাসন গড়ে তোলে। অতপর হযরত আলী (রা) খলীফা হলেন। তিনি কুফাকে বানালেন 'দারুল খিলাফা'। এসব কারণে রাসূলুল্লাহর (সা) দারসগাহের মেধাবী শিক্ষার্থীদের অনেকেই মদীনা ছেড়ে অন্য শহরে চলে যান। তবে এর ফলে জ্ঞানচর্চার বেষ্টনী ও পরিধি আরো বিস্তার লাভ করে। কিন্তু তার সম্মিলিত রূপ বা বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যায়। যা কিছু বিদ্যমান ছিল তা কেবল মদীনাতেই।

উঁচু স্তরের সাহাবীদের পরে মদীনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, হযরত আবু হুরায়রা ও হযরত 'আয়িশা (রা)– এ চারজন বেশীর ভাগ সময় ফিকাহ ও ফাতওয়ার কাজ করেন। কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বিধান যেখানে নেই সেখানে এ চারজনের নীতিও ছিল ভিন্ন। 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার ও আবু হুরায়রার (রা) রীতি ছিল যে, উপস্থিত মাসয়লা সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর কোন হুকুম বা পূর্ববর্তী খলীফাদের কোন আমল যদি থাকতো, তারা তা বলে দিতেন। আর যদি তা না থাকতো তাঁরা নীরব থাকতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) এ ক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ ও পূর্ববর্তী খলীফাদের সময়ে সমাধানকৃত মাসয়ালার উপর কিয়াস করে নিজের বোধ ও বুদ্ধি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিতেন। এ ক্ষেত্রে হযরত 'আয়িশার (রা) উসুল ছিল, প্রথমে তিনি কুরআন থেকে সমস্যার সমাধান খুঁজতেন। সেখানে না পেলে সুন্নাহর দিকে দৃষ্টি দিতেন। সেখানে ব্যর্থ হলে নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী কিয়াস করতেন। হযরত 'আয়িশার (রা) ইজতিহাদ ও ইসতিমবাতের (গবেষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ) রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে ইতিপূর্বে কিছু আলোচনা আমরা করেছি। এখানে আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি।

কুরআনে এসেছে–৩৭৫

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ -

–"তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন 'কু'রূ' পর্যন্ত।" অর্থাৎ তার ইদ্দতের সময়সীমা তিন 'কুরূ'। এই 'কুরূ'-এর অর্থ নিয়ে মতভেদ আছে। হযরত 'আয়িশার (রা) এক ভাতিজীকে তার স্বামী তালাক দেয়। তিনি 'তুহূর' অর্থাৎ পবিত্রতার তিনটি মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পর যখন নতুন মাস শুরু হয় তখন তিনি তাকে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসতে বলেন। কিছু লোক তাঁর এ কাজের প্রতিবাদ করে

---

৩৭৫. সূরা আল-বাকারা-২২৮

বলেন, এটা কুরআনের হুকুমের পরিপন্থী। তাঁরা তাঁদের মতের সপক্ষে কুরআনের উপরে উল্লেখিত আয়াতটি প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন। জবাবে উম্মুল মুমিনীন বলেন, 'তিন কুরূ'– তা ঠিক আছে। তবে তোমরা কি জান 'কুরূ'-এর অর্থ কি? 'কুরূ' অর্থ 'তুহুর' (পবিত্রতা)। মদীনার সকল ফকীহ্ এ মাসয়ালায় হযরত 'আয়িশার (রা) অনুসরণ করেছেন। তবে ইরাকীরা 'কুরূ' অর্থ হায়েজ (মাসিকের বিশেষ দিনগুলি) বুঝেছেন।৩৭৬

হযরত যায়িদ ইবন আরকাম (রা) এক মহিলার নিকট থেকে বাকীতে আট শো দিরহামে একটি দাসী খরীদ করেন। শর্ত করেন যে ভাতা পেলে মূল্য পরিশেধ করবেন। মূল্য পরিশোধের পূর্বেই তিনি উক্ত দাসীটি নগদ ছয়শো দিরহামে আবার সেই মহিলার নিকট বিক্রী করেন। মহিলা ক্রয়-বিক্রয়ের এ বিষয়টি হযরত 'আয়িশাকে (রা) অবহিত করেন। হযরত আয়িশা (রা) মহিলাকে বলেন, তুমিও খারাপ কাজ করেছো এবং যায়িদ ইবন আরকামও। তুমি তাঁকে বলে দিবে, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে জিহাদ করে যে সাওয়াব অর্জন করেছিলেন তা বরবাদ হয়ে গেছে। তবে তিনি যদি তাওবা করে নেন।

এই বিশেষ অবস্থায় হযরত আয়িশা (রা) অতিরিক্ত দুই শো দিরহামকে সুদ বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আয়িশা (রা) সূরা আল-বাকারার ২৭৫তম আয়াতের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

আল-কুরআনুল কারীমের পরে হাদীসের স্থান। এ হাদীসের হুকুমের উপর কিয়াস করে কিভাবে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে পেশ করা হলো।

স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দানের ক্ষমতা অর্পণ করে এবং স্ত্রী সে ক্ষমতা স্বামীকে ফিরিয়ে দিয়ে উক্ত স্বামীকে মেনে নেয় তাহলেও কি সেই স্ত্রীর উপর কোন তালাক পড়বে? এ প্রশ্নে হযরত আলী (রা) ও হযরত যায়িদের (রা) মতে এক তালাক হয়ে যাবে। কিন্তু হযরত আয়িশা (রা) বলেন, এক তালাকও হবে না। তিনি তাঁর মতের সপক্ষে রাসূলুল্লাহর (সা) সেই 'তাখঈর'-এর ঘটনা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা) তাঁর স্ত্রীদেরকে এই ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা দিয়েছিলেন যে, তাঁরা তাঁকে ছেড়ে পার্থিব সুখ-ঐশ্বর্য গ্রহণ করতে পারেন অথবা তাঁর সাথে থেকে এই দারিদ্র্য ও অনাহারকে বরণ করতে পারেন। সবাই দ্বিতীয় অবস্থাটি গ্রহণ করেন। এতে কি তাদের উপর এক তালাক পতিত হয়েছে?৩৭৭

কেউ যদি কোন দাস মুক্ত করে তাহলে সেই মনিব ও মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের মধ্যে ইসলামী বিধান মতে এক প্রকার সম্পর্ক সৃষ্টি হয় যাকে ইসলামী পরিভাষায় 'আল-ওয়ালা' (অভিভাবকত্ব) বলে। যার ফলে মুক্তিদানকারী মনিব মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের সম্পদের উত্তরাধিকারী হতে পারে এবং আইনগতভাবে মুক্তিপ্রাপ্ত দাস পূর্বের মনিবের বংশের

---

৩৭৬. দেখুন ঃ মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ঃ কিতাবুল তালাক

৩৭৭. সহীহ বুখারী ঃ বাবু মান খায়্যারা নিসায়াহু

লোক বলে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়। এ কারণে এ 'আল-ওয়ালা' সম্পর্কের গুরুত্ব অত্যধিক। একজন মুক্তিপ্রাপ্ত দাস একবার হযরত আয়িশার (রা) নিকট এসে বললো, আমি উতবা ইবন আবী লাহাবের দাস ছিলাম। তারা স্বামী-স্ত্রী আমাকে এই শর্তে বিক্রী করে দেয় যে, আমি মুক্ত হলে আমার 'আল-ওয়ালা'-এর অধিকারী হবে সে। এখন আমি মুক্ত। আমার এই 'আল-ওয়ালা'-এর সম্পর্ক হবে কার সাথে? উতবা ইবন আবী লাহাবের সাথে না, যে মুক্ত করেছে তার সাথে? হযরত আয়িশা (রা) বললেন, 'বারীরা' নাম্নী দাসীর অবস্থাও ছিল এমন। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেন যে, বারীরাকে খরীদ করে আযাদ করে দাও। তুমিই তার 'আল-ওয়ালা'-এর অধিকারিণী হবে– বিক্রয়কারী আল্লাহর হুকুমের পরিপন্থী যত শর্তই আরোপ করুক না কেন।[৩৭৮]

হযরত বারীরা (রা) ছিলেন একজন দাসী। তাঁর মনিব তাঁকে এ শর্তে বিক্রী করতে চায় যে, তিনি মুক্ত হলে তাঁর আল-ওয়ালা-এর অধিকারী সে হবে। হযরত বারীরা (রা) হযরত 'আয়িশার (রা) নিকট এসে নিজের অবস্থার কথা তাঁকে বলেন। হযরত 'আয়িশা (রা) তাঁকে ক্রয় করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন; কিন্তু তাঁর মনিবের আল-ওয়ালার শর্তটি মানতে রাজি হলেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) ঘরে এলে তিনি বিষয়টি অবহিত করেন। রাসূল (রা) 'আয়িশাকে (রা) বলেন– তুমি নির্দ্বিধায় তাঁকে ক্রয় করে মুক্তি দিতে পার। আল্লাহর কিতাবের বিরোধী শর্ত স্বাভাবিকভাবেই রহিত হয়ে যাবে। বারীরা (রা) দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেন। দাসী অবস্থায় যার সাথে বিয়ে হয়েছিল, মুক্ত হয়ে তাঁকে আর স্বামী হিসেবে গ্রহণ করলেন না। লোকেরা তাঁকে সাদাকা দিত। তিনি সেই সাদাকা থেকে কিছু খাদ্য বস্তু রাসূলকে (সা) হাদিয়া (উপঢৌকন) হিসেবে দিতেন এবং রাসূল (সা) তা গ্রহণ করতেন।

হযরত বারীরার (রা) এ ঘটনা থেকে হযরত 'আয়িশা (রা) শরীয়াতের একাধিক হুকুম বের করেছেন। তিনি বলতেন ঃ বারীরার মাধ্যমে ইসলামের তিনটি বিধান জানা যায়।[৩৭৯] যথা ঃ

১. মুক্তিদানকারী ব্যক্তিই হবে আল-ওয়ালার অধিকারী।

২. দাসত্ব অবস্থায় যদি একটি দাস ও একটি দাসীর বিয়ে হয় এবং পরে স্ত্রী দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়, কিন্তু স্বামী দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, তাহলে দাস স্বামীকে গ্রহণ করা বা না করার ইখতিয়ার স্ত্রী লাভ করে।

৩. যদি দান-সাদকা পাওয়ার উপযুক্ত কোন ব্যক্তি কোন কিছু দান-সাদকা হিসেবে পায় এবং সে তা থেকে কিছু এমন ব্যক্তিকে হাদিয়া হিসেবে দেয় যে সাদকা পাওয়ার উপযুক্ত নয়, তাহলে সে ব্যক্তির জন্য তা গ্রহণ করা জায়েয হবে।

বিদায় হজ্জে কিছু কম-বেশী প্রায় এক লাখ মুসলমান অংশ গ্রহণ করেন। উঁচু স্তরের সকল সাহাবী এ সফরে রাসূলুল্লাহর (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন। এ সফরের যাবতীয় ঘটনা

---

৩৭৮. বায়হাকী ঃ কিতাবুল বুয়ূ; আল ফাতহুর রাব্বানী মায়া বুলুগিল আমানী-১৩/১৬২-১৬৩

৩৭৯. বুখারী ঃ বাবুল হুররাহ তাকুনু তাহতাল 'আবদি

সকলের জানা থাকার কথা। হযরত 'আয়িশার ও (রা) ঘটনাবলী তিনি স্মৃতিতে ধরে রাখেন। বিভিন্ন হাদীসে তা হুবহু বর্ণিতও হয়েছে। তবে হযরত 'আয়িশার (রা) বর্ণনাসমূহ ফকীহ ও মুজতাহিদদের মূলনীতিতে পরিণত হয়েছে। হযরত 'আয়িশা (রা) ঠিক হজ্জের অনুষ্ঠানগুলি আদায়কালীন সময়ের মধ্যে নারী প্রকৃতির বিশেষ অবস্থা দেখা দেওয়ায় হজ্জের কিছু অনুষ্ঠান আদায়ে অপারগ হয়ে পড়েন। এতে তিনি ভীষণ কষ্ট পান। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে সান্ত্বনা দেন এবং তাঁরই নির্দেশে তিনি 'তানঈম'-এ নতুন করে 'ইহরাম' বেঁধে কা'বার তাওয়াফ করেন।[৩৮০] হাফেজ ইবন কায়্যিম (র) হযরত 'আয়িশার (রা) এ বর্ণনাটি নকল করার পর বলেছেন :[৩৮১]

وحديث عائشة هذا يؤخذ منه أصول عظيمة من اصول المناسك -

–হযরত 'আয়িশার (রা) এ হাদীস থেকে হজ্জের অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু মূলনীতি গৃহীত হয়েছে। যেমন ঃ

১. যে ব্যক্তি হজ্জের সাথে উমরার নিয়্যেত অর্থাৎ 'কিরান' হজ্জের নিয়্যেত করবে তার জন্য একটি তাওয়াফ ও সাঈ করলে হয়ে যাবে।
২. নারীদের ক্ষেত্রে শারীরিক বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে 'তাওয়াফুল কুদুম' রহিত হয়ে যাবে।
৩. নারীদের বিশেষ অবস্থা দেখা দিলে হজ্জের পরে 'উমরার নিয়্যেত করা জায়িয।
৪. নারীরা বিশেষ অবস্থায় শুধু কা'বার তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের অন্য সব কাজ আদায় করতে পারবে।
৫. 'তানঈম' 'হারাম'-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। হারাম-এর বাইরে।
৬. 'উমরা এক বছরে, বরং এক মাসেও দুইবার আদায় করা যায়।
৭. কেবলমাত্র হযরত আয়িশার (রা) এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, মক্কার বাইরের লোকেরা মক্কা থেকেই (তানঈম) ইহরাম বেঁধে 'উমরা আদায় করতে পারে।

এখানে কিয়াসে 'আকলী বা প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিনির্ভর অনুমান সম্পর্কে একটু আলোচনা করা দরকার। কিয়াসে আকলী অর্থ এই নয় যে, যে কেউ নিজের বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে শরীয়াতের কোন হুকুম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দান করবে। বরং তার অর্থ হলো, আলিমগণ, যাঁরা শরীয়াতের গূঢ় রহস্য এবং দ্বীনী ইলমসমূহে অভিজ্ঞ, কিতাব ও সুন্নাতের অধ্যয়ন, গবেষণা এবং নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়নের কারণে তাঁদের মধ্যে এমন এক যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে যায় যে, যখন তাঁদের সামনে কোন নতুন মাসয়ালা আসে তখন তাঁরা তাঁদের সেই যোগ্যতা বলে বুঝতে সক্ষম হন যে, যদি শারে (আ) (বিধানদাতা) অর্থাৎ রাসূল (সা) জীবিত থাকতেন, তাহলে তিনি এই জবাব দিতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, কোন অভিজ্ঞ আইনজীবী, কোন বিশেষ আদালতের বহু মামলার রায় যিনি

৩৮০. মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ঃ ইফাদাতুল হামিদ
৩৮১. যাদুল মা'য়াদ-১/২০৭

দেখেছেন। তারপর তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ঐ জাতীয় কোন মোকদ্দমা সম্পর্কে সেই সকল রায়ের উপর অনুমান করে যদি একথা বলে দেন যে, মোকদ্দমাটি এই আদালতে উঠলে তার রায় এমন হবে। তখন তাকে কিয়াসে আকলী বলা হবে। ইসলামী শরীয়াতে নজীর ও ফয়সালা (দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত) সমূহ সম্পর্কে হযরত 'আয়িশা (রা) যে কতখানি অবহিত ছিলেন তা আমাদের পূর্বের আলোচনায় মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে গেছে। এ কারণে তাঁর কিয়াসে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা খুব কম থাকাই স্বাভাবিক। এখানে আমরা হযরত আয়িশার (রা) কিয়াসে আকলীর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি।

রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় সাধারণভাবে মহিলারা মসজিদে আসতো এবং নামাযের জামায়াতে শরীক হতো। পুরুষদের পিছনে শিশু-কিশোররা এবং তাদের পিছনে মহিলারা সারিবদ্ধ হতো, রাসূলুল্লাহ (সা) মহিলাদের মসজিদে আসতে বারণ করতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন ঃ

لَا تَمْنَعُوْا اَمَاءَ اللّٰهِ مِنْ مَسَاجِدِاللّٰهِ ـ

-"আল্লাহর বান্দীদের আল্লাহর মসজিদে আসতে তোমরা বারণ করোনা।"

রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর লোকদের সাথে আরবদের উঠা-বসা, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ও আর্থিক প্রাচুর্যের কারণে মহিলাদের চাল-চলন, সাজ-সজ্জা ও বেশ-ভূষায় পরিবর্তন আসে। এ অবস্থা দেখে হযরত আয়িশা (রা) বলেন ঃ 'আজ যদি রাসূলুল্লাহ (সা) জীবিত থাকতেন তাহলে মহিলাদের মসজিদে আসতে বারণ করতেন।' তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ৩৮২

عن عمرة عن عائشة قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى اسرائل ـ

আমারাহ্ থেকে বর্ণিত। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, "আজকাল মহিলারা যে সব নতুন কথা ও কাজের জন্ম দিচ্ছে, যদি রাসূলুল্লাহ (সা) এ সময় জীবিত থাকতেন তাহলে, তাদের মসজিদে আসা বন্ধ করে দিতেন, যেমন ইহুদী মহিলাদের বন্ধ করা হয়েছিল।"

হযরত 'আয়িশার (রা) এ সিদ্ধান্ত যদিও সে সময় বাস্তবায়িত হয়নি, তবে তার ভিত্তি ছিল ঐ কিয়াসে আকলী। তিনি তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝেছিলেন, এক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুম কেমন হতে পারতো।

হযরত আবু হুরাইয়া (রা) ফাতওয়া দিতেন, কোন ব্যক্তি মৃতকে গোসল দিলে তাকেও গোসল করতে হবে। আর যদি কেউ মৃতের খাটিয়া বহন করে তাকে দ্বিতীয়বার ওজু

---

৩৮২. সহীহ বুখারী ঃ বাবু খুরূজিন নিসা ইলাল মাসাজিদ

করতে হবে। একথা হযরত 'আয়িশার (রা) কানে গেলে বলেন ঃ

أو ينجس موتى المسلمين وما على رجل لو حمل عودا -

"মুসলমান মোর্দাও কি নাপাক হয়ে যায়? আর কেউ যদি কাঠ বহন করে তাতে তার কি হয়?"

গোসল ওয়াজিব হওয়ার জন্য ধাতু নির্গত হওয়া প্রয়োজন কিনা, সে সম্পর্কে সাহাবীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। হযরত জাবির (রা) বলতেন ঃ - الماء من الماء 'পানির জন্য পানি'। –অর্থাৎ ধাতু নির্গত হলেই কেবল পানি ব্যবহার প্রয়োজন, অন্যথায় নয়। হযরত আয়িশা (রা) এ মতের বিপরীত একটি হাদীস বর্ণনা করে বলেন, "কেউ যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং পানি বের না হলেও তো তোমরা তাকে রজম করে থাক, তাহলে গোসল ওয়াজিব হবে না কেন?"

সাহবায়ে কিরামের (রা) মধ্যে হযরত ইবন 'উমার (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) যাবতীয় কর্মকে সুন্নাত বলে মনে করতেন এবং সে অনুযায়ী আমল করতেন। ফকীহগণ সুন্নাতকে যে ইবাদী ও 'আদী[৩৮৩] দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন, তিনি তা করতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কোন কাজ যে কারণেই করুন না কেন, তা সুন্নাত। তা অনুসরণ করা জরুরী। এ কারণে তিনি সফরের মানযিল-এর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর (সা) অনুসরণ করতেন। অর্থাৎ রাসূল (সা) কোন সফরে যেখানে যেখানে অবস্থান করেছেন, ইবন উমার (রা) পরবর্তী কালে ঠিক সেখানেই অবস্থান করতেন। যদি কোন মানযিলে রাসূল (সা) ঘটনাক্রমে পাক-পবিত্র হয়ে থাকেন, তিনিও সেখানে বিনা প্রয়োজনে পাক-পবিত্র হতেন। কিন্তু হযরত আয়িশা (রা) ও হযরত ইবন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাতের উপরোক্ত পার্থক্যের প্রবক্তা ছিলেন। তাঁরা ইবন 'উমারের (রা) মতকে সমর্থন করেননি। হজ্জের সময় রাসূল (সা) 'আবতাহ' উপত্যকায় তাবু গেড়ে অবস্থান করেছিলেন। কিন্তু 'আয়িশা (রা) এটাকে সুন্নাত মনে করেননি। সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে ঃ

نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان اسمح لخروجه إذا خرج -

"আল-আবতাহ উপত্যকায় অবস্থান করা সুন্নাত নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে এ জন্য অবস্থান করেছিলেন যে, সেখান থেকে বের হওয়া তাঁর জন্য সহজ ছিল।"

হযরত 'আয়িশা (রা) বহু ফিকহী মাসয়ালায় তাঁর সমকালীনদের থেকে দ্বিমত পোষণ করেছেন। পরবর্তী কালে হিজাযের ফকীহরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরই মতের উপর আমল করেছেন। হযরত 'আয়িশার (রা) এসব মতামত ও আমলের বিরাট একটি অংশ

৩৮৩. রাসূল (সা) যে কাজ সাওয়াবের নিয়্যেতে ইবাদাতের পদ্ধতিতে করেছেন, তা হলো 'ইবাদী। এই ইবাদী কর্ম আবার দুই প্রকার-মুওয়াক্কাদা ও গায়ের মুওয়াক্কাদা। আর যে কাজ তিনি স্বভাব ও অভ্যাসবশত অথবা কোন সাময়িক প্রয়োজনে করেছেন, তা হলো 'আদী। উম্মাতের জন্য তা অনুসরণ জরুরী নয়

ইমাম মালিক (র) তাঁর 'আল-মুওয়াত্তা'গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

## তা'লীম ও ইফ্তা (শিক্ষাদান ও ফাতওয়ার দায়িত্ব পালন)

ইলম বা জ্ঞান অন্যের নিকট পৌঁছানো ইলমের অন্যতম খিদমাত বলে ইসলাম বিশ্বাস করে। রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দেশ দিয়েছেন–

فليبلغ الشاهد الغائب -

উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট অবশ্যই পৌঁছাবে। হযরত 'আয়িশা (রা) এ দায়িত্ব কতটুকু পালন করেছিলেন তা আমাদের পূর্বের আলোচনা সমূহ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে। এখানে আমরা আরো একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই।

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর সাহাবায়ে কিরাম (রা) ইসলামী দাওয়াত ও ইলমের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশে ইসলামী খিলাফতের বিভিন্ন শহর ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। মক্কা মুয়াজ্জামা, তায়িফ, বাহরাইন; ইয়ামান, দিমাশক, মিসর, কুফা, বসরা প্রভৃতি বড় বড় শহর ও নগরে এই সকল মহান শিক্ষকবৃন্দের এক একটি ছোট দল অবস্থান করতেন। খিলাফত ও সরকারের কেন্দ্র ২৭ বছর পর মদীনা থেকে প্রথমে কুফায় এবং পরবর্তীকালে দিমাশকে স্থানান্তরিত হয়। তা সত্ত্বেও মদীনার রূহানী ও ইল্মী (আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানগত) শ্রেষ্ঠত্বের কোন অংশে ভাটা পড়েনি। তখনও মদীনায় হযরত ইবন 'উমর (রা), হযরত আবু হুরাইরা (রা), হযরত ইবন আব্বাস (রা) ও হযরত যায়িদ ইবন সাবিত (রা) প্রমুখের পৃথক পৃথক দারসগাহ চালু ছিল। তবে সবচেয়ে বড় দারসগাহটি ছিল হযরত আয়িশার (রা) হুজরাকেন্দ্রিক মসজিদে নববীর সেই বিশেষ স্থানে।

মদীনা ছিল ইসলামী খিলাফতের প্রাণকেন্দ্র। যিযারত ও বরকত হাসিলের উদ্দেশে চতুর্দিক থেকে মানুষ সেখানে ছুটে আসতো। যারা আসতো তারা অবশ্যই একবার না একবার উম্মুল মুমিনীনের হুজরার দরজায় হাজিরা দিত। তারা সালাম পেশ করতো। তিনি আগন্তুকদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করতেন। কথাবার্তা, সালাম-কালাম, মাসয়ালা জিজ্ঞাসা ও জবাব দান সবই হতো পর্দার অন্তরাল থেকে। ইরাক, মিসর, শাম প্রভৃতি অঞ্চল থেকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে তাঁর খিদমতে হাজির হতো এবং বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ও ফাতওয়া চাইতো। যে সব শিক্ষার্থী সর্বক্ষণ উম্মুল মুমিনীনের খিদমতে থাকতো, এসকল আগন্তুক তাদেরকেও সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতো। এ ধরনের একজন শিক্ষার্থী 'আয়িশা বিন্ত তালহা বর্ণনা করেছেন ঃ

كان الناس يأتونها من كل مصر فكان الشيوخ ينتابونى لمكانى منها وكان الشباب يتاخونى فيهدون الى ويكتبون الى من الامصار فأقول لعائشة يا خالة هذا كتاب فلان وهديته تقول لى عائشة أى بنية فاجيبه واثبيه.(أدب

المفرد للبخاري: باب الكتابة الى النساء)

"প্রতিটি শহর থেকে মানুষ হযরত 'আয়িশার (রা) নিকট আসতো। তাঁর সাথে আমার সম্পর্কের কারণে বৃদ্ধরা আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতো। যুবকরা আমার সাথে ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্ক গড়ে তুলতো। লোকেরা আমার কাছে হাদিয়া-তোহাফা পাঠাতো এবং বিভিন্ন শহর থেকে চিঠি-পত্র লিখতো। আমি তা হযরত 'আয়িশার (রা) সামনে উপস্থাপন করে বলতাম, খালা আম্মা! এ অমুকের চিঠি ও হাদিয়া। তিনি বলতেন, বেটি! তুমি এর জবাব দাও এবং বিনিময়ে তুমিও কিছু পাঠিয়ে দাও।'

স্বাভাবিক ভাবেই পুরুষের চেয়ে মহিলাদেরই ভীড় হতো বেশী। মহিলা বিষয়ক মাসয়ালার সমাধান দানের সাথে সাথে বলে দিতেন, তোমরা পুরুষদেরকেও অবহিত করবে। একবার বসরা থেকে কিছু মহিলা আসে। তিনি তাদের কিছু নসীহত করে বলেন, তোমরা পুরুষদেরকে অবহিত করবে। তাদেরকে অনেক কথা বলতে আমার শরম হয়। তাদের বলবে তারা যেন পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করে।

নারী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে এবং যে সকল পুরুষদের থেকে হযরত 'আয়িশার (রা) পর্দা করার প্রয়োজন ছিল না, তাঁরা সকলে হুজরার ভিতরের মজলিসে বসতেন, আর অন্যরা বসতেন হুজরার বাইরে মসজিদে নববীর মধ্যে। দরজায় পর্দা টানানো থাকতো। পর্দার আড়ালে তিনি নিজে বসে যেতেন।[৩৮৪] লোকেরা প্রশ্ন করতো, তিনি জবাব দিতেন। কোন কোন মাসয়ালায় শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষার্থীর মধ্যে তর্ক-বাহাছ হতো।[৩৮৫] কখনও কোন মাসয়ালা নিজেই বিস্তারিত বর্ণনা করতেন, লোকেরা নীরবে কান লাগিয়ে শুনতো। তিনি শিক্ষার্থীদের ভাষা, প্রকাশভঙ্গি এবং সঠিক উচ্চারণের দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। একবার তাঁর দুই ভাতিজা আসেন। তাঁরা দুইজন ছিলেন দুই মায়ের সন্তান। একজনের ভাষা তেমন শুদ্ধ ছিল না। তার ভাষায় যথেষ্ট ভুল-ত্রুটি ছিল। হযরত 'আয়িশা (রা) তাঁর ভুল ধরে দিয়ে বলেন, তুমি তেমন ভাষায় কথা বল না কেন যেমন আমার এই ভাতিজা কথা বলে? হাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি, তাকে তার মা এবং তোমাকে তোমার মা শিক্ষা দিয়েছে। উল্লেখ্য যে, যাঁর ভাষা শুদ্ধ ছিল না, তার মা ছিলেন দাসী।

উপরে উল্লেখিত এ ধরনের অস্থায়ী শিক্ষার্থীরা ছাড়া তিনি বিভিন্ন খান্দানের ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে এবং ইয়াতীম শিশুদেরকে নিজের তত্ত্বাবধানে লালন-পালন করতেন ও শিক্ষা দিতেন। কখনও এমন হয়েছে যে, শিশু নয়, বরং যারা বড় হয়ে গেছে এমন ছেলেদেরকে তাঁদের দুধ-খালা বা দুধ-নানী হওয়ার কারণে নিজের ঘরের মধ্যে ঢোকার অনুমতি দিতেন।[৩৮৬] আর যাদের ঘরের ঢোকার অনুমতি ছিল না, এমন গায়ের মুহাররম ব্যক্তিরা আফসোস করে বলতো, ইলম হাসিলের ভালো সুযোগ থেকে আমরা

---

৩৮৪. মুসনাদ-৬/৭২; তাবাকাত-২/২৯

৩৮৫. মুসনদা-৬/৭৫

৩৮৬. হযরত আয়িশা (রা) এমত পোষণ করতেন যে, যদি কোন মহিলা কোন বালেগ ছেলেকেও দুধ পান করায় তাহলে তাতে রাদা'ঈ হুরমত বা দুধপানগত কারণে মুহাররম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহর

বঞ্চিত। কুবায়সা বলতেন, 'উরওয়া আমার চেয়ে জ্ঞানে এগিয়ে যাওয়ার কারণ হলো, সে আয়িশার (রা) গৃহাভ্যন্তরে যেতে পারতো। ইরাকের সর্বজন মান্য ইমাম নাখঈ ছোটবেলায় হযরত 'আয়িশার (রা) সান্নিধ্যে যাওয়ার সুযোগ লাভ করেছিলেন। এজন্য তার সমকালীনরা তাঁকে ঈর্ষা করতেন।[৩৮৭]

হযরত 'আয়িশা (রা) প্রতিবছর হজ্জে যেতেন। হিরা ও সাবীর পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে তাঁর তাঁবু স্থাপন করা হতো। দূর-দূরান্তের জ্ঞান পিপাসুরা সেই তাঁবুর পাশে ভীড় জমাতো। কখনো কখনো কা'বার চত্বরে যমযমের ছাদের নীচে বসে যেতেন, জ্ঞান পিপাসুরা সামনে জমায়েত হতো। তিনি যখন চলতেন মহিলারা চারিদিক থেকে ঘিরে রাখতো। ইমামের মত তিনি চলতেন আগে আগে, আর অন্যরা পিছনে। লোকেরা বিভিন্ন মাসয়ালার সমাধান চাইতো এবং সন্দেহ-সংশয় দূর করতে চাইতো, তিনি তাদের সমাধান বলে দিয়ে সন্দেহ দূর করে দিতেন। তিনি লোকদের যে কোন ধরনের প্রশ্ন করার জন্য উৎসাহ দিতেন। বলতেন, তোমরা তোমাদের মার কাছে যে প্রশ্ন করতে পার, তা আমার কাছেও করতে পার। একবার তিনি হযরত আবু মূসা আল-আশয়ারীকেও (রা) এ রকম কথা বলেছিলেন।[৩৮৮] তিনি বলতেন, আমি তোমাদের মা। আসলেই তিনি শিক্ষার্থীদের মায়ের মতই শিক্ষা দিতেন। 'উরওয়া, কাসেম, আবু সালামা, মাসরূক ও সাফিয়্যাক মাতৃস্নেহে শিক্ষাদীক্ষা দেন। ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে নিজের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করতেন এবং তাদের যাবতীয় খরচও নিজে বহন করতেন। কোন কোন শিক্ষার্থীর সাথে তিনি এমন মাতৃসুলভ আচরণ করতেন যে, তা দেখে তাঁর আপন জনেরাও ঈর্ষা করতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা) ছিলেন হযরত আয়িশার (রা) অতি স্নেহের ভাগ্নে। তিনি একবার খালার এক শাগরিদ আসওয়াদকে বলেন, 'উম্মুল মুমিনীন তোমার কাছে যে সব গোপন কথা বলতেন, তা কিছু আমাকেও বলো।

হযরত 'আয়িশার (রা) শাগরিদরা তাঁকে খুবই সম্মান করতেন। হযরত 'আমারাহ্ ছিলেন আনসার-কন্যা। তিনি হযরত 'আয়িশাকে (রা) খালা বলে ডাকতেন। ইমাম আশ-শা'বী বলেন : 'আয়িশা (রা) মাসরূক ইবন আজদা'কে ছেলে হিসেবে গ্রহণ করেন।[৩৮৯] হযরত আয়িশার (রা) জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে অসংখ্য মানুষ গ্রহণ করেছেন। তবে যাঁরা

---

(সা) অন্য বিবিগণ হযরত 'আয়িশার (রা) এমত গ্রহণ করেননি। ইমামদের মধ্যে একমাত্র দাউদ জাহিরী ছাড়া সকল ইমাম ও ফকীহ রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য বিবিগণের সাথে আছেন। কেবল দাউদ জাহিরী হযরত আবু হুজায়ফা ও তাঁর মাওলা সালেমের (রা) ঘটনার ভিত্তিতে হযরত আয়িশার মতটি গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া অন্য সহীহ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত যে, কেবল শিশু অবস্থায় দুধপান করলেই হুরমত প্রতিষ্ঠিত হয়। কুরআন মজীদের সূরা আল-বাকারার ২৩৩ নং আয়াতে দুধপানের সময়কাল জন্মের পর থেকে দুই বছর নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। একারণে অধিকাংশ ফকীহ এ ক্ষেত্রে হযরত আয়িশার (রা) মতটি গ্রহণ করেননি। তাঁরা আবু হুজায়ফার স্ত্রী ও সালেমের ঘটনাটি ব্যতিক্রমধর্মী বলে মনে করেছেন। (ইমাম নাওয়াবী : শরহু মুসলিম : বাবু রাদীয়াতুল কাবীর; মুসনাদে আহমাদ-৬/২৭১)

৩৮৭. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৪

৩৮৮. মুসনাদ-৬/৯০; মুওয়াত্তা ইমাম মালিক : বাবুল গুসল

৩৮৯. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৯

শৈশব থেকে তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন এবং পরবর্তীকালে আয়িশার (রা) জ্ঞানের সত্যিকার বাহকরূপে মুহাদ্দিসদের নিকট সমাদৃত হন নিম্নে তাঁদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হলো ঃ

১. 'উরওয়া ঃ তাঁর পিতা যুবাইর (রা), মাতা আসমা বিন্ত আবী বকর (রা)। নানা হযরত আবু বকর (রা) এরং খালা হযরত আয়িশা (রা)। খালা অতি আদরে তাঁকে লালন-পালন করেন। মদীনার জ্ঞান ও মহত্ত্বের শিরোমণিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ইমাম যুহরী ও আরো অনেকে তাঁর ছাত্র ছিলেন। তাঁকে সীরাত ও মাগাযীশাস্ত্রের ইমাম গণ্য করা হয়। ইমাম যুহরী বলেন, আমি তাঁকে অফুরন্ত সাগররূপে দেখেছি। হযরত 'আয়িশার (রা) বর্ণনা, ফিকাহ ও ফাতওয়ার জ্ঞানে তাঁর চেয়ে বড় কোন আলিম সে যুগে আর কেউ ছিলেন না। হিজরী ৯৪ সনে ইনতিকাল করেন।[৩৯০]

২. কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ঃ তাঁর দাদা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং ফুফু হযরত আয়িশা (রা)। ছোটবেলা থেকেই ফুফুর স্নেহে বেড়ে ওঠেন এবং তাঁর কাছেই শিক্ষা লাভ করেন। বড় হয়ে মদীনার ফিকাহর একজন ইমাম হন। মদীনায় সাত সদস্যবিশিষ্ট ফকীহদের যে মজলিস ছিল, তিনি ছিলেন তার অন্যতম সদস্য। আবুয যিয়াদ বলেন ঃ 'আমি কাসিমের চেয়ে বড় ফকীহ যেমন দেখিনি, তেমনি সুন্নাতের জ্ঞানে তাঁর চেয়ে বড় জ্ঞানী আর কাউকে দেখেনি।' ইবন 'উয়ায়না বলেন ঃ 'কাসিম ছিলেন তাঁর সময়ের সবচেয়ে বড় আলিম।' হিজরী ১০৬, মতান্তরে ১০৭ সনে ইনতিকাল করেন।[৩৯১]

৩. আবু সালামা ঃ প্রখ্যাত সাহাবী হযরত 'আবদুর রহমান ইবন আউফের (রা) ছেলে। অল্প বয়সে পিতার মৃত্যুর পর তিনি হযরত আয়িশার (রা) স্নেহে বড় হন। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের মদীনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আলিম। ইমাম যুহরী বলেন ঃ 'আমি চারজনকে সাগরের মত পেয়েছি। তাঁরা হলেন ঃ 'উরওয়া ইবন যুবাইর, ইবনুল মুসায়্যাব, আবু সালামা ও উবাইদুল্লাহ ইবন আবদিল্লাহ।' হিজরী ৯৪, মতান্তরে ১০৪ সনে ইনতিকাল করেন।[৩৯২]

৪. মাসরূক ইবনুল আজদা ঃ তাঁর পিতা ছিলেন ইয়ামনের একজন বিখ্যাত অশ্বারোহী। আরবের বিখ্যাত বীর 'আমর ইবন মা'দিকারিব ছিলেন তাঁর মামা। ইমাম জাহাবী শা'বীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত 'আয়িশা (রা) মাসরূককে ছেলে হিসেবে গ্রহণ করেন। ইবন সা'দ বর্ণনা করেছেন যে, একবার তিনি উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশার (রা) সাথে দেখা করতে এলে তিনি মাসরূকের জন্য শরবত তৈরী করতে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, আমার ছেলের জন্য শরবত বানাও। তিনি আয়িশা (রা) থেকে যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশ ইমাম আহমাদ মুসনাদে এবং ইমাম বুখারী তাঁর আল-জামে' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তাঁকে ইরাকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ গণ্য করা হতো। ইমাম

---

৩৯০. প্রাগুক্ত-১/৬২
৩৯১. প্রাগুক্ত-১/৯৬-৯৭
৩৯২. প্রাগুক্ত-১/৬৩

শা'বী বলেন ঃ 'আমি তাঁর চেয়ে বড় জ্ঞানপিপাসু আর কাকেও জানিনে। তিনি কাজী শুরাইহ থেকেও বড় মুফতী ছিলেন। কাজী শুরাইহ তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। কিন্তু মাসরূকের কাজী শুরাইহ এর কোন প্রয়োজন হতো না। তিনি কুফার বিচারকের দায়িত্ব পালন করতেন। তবে কোন পারিশ্রমিক নিতেন না। উঁচুস্তরের আবেদ ব্যক্তি ছিলেন। আবু ইসহাক বলেন ঃ 'একবার তিনি হজ্জে যান। বাড়ী থেকে বের হয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত সিজদারত অবস্থায় ছাড়া ঘুমাননি।' তাঁর স্ত্রী বলেছেন ঃ 'নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর পা ফুলে যেত।' হিজরী ৬৩ সনে ইনতিকাল করেন।[৩৯৩]

৫. আমারাহ বিনত আবদির রহমান ঃ তিনি ছিলেন প্রখ্যাত আনসারী সাহাবী আস'য়াদ ইবন যুরারার (রা) পৌত্রী। মহিলাদের মধ্যে হযরত 'আয়িশার (রা) তা'লীম-তারবিয়্যাত বা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম নমুনা হলেন তিনি। মুহাদ্দিসগণ অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর নামটি উচ্চারণ করে থাকেন। 'আয়িশার (রা) হাদীস সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন তিনি'—একথা বলেছেন ইবন হিব্বান। সুফইয়ান সাওরী বলেন ঃ 'আমারাহ, কাসিম ও 'উরওয়ার হাদীসই হচ্ছে 'আয়িশার (রা) সর্বাধিক শক্তিশালী ও প্রমাণিত হাদীস।' উম্মুল মুমিনীন তাঁকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। একারণে লোকেরা তাঁকে অতিরিক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করতো। ইমাম বুখারীর বর্ণনামতে তিনি ছিলেন উম্মুল মুমিনীনের সেক্রেটারী। লোকেরা তাঁরই মাধ্যমে হাদিয়া-তোহফা ও চিঠি-পত্র হযরত 'আয়িশার (রা) নিকট পাঠাতো।[৩৯৪]

৬. সাফিয়্যা বিন্‌ত শায়বা ঃ কা'বার চাবি রক্ষক শায়বার কন্যা, সাফিয়্যা। হাদীসের প্রায় সকল গ্রন্থে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। হাদীসের সনদে তাঁকে— 'শায়বার কন্যা সাফিয়্যা, আয়িশার (রা) বিশেষ শাগরিদ' অথবা 'আয়িশার (রা) সাহচর্যপ্রাপ্তা'— এভাবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে।[৩৯৫] মানুষ তাঁর কাছে বিভিন্ন মাসয়ালা এবং হযরত 'আয়িশার (রা) হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে আসতো। আবু দাউদ বলেন ঃ[৩৯৬]

خرجت مع عدى بن عدى الكندى حتى قدمنا مكة فبعثنى
إلى صفية بنت شيبة وكانت حفظت من عائشة -

—আমি 'আদী ইবন আদী আল-কিন্দীর সাথে হজ্জের উদ্দেশে বের হলাম। মক্কায় পৌছার পর তিনি আমাকে সাফিয়্যা বিন্‌ত শায়বার নিকট পাঠালেন। তিনি হযরত আয়িশা (রা) থেকে হাদীস শুনে মুখস্থ করেছিলেন।

৭. 'আয়িশা বিন্‌ত তালহা (রা) ঃ প্রখ্যাত সাহাবী হযরত তালহার কন্যা। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর নানা এবং হযরত 'আয়িশা (রা) তাঁর খালা। খালার তত্ত্বাবধানে

---

৩৯৩. প্রাগুক্ত-১/৪৯
৩৯৪. বুখারী ঃ আদাবুল মুফরাদ-বাবুল মুরাসালা ইলান নিসা
৩৯৫. মুসনাদ-৬/২৭৬; তাবাকাত-৮/২৮৪
৩৯৬. বাবুত তালাক আলাল গালাত

লালিত-পালিত হন। আবু যার'আ দিমাশকী বলেন, লোকেরা তাঁর সম্মান, মর্যাদা ও শিষ্টাচারিতা দেখে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৮. মুয়াজা বিন্ত আবদিল্লাহ্ আল-'আদাবিয়্যা ঃ একজন বসরী মেয়ে। হযরত 'আয়িশার (রা) শাগরিদ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তিনি বহু হাদীস হযরত 'আয়িশার (রা) ভাষায়ই বর্ণনা করেছেন। একজন উঁচু স্তরের আবেদা ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি আর কোন দিন বিছানায় ঘুমাননি।

এখানে মাত্র কয়েকজনের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ করা হলো। এছাড়া আরো অনেকে আছেন।

চিকিৎসা বিদ্যা, ইতিহাস, সাহিত্য, কবিতা ও বক্তৃতা-ভাষণে হযরত 'আয়িশার (রা) আগ্রহ ও পারদর্শিতা সম্পর্কে যদিও আগে কিছু কিছু আলোচনা এসে গেছে, তা সত্ত্বেও স্বতন্ত্রভাবে আরো কিছু আলোচনা প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। হযরত আয়িশার (রা) ছাত্র-শিষ্যরা বর্ণনা করেছেন যে, ইতিহাস, বক্তৃতা-ভাষণ, সাহিত্য ও কবিতায় তার বেশ ভালোই দখল ছিল। আর চিকিৎসা বিদ্যায় ছিল মোটামুটি জ্ঞান। হিশাম ইবন উরওয়ার বর্ণনা ঃ[৩৯৭]

ما رأيت أحدا من الناس أعلم بالقران ولا بفريضة ولا بحلال ولا حرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا النسب من عائشة -

'আমি (উরওয়া) কুরআন, ফারায়েজ, হালাল-হারাম (ফিকাহ্) কবিতা, আরবের ইতিহাস ও নসব (বংশ) বিদ্যায় 'আয়িশা (রা) অপেক্ষা অধিকতর পারদর্শী আর কাউকে দেখিনি।'

'উরওয়া আরো বলেন ঃ 'আমি চিকিৎসা বিদ্যায় আয়িশা (রা) অপেক্ষা অধিকতর অভিজ্ঞ আর কাউকে পাইনি।[৩৯৮] তৎকালীন আরবে চিকিৎসা বিদ্যার যথাযথ চর্চা ও প্রচলন ছিলনা। সেকালের আরবের সবচেয়ে বড় চিকিৎসাবিদ ছিলেন হারিস ইবন কালদা। তাছাড়া সারা আরবে ছোট ছোট আরো অনেক চিকিৎসক ছিলেন। একটা নিরক্ষর সমাজে চিকিৎসার যতটুকু প্রচলন হয়ে থাকে, সেকালের আরব সমাজে চিকিৎসাবিদ্যা বলতে তাই বুঝায়। গাছ-গাছড়ার কিছু গুণাগুণ জানা, অসুস্থ ব্যক্তিদের পরীক্ষিত কিছু ওষুধ সম্পর্কে জানা ইত্যাদি। এক ব্যক্তি হযরত আয়িশাকে (রা) জিজ্ঞেস করে, আপনি কবিতা বলেন, তা মানলাম যে, আপনি আবু বকরের (রা) মেয়ে, বলতে পারেন; কিন্তু আপনি এ চিকিৎসাবিদ্যা কিভাবে আয়ত্ব করেন? তিনি জবাব দেন, রাসূলুল্লাহ (সা) শেষ জীবনে অসুস্থ থাকতেন। আরবের চিকিৎসকরা আসতো। তারা যে ওষুধের কথা বলতো, আমি মনে রাখতাম।[৩৯৯] আমরা বুঝতে পারি যে, পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর

৩৯৭. তাজকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/২৮

৩৯৮. প্রাগুক্ত

৩৯৯. মুসনাদে আহমাদ-৬/৬৭

লোকেরা যে ভাবে গাছ-গাছড়ার মাধ্যমে চিকিৎসা করে থাকে, তাঁর চিকিৎসাবিদ্যা ছিল সেই পর্যায়ের। তাছাড়া আরো কিছু রোগীর ব্যবস্থাপত্র তিনি মনে রেখেছিলেন। সেই সময় মুসলিম মহিলারা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যুদ্ধে যেতেন, তাঁরা আহত সৈনিকদের ব্যাণ্ডেজ লাগাতেন[৪০০] ও সেবা করতেন। আয়িশা (রা) নিজেও উহুদ যুদ্ধের আহত সৈনিকদের সেবা করেছিলেন। এতে ধারণা হয় যে সে যুগের মুসলিম মহিলাদের প্রাথমিক প্রয়োজন মেটানোর মত এই শাস্ত্রের জ্ঞান থাকতো।

প্রাচীন আরবের ইতিহাস, জাহিলিয়াতের রীতি-প্রথা এবং আরবের বিভিন্ন গোত্র- গোষ্ঠীর বংশ সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি। হযরত আয়িশা (রা) তাঁরই মেয়ে। বলা চলে পিতার জ্ঞান তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন। এ কারণে আমরা হযরত উরওয়াকে বলতে শুনি– 'আমি আরবের ইতিহাস ও কুষ্ঠিবিদ্যায় আয়িশার (রা) চেয়ে বেশী জানা কাউকে দেখিনি।' জাহিলী আরবের রীতি-প্রথা ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ তিনি দিয়েছেন, যা হাদীসের গ্রন্থসমূহে সংকলিত হয়েছে। যেমন, আরবে কত রকমের বিয়ে চালু ছিল, তালাকের পদ্ধতি কেমন ছিল, বিয়ের সময় কি গাওয়া হতো, তারা কোন কোন দিন রোযা রাখতো, হজ্জের সময় কুরাইশরা কোথায় অবস্থান করতো, মৃত ব্যক্তির লাশ দেখে তারা কি কথা উচ্চারণ করতো ইত্যাদি। সহীহ বুখারী, তিরমিজী, মুসনাদে আহমাদ প্রভৃতি গ্রন্থে তার এসব বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইসলাম–পূর্ব আ২লে মদীনার আনসারদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ 'বুয়াস'-এর বর্ণনা[৪০১] যেমন আয়িশা (রা) দিয়েছেন, তেমনি তাদের ধর্ম বিশ্বাসের কথা, দেব-দেবীর কথাও বলেছেন। যেমন তারা 'মুশাল্লাল' পর্বতের মূর্তির পূজা করতো।[৪০২] ইসলামের কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যেমন ওহীর সূচনা পর্ব, ওহী কেমন করে হতো, ওহীর সময় রাসূলুল্লাহর (সা) অবস্থা কিরূপ দাঁড়াতো, নবুওয়াতের সূচনা পর্বের নানা ঘটনা, হিজরতের ঘটনা, নিজের জীবনের ইফকের ঘটনা ইত্যাদির তিনি আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়েছেন।[৪০৩] মজার ব্যাপার হলো, এ সব ঘটনার সাথে যারা জড়িত ছিলেন অথবা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই সব পরিণত বয়সের লোকেরা যেখানে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বাক্যে তার বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানে হযরত আয়িশার (রা) বর্ণনা হাদীসের গ্রন্থসমূহে কয়েক পৃষ্ঠা ছড়িয়ে গেছে। অথচ অনেক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় তিনি ছিলেন একটি শিশু অথবা বড়জোর একজন কিশোরীমাত্র। কুরআন কিভাবে, কি তারতীবে নাযিল হয়েছে এবং নামাযের পদ্ধতির বর্ণনা তিনি দিয়েছেন।[৪০৪] তাছাড়া রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতকালীন অবস্থা, কাফন-দাফনের ব্যবস্থা, কাফনের কাপড়ের সংখ্যা, মাপ

---

৪০০. আবু দাউদ ঃ কিতাবুল জিহাদ

৪০১. সহীহ বুখারী ঃ বাবু আয়্যাম আল-জাহিলিয়্যা,

৪০২. প্রাগুক্ত ঃ কিতাবুল হাজ্জ।

৪০৩. দেখুন ঃ সহীহ বুখারী ঃ বাবু বুদয়ুল ওয়াহ্য়ি, বাবুল হিজরাহ্, বাবুল ইফ্ক

৪০৪. প্রাগুক্ত ঃ বাবু তা'লীফ আল-কুরআন

ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা তো বিশ্ববাসী তাঁর মাধ্যমেই জেনেছে।[৪০৫]

শুধু কি তাই, তিনি যুদ্ধের ময়দানের অবস্থাও আমাদের শুনিয়েছেন। বদরের ঘটনা,[৪০৬] উহুদের অবস্থা, খন্দক ও বনী কুরায়জার কিছু কথা [৪০৭], জাতুর রুকা 'যুদ্ধে সালাতুল খাওফ' (ভীতিকালীন নামায) এর অবস্থা, মক্কা বিজয়কালীন মহিলাদের বাইয়াত, বিদায় হজ্জের ঘটনাবলীর একাংশ ইত্যাদির কথা আমরা তাঁর মুখে শুনতে পাই। রাসূলুল্লাহর (সা) নৈশকালীন ইবাদতের কথা, ঘর-গৃহস্থলীর কথা, তাঁর আদব-আখলাক, স্বভাব-আচরণের কথা তিনি আমাদের শুনিয়েছেন। এমন কি রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনে সবচেয়ে কঠিন দিন কোনটি গেছে সেকথাও তিনি বলেছেন।[৪০৮] মোটকথা, নবীজীবনের একটি স্বচ্ছ ও সঠিক চিত্র তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফত, হযরত ফাতিমা (রা) ও রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য বিবিগণের দাবী-দাওয়া, বাইয়াত, ইত্যাদির কথাও তিনি বর্ণনা করেছেন।[৪০৯]

একথা ঠিক যে, ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে তাঁর যে জ্ঞান, তা ছিল তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ। অনেক কিছুই তাঁর সামনে ঘটেছিল। কিন্তু জাহেলী আরবের অবস্থার কথা তিনি কার কাছে জেনেছিলেন? নিশ্চয়ই তা পিতা আবু বকরের (রা) মুখে শুনেছেন।

## সাহিত্য

অসংখ্য বর্ণনায় জানা যায় যে, হযরত 'আয়িশা (রা) ছিলেন একজন সুভাষিণী। তাঁর কথা ছিল অতি স্পষ্ট, বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল। মূসা ইবন তালহা তাঁর একজন ছাত্র। ইমাম তিরমিজী 'মানাকিব' পরিচ্ছেদে তার এ মন্তব্য–

ما رأيت أفصح من عائشة -

বর্ণনা করেছেন। যার অর্থ– 'আমি আয়িশার (রা) অপেক্ষা অধিকতর প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধভাষী কাউকে দেখিনি।' মুসতাদরিকে হাকেমে আহনাফ ইবন কায়সের একটি মন্তব্য বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'আমি আয়িশার (রা) মুখের চমৎকার বর্ণনা ও শক্তিশালী কথার চেয়ে ভালো কথা আর শুনিনি। হযরত 'আয়িশার (রা) থেকে যে শত শত হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে তাঁর নিজের ভাষার অনেক বর্ণনাও সংরক্ষিত হয়েছে। সেগুলি পাঠ করলে তার মধ্যে চমৎকার এক শিল্পরূপ পরিলক্ষিত হয়। তাতে রূপক ও উপমা-উৎপ্রেক্ষার সার্থক প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা)

---

৪০৫. প্রাগুক্ত ঃ বাবু ওফাতুন নাবিয়্যি (সা)

৪০৬. মুসনাদে আহমাদ-৬/১৫০, ২৭২

৪০৭. বুখারী ঃ জিকরু বনী কুরায়জা.

৪০৮. প্রাগুক্ত ঃ বাবু আশাদ্দু মা বাকিয়ান নাবিয়্যি (সা)

৪০৯. দেখুন ঃ প্রাগুক্ত ঃ বাবু ওফাতুন নাবিয়্যি; কিতাবুল ফারায়িজ, গাযওয়াতুন খায়বার; সহীহ মুসলিম ঃ বাবু কাওলিন নাবিয়্যি (সা)-মা তারাকনা ফাওয়া সাদাকাতুন

উপর ওহী নাযিলের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন ঃ ৪১০

أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة فى النوم، فكان لا يري رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح -

অর্থাৎ "প্রথম প্রথম রাসূলুল্লাহ (সা) ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে ওহী লাভ করতেন। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন না কেন, তা প্রভাতের দীপ্তির মত উদ্ভাসিত হতো।" হযরত 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সত্য স্বপ্নসমূহকে প্রভাতের দীপ্তি ও কিরণের সাথে তুলনা করেছেন। ওহী লাভের সময় রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারা মুবারকে ঘাম জমতো। এই ঘামের ফোঁটাকে তিনি উজ্জ্বল মোতির দানার সাথে তুলনা করেছেন। মুনাফিকরা যখন তাঁকে নিয়ে কুৎসা রটনা করেছিলো, তাঁর চরিত্রের প্রতি কলঙ্ক আরোপ করেছিলো, তখন সেই দিনগুলি যে কেমন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল, তার একটা সুন্দর চিত্র আমরা পাই তাঁর বর্ণনার মধ্যে। সেই সময়ে তাঁর জীবনের একটি রাতের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন ঃ৪১১

فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لى دمع ولا اكتحل بنوم -

অর্থাৎ "সারারাত আমি কাঁদলাম। সকাল পর্যন্ত আমার অশ্রুও শুকায়নি এবং আমি চোখে ঘুমের সুরমাও লাগাইনি।" তিনি সে রাতটি বিনিদ্র অবস্থায় এবং চোখের পানি ঝরিয়ে কাটিয়েছেন, সে কথাটি সরাসরি না বলে একটি সুন্দর চিত্রকল্পের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। চোখে ঘুম আসাকে তিনি চোখে সুরমা লাগানোর সাথে তুলনা করেছেন। ভাষায় প্রচণ্ড অধিকার থাকলেই কেবল এমনভাবে বলা যায়। একবার তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি এমন দুইটি চারণভূমি থাকে– যার একটিতে পশু চারিত হয়েছে, আর অন্যটি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রয়েছে। তখন আপনি কোনটিতে উট চরানো পছন্দ করবেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, যেটি সুরক্ষিত আছে, সেটিতে। মূলত ঃ তিনি জানতে চেয়েছেন, যে নারী স্বামীসঙ্গ লাভ করেছে, আর যে লাভ করেনি, এর কোনটিকে আপনি পছন্দ করেন? আসলে তিনি নিজের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) ইচ্ছার কথা জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সরাসরি সে কথাটি না বলে একটি উপমার মাধ্যমে চমৎকারভাবে বুঝিয়ে দেন। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহর (সা) বিবিগণের মধ্যে একমাত্র 'আয়িশা (রা) ছিলেন কুমারী। অন্যরা সকলেই ছিলেন হয় বিধবা, নয়তো স্বামী পরিত্যক্তা।

হযরত 'আয়িশা (রা) প্রাচীন আরবের অনেক লোক কাহিনীও জানতেন এবং সুন্দরভাবে তা বর্ণনাও করতে পারতেন। হাদীসের কোন কোন গ্রন্থে তাঁর বলা দুই একটি গল্প বর্ণিত

৪১০. প্রাগুক্ত ঃ কায়ফা কানা বুদউল ওহয়ি
৪১১. প্রাগুক্ত ঃ বাবু হাদীসুল ইফ্ক

হয়েছে। আরবের এগারো সহদরার একটি দীর্ঘ কাহিনী তিনি একদিন স্বামী রাসূলুল্লাহকে (সা) শুনিয়েছিলেন। রাসূল (সা) অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে তাঁর গল্প শোনেন।[৪১২] এ গল্পে তাঁর চমৎকার বাচনভঙ্গি এবং শিল্পকারিতা লক্ষ্য করা যায়। শব্দ ও বাক্যালংকারের ছড়াছড়ি দেখা যায়।

## বক্তৃতা ভাষণ

বাগ্মী ও বাকপটু ব্যক্তিরাই বক্তৃতা-ভাষণ দিতে পারে। এ এক খোদাপ্রদত্ত গুণ। মানুষকে স্বমতে আনার জন্য, প্রভাবিত করার জন্য এ এক অসাধারণ শিল্প। সেই আদিকাল থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে সকল জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে এ শিল্পের চর্চা দেখা যায়। সেই প্রাচীন আরবদের মধ্যে এর ব্যাপক চর্চা ছিল। জাহিলী আরবের বড় বড় খতীব এবং তাদের খুতবা বা ভাষণের কথা ইতিহাসে দেখা যায়। নানা কারণ ও প্রয়োজনে ইসলামী আমলে এই খুতবা শাস্ত্রের ব্যাপক উন্নতি ও বিকাশ ঘটে। পুরুষদের গণ্ডি অতিক্রম করে নারীদের মধ্যেও এর বিস্তার ঘটে। হযরত 'আয়িশা (রা) একজন শ্রেষ্ঠ মহিলা খতিব বা বক্তা ছিলেন। আরবী সাহিত্যের প্রাচীন সূত্রসমূহে হযরত 'আয়িশার (রা) বহু খুতবা বা বক্তৃতা সংকলিত হয়েছে। উটের যুদ্ধের ডামাডোলের সময় তিনি যে সকল খুতবা দিয়েছিলেন তাবারীর ইতিহাসে তা সংকলিত হয়েছে। ইবন আবদি রাব্বিহি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *'আল-ইকদুল ফারীদ'* এ তার কিছু নকল করেছেন।[৪১৩]

বাগ্মিতা ও বিশুদ্ধভাষিতা যেমন একজন সুবক্তার অন্যতম গুণ, তেমনি স্পষ্ট উচ্চারণ, উচ্চকণ্ঠ এবং ভাব-গাম্ভীর্যের অধিকারী হওয়াও তার জন্য জরুরী। হযরত আয়িশার (রা) কণ্ঠধ্বনি এমনই ছিল। তাবারী বর্ণনা করেছেন ঃ[৪১৪]

فتكلمت عائشة وكانت جهورية يعلو صوتها كثيرة كأنه
صوت إمرأة جليلة -

"হযরত 'আয়িশা (রা) ভাষণ দিলেন। তিনি ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। তাঁর গলার আওয়ায অধিকাংশ মানুষকে প্রভাবিত করতো। যেন তা কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার গলার আওয়ায।"

আহনাফ ইবন কায়স একজন বিখ্যাত তাবেঈ। সম্ভবত ঃ তিনি বসরায় হযরত আয়িশার (রা) একটি ভাষণ শোনার সুযোগ লাভ করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছেন, 'আমি হযরত আবু বকর (রা), হযরত উমার (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা) এবং এই সময় পর্যন্ত সকল খলীফার ভাষণ শুনেছি; কিন্তু আয়িশার (রা) মুখ থেকে বের

---

৪১২. সীরাতে আয়িশা (রা)-৫৪-৫৫

৪১৩. দেখুন ঃ কালকাশান্দীর 'সুবহুল আ'শা-১/২৪৮; ইবন আবদি রাব্বিহির-আল ইকদুল ফারীদ-২/১৫৬, ২০৬, ২২৬; মাহমুদ শুকরী আল-আলুসীর-নিহায়াতুল আরিব-৭/২৩০; ইবনুল আসীরের আল-কামিল-৩/১০৫; তাবারীর তারিখ-৫/১৭৫ ও শারহু ইবন আবী আল হাদীদ-২/৮১

৪১৪. তাবারী ঃ তারীখ-৫/১৭৫; জামহারাতু খুতাবিল আরাব-১/২৮৬

হওয়া কথায় যে কলামণ্ডিত সৌন্দর্য ও জোর থাকতো তা আর কারও কথায় পাওয়া যেত না।' আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নাদভী আহনাফ ইবন কায়সের মন্তব্যের উদ্ধৃতি টেনে বলছেন, 'আমার মতে, আহনাফ ইবন কায়সের এ কথা অতিরঞ্জিত থেকে মুক্ত নয়, তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আয়িশা (রা) একজন স্বচ্ছন্দ ও শুদ্ধভাষী বক্তা ছিলেন।'[৪১৫]

আহনাফের মত ঠিক একই রকম মন্তব্য করেছেন হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা) ও মূসা ইবন তালহা। উটের যুদ্ধের সময়ে তিনি যে সকল বক্তৃতা ভাষণ দান করেছিলেন, তাতে যে আবেগ, শক্তি ও উত্তাপ দেখা যায় তা অনেকটা তুলনাহীন। পূর্বেই আমরা উটের যুদ্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর একটি ভাষণের অনুবাদ উপস্থাপন করেছি। এখানে আমরা তাঁর ঐ সময়ের আর একটি ভাষণের ছোট্ট উদ্ধৃতি টেনে এ আলোচনার সমাপ্তি টানবো।

হযরত 'আয়িশা (রা) যখন হযরত তালহা ও যুবাইরকে (রা) সঙ্গে নিয়ে বসরায় পৌঁছলেন তখন বসরাবাসীরা 'আল মিরবাদ'-এ সমবেত হলো। সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে প্রথমে তালহা (রা) তারপরে যুবাইর (রা) ভাষণ দিলেন। সবশেষে হযরত 'আয়িশা (রা) বক্তৃতা করলেন। সর্বপ্রথম তিনি আল্লাহর হাম্‌দ এবং রাসূলের (সা) প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করলেন। তারপর বললেন ঃ[৪১৬]

كان الناس يتجنون على عثمان رضى الله عنه، ويزرون على عماله، ويأتوننا بالمدينة، فيستشيروننا فيما يخبروننا عنهم ، فننظر فى ذلك فنجده بريا، تقيا وفيا، ونجدهم فجرة غدرة كذبة ، يحاولون غير ما يظهرون، فلما قووا على المكاثرة كاثروه، واقتحموا عليه داره، واستحلوا الدم الحرام، والمال الحرام ، والبلد الحرام، بلاترة ولا عذر، ألا إن مما ينبغى، لا ينبغى لكم غيره، أخذ قتلة عثمان رضى الله عنه، وإقامة كتاب الله عزوجل: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوْا نَصِيْبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعُوْنَ إِلَى كِتَابِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ، الاية ـ

"মানুষ ওসমানের (রা) অপরাধের কথা বলতো, তাঁর কর্মচারী-কর্মকর্তাদের প্রতি দোষারোপ করতো। তারা মদীনায় আসতো এবং তাঁদের সম্পর্কে নানা রকম তথ্য

---

৪১৫. সীরাতে আয়িশা-২৫০

৪১৬. ইবনুল আসীর ঃ আল-কামিল ঃ ৩/১০৫; তাবারী ঃ আত-তারীখ-৫/১৭৫; জামাহারাতু খুতাবিল আরাব-১/২৮৬-২৮৭

আমাদেরকে জানিয়ে পরামর্শ চাইতো। আমরা বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতাম। আমরা উসমানকে (রা) পবিত্র, খোদাভীরু অঙ্গীকার পালনকারী হিসেবে দেখতে পেতাম। আর অভিযোগকারীরা আমাদের কাছে পাপাচারী, ধোঁকাবাজ ও মিথ্যাবাদী বলে প্রতীয়মান হতো। তারা মুখে যা বলতো, তার বিপরীত কাজ করার চেষ্টা করতো। যখন তারা মুকাবিলা করার মত শক্তিশালী হলো সম্মিলিতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। তারা তাঁর উপর তাঁর বাড়ীতেই হামলা চালালো। যে রক্ত ঝরানো হারাম ছিল তা তারা হালাল করলো, আর যে মাল লুট করা, যে শহরের অবমাননা করা অবৈধ ছিল তা তারা বিনা দ্বিধায় ও বিনা কারণে বৈধ করে নিল। শোন! এখন যা করণীয় এবং যা ব্যতীত অন্য কিছু করা তোমাদের উচিত হবে না, তা হলো 'উসমানের (রা) হত্যাকারীদের ধরা এবং তাদের উপর কিতাবুল্লাহর হুকুম কার্যকরী করা। তারপর তিনি সূরা আলে ইমরানের ২৩ নং আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

'আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা কিতাবের কিছু অংশ পেয়েছে– আল্লাহর কিতাবের প্রতি তাদের আহ্বান করা হয়েছিল যাতে তাদের মধ্যে মীমাংসা করা যায়। অত ঃপর তাদের মধ্যে একদল তা অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নেয়।'

বসরায় তিনি আরেকটি আগুনঝরা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে তার কিছু অংশের অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে। সেই দীর্ঘ বক্তৃতার প্রতিটি শব্দ ও বাক্য যেন একটা প্রবল আবেগ ও উদ্দীপনা ঢেলে দিয়ে শ্রোতাদের সম্মোহিত করে তুলেছে। এখানে তাঁর মূল ভাষায় কয়েকটি লাইন তুলে ধরা হলো ঃ[৪১৭]

أيهاالناس: صه صه، إن لى عليكم حق الأمومة وحرمةالموعظة، لا يتهمنى إلامن عصى ربه، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحرى ونحرى، فأنا إحدى نسائه فى الجنة، له ادخرنى ربى وخلصنى من كل بضاعة، وبي ميزمنافقكم من مؤمنكم ، وبى أرخص الله لكم فى صعيد الأبواء، ثم أبى ثانى اثنين الله ثالثهما وأول من سمى صديقا، مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم راضيا عنه،... وأنا نصب المسألة عن مسيرى هذا، لم ألتمس أثما ولم أونس فتنة أوطئكموها...

'ওহে জনমণ্ডলী! চুপ করুন, চুপ করুন। নিশ্চয় আপনাদের উপর আমার মায়ের দাবী আছে, উপদেশ দানের অধিকার আছে। আমার প্রতি কেউ কলঙ্ক আরোপ করতে

৪১৭. আল-ইকদুল ফারীদ ৪/৩১৪-৩১৬

পারেনা– একমাত্র সেই ব্যক্তি ছাড়া যে তার প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) আমারই বুকে মাথা রেখে ইনতিকাল করেছেন। জান্নাতে আমি হবো তাঁর অন্যতম স্ত্রী। আমার রব আমাকে তাঁর জন্যই সংরক্ষিত রেখেছেন এবং অন্যদের থেকে পবিত্র রেখেছেন। আমার সত্তা দ্বারাই তোমাদের মুনাফিকদের তোমাদের মুমিনদের থেকে পৃথক করেছেন। আমার দ্বারাই আল্লাহ তোমাদেরকে আবওয়ার মাটিতে তায়াম্মুমের সুযোগ দিয়েছেন। অত ঃপর আমার পিতা সেই সাওর পর্বতের গুহায় দুই জনের মধ্যে দ্বিতীয়, আর আল্লাহ ছিলেন তৃতীয়। তিনিই সর্বপ্রথম সিদ্দীক উপাধি লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর প্রতি খুশী থাকা অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেছেন.... হাঁ, এখন আমি মানুষের এই প্রশ্নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছি যে, আমি কিভাবে বাহিনী নিয়ে বের হলাম? এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য কোন পাপের বাসনা ও ফিত্না ফাসাদের অন্বেষণ করা নয়....।"

### চিঠি-পত্র

আরবী সাহিত্যের নির্ভরযোগ্য প্রাচীন সংকলনসমূহে হযরত 'আয়িশার (রা) বহু গুরুত্বপূর্ণ চিঠি দেখতে পাওয়া যায়। সে সব চিঠি তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিকট লিখেছেন। এখন প্রশ্ন হলো, এ সব চিঠি কি তিনি নিজ হাতে লিখেছিলেন না তার পক্ষ থেকে কোন সেক্রেটারি এ দায়িত্ব পালন করেছিলেন? যিনিই লিখুন না কেন, তার ভাব ও ভাষা যে হযরত আয়িশার (রা) ছিলনা, এমন কোন প্রমাণ নেই। তাই আরবী সাহিত্যের প্রাচীন কালের পণ্ডিতরা হযরত আয়িশার এ সব চিঠির সাহিত্য-মূল্য বিবেচনা করে নিজেদের রচনাবলীতে স্থান দিয়ে গেছেন। ইবন আবদি রাব্বিহি আল-আন্দালুসীর বিখ্যাত সংকলন– 'আল-ইকদুল ফরীদ'–এর ৪র্থ খণ্ডে তার অনেকগুলি চিঠি সংকলিত হয়েছে। যেমন, তিনি বসরায় পৌঁছে তথাকার এক নেতা যায়িদ ইবন সুহানকে লিখেছেন ঃ[৪১৮]

من عائشة أم المؤمنين إلى إبنها الخالص زيد بن صوحان، سلام عليك ، أما بعد، فإن أباك كان رأسا في الجاهلية وسيدا في الاسلام ، وإنك من ابيك بمنزلة المصلى من السابق يقال كاد أولحق وقد بلغك الذى كان في الاسلام من مصاب عثمان بن عفان، ونحن قادمون عليك، والعيان أشفى لك من الخبر. فإذا أتاك كتابي هذا فثبط الناس عن على بن أبى طالب، وكن مكانك حتى يأتيك أمرى، والسلام -

---

৪১৮. প্রাগুক্ত ঃ ৪/৩১৬-৩২০

"উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশার (রা) পক্ষ থেকে তার নিষ্ঠাবান ছেলে যায়িদ ইবন সুহানের প্রতি। সালামুন আলাইকা। অত ঃপর তোমার পিতা জাহিলী আমলে নেতা ছিলেন, ইসলামী আমলেও। তুমি তোমার পক্ষ থেকে মাসবূক মুসল্লীর অবস্থানে আছ যাকে বলা যায় প্রায় অথবা নিশ্চিতভাবে লাহেক হয়েছে। তুমি জেনেছো যে, উসমান ইবন আফ্ফান হত্যার মাধ্যমে ইসলামে কী বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। আমরা তোমাদের কাছে এসেছি। চাক্ষুস দেখা সংবাদের চেয়ে অধিক স্বস্তিদায়ক। তোমার কাছে আমার এ চিঠি পৌঁছার পর মানুষকে আলী ইবন আবী তালিবের পক্ষাবলম্বন থেকে ঠেকিয়ে রাখবে। তুমি তোমার গৃহে অবস্থান করতে থাক, যতক্ষণ না আমার নির্দেশ তোমার কাছে যায়। ওয়াস্ সালাম্।'

উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) উপরোক্ত চিঠির যে জবাব যায়িদ ইবন সুহান দিয়েছিলেন তা একটু দেখার বিষয়। আমরা সেই চিঠিটি তুলে দিয়ে এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানছি। যায়িদ ইবন সুহান লিখলেন ঃ[৪১৯]

من زيد بن صوحان إلى عائشة أم المؤمنين سلام عليك، أما بعد، فإنك أمرت بأمر وأمرنا بغيره، أمرت أن تقر فى بيتك، وأمرنا أن نقاتل الناس حتى لا تكون فتنة، فتركت ما أمرت به وكتبت تنهينا عما أمرنا به والسلام ـ

"যায়িদ ইবন সুহানের পক্ষ থেকে উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশার (রা) প্রতি। আপনার প্রতি সালাম। অত ঃপর, আপনাকে কিছু কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আর আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ভিন্ন কিছু কাজের। আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঘরে অবস্থান করার জন্য, আর আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার জন্য– যতক্ষণ ফিত্না দূরীভূত না হয়। আপনি ছেড়ে দিয়েছেন যা আপনাকে করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর আমাদের যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা থেকে বিরত থাকার জন্য আপনি লিখেছেন। ওয়াস সালাম।"

### হযরত 'আয়িশার (রা) কাব্যপ্রীতি

ইসলাম-পূর্ব আমলের আরবরা ছিল একটি কাব্যরসিক জাতি। তাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কবি ও কবিতার প্রভাব ছিল অপরিসীম। তাদের নিকট কবির স্থান ছিল সবার উপরে। তারা কবি ও নবীকে একই কাতারের মানুষ বলে মনে করতো। তাইতো তারা রাসূলুল্লাহকেও (সা) কবি বলে আখ্যায়িত করেছিল। ইবন রাশীক আল-কায়রোয়ানী জাহিলী আরবে কবির স্থান ও মর্যাদার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ[৪২০]

---

৪১৯. প্রাগুক্ত ঃ ৪/৩১৭-৩১৮
৪২০. কিতাবুল 'উমদাহ-১/৭৮

كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها، وصنعت الأطعمة، واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر، كما يصنعون فى الأعراس، ويتباشر الرجال والولدان، لأنه (اى الشاعر)حماية لأعراضهم وذب عن أحسابهم وإشادة بذكرهم...

"আরবের কোন গোত্রে যখন কোন কবি প্রতিষ্ঠা লাভ করতেন তখন অন্যান্য গোত্রের লোকেরা এসে সেই গোত্রকে অভিনন্দন জানাতো। নানা রকম খাদ্যদ্রব্য তৈরী করা হতো। বিয়ের অনুষ্ঠানের মত মেয়েরা সমবেত হয়ে বাদ্য বাজাতো। পুরুষ ও শিশু-কিশোররা এসে আনন্দ প্রকাশ করতো। এর কারণ, কবি তাদের মান-মর্যাদার রক্ষক, বংশের প্রতিরোধক এবং নাম ও খ্যাতির প্রচারক।"

প্রাচীন আরবী সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায়, জাহিলী আরবে যেন কাব্যচর্চার প্লাবন বয়ে চলেছে। অসংখ্য কবির নাম পাওয়া যায় যা গুণেও শেষ করা যাবে না। ইবন কুতায়বা বলেছেন ঃ[৪২১]

والشعراء المعوفون بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم فى الجاهلية والاسلام أكثر من أن تحيط بهم محيط ـ

"কবিরা— যাঁরা কবিতার জন্যে তাদের সমাজে ও গোত্রে জাহিলী ও ইসলামী আমলে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন তাঁদের সংখ্যা এত বেশী যে কেউ তা শুমার করতে পারবে না।"

তিনি আরও বলেছেন ঃ[৪২২]

ولو قصدنا لذكر من لم يقل من الشعر الا الشذ اليسير لذكرنا أكثر الناس ـ

"যারা কবিতা বলেনি— তাদের সংখ্যা খুবই কম— তাদের নাম যদি আমরা উল্লেখ করতে চাই তাহলে অধিকাংশ লোকের নাম উল্লেখ করতে পারবো।"

রাসূলুল্লাহর (সা) খাদেম প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন ঃ[৪২৩]

قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فى الانصار بيت إلا وهو يقول الشعر ـ

---

৪২১. আশ-শি'রু ওয়াশ্ শু'আরাউ-পৃ. ৩

৪২২. প্রাগুক্ত-পৃ. ৩

৪২৩. আল-ইকদুল ফারীদ-৫/২৮৩

অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ (সা) যখন আমাদের এখানে আসেন তখন আনসারদের প্রতিটি গৃহে কবিতা বলা হতো।"

মোটকথা একজন আরব কবি তার কবিতার মাধ্যমে কোথাও যেমন আগুন জ্বালিয়ে দিত তেমনিভাবে কোথাও জীবনের বারি বর্ষণও করতো। এ গুণটি কেবল পুরুষদের সাথে সংযুক্ত ছিল না; বরং নারীরাও এর সাথে প্রযুক্ত ছিল। ইসলামের পূর্বে এবং ইসলামের পরেও শতবর্ষ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে আরবীয় এ গুণ-বৈশিষ্টটি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। সে আমলের এমন অসংখ্য নারীর পরিচয় পাওয়া যায় যাঁরা কবিতা ও সঙ্গীত রচনায় এমন নৈপুণ্য দেখিয়েছেন যে, তাঁদের কথা আরবী কাব্যজগতের একেকটি সৌন্দর্যে পরিণত হয়েছে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) আরবের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এমন একটি পর্বে জন্মলাভ করেন। তাঁর নিজের পরিবারেও কবিতার চর্চা ছিল। পিতা আবু বকর (রা) একজন কবি ছিলেন।[৪২৪] প্রখ্যাত তাবে'ঈ হযরত সা'ঈদ ইবন আল-মুসয়্যিব বলেন ঃ[৪২৫]

كان ابوبكر شاعرا، وعمر شاعرا وعلى أشعر الثلاثة -

"আবু বকর (রা) কবি ছিলেন। 'উমার (রা) কবি ছিলেন। আর আলী (রা) ছিলেন তিনজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি।"

তাই বলা চলে পিতার কাছ থেকেই তিনি কাব্যশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেন। কবিতার আঙ্গিক, বিষয়বস্তু, চিত্রকল্প ইত্যাদি বিষয়ে তিনি যেসব মন্তব্য ও মতামত রেখেছেন তাতে এ শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা প্রমাণিত হয়। তাঁর এক গুণমুগ্ধ শাগরিদ আল-মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ বলেছেন ঃ[৪২৬]

ما كنت أعلم أحدا من أصحاب رسول صلعم أعلم بشعر ولا فريضة من عائشة رضى الله عنها -

"রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের মধ্যে কাব্য ও ফারায়েজ শাস্ত্রে আয়িশার (রা) চেয়ে বেশী জ্ঞান রাখে এমন কাউকে আমি জানিনে।"

হযরত উরওয়া ইবন যুবাইর ঠিক একই রকম কথা বলেছেন।[৪২৭] তাঁর অন্য একজন শাগরিদ বলেছেন, "আমি আয়িশার (রা) কাব্য-জ্ঞান দেখে বিস্মিত হইনে। কারণ তিনি আবু বকরের (রা) মেয়ে।"

হযরত 'আয়িশা (রা) নিজেও একজন কবি ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি যে

---

৪২৪. মুসনাদ -৬/৬৭
৪২৫. আল-ইকদুল ফারীদ-৫/২৮৩
৪২৬. প্রাগুক্ত -৫/২৭৪
৪২৭. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২৮

শোকগাঁথাটি রচনা করেন, তার কিছু অংশ আল্লামা আলুসী তাঁর *'বুলুগুল আরিব'* গ্রন্থের ২য় খণ্ডে সংকলন করেছেন।

ইমাম বুখারী *'আদাবুল মুফরাদ'* গ্রন্থে হযরত 'উরওয়ার একটি বর্ণনা নকল করেছেন। তিনি বলেছেন, হযরত কা'ব ইবন মালিকের (রা) একটি পূর্ণ কাসীদা হযরত 'আয়িশার (রা) মুখস্থ ছিল। একটি কাসীদায় কম-বেশী চল্লিশটি শ্লোক ছিল![৪২৮] হযরত 'আয়িশা (রা) বলতেন ঃ[৪২৯]

رَوُّوْا أَوْلَادَكُمْ الشِّعْرَ تَعْذُبْ أَلْسِنَتُهُمْ -

"তোমরা তোমাদের সন্তানদের কবিতা শেখাও। তাতে তাদের ভাষা মাধুরীময় হবে।" জাহিলী ও ইসলামী যুগের কবিদের বহু কবিতা হযরত 'আয়িশার (রা) মুখস্থ ছিল। সেই সকল কবিতা বা তার কিছু অংশ সময় ও সুযোগমত উদ্ধৃতির আকারে উপস্থাপন করতেন। তার বর্ণিত বহু কবিতা বা পংক্তি হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এক ব্যক্তি হযরত 'আয়িশাকে (রা) জিজ্ঞেস করে, রাসূলুল্লাহ (সা) কি কখনও কবিতা আবৃত্তি করেছেন? বললেন ঃ হাঁ, আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার কিছু শ্লোক তিনি আবৃত্তি করতেন। যেমন ঃ[৪৩০]

ويأتيك بالأخبار من لم تزود -

"তমি যাকে পাথেয় দিয়ে পাঠাওনি সে অনেক খবর নিয়ে তোমার কাছে আসবে।" রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন শুনলেন, 'আয়িশা (রা) কবি যুহাইর ইবন জানাবের নিম্নোক্ত পংক্তি দুইটি আবৃত্তি করছেন ঃ[৪৩১]

ارفع ضعيفك لا يحربك ضعفه + يوما فتدركه عواقب ماجنى

يخزيك أويثنى عليك فاءن من + أثنى عليك بما فعلت كمن جزى -

"তুমি উঠাও তোমার দুর্বলকে। যার দুর্বলতা তোমার বিরুদ্ধে কোন দিন যুদ্ধ করবে না। অত ঃপর সে যা অর্জন করেছে তার পরিণতি সে লাভ করবে।
সে তোমাকে প্রতিদান দিবে, অথবা তোমার প্রশংসা করবে। তোমার কর্মের যে প্রশংসা করে সে ঐ ব্যক্তির মত যে প্রতিদান দিয়েছেন।"

পংক্তি দুইটি শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ 'আয়িশা! সে সত্য বলেছে। যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা সে আল্লাহরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

আবু কাবীর আল-হুজালী একজন জাহিলী কবি। তিনি তাঁর সৎ ছেলে কবি তায়াব্বাতা শাররান–এর প্রশংসায় একটি কবিতা রচনা করেন। যার দুইটি পংক্তি নিম্নরূপ ঃ[৪৩২]

---

৪২৮. বাবু ঃ আশ-শি'রু হাসানুন কা হাসানিল কালাম
৪২৯. আল-ইকদুল ফারীদ–৫/২৭৪
৪৩০. আদাবুল মুফরাদ-বাব ঃ আশ-শি'রু হাসানুন কা হাসানিল কালাম
৪৩১. আল-ইকদুল ফারীদ-৫/২৭৫
৪৩২. হাফেজ ইবন কায়্যিম তাঁর মাদারিজুস সালিকীন গ্রন্থে পংক্তি দুইটি বর্ণনা করেছেন। পৃ. ২৭৭ (মিসর)

ومبرء من كل غير حيضة + وفساد مرضعة وداء مغيل
وإذا نظرت إلى أسرة وجهه + برقت كبرق العارض المتهلل

"সে তার মায়ের গর্ভের সকল অশুচিতা এবং
দুধদানকারী ধাত্রীর যাবতীয় রোগ-থেকে মুক্ত।
যখন তুমি তার মুখমণ্ডলের মজবুত শিরা উপশিরার দিকে
দৃষ্টিপাত করবে, তখন তা প্রবল বর্ষণের সাথে
বিদ্যুতের চমকের মত চমকাতে দেখবে।"

হযরত 'আয়িশা (রা) একদিন উপরোক্ত শ্লোক দুইটি রাসূলুল্লাহকে (সা) শুনিয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিই তো এ দুইটি শ্লোকের বেশী হকদার। তাঁর এ কথায় রাসূলুল্লাহ (সা) উৎফুল্ল হন।

'আয়িশা (রা) নিম্নের দুইটি বয়েত দিয়ে প্রায়ই মিছাল দিতেন ঃ৪৩৩

إذا ما الدهر جرى على أناس + حوادثه أناخ بآخرينا
فقل للشامتين بنا أفيقوا + سيلقى الشامتون كما لقينا ـ

"কালচক্র যখন তার বিপদ মুসীবত সহ কোন জনমণ্ডলীর উপর দিয়ে ধাবিত হয় তখন তা আমাদের সর্বশেষ ব্যক্তিটির কাছে গিয়ে থামে। আমাদের এ বিপদ দেখে যারা উৎফুল্ল হয় তাদের বলে দাও– তোমরা সতর্ক হও। খুব শিগগিরই তোমরাও মুখোমুখি হবে, যেমন আমরা হয়েছি।"

হযরত 'আয়িশার (রা) ভাই আবদুর রহমান ইবন আবী বকরের (রা) ইনতিকাল হয় মক্কার পাশে এবং মক্কায় দাফন করা হয়। পরে যখন হযরত 'আয়িশা (রা) মক্কায় যান তখন ভাইয়ের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত শ্লোক দুইটি আবৃত্তি করেন ঃ৪৩৪

وكنا كندمانى جذيمة حقبة + من الدهر حتى قيل لن يتصدعا
فلما تفرقا كأنى ومالكا + لطول اجتماع لم نبت ليلة معا ـ

"আমরা দুইজন বাদশাহ জাজীমার দুইজন সহচরের মত একটা দীর্ঘ সময় একসাথে থেকেছি। এমনকি লোকে আমাদের সম্পর্কে বলাবলি করতো যে, আমরা আর কখনও পৃথক হবোনা।

অত ঃপর আমরা যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম তখন আমি ও মালিক যেন দীর্ঘকাল

---

৪৩৩. আল-ইদুল ফারীদ-২/৩২২। আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী এই বয়েত দুইটি কবি আল-ফারাযদাকের মামা কবি আল-আলা' ইবন কারাজা-এর বলে উল্লেখ করেছেন। (আল-আগানী, মাতবায়াতু বুলাক, মিসর,খণ্ড ১৯,পৃ. ৪৯)

৪৩৪. তিরমিজী ঃ যিয়ারাতুল কুবুর লিন্-নিসা

সহঅবস্থান সত্ত্বেও একটি রাতও এক সাথে কাটাইনি।"

মক্কার মুহাজিরদের শরীরে প্রথম প্রথম মদীনার আবহাওয়া খাপ খাচ্ছিল না। হযরত আবু বকর (রা), হযরত 'আমির ইবন ফুহায়রা (রা), হযরত বিলাল (রা) এবং আরো অনেকে, এমনকি খোদ 'আয়িশা (রা) মদীনায় আসার পর প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন। জ্বরের ঘোরে তাঁদের অনেকের মুখ থেকে তখন কবিতার পংক্তি উচ্চারিত হতো। এমন কিছু পংক্তি হযরত 'আয়িশার (রা) স্মৃতিতে ছিল এবং তিনি বর্ণনা করেছেন। যেমন ঃ হযরত আবু বকরের (রা) জ্বরের প্রকোপ দেখা দিলে নিম্নোক্ত শ্লোকটি আওড়াতেন ঃ[৪৩৫]

كل إمرئ مصبح فى أهله

والموت أدنى من شراك نعله -

"প্রতিটি মানুষ তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে দিনের সূচনা করে।
অথচ মৃত্যু তার জুতোর ফিতের চেয়েও বেশী নিকটবর্তী।"

হযরত বিলাল (রা) জ্বরের ঘোরে নিম্নের পংক্তি দুইটি জোরে জোরে আওড়াতেন ঃ

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة + بوالى حولى ذخر وجليل

وهل أردن يوما مياه مجنة + وهل يبدون لى شامة وطفيل

"হায়! আমি যদি জানতে পারতাম যে, কোন একটি রাত আমি মক্কার উপত্যকায় কাটাবো এবং আমার চারপাশে ইজখীর ও জলী ঘাস থাকবে। অথবা মাজান্নার সরোবরে কোন একদিন আমার বিচরণ ঘটবে, অথবা শামা ও তুফায়েল পর্বতদ্বয় কোনদিন আমার দৃষ্টিগোচর হবে!"

হযরত 'আমির ইবন ফুহাইরাকে (রা) তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে এই পংক্তিটি আবৃত্তি করতেন ঃ[৪৩৬]

إنى وجدت الموت قبل ذوقه + إن الجبان حتفه من فوقه -

"আমি স্বাদ চাখার আগেই সত্যকে পেয়ে গেছি। ভীরু-কাপুরুষের মৃত্যু তার উপর দিক থেকেই আসে।"

বদর যুদ্ধে কুরাইশদের অনেক বড় বড় নেতা নিহত হয় এবং তাদেরকে বদরের কুয়োয় নিক্ষেপ করা হয়। কুরাইশ কবিরা তাঁদের স্মরণে অনেক আবেগজড়িত মরসিয়া রচনা করেছিল। সেই সকল কবিতার অনেক পংক্তি হযরত 'আয়িশার (রা) স্মৃতিতে ছিল এবং তিনি তা বর্ণনাও করেছেন। নিম্নের বয়েত দুইটিও তিনি বর্ণনা করেছেন।[৪৩৭]

---

৪৩৫. সহীহ বুখারী ঃ বাবুল হিজরাহ্
৪৩৬. মুসনাদ-৬/৬৫
৪৩৭. সহীহ বুখারী ঃ বাবুল হিজরাহ

وماذا بالقليب بدر + من القينات والشرب الكرام

تحى بالسلامة أم بكر + وهل لى بعد قومى من سلام -

"বদরের কূপের মধ্যে কতনা নর্তকী ও অভিজাত শরাবখোর পড়ে আছে, তাদের অবস্থা কি? উম্মে বকর তাদের শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করছে। আমার স্বগোত্রের লোকদের মৃত্যুর পরে আমার জন্য কোন শান্তি আসতে পারে কি?"

হযরত সা'দ ইবন মু'য়াজ (রা) খন্দক যুদ্ধের সময় আরবী রজয ছন্দের একটি গানের একটি কলি আওড়াতেন, তাও হযরত 'আয়িশা (রা) মনে রেখেছিলেন। সেটি তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

ليت قليلا يدرك الهيجا جمل + ما أحسن الموت إذا حان الأجل -

"হায়! যদি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে উট যুদ্ধের নাগাল পেয়ে যেত। মরণের সময় যখন ঘনিয়ে এসেছে তখন সে মরণ কতনা প্রিয়।"

মক্কার কুরাইশ কবিরা যখন রাসূলুল্লাহর (সা) নিন্দায় কবিতা বলতো তখন মদীনার মুসলমান কবিরা কিভাবে তার জবাব দিতেন, সে কথাও আমরা হযরত 'আয়িশার (রা) মাধ্যমে জানতে পারি। তিনি বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমরা কুরাইশদের নিন্দা করে কবিতা রচনা কর। এ কবিতা তাদের উপর তরবারির আঘাতের চেয়েও বেশী কার্যকর হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) একজন কবি ছিলেন। তিনি একটি কবিতা রচনা করলেন; কিন্তু তা রাসূলুল্লাহর (সা) তেমন পছন্দ হলো না। তিনি কবি কা'ব ইবন মালিককে (রা) নির্দেশ দিলেন কুরাইশদের জবাবে একটি কবিতা লিখতে। অবশেষে হযরত হাসসান ইবন সাবিতের পালা এলো। তিনি এসে আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন। আমি তাদের এমন বিধ্বস্ত করে ছাড়বো, যেমন লোকেরা চামড়াকে করে থাকে।' রাসূল (সা) বললেন ঃ তাড়াহুড়োর প্রয়োজন নেই। আবু বকর গোটা কুরাইশ খান্দানের মধ্যে কুরাইশদের নসবনামা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অভিজ্ঞ। আমারও তাঁর সাথে নিকট সম্পর্ক। আমার বংশসূত্র তাঁর কাছ থেকে ভালো করে বুঝে নাও। অতঃপর তিনি আবু বকরের (রা) নিকট যান এবং বংশসূত্রের নানা রকম প্যাঁচ ও জটিলতা সম্পর্কে জেনে আবার রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই জাতের কসম! যিনি আপনাকে সত্য রাসূল করে পাঠিয়েছেন। আমি আপনাকে তাদের থেকে এমনভাবে বের করে আনবো, যেমন লোকেরা আটার দলা থেকে চুল টেনে বের করে আনে। তারপর হাস্‌সান (রা) একটি কাসীদা পাঠ করেন যার একটি বয়েত এই ঃ

إن سنام المجد من ال هاشم + بنو بنت مخزوم ووالدك

"আলে হাশিমের সম্মান ও মর্যাদার শিখর হচ্ছেন মাখযূমের নাতি। আর তোমার বাপ ছিল দাস।"

হযরত 'আয়িশা (রা) বলছেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি, 'হাস্সান! যতক্ষণ তুমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করতে থাকবে, রুহুল কুদুসের সাহায্য তুমি লাভ করবে।' তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) একথাও বলতে শুনেছি, 'হাস্সান তাদের জবাব দিয়ে দু ঃখ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করেছে।' এসব কথা বর্ণনার পর উম্মুল মুমিনীন আমাদেরকে হাসসানের এ কাসীদাটিও শুনিয়েছেন ঃ৪৩৮

هجوت محمدا فاجبت عنه + عند الله في ذلك الجزاء

هجوت محمدا براً حنيفا + رسول الله شيمته الوفاء

فان أبي ووالده وعرضي + لعرض محمد منكم وقاء

فمن يهجورسول الله منكم + ويمدحه وينصره سواء

وجبريل رسول الله فينا + وروح القدس ليس له كفاء.

"তুমি করেছো মুহাম্মাদের নিন্দা, আর আমি তার জবাব দিয়েছি। আমার এ কাজের প্রতিদান রয়েছে আল্লাহর কাছে।

তুমি মুহাম্মাদের নিন্দা করেছো, যিনি সৎকর্মশীল, ধার্মিক ও আল্লাহর রাসূল। প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞা পালন যার স্বভাব-বৈশিষ্ট।

আমার বাপ-দাদা আমার ইজ্জত-আবরু সবই তোমাদের আক্রমণ থেকে মুহাম্মাদের মান-ইজ্জত রক্ষার জন্য ঢাল স্বরূপ।

তোমাদের মধ্য থেকে কেউ রাসূলুল্লাহর নিন্দা, প্রশংসা বা সাহায্য করুক না কেন, সবই তাঁর জন্য সমান।

জিবরীল আমাদের মধ্যে আছেন। যিনি আল্লাহর বার্তাবাহক ও পবিত্র রূহ–যার সমকক্ষ কেউ নেই।"

হযরত 'উসমানের (রা) শাহাদাতের পর মদীনার বিশৃঙ্খল অবস্থার কথা যখন জানলেন তখন তাঁর মুখে নিম্নোক্ত পংক্তিটি উচ্চারিত হলো ঃ৪৩৯

ولو أن قومي طاوعتني سراتهم +لا نقذتهم من الحبال والخبل

"যদি আমার সম্প্রদায়ের নেতারা আমার কথা মানতো তাহলে আমি তাদের এই ফাঁদ ও ধ্বংস থেকে বাঁচাতে পারতাম।"

বসরা পৌঁছার পর তাঁর মুখে নিম্নের দুইটি বয়েত শোনা যেত ঃ

دعي بلاد جموع الظلم اذ صلحت + فيها المياه وسيري سير مذعور

৪৩৮. এই ঘটনা ও কাসীদাটি সহীহ মুসলিমে 'মানাকিবে হাস্সান' পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে

৪৩৯. দেখুন ঃ তাবারী ব্রীলি সংস্করণ, পৃ. ৩০৯৯, ৩১০৫, ৩২০১

تخيرى النبت فارعى ثم ظاهرة + وبطن واد من الضماد ممطور -

"অত্যাচারীদের আবাসভূমি ছেড়ে দাও– যদিও সেখানে পানি বিশুদ্ধ থাকে এবং ভীতিগ্রস্তদের চলার মত চল।
ঘাস নির্বাচন কর। অতঃপর দামাদের সবুজ উপত্যকায় রোদের মধ্যে চরতে থাক।"
আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, উটের যুদ্ধে কোন কোন বীর সৈনিক রজয ছন্দের যে চরণ দুইটি আবৃত্তি করেছিলেন, তা হযরত আয়িশার (রা) স্মরণে ছিল। একবার তিনি চরণ দুইটি আবৃত্তি করে খুব কেঁদেছিলেন। সেই চরণ দুইটি এই ঃ

يا أمنا يا خير ام نعلم + أما ترين كم شجاع يكلم
وتختلى هامته والمعصم -

"হে আমাদের মা! যাঁকে আমরা সর্বোত্তম মা বলে জানি, আপনি কি দেখছেন না, কত বীর আহত হয়েছে, কত মাথা ও হাত ঘাসের মত কাটা গেছে।"
হিশাম ইবন 'উরওয়া তাঁর পিতা 'উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। 'আয়িশা (রা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কবি লাবীদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করুন! তিনি বলতেন ঃ৪৪০

ذهب الذين يعاش فى أكنافهم + وبقيت فى خلف كجلد الاجرب

"যাঁদের পাশে বসবাস করা যেত, তাঁরা সব চলে গেছেন। এখন আমি বেঁচে আছি চর্মরোগগ্রস্ত উটের মত উত্তরসূরীদের মাঝে।"

তারপর হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ

"তিনি যদি আমাদের এ কালের অবস্থা দেখতেন, তাহলে কী বলতেন! আমি কবি লাবীদের এ রকম হাজারটি বয়েত বলতে পারি। অবশ্য অন্য কবিদের যে পরিমাণ বয়েত আমি বলতে পারি তার তুলনায় এ অতি নগণ্য।"

হযরত 'আয়িশার (রা) এ মন্তব্য থেকে আমরা অনুমান করতে পারি, তিনি কি পরিমাণ কাব্যরসিক ছিলেন, এ শাস্ত্রে তাঁর কি পরিমাণ দখল ছিল এবং কত শত আরবী বয়েত তাঁর মুখস্থ ছিল। আমরা হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি, কী অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর তিনি সেখানে রেখেছেন! আরবী কবিতার ক্ষেত্রে একই দৃশ্য দেখা যায়।

হযরত 'আয়িশার (রা) এমন কাব্যরুচি এবং শিল্পরস আস্বাদন ক্ষমতা দেখে অনেক কবি তাঁকে নিজের কবিতা শোনাতেন। হযরত হাস্সান ইবন সাবিত (রা) আনসারদের মধ্যে কবিত্বের স্বীকৃত উসতাদ ছিলেন। ইফ্কের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ার কারণে হযরত

৪৪০. আল-ইকদুল ফারীদ–২/৩৩৯; ৫/২/৭৫

'আয়িশার (রা) তাঁর প্রতি অসন্তোষ থাকা স্বাভাবিক ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি হযরত 'আয়িশার (রা) খিদমতে হাজির হয়ে তাঁকে নিজের কবিতা শোনাতেন।[৪৪১] হযরত 'আয়িশা (রা) তার প্রশংসা করতেন এবং তাঁর বিভিন্ন গুণাবলী বর্ণনা করতেন। তাছাড়া প্রসঙ্গক্রমে নবীর (সা) জলসার অপর দুইজন শ্রেষ্ঠ কবি হযরত কা'ব ইবন মালিক (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার (রা) নামও উল্লেখ করতেন।[৪৪২]

মূলগতভাবে কাব্যচর্চা করা না ভালো, না মন্দ। কবিতাও কথার একটি প্রকার। কথার ভালো মন্দ কবিতার ছন্দের উপর নির্ভরশীল নয়; বরং বিষয়বস্তুর উপর নির্ভরশীল। বিষয়বস্তু যদি খারাপ না হয় তাহলে সেই কবিতায় কোন দোষ নেই। গদ্যেরও ঠিক একই অবস্থা। ভালোমন্দ নির্ভর করে বিষয়বস্তুর উপর।

কবিতার ভালোমন্দ সম্পর্কে হযরত 'আয়িশা (রা) ঠিক এ রকম কথাই বলেছেন ঃ[৪৪৩]

الشعر منه حسن ومنه قبيح، خذ بالحسن ودع القابح -

"কিছু কবিতা ভালো হয়, কিছু কবিতা খারাপ হয়। ভালোটি গ্রহণ কর, খারাপটি পরিত্যাগ কর।"

তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ 'সবচেয়ে বড় গুনাহগার ঐ কবি, যে গোটা গোত্রের নিন্দা করে। অর্থাৎ এক দুই জনের খারাপ কাজের জন্য গোটা গোত্রের নিন্দা করা নৈতিকতার পদস্খলন এবং কবিত্ব শক্তির অপব্যবহার মাত্র।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, হযরত 'আয়িশা (রা) এমন এক বিস্ময়কর প্রতিভা যার বর্ণনা ও মূল্যায়ন কোন সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়। তাঁর জীবন ও বিচিত্রমুখী প্রতিভার বিবরণের জন্য প্রয়োজন একখানি বৃহদাকৃতির গ্রন্থের। আমাদের আলোচনায় আমরা তাঁর কিছু পরিচয় পাঠকবর্গের নিকট তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

---

৪৪১. সহীহ বুখারী ঃ মানকিবু হাস্সান

৪৪২. প্রাগুক্ত

৪৪৩. আদাবুল মুফরাদ ঃ বাবুশ শি'রু

# হাফসা বিন্‌ত 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)

উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা) দ্বিতীয় খলীফা উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) কন্যা। মা খুযা'আা গোত্রের মেয়ে যয়নাব বিন্‌ত মাজ'উন প্রখ্যাত সাহাবী উসমান ইবন মাজ'উনের আপন বোন। তিনি নিজেও একজন সাহাবী। 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার ও হাফসা আপন ভাই-বোন।[১] হাফসা আবদুল্লাহর চেয়ে ছয় বছরের বড়।[২] রাসূলুল্লাহর (সা) নুবুওয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। উমার (রা) বলেন ঃ মক্কার কুরাইশরা তখন কা'বা ঘরের পুন ঃনির্মাণের কাজে ব্যস্ত।[৩]

বিয়ের বয়স হলে পিতা 'উমার ইবনুল খাত্তাব বনু সাহ্‌ম গোত্রের সন্তান খুনাইস ইবন হুজাফার সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে দেন। এই খুনাইস মক্কায় প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। হাবশায় হিজরাতকারী দ্বিতীয় দলটির সাথে হাবশায় হিজরাত করেন।[৪] অবশ্য মূসা ইবন 'উকবা ও আবু মা'শার তাঁর হাবশায় হিজরাতের কথা উল্লেখ করেননি।[৫] সেখান থেকে মক্কায় ফিরে এসে আবার মদীনায় হিজরাত করেন। মদীনায় পৌঁছে কুবার বনু 'আমর ইবন আওফ গোত্রের রিফা'য়া ইবন আবদুল মুনজিরের গৃহে আশ্রয় নেন।[৬]

হাফসার (রা) ইসলাম গ্রহণের সময়কাল সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায়না। তবে এতটুকু নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, উমার ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে তাঁর নিজ গোত্র ও খান্দানের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে। সম্ভবত ঃ হাফসাও সেই সময় পরিবারের লোকদের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৭]

স্বামীর সাথে তিনি মদীনায় হিজরাত করেন। মদীনায় আসার অল্পকাল পরেই বিধবা হন। তখন তাঁর বয়স বিশ বছরও হয়নি।[৮] খুনাইসের মৃত্যুর সময়কাল নিয়ে কিঞ্চিত মতভেদ আছে। অধিকাংশ সীরাত বিশেষজ্ঞের মতে তিনি বদর ও উহুদ উভয় যুদ্ধে যোগদান করেন। উহুদে তাঁর দেহে একাধিক স্থানে জখম হয় এবং মদীনায় ফিরে এসে তাতেই মারা যান।[৯] ভিন্ন মতে তিনি বদরে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে ছিলেন। সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন বা জখম হন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) বদর থেকে মদীনায় ফেরার পর হিজরী দ্বিতীয়

---

১. উসুদুল গাবা- ৫/৪২৫; আল-ইসতী'য়াব-৪/২৬৮,
২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২৭.
৩. তাবাকাত- ৮/৫৬; তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-২/২২১
৪. তাবাকাত-৮/৫৬; উসুদাল গাবা-৫/৪২৫
৫ আনসাবুল আশরাফ- ১/২১৪
৬. ইবন হিশাম-১/৪৭৭
৭. সাহাবিয়াত-৬৫
৮. ডঃ আহমাদ শালবা-আত-তারীখ আল-ইসলামী ১/৩৩১;
৯. তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর-২/২২১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, টীকা-২/২২৭

সনে তিনি মারা যান।[১০]

মেয়ে বিধবা হওয়ার পর পিতা উমার (রা) তাঁর দ্বিতীয় বিয়ের কথা ভাবতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময় রাসূলুল্লাহর (সা) মেয়ে ও হযরত উসমানের স্ত্রী রুকাইয়্যা (রা) ইনতিকাল করেন। উমার (রা) সর্বপ্রথম উসমানের সাথে দেখা করে তাঁর সাথে হাফসার বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 'উসমান বিষয়টি ভেবে দেখবো বলে সময় নেন। কয়েক দিন পর, 'আমি এ সময় বিয়ে করতে চাচ্ছি না'– বলে জবাব দেন। তারপর উমার গেলেন আবু বকরের (রা) কাছে। বললেন ঃ আপনার সাথে আমি হাফসাকে বিয়ে দিতে চাই। আবু বকর চুপ থাকলেন, কোন জবাব দিলেন না। উসমানের জবাবে উমার যতখানি আহত হন তার চেয়ে বেশী হন আবু বকরের আচরণে। 'উমার (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে মনের দু ঃখ প্রকাশ করেন।[১১] ইবনুল আসীর বলেন, 'উমার প্রথমে আবু বকরকে প্রস্তাব করেন, কিন্তু তিনি কোন উত্তর না দেওয়ায় উসমানকে প্রস্তাব করেন।[১২]

'আয়িশার (রা) সাথে বিয়ের মাধ্যমে আবু বকরের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। কিন্তু উমারের সাথে কোন আত্মীয়তা ছিলনা। হাফসার সাথে বিয়ের মাধ্যমে এমন সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়া আল্লাহর মর্জি ছিল। উমারের (রা) দু:খের কথা শুনে রাসূল (সা) বলেন ঃ হাফসাকে বিয়ে করবে উসমানের চেয়েও ভালো এক ব্যক্তি এবং 'উসমান বিয়ে করবে হাফসার চেয়েও ভালো এক মহিলাকে।[১৩] অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে রাসূল (সা) বলেন ঃ আমি কি তোমাকে 'উসমানের চেয়ে ভালো জামাই এবং 'উসমানকে তোমার চেয়ে ভালো শ্বশুরের সন্ধান দেব না? 'উমার বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই দেবেন। তখন রাসূল (সা) বলেন ঃ তোমার মেয়ে হাফসাকে আমার সাথে বিয়ে দাও, আর আমার মেয়ে উম্মু কুলসুমকে বিয়ে দিই 'উসমানের সাথে।[১৪] এভাবে বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে যায়। হাফসার পিতা উমার নিজেই ওলি হয়ে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করেন। রাসূল (সা) হাফসাকে চার শো দিরহাম দেন মোহর দান করেন।[১৫]

উমারের (রা) প্রস্তাবে 'উসমান ও আবু বকরের (রা) সাড়া না দেওয়ার কারণ হলো, তাঁরা রাসূলুল্লাহকে (সা) হাফসার কথা আলোচনা করতে শুনেছিলেন। তারা বুঝেছিলেন, তিনি উমারের সম্মানার্থে হাফসাকে বিয়ে করতে আগ্রহী। কিন্তু তাঁরা এ কথাটি উমারকে বলতে সাহস করেননি এই ভয়ে যে, তাঁদের বুঝার ভুলও হতে পারে।[১৬] এ কারণে

---

১০. আনসাবুল আশরাফ-১/২১৪, ৪২২
১১. আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৩; হায়াতুস সাহাবা-২/৫০২, ৬৫৬
১২. উসুদুল গাবা- ৫/৪২৫; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২৮
১৩. উসুদুল গাবা-৫/৪২৫
১৪. আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৩
১৫. ইবন হিশাম-২/৬৪৫
১৬. ড. আহমাদ শালবী ঃ তারীখুল ইসলাম-১/৩৩১

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে হাফসার বিয়ের কাজ সম্পন্ন হবার পর আবু বকর একদিন উমারের সাথে দেখা করে বলেন ঃ রাসূল (সা) একদিন হাফসার কথা বলেছিলেন, আমি তাঁর গোপন কথা প্রকাশ করতে চাইনি। এছাড়া আপনার প্রস্তাবের জবাব না দেওয়ার আর কোন কারণ ছিল না।[১৭]

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে হাফসার বিয়ে কখন হয় সে বিষয়ে সীরাত বিশেষজ্ঞদের একটু মতভেদ আছে। এ মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে মূলত ঃ তাঁর প্রথম স্বামীর মৃত্যুর সময় নিয়ে মতপার্থক্যের কারণে। ইবনুল আসীর বলেন, অধিকাংশ আলেমের মতে হিজরী তৃতীয় সনে এ বিয়ে হয়।[১৮] ইমাম জাহাবী বলেন, তৃতীয় হিজরীর শা'বান মাসে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে ঘরে তুলে নেন। তখন হাফসার বয়স প্রায় বিশ বছর।[১৯] আবু উবায়দার মতে, এ বিয়ে হয় হিজরী দ্বিতীয় সনে। আর এটাই ইবন আবদিল বার-এর মত। ইবন হাজার আল-ইসাবা গ্রন্থে তৃতীয় সনের মতটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ, তাঁর প্রথম স্বামী উহুদে শাহাদাত বরণ করেন। অনেকে বলেন, হিজরাতের ২৫ মতান্তরে ৩০ মাস পরে এ বিয়ে হয়। কোন কোন বর্ণনায় ২০ মাস পরের কথাও এসেছে। অথচ উহুদ যুদ্ধ হয় হিজরাতের ৩০ মাসেরও পরে। ইবন সা'দ জোর দিয়ে বলেন, তাঁর প্রথম স্বামী বদর থেকে ফেরার পর মারা যান। ইবন সায়্যিদিন নাস বলেন, হিজরাতের ৩০ মাসের মাথায় শা'বান মাসে এ বিয়ে হয়।[২০]

হাফসার (রা) মৃত্যুসন নিয়ে সীরাত বিশেষজ্ঞদের একটু মতপার্থক্য আছে। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে, তিনি ৪৫ হিজরীর শা'বান মাসে মদীনায় ইনতিকাল করেন। আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকাল এবং মদীনার গভর্ণর তখন মারওয়ান। তিনি জানাযার নামায পড়ান, লাশের সাথে বাকী গোরস্তান পর্যন্ত যান এবং দাফন কার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত বসে থাকেন। আলে হাযামের বাড়ী থেকে মুগীরার বাড়ী পর্যন্ত লাশবাহী খাটিয়ায় তিনি কাঁধ দেন এবং সেখান থেকে তাঁর স্থলে আবু হুরাইরা কাঁধ দিয়ে কবর পর্যন্ত নিয়ে যান। হাফসার (রা) ভাই আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) এবং তাঁর ছেলেরা– আসেম, সালেম, আবদুল্লাহ ও হামযা লাশ কবরে নামান। এভাবে তিনি বাকী গোরস্তানে সমাহিত হন। উল্লেখিত মতটি মা'মার, যুহরী ও সালেমের সূত্রে আল-ওয়াকিদী বর্ণনা করেছেন।[২১] তবে ইবনুল আসীরের ঝোঁক এই দিকে যে, যে সময় হাসান ইবন আলী (রা) আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) হাতে বাই'য়াত করেন সেই সময় হাফসার ওফাত হয়। আর সেটা ৪১ হিজরীর জামাদিউল আওয়াল মাস। আর এই সনকে 'আমুল জামা'য়াহ' বলা হয়।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি হিজরী ২৭ সনে 'উসমানের (রা) খিলাফতকালে মারা

---

১৭. বুখারী- ৯/১৫২-১৫৩; আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৩; ইমাম আহমাদ, ইবন সাদ, বুখারী, নাসাঈ, বায়হাকী প্রমুখ মুহাম্মদ্দিসীন হাফসার বিয়ে সংক্রান্ত বর্ণনা সংকলন করেছেন।

১৮. উসুদুল গাবা- ৫/৪২৫

১৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২৭, ২৩০; আনসাবুল আশরাফ-১/৪২২

২০. আল-ফাতহুর রাব্বানী মা'য়া বুলুগুল আমানী-২২/১৩০

২১. তাবাকাত-৮/৬০; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/২২৯, ২৩০; আনসাবুল আশরাফ ১/৪২৭,৪২৮

যান। এ মতটির ভিত্তি হলো, ওয়াহাব ইবন মালিক বলেছেন, যে বছর আফ্রিকা বিজয় হয় সেই বছর তিনি মারা যান। আর আফ্রিকা বিজয় হয় হিজরী ২৭ সনে। কিন্তু এ এক মারাত্মক ভুল। কারণ আফ্রিকা বিজয় হয় দুইবার। প্রথম বিজয় হয় হিজরী ২৭ সনে, আর দ্বিতীয় বিজয় হয় মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালে। এ বিজয়ের গৌরবের অধিকারী ছিলেন মু'য়াবিয়া ইবন খাদিজা (রা)[২২] মৃত্যুকালে হাফসার বয়স হয়েছিল ৬৩ অথবা ৫৯ বছর।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি ভাই আবদুল্লাহ ইবন উমারকে (রা) একই উপদেশ দান করেন যা তাঁর পিতা উমার (রা) তাঁকে মৃত্যুর সময় দান করেছিলেন। পিতা তাঁকে গাবা'তে যে ভূ-সম্পত্তি দিয়ে যান তা তিনি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্ফ করে দেন।[২৩] হাফসা কোন সন্তান রেখে যাননি।[২৪]

হাফসার (রা) সন্তানাদি না থাকলেও তিনি অনেক স্নেহভাজন নারী ও পুরুষ রেখে যান যারা তাঁর নিকট হাদীস শুনেছিলেন এবং তা বর্ণনাও করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন ঃ আবদুল্লাহ ইবন উমার, হামযা ইবন আবদিল্লাহ, সাফিয়্যা বিন্ত আবী উবায়দা (আবদুল্লাহর স্ত্রী), মুত্তালিব ইবন আবী ওয়াদায়া, উম্মু মুবাশ্শির আল আনসারিয়্যা, আবদুর রহমান ইবন হারেস ইবন হিশাম, আবদুল্লাহ ইবন সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা, শুতাইর ইবন শাকাল, সাওয়া আল-খুযাঈ, আল-মুসায়্যিব ইবন রাফে, আল-মাজলায ও আরো অনেকে।[২৫]

হাফসা (রা) থেকে মোট ৬০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এগুলি তিনি খোদ রাসূলুল্লাহ (সা) ও পিতা উমার (রা) থেকে শুনেছিলেন।[২৬] তাঁর বর্ণিত চারটি হাদীস মুত্তাফাক আলাইহি এবং ছয়টি হাদীস বুখারী এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[২৭]

হযরত হাফসার (রা) তৎকালীন আরবের অন্য সকল নারী-পুরুষের মতই কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। তবে পিতা 'উমার (রা) ও স্বামী রাসূলুল্লাহর (সা) চেয়ে বড় শিক্ষক আর কে হতে পারতেন? তাঁদের প্রতিপালন ও তত্ত্বাবধানে তাঁর মধ্যে জ্ঞানার্জন ও দ্বীনকে বুঝার প্রবল আগ্রহ জন্ম নেয়। দ্বীনী বিষয়ে তাঁর যে গভীর জ্ঞান ছিল, বিভিন্ন ঘটনায় তা জানা যায়। একবার রাসূল (সা) বললেন ঃ 'আমি আশা করি বদর ও হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণকারীগণ জাহান্নামে যাবে না'। হযরত হাফসা (রা) বলে উঠলেন, আল্লাহ তো বলেছেন ঃ

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا - (سورة مريم - ٧١)

---

২২. উসুদাল গাবা-৫/৪২৬; তাহজীবুত তাহজীব-১২/৪৩৯ আল-ইসাবা-৪/২৭৩
২৩. প্রাগুক্ত
২৪. যারকানী ঃ শারহুল মাওয়াহিব-৩/২১
২৫. তাহজীবুত তাহজীব-১২/৪৩৯; জাহাবী ঃ তারীখ-২/২২১; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২৮
২৬. যারকানী-৩/২২১; তাহজীবুত তাহজীব-১২/৪৩৯
২৭. বুলূগুল আমানী-২২/১৩১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৩০

তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে সেখানে (জাহান্নামে) পৌঁছবে না।

রাসূল (সা) বললেন ঃ হাঁ, তা ঠিক, তবে একথাও তো আল্লাহ বলেছেন ঃ

ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا -

(سورة مريم -٧٢)

অত ঃপর আমি খোদাভীরু লোকদের উদ্ধার করবো এবং জালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব। (সূরা মারইয়াম-৭১-৭২)[২৮]

হাফসার (রা) মধ্যে শেখা ও জানার প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করে রাসূলে কারীমও (সা) সব সময় তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে শেখানোর চিন্তা করতেন। হযরত শিফা বিন্‌ত আবদিল্লাহ ছিলেন একজন মহিলা সাহাবী। তিনি লিখতে ও পড়তে জানতেন। হযরত হাফসা তাঁর নিকট লেখা শেখেন। এই শিফা 'নামলা'[২৯] নামক এক প্রকার ক্ষত-রোগ নিরাময়ের ঝাঁড়-ফুক জানতেন। জাহিলী জীবনে এই ঝাঁড়-ফুঁক করতেন। একদিন তিনি রাসূলে কারীমের (সা) নিকট এসে বললেন ঃ আমি জাহিলী জীবনে ঝাঁড়-ফুঁক করতাম। আপনি অনুমতি দিলে তা আমি আপনাকে শুনাই। রাসূল (সা) শুনে বললেন, এই ঝাঁড়-ফুঁকটি তুমি হাফসাকেও শিখিয়ে দাও। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে রাসূল (সা) শিফাকে বলেন, তুমি কি হাফসাকে এই 'নামলা'র দু'আটি শিখিয়ে দেবে না যেমন তাকে লেখা শিখিয়েছো?[৩০]

রাসূলে পাকের (সা) জীবদ্দশায় এবং পরবর্তী জীবনে হাফসা (রা) প্রচুর ইবাদাত-বন্দেগী করতেন। সব সময় রোযা রাখতেন এবং অতিমাত্রায় রাত জেগে নামায আদায় করতেন। জিবরীল (আ) তাঁর সম্পর্কে রাসূলকে (সা) বলেছেন ঃ তিনি অতিমাত্রায় সিয়াম পালনকারিণী এবং রাতের বেলায় খুব বেশী ইবাদাতকারিণী।[৩১] অন্য একটি বর্ণনা এসেছে, জিবরীল (আ) বলেন ঃ তিনি একজন সৎকর্মশীলা নারী।[৩২] তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, রোযা অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।[৩৩]

তিনি সব রকমের মতবিরোধকে অপছন্দ করতেন। সিফ্‌ফীন যুদ্ধের পর যখন 'দুমাতুল জান্দালে' শালিশ-ফয়সালার বিষয়টি এলো তখন তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) তা একটি ফিতনা-ফাসাদ মনে করে ঘর থেকে বের হতে চাইলেন না। কিন্তু হাফসা তাঁকে বললেন, এতে অংশগ্রহণে তোমার কোন লাভ নেই, তবে তোমার অংশগ্রহণ করা উচিত। কারণ, মানুষ তোমার মতামতের অপেক্ষায় থাকবে। এমনও হতে পারে,

২৮. মুসনাদ-৬/২৮৫

২৯. নামলা' মানুষের দেহের পার্শ্বদেশে নির্গত একপ্রকার ক্ষত, (সহীহ মুসলিম বিশারহিন নাওয়াবী-১৪/১৮২)

৩০. 'আওনুল মা'বুদ, শারহু সুনানে আবী দাউদ-১০/৩৭৪; আল মুফাস্‌সাল ফী আহকামিল মারয়াতি ওয়াল বায়ত-৩/২৬২

৩১. তাবাকাত-৮/৮৫

৩২. আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৬

৩৩. তাবাকাত-৮/৮৫

তোমার এই দূরে থাকা তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে পারে।[৩৪] অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন ঃ উম্মাতে মুহাম্মদীর মধ্যে আপোষ-মীমাংসা হতে পারে এমন কোন বিষয় থেকে দূরে থাকা সমীচীন নয়। তুমি হচ্ছো রাসূলুল্লাহর (সা) শ্যালক এবং 'উমার ইবনুল খাত্তাবের ছেলে।[৩৫]

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর হাফসা (রা) জনগণের পক্ষে বিভিন্ন দাবী নিয়ে খলীফাদের সাথে, বিশেষত তাঁর পিতা দ্বিতীয় খলীফা 'উমারের (রা) সাথে কথা বলতেন। অনেক সময় খলীফাও তাঁর মেয়ের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এ রকম কিছু ঘটনা সীরাতের গ্রন্থাবলীতে দেখা যায়।

'উমার (রা) খলীফা হওয়ার পরও প্রথম খলীফা আবু বকরের (রা) সময় তাঁর জন্য নির্ধারিত ভাতার উপর নির্ভর করে সংসার চালাতেন। কিন্তু তাতে তার সংসার ভালো মত চলে না দেখে উসমান, আলী, তালহা, যুবাইর প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবী একত্র হয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন। তাঁরা বিষয়টি নিয়ে খলীফা উমারের (রা) সাথে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবেন কে? বিষয়টি নিয়ে খলীফার সাথে কথা বলতে তাঁরা কেউ সাহস পেলেননা। শেষমেষ তাঁরা হাফসার দ্বারস্থ হলেন এবং তাঁকেই খলীফার সাথে কথা বলার জন্য অনুরোধ করলেন। হাফসা (রা) কথা বললেন, কিন্তু খলীফা রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের আড়ম্বরহীনতা ও সরলতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁকে বিদায় দেন।[৩৬]

আর একবার তিনি তাঁর পিতা খলীফা উমারকে তাঁর পোশাক ও খাদ্যের মান বাড়ানোর জন্য আবেদন জানিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এখন তো মুসলমানদের জীবিকায় আগের চেয়ে প্রশস্ততা দান করেছেন। তাদেরকে আগের তুলনায় অঢেল কল্যাণও দান করেছেন। উমার (রা) তাঁর মেয়েকে তখন রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের কঠিন বাস্তবতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে খুব কাঁদলেন।[৩৭]

একবার খলীফা 'উমারের (রা) নিকট কিছু অর্থ-সম্পদ এলো। হাফসা এসে বললেন ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ তা'আলা নিকট-আত্মীয়দের ব্যাপারে অসীয়াত করেছেন। এই সম্পদে আপনার নিকট-আত্মীয়দের অধিকার আছে। মেয়ের কথা শুনে খলীফা বললেন ঃ আমার নিকট-আত্মীয়দের অধিকার আছে আমার সম্পদে। আর এই সম্পদ তো মুসলমানদের। মেয়ে. তুমি তোমার পিতাকে ধোঁকায় ফেলেছো। ওঠো, এখান থেকে যাও। এরপর হাফসা চাদরের আঁচল টানতে টানতে দ্রুত স্থান ত্যাগ করেন।[৩৮]

ইবন জুরাইজ থেকে বর্ণিত হয়েছে খলীফা উমার (রা) একদিন রাতের বেলা কা'বা

---

৩৪. বুখারী- ২/৫৮৯; সিয়ারুস সাহাবিয়াত-৩৮

৩৫. হায়াতুস সাহাবা-২/৬১

৩৬. তাবারী-৪/১৬৪; হায়াতুস সাহাবা-২/২৭৭

৩৭. তাবাকাত-৩/১৯৯; হায়াতুস সাহাবা-২/৩৭১

৩৮. মুন্তাখাবুল কানয-৪/৪১২; হায়াতুস সাহাবা-২/২৩৮

তাওয়াফ করা অবস্থায় এক মাহিলাকে করুণ সুরে একটি বিরহ সঙ্গীত গাইতে শুনলেন। যার দুইটি পংক্তি এই রকম ঃ

تطاول هذا الليل واسود جانبه -

وارقنى أن لا حبيب ألاعبه

فلولا حذار الله لا شئ مثله

لزعزع من هذا السرير جوانبه

– এই রাত দীর্ঘ ও বিস্তৃত হয়েছে, চতুর্দিক ঘন অন্ধকারে ঢেকে গেছে। একাকী আমি জেগে আছি, পাশে কোন প্রিয়জন নেই যার সাথে প্রেমালাপ করতে পারি।

– আল্লাহ-যিনি অতুলনীয়, যদি তাঁর ভয় না থাকতো তাহলে এই শয্যাধারের চারপাশ অবশ্যই কম্পিত হতো।

খলীফা 'উমার (রা) মহিলার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কি হয়েছে? মহিলা বললো ঃ কয়েক মাস যাবত আমার স্বামী আমার থেকে দূরে আছে। তাঁকে কাছে পাওয়ার অনুভূতি আমার মধ্যে তীব্র হয়ে উঠেছে। তারপর উমার (রা) মেয়ে হাফসার কাছে গিয়ে বলেন, আমি তোমার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে চাই, আমাকে তুমি সাহায্য কর। মেয়েরা স্বামী থেকে দূরে থাকলে কতদিন পর স্বামীকে কাছে পাওয়ার অনুভূতি তীব্র হয়ে ওঠে? হাফসা লজ্জায় মাথানত করে ফেলেন। 'উমার বললেন ঃ আল্লাহ সত্য প্রকাশের ব্যাপারে লজ্জা করেন না। তখন হাফসা হাত দিয়ে ইশারা করে তিন অথবা চার মাস বুঝিয়ে দেন। তখন 'উমার (রা) নির্দেশ দেন, কোন সৈনিককে যেন চার মাসের অধিক আটকে রাখা না হয়।[৩৯]

আল-বায়হাকী (৯/২৯) ইবন উমার থেকে বর্ণনা করেছেন। একদিন 'উমার রাতের বেলা নগর পরিভ্রমণে বেরিয়ে এক মহিলাকে উপরোক্ত পংক্তি দুইটি গাইতে শোনেন। তারপর তিনি হাফসাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ মেয়েরা সর্বাধিক কতদিন স্বামী ছাড়া থাকতে পারে? হাফসা বলেন ঃ ছয় অথবা চার মাস। উমার বলেন ঃ আমি এর চেয়ে বেশীদিন কোন সৈনিককে আটকে রাখবো না।[৪০]

খলীফা হযরত আবু বকর (রা) কুরআনের যে কপি তৈরী করান, তাঁর ইনতিকালের পর তা উসমানের (রা) কাছে ছিল। তারপর তা হাফসার কাছে রাখা হয়। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত কপিটি তাঁর কাছেই রক্ষিত ছিল।[৪১]

হাফসা (রা) ছিলেন 'উমারের কন্যা। পিতার মত তাঁর মেজাজেও ছিল কিছুটা তীক্ষ্ণতা। কখনো কখনো রাসূলুল্লাহর (সা) কথার পিঠে কথা বলতেন। তাতে দাম্পত্য জীবনে

---

৩৯. কানযুল 'উম্মাল-৮/৩০৮; হায়াতুস সাহাবা-১/৪৭৫

৪০. হায়াতুস সাহাবা-১/৪৭৬

৪১. কানযুল উম্মাল-১/২৭৯

মনোমালিন্যের উপক্রম হতো। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা বুখারীসহ অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। উমার (রা) একবার ইবন আব্বাসকে (রা) বললেন ঃ জাহিলী আমলে কুরাইশ নারীরা পুরুষের অনুগত ও বাধ্য থাকতো। আমরা তাদের বিন্দুমাত্র মূল্য দিতাম না। ইসলাম তাদেরকে মর্যাদা দান করে। তাদের সম্পর্কে বহু আয়াত নাযিল হওয়ার পর আমরা তাদের স্থান ও মর্যাদা অবগত হই। আমরা মদীনায় এসে দেখলাম, মদীনায় নারীরা পুরুষদের বাধ্য ও অনুগত করে রেখেছে। ধীরে ধীরে আমাদের নারীরা তাদের কাছে শিক্ষা পেতে লাগলো। আমার বাড়ীটি ছিল 'আওয়ালীর বনু উমাইয়্যা ইবন যায়িদ পল্লীতে। আমি একদিন স্ত্রীর উপর ভীষণ ক্ষেপে গেলাম। সেও ছেড়ে দিল না, কথার পিঠে কথা শুনিয়ে দিল। তার এমন প্রত্যুত্তর আমার মোটেই ভালো লাগলো না। তখন সে বললো, আমার এরূপ উত্তর করা আপনার পছন্দ নয়, অথচ রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীরাও তাঁর কথার প্রত্যুত্তর করে থাকেন। কোন কোন স্ত্রী আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর থেকে দূরে আছেন। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন ঃ আপনার মেয়ে হাফসা রাসূলুল্লাহর (সা) মুখের উপর জবাব ছুড়ে দেয়। তাতে এমন হয় যে রাসূলুল্লাহ (সা) সারাদিন বিমর্ষ থাকেন।

'উমার (রা) বলেন ঃ একথা শুনে আমি হাফসার কাছে ছুটে গেলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তোমরা কি রাসূলুল্লাহর (সা) কথার প্রত্যুত্তর করে থাক? হাফসা বললো ঃ হাঁ। আমরা এমন করে থাকি। আমি প্রশ্ন করলাম ঃ তোমাদের কেউ কি রাত পর্যন্ত তাঁর থেকে দূরে থাক? হাফসা বললো ঃ হাঁ। বললাম ঃ তোমাদের মধ্যে যে এমন করে সে সফল হবে না। সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তোমাদের কেউ কি আল্লাহর রাসূলের ক্রুদ্ধ হওয়ার পরেও আল্লাহর ক্রোধ থেকে নিরাপদ মনে করেছে? মেয়ে, তোমার চেয়ে যে বেশী সুন্দরী ও রাসূলুল্লাহর (সা) অধিক প্রিয় সে যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে।[৪২]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, উমার (রা) হাফসাকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ সাবধান! এমন করোনা। আমি তোমাকে আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করছি। তুমি তার অহমিকার ফাঁদে পড়োনা যার সৌন্দর্য রাসূলুল্লাহকে (সা) বিমোহিত করেছে। (অর্থাৎ আয়িশা রা)[৪৩] অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি হাফসাকে বলেন ঃ তুমি রাসূলুল্লাহর (সা) কথার উত্তর করবে না। তোমার না আছে যয়নাবের সৌন্দর্য ও আয়িশার সৌভাগ্য।[৪৪]

তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। একদিন উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়্যা বসে বসে কাঁদছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ঘরে এসে তাঁকে কাঁদতে দেখে এভাবে কান্নার কারণ জানতে চাইলেন। সাফিয়্যা বললেন ঃ হাফসা আমাকে 'ইহুদীর মেয়ে' বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) হাফসাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'তুমি আল্লাহকে ভয় কর।' তারপর সাফিয়্যাকে বললেন ঃ তুমি তো একজন নবীর মেয়ে, তোমার চাচাও একজন নবী। তারপর একজন

---

৪২. বুখারী-৬/১৯৫-১৯৬; হায়াতুস সাহাবা-২/৬৮২-৬৮৩

৪৩. মুসনাদ-৬/২৮৩; বুখারী-৬/১৯৬; শিবলী নু'মানী ঃ সীরাত-২/৪১০

৪৪. আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৭

নবীর স্ত্রী। কোন্ ব্যাপারে হাফসা তোমার উপর গর্ব করতে পারে?[৪৫]

আর একবার হাফসা ও আয়িশা (রা) সাফিয়্যাকে বললেন : রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আমরা দুইজন তোমার চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী। আমরা তাঁর স্ত্রী, তদুপরি তাঁর চাচাতো বোন। কথাগুলো হযরত সাফিয়্যাকে ভীষণ আহত করে। তিনি তাঁদের দুইজনের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট অভিযোগ করলেন। রাসূল (সা) তাঁকে বললেন : তুমি তাদেরকে কেন একথা বললে না যে, তোমরা আমার চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী হতে পার না। কারণ, আমার স্বামী মুহাম্মাদ, আমার পিতা হারূন এবং চাচা মূসা।[৪৬]

'আয়িশা ও হাফসা (রা) পরস্পর সতীন হলেও তাঁদের সম্পর্ক ছিল বোনের মত। অধিকাংশ ব্যাপারে তাঁরা একে অপরের সহযোগী ছিলেন। আয়িশা (রা) হাফসা সম্পর্কে বলেছেন : হাফসা বাপের বেটি। তাঁর বাপ যেমন প্রতিটি কথা ও কাজে দৃঢ়সংকল্প, হাফসাও তেমন।[৪৭] রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র হাফসাই আমার সমকক্ষতার দাবীদার ছিলেন।[৪৮] আমরা দুইজন ছিলাম যেন একটি হাত।[৪৯]

রাসূলুল্লাহ (সা) অন্তিম রোগ শয্যায়। জীবনের প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়েছেন। নামাযের সময় হলো। তিনি বললেন : আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াতে বল। আয়িশা বললেন : আবু বকর একজন কোমল মনের মানুষ। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) স্থানে দাঁড়িয়ে কুরআন পাঠ করতে গেলে কান্নায় তাঁর বাকরুদ্ধ হয়ে যাবে, লোকেরা কিছুই শুনতে পাবে না– একথাগুলি তিনি হাফসাকে বললেন এবং তাঁর স্থলে 'উমারকে নির্দেশ দানের জন্য রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে তাঁকে অনুরোধ করলেন। আয়িশার (রা) কথামত হাফসা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতেই তিনি মন্তব্য করলেন : 'তোমরা সবাই ইউসুফের সঙ্গী-সাথীদের মত।'[৫০]

আয়িশা ও হাফসা, দুইজনের মনের এমন চমৎকার মিল এবং উভয়ের মধ্যে এত ভাব থাকা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে মাঝে মাঝে নারীর স্বাভাবিক প্রবণতা মাথাচাড়া দিত। স্বামীসঙ্গ ও সোহাগ প্রাপ্তির ব্যাপারে তাঁরা ঈর্ষার শিকার হতেন। একবার এক সফরে তাঁরা দুইজন রাসূলুল্লাহর (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন। রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ (সা) 'আয়িশার উটের উপর সওয়ার হয়ে তাঁর সাথে কথা বলতে বলতে পথ চলতেন। একদিন হাফসা আয়িশাকে বললেন, আজ রাতে তুমি যদি আমার উটের উপর, আর আমি তোমার উটের উপর সওয়ার হই তাহলে অন্য একটা দৃশ্য দেখা যাবে। 'আয়িশা রাজি হয়ে গেলেন। রাসূল (সা) হাফসার সাথে তাঁর বাহনে পথ চললেন। মনযিলে

---

৪৫. তিরমিযী (কিতাবুল মানাকিব)-৫/৩৬৮; শিবলী-২/৪১০

৪৬. প্রাগুক্ত

৪৭. সুনানে আবী দাউদ, (হাফসার আলোচনা অধ্যায়)

৪৮. জাহাবী : তারীখ-২/২২১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২৭

৪৯. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩১

৫০. প্রাগুক্ত-১/৫৫৪, ৫৫৬-৫৫৭

পৌঁছে আয়িশা যখন রাসূলকে (সা) পেলেন না তখন নিজের চরণ দুইখানি ইযখীর ঘাসের মধ্যে ঝুলিয়ে বলতে লাগলেন ঃ হে আল্লাহ! কোন সাপ অথবা বিচ্ছু যদি আমাকে দংশন করতো।[৫১]

আয়িশা ও হাফসা ছিলেন যথাক্রমে আবু বকর (রা) ও উমারের (রা) কন্যা। এই দুই মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন রাসূলেকারীমের (সা) অতি কাছের মানুষ। এ কারণে, আয়িশা ও হাফসা দুইজন ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) পারিবারিক জীবনে অন্যান্য আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের বিপরীতে একজোট। তাঁদের এই জোটবদ্ধতা নবীপাকের পারিবারিক জীবনের অনেক ঘটনার পশ্চাতে কাজ করেছে।

আমাদের একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে, রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের সকল ছোট-বড় ঘটনা সাধারণ মানুষের জীবনের মত নিছক কোন ঘটনা নয়। প্রত্যেকটি ঘটনার মধ্যে রয়েছে মানবজাতির জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। আল্লাহ তা'আলা এসব ঘটনার মাধ্যমে মানব জাতিকে বিভিন্ন বিধি-বিধান ও আচরণের বাস্তব শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। তা না হলে তাঁর নবীর জীবনে এসব ঘটনা না ঘটালেও পারতেন। আমাদের প্রিয় নবীজীর জীবনের প্রতিটি ঘটনা এভাবেই দেখতে হবে।

হিজরী ৯ম সনে সূরা আত-তাহরীম অবতীর্ণ হয়। এই অবতরণের পশ্চাতে রয়েছে রাসূলুল্লাহর (সা) পারিবারিক জীবনের একটি ঘটনা। মিষ্টি ও মধু ছিল রাসূলে কারীমের (সা) অতি প্রিয় খাবার। তিনি সাধারণত আসরের নামাজের পর সকল সহধর্মিণীদের ঘরে গিয়ে দেখা করতেন। একদিন যয়নাবের (রা) নিকট স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে একটু দেরী হয়ে যায়। এতে আয়িশা মনক্ষুণ্ন হন। তিনি অবগত হন যে, কোন এক মহিলা যয়নাবকে কিছু মধু উপঢৌকনস্বরূপ পাঠিয়েছে। রাসূল (সা) সেই মধু যয়নাবের নিকট পান করেছেন। আর সেই কারণে তাঁর ঘরে রাসূলুল্লাহর (সা) অবস্থান দীর্ঘ হয়েছে। আয়িশা ও হাফসা জোটবদ্ধ হন। আয়িশা হাফসাকে বলেন, রাসূল (সা) যখন আমার অথবা তোমার ঘরে আসবেন তখন আমরা তাঁকে বলবো, আপনার মুখ থেকে মাগাফীর-এর দুর্গন্ধ আসছে। (মাগাফীর, মাগফুর-এর বহুবচন। একপ্রকার উদ্ভিদের ফুল যা থেকে মৌমাছি মধু আহরণ করে) আয়িশা একই কথা সাফিয়্যাকেও শিখিয়ে দিলেন। রাসূল (সা) যখন তাঁদের ঘরে আসলেন তখন তাঁরা পূর্ব সিদ্ধান্ত মত একই কথা বললেন। রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট দুর্গন্ধ ছিল খুবই অপ্রিয়। এরপর তিনি যখন আবার যয়নাবের নিকট যান তিনি রাসূলকে (সা) আবার মধু পান করাতে চান। তখন রাসূল (সা) বলেন, প্রয়োজন নেই। তারপর তিনি নিজের জন্য মধু পান হারাম করে নেন। রাসূলুল্লাহর (সা) এমন সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে আয়িশা আফসোসের সুরে হাফসাকে বলেন ঃ আমরা একটি মারাত্মক কাজ করে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহকে (সা) তাঁর একটি প্রিয় বস্তু থেকে বঞ্চিত করে ফেলেছি। এ ঘটনারই প্রেক্ষিতে নাযিল হয় সূরা আত-তাহরীমের নিম্নোক্ত আয়াত ঃ [৫২]

---

৫১. শিবলী নু'মানী ঃ সীরাত-২/৪১১; সিয়ারুস সাহাবিয়াত-৪২

৫২. আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৫; হায়াতুস সাহাবা-২/৬৮০ বুখারী -৬/১৯৫

– হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্যে যা হালাল করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্যে তা নিজের জন্যে হারাম করছেন কেন? (আত-তাহরীম-১)

রাসূলুল্লাহকে (সা) মধু পরিবেশনকারিণী হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনায় ভিন্ন ভিন্ন জনের নাম এসেছে। কোন কোন বর্ণনায় হাফসার নামটি এসেছে। সে ক্ষেত্রে আয়িশা সাওদা ও সাফিয়্যার সাথে দল বাঁধেন। ইবন সাদের একটি বর্ণনায় তেমনি বুঝা যায়।[৫৩] কোন কোন বর্ণনায় উম্মু সালামার নামও এসেছে।[৫৪]

রাসূলে কারীম (সা) স্ত্রীদের খুশী করার জন্য মধু পান না করার যে সিদ্ধান্ত নেন তা তিনি সংশ্লিষ্ট স্ত্রীদের গোপন রাখতে বলেন। যাতে মধু পরিবেশনকারিণী মনে কষ্ট না পান। অধিকাংশ বর্ণনা মতে, রাসূল (সা) হাফসার (রা) কাছে এই গোপন কথাটি বলেছিলেন। কিন্তু হাফসা কথাটি গোপন রাখতে পারলেন না। তিনি তা আয়িশার কাছে প্রকাশ করে দেন। একথাই আল্লাহ সূরা আত-তাহরীমের তৃতীয় আয়াতে বলেছেন এভাবে ঃ যখন নবী তাঁর একজন স্ত্রীর কাছে একটি কথা গোপনে বললেন, অত ঃপর স্ত্রী যখন তা বলে দিল আর আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী সে বিষয়ে স্ত্রীকে কিছু বললেন না এবং কিছু বললেন। নবী যখন তা স্ত্রীকে বললেন, তখন স্ত্রী বললেন ঃ কে আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করলো? নবী বললেন ঃ যিনি সর্বজ্ঞ ওয়াকিফহাল, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন।

সূরা আত-তাহরীমের নাযিলের কারণ সম্পর্কে আল-ওয়াকিদীসহ আরো অনেক সীরাত বিশেষজ্ঞ ভিন্ন একটি ঘটনাও বর্ণনা করেছেন। একদিন হাফসা (রা) ঘরে ছিলেন না। এ সময় রাসূল (সা) তাঁর ঘরে আসেন এবং দাসী মারিয়া কিবতিয়্যাকে ডেকে সঙ্গ দেন। এর মধ্যে হাফসা ফিরে আসেন এবং অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তখন রাসূল (সা) হাফসার সন্তুষ্টির জন্য উক্ত দাসীর সাহচর্যকে নিজের জন্য হারাম করে নেন। আর একথা তিনি হাফসাকে গোপন রাখতে বলেন। কিন্তু তিনি তা গোপন রাখতে পারলেন না। আয়িশার কাছে প্রকাশ করে দেন। তখন সূরা আত-তাহরীম নাযিল হয়। নাফে বলেছেন ঃ একথা কি ঠিক নয় যে, রাসূল (সা) নিজের জন্য তার দাসীকে হারাম করেছিলেন, তারপর আল্লাহ তা'আলা কসম ভঙ্গ করে কাফ্‌ফারা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন?[৫৫]

যে দুইজন নারী এসব ঘটনা সৃষ্টি করে রাসূলুল্লাহকে (সা) বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছিলেন, তাঁদেরই সম্পর্কে আল্লাহ নাযিল করেন আত-তাহরীমের চতুর্থ আয়াতটি।– 'তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলে যদি তোমরা উভয়ে তওবা কর, তবে ভালো কথা। আর যদি তোমরা নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য

---

৫৩. তাবাকাত-৮/৮৫

৫৪. আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৫; ঘটনাটি বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ তাফসীর ইবন কাসীর (সূরা আত-তাহরীম) ৩/৫১৯-৫২১

৫৫. আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৪; তাফসীরে ইবন কাসীর-৩/৫২০

কর, তবে জেনে রেখ আল্লাহ, জিবরীল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণ তাঁর সহায়।'[৫৬]

এই দুই নারী হলেন আয়িশা (রা) ও হাফসা (রা)। এই দুইজন নারী কে, সে সম্পর্কে সহীহ্ বুখারীতে ইবন আব্বাস (রা) এর একটি দীর্ঘ বর্ণনা আছে। এতে তিনি বলেন ঃ যে দুইজন নারী সম্পর্কে কুরআনে 'যদি তোমরা উভয়ে তওবা কর'– বলা হয়েছে, তাঁদের ব্যাপারে উমারকে (রা) প্রশ্ন করার ইচ্ছা বেশ কিছুকাল আমার মনে ছিল। অবশেষে একবার তিনি হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে সুযোগ বুঝে আমিও সফরসঙ্গী হয়ে গেলাম। পথিমধ্যে একদিন যখন তিনি অজু করছিলেন এবং আমি পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম, তখন প্রশ্ন করলাম ঃ কুরআনে যে দুইজন নারী সম্পর্কে 'যদি তোমরা তওবা কর'– বলা হয়েছে তাঁরা কে? উমার বললেন ঃ আশ্চর্যের বিষয়, আপনি জানেন না, এঁরা দুইজন হলেন হাফসা ও আয়িশা (রা)।[৫৭]

নবী পরিবারের মধ্যে এই তুচ্ছ কলহ কোন সাধারণ ব্যাপার ছিল না। মুনাফিকরা সব সময় ধান্দায় থাকতো খোদ নবী পরিবার ও তাঁর বিশেষ আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে যে কোন ধরনের ফাটল ধরানোর। তারা আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের এই মামুলি বিরোধের কথা জানতে পেরে হয়তো আরো একটু উস্কে দিতে চেয়েছিল। তারা ভেবেছিল আয়িশা ও হাফসার পিতা আবু বকর ও উমারকে এবার রাসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে দাঁড় করানো যাবে। কিন্তু তারা জানতো না, রাসূলুল্লাহর (সা) পদতলে তাঁরা কন্যা কেন, নিজেদের জীবনও বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। তাই উমার (রা) হাফসার সাথে দেখা করার অনুমতি না পেয়ে চিৎকার করে বলে ওঠেন ঃ অনুমতি পেলে হাফসার মাথা কেটে নিয়ে আসি।[৫৮] সূরা আত-তাহরীমের ৪র্থ আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ আয়িশা ও হাফসা যদি ষড়যন্ত্র করে, আর মুনাফিকরা তা কাজে লাগায় তাহলেও আল্লাহ তাঁর নবীকে সাহায্য করবেন। আর আল্লাহর সাথে আছেন জিবরীল, ফিরিশতামণ্ডলী ও সমস্ত বিশ্বের মুমিন নর-নারী।[৫৯]

বর্ণিত হয়েছে উপরোক্ত ঘটনার পর রাসূলে কারীম (সা) হাফসাকে তালাক দেন। তারপর আবার ফিরিয়ে নেন। একথা আসেম ইবনে উমার বলেছেন।[৬০] তালাক দেওয়ার পর জিবরীল (আ) এসে রাসূলকে (সা) বলেন ঃ হাফসা খুব বেশী রোযা পালনকারিণী এবং রাতে বেশী বেশী নামায আদায়কারিণী। জান্নাতে তিনি আপনার স্ত্রী হবেন। জিবরীলের এ কথায় রাসূল (সা) আবার তাঁকে ফিরিয়ে নেন।[৬১]

ইবন সা'দ, কায়স ইবন ইয়াযীদ এবং ইবন সীরীনের একটি বর্ণনা নকল করেছেন। নবী

---

৫৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২৯

৫৭. বুখারী-৬/১৯৫-১৯৬; হায়াতুস সাহাবা-২/৬৮১; তাফসীরে ইবন কাসীর-৩/৫২১

৫৮. সীয়ারুস সাহাবিয়াত-৪১

৫৯. প্রাগুক্ত-৪২

৬০. আল-ফাতহুর রাব্বানী (শারহুল মুসনাদ) ১৭/৩; ইবন মাজা-(২০১৬); সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২৮; নাসাঈ-৬/২১৩; আল মুসতাদরিক-৪/১৫

৬১. উসুদুল গাবা-৫/৪২৫; আবু দাউদ-(২২৮৩); সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২৮

(সা) হাফসাকে এক তালাক দেন। তারপর হাফসার দুই মামা– কুদামা ও উসমান ইবন মাজউন হাফসার সাথে দেখা করেন। হাফসা কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! তিনি আমাকে কোন মন্দ কাজের জন্য তালাক দেননি। এমন সময় নবী (সা) উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন ঃ 'জিবরীল আমাকে বলেছেন, আপনি হাফসাকে ফিরিয়ে নিন। কারণ, তিনি খুব বেশী রোযা পালন করেন এবং বেশী নামায আদায় করেন। জান্নাতে তিনি আপনার স্ত্রী হবেন।'[৬২]

'উমার ইবনুল খাত্তাব বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকতে লাগলেন। লোকমুখে প্রচার হলো, তিনি তাঁর সকল স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন। এটা হিজাবের হুকুমের আগের ঘটনা। আমি আয়িশার কাছে গিয়ে বললাম ঃ আবু বকরের মেয়ে! তুমি রাসূলুল্লাহকে কষ্ট দিয়ে থাক– লোকেরা যে একথা বলাবলি করছে, তাকি তুমি শুনেছো? আয়িশা বললেন ঃ ওহে খাত্তাবের পুত্র, আমার সাথে আপনার সম্পর্ক কি? আপনি অন্যত্র যেতে পারেন।

এরপর আমি হাফসার কাছে গিয়ে বললাম ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমি জেনেছি তিনি তোমাকে ভালোবাসেন না। আমি না থাকলে তিনি অবশ্যই তোমাকে তালাক দিতেন। একথা শুনে হাফসা খুব কাঁদলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) কোথায়? বললো ঃ পাশেই একটি ঘরে আছেন। আমি সেখানে রাসূলুল্লাহকে বসা দেখতে পেলাম। দরজায় দাঁড়ানো তাঁর চাকর রাবাহ। তার মাধ্যমে আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলাম। তিনবারের মাথায় অনুমতি পেলাম। আমি রাসূলুল্লাহকে বললাম ঃ আপনার অনুমতি পেলে আমি হাফসার কল্লা কেটে ফেলবো। রাসূল (সা) আমাকে নরম হওয়ার জন্য হাত দিয়ে ইশারা করলেন। আমি শান্ত হয়ে প্রশ্ন করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি তাদেরকে তালাক দিয়েছেন? বললেন ঃ না। তখন আমি মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলাম ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর স্ত্রীদের তালাক দেননি। তখন নাযিল হয় সূরা আন-নিসার ৮৩তম আয়াতটি।[৬৩] বিভিন্ন সূত্রে ঘটনাটি ভিন্ন ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে।

নবী পরিবারের মনোমালিন্য ও তালাক সম্পর্কিত বর্ণনাগুলির মাধ্যমে হাফসার (রা) অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা এবং শরীয়াতের কিছু বিধান আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন ঃ

১. তালাক দান একটি বৈধ কাজ। যদি সে তালাক হয় কোন প্রয়োজন বা কল্যাণের নিমিত্তে, তবে তা কামালিয়াত বা পূর্ণতার পরিপন্থী নয়।[৬৪]

২. খোদ আল্লাহ্‌পাক হাফসার বেশী রোযা রাখা ও বেশী নামায পড়ার সনদ দিয়ে তাঁর প্রশংসা করেছেন।

---

৬২. তাবাকাত-৮/৮৪- আল হাকেম-৪/১৫; জাহাবী ঃ তারীখ-২/২২১

৬৩. কানযুল উম্মাল-১/২৬৯; তাফসীরে ইবন কাসীর-৩/৫২১; হায়াতুস সাহাবা-২/৬৮৪; আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৬

৬৪. আল-ফাতহুর রাব্বানী-২২/১৩১

৩. জান্নাতেও তিনি নবীর (সা) স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবেন।

৪. তাকে খুশী করার জন্য নবী (সা) দুইটি হালাল বস্তুকে নিজের জন্য হারাম করে নেন।

৫. আয়িশার (রা) বক্তব্যে জানা গেছে, 'তিনি ছিলেন তাঁর পিতার মত।'

৬. দাম্পত্য জীবনে ছোট-খাট মনোমালিন্য স্বাভাবিক ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে নবীর (সা) আদর্শ আমাদের জন্য অনুসরণীয়।

হাফসার (রা) মধ্যে প্রবল দাজ্জাল-ভীতি ছিল। মদীনায় ইবন সাইয়্যাদ নামে এক ব্যক্তি ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) দাজ্জালের যতগুলো চিহ্ন বা আলামত বর্ণনা করেছিলেন, এই লোকটির মধ্যে তার অনেকগুলি ছিল। এমনকি তার সম্পর্কে খোদ রাসূলুল্লাহরও (সা) সন্দেহ ছিল। একদিন হাফসা ও আবদুল্লাহ ইবন উমারের সাথে পথে সেই লোকটির দেখা হয়ে গেল। ইবন উমার তাঁকে কিছু বলতেই সে রেগে এত ফুলে উঠে যে পথই বন্ধ হয়ে যায়। তখন ইবন উমার তাকে মারতে উদ্যত হন। হাফসা ভীত হয়ে পড়েন। তিনি ইবন 'উমারকে বলেন, তার সাথে তোমার সম্পর্ক কি? তুমি কি জাননা রাসূল (সা) বলেছেন ঃ দাজ্জালের ক্রোধই তার বের হবার কারণ হবে?[৬৫]

উম্মুল মুমিনীন হাফসার (রা) সম্মান ও মর্যাদা ছোট একটি প্রবন্ধে বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। এ পৃথিবীতে তিনি সীরাতে রাসূলের সাথে যেমন একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন, তেমনি আখিরাতের জীবনেও একাত্ম থাকবেন বলে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন।

---

৬৫. মুসনাদ-৬/২৮৩

# যায়নাব বিন্‌ত খুযায়মা (রা)

হযরত যায়নাব বিন্‌ত খুযায়মা ইবন আল হারিস আল-হিলালিয়্যা ছিলেন বনু বাক্‌র ইবন হাওয়াযিনের কন্যা। তাঁর উপাধি বা লকব ছিল 'উম্মুল মাসাকীন'। উহুদ যুদ্ধে তাঁর স্বামী শাহাদাত বরণ করলে ঐ বছরই হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে বিয়ে করেন এবং তিনি উম্মুল মুমিনীন-এর অতুলনীয় মর্যাদার অধিকারিণী হন।

হযরত যায়নাব বিন্‌ত খুযায়মার (রা) প্রথম বিয়ে কার সাথে হয় সে ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। বালাজুরী, ইবনুল কালবী এবং নসববিদ আবুল হাসান আলী আল-জুরজানীর মতে, রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ের আগে তার প্রথম স্বামী ছিলেন তুফাইল ইবন আল হারিস। তুফাইল তালাক দিলে তাঁর ভাই উবায়দা ইবন আল-হারিস তাঁকে বিয়ে করেন। বদরে তিনি আহত হয়ে আস-সাফরাতে মারা যান। তখন 'উবায়দার বয়স ৬৪ বছর। তারপর রাসূল (সা) তৃতীয় হিজরীর রমজান মাসে তাঁকে বিয়ে করেন। একথা বালাজুরী ও ইবন সা'দও বলেছেন।[১]

ইউনুস ইবন মুহাম্মাদ, ইবন ইসহাকের সূত্রে বলেছেন, পূর্বে তিনি আল-হুসাইন ইবনুল হারিস ইবন 'আবদিল মুত্তালিবের স্ত্রী ছিলেন, অথবা তাঁর ভাই আত-তুফাইল ইবন আল-হারিসের।[২] ইবন হিশাম বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ের পূর্বে তিনি 'উবায়দা ইবনুল হারিসের স্ত্রী ছিলেন। আর 'উবায়দার পূর্বে তিনি স্ত্রী ছিলেন জাহ্‌ম ইবন 'আমর ইবনুল হারিসের। এই জাহ্‌ম ছিলেন তাঁর চাচাতো ভাই।[৩]

তবে ইবন আবদিল বার ও ইবনুল আসীরের মতে, রাসূলুল্লাহের সাথে বিয়ের অব্যবহিত পূর্বে তিনি আবদুল্লাহ ইবন জাহাশের স্ত্রী ছিলেন।[৪] হিজরী তৃতীয় সনে এই আবদুল্লাহ উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। কাফিররা তাঁর দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বিচ্ছিন্ন করে লাশ বিকৃত করে ফেলে। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু উমাইমা বিন্‌ত 'আবদিল মুত্তালিবের ছেলে। স্বামীর এমন মৃত্যুতে হযরত যায়নাব (রা) দারুণ ব্যথা পান। ইমাম যুহরীও একথা বলেছেন।[৫]

তৃতীয় হিজরীর রমজান মাসের প্রথম দিকে রাসূল (সা) তাঁকে বিয়ে করেন এবং দেনমোহর বাবদ বারো উকিয়া সোনা দান করেন। ইবন হিশাম বলেন, চার শো দিরহাম দেনমোহরের বিনিময়ে রাসূল (সা) তাঁকে বিয়ে করেন।[৬] এ বিয়ের মধ্যস্থতা করেন

---

১. আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৯; আল-ইসাবা-৪/৩১৬, তাবাকাত-৮/৮২

২. ইবন কাসীর : আস-সীরাহ্ আন-নাবাবিয়্যা-২/৫১৮

৩. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬৪৭

৪. উসুদুল গাবা-৫/৪৬৬

৫. আসাহ আস-সিয়ার-৬১৯; আল-ইসতীয়াব-৪/৩১৩

৬. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬৪৭

কুবায়সা ইবন 'আমর আল-হিলালী (রা)।[৭] রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ের পর, কোন কোন বর্ণনা মতে, দুই অথবা তিন মাস জীবিত ছিলেন।[৮] বালাজুরী বলেন, আট মাস রাসূলুল্লাহর (সা) ঘর করার পর ৪র্থ হিজরীর রবী'উস সানী মাসের শেষ দিকে মারা যান।[৯] এ মতটিই সঠিক বলে মনে হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল তিরিশ বছর।[১০] রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীদের মধ্যে তিনিই তাঁর জীবদ্দশায় হযরত খাদীজার পর প্রথম জান্নাতবাসিনী হন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং মদীনার বাকী গোরস্তানে দাফন করেন।[১১]

ইবন হাজার (র) বলেন, হযরত হাফসার (রা) পরে রাসূল (সা) যায়নাব বিন্‌ত খুযায়মাকে (রা) ঘরে আনেন। হযরত উম্মু সালামার (রা) একটি বর্ণনায় এসেছে, যায়নাব বিন্‌ত খুযায়মার মৃত্যুর পর রাসূল (সা) তাঁকে বিয়ে করে তাঁরই ঘরে এনে উঠান।[১২]

কেউ কেউ বলেছেন, রাসূলুল্লাহর (সা) এ বাণী

أَسْرَعُكُنَّ لُحُوْقاً بِىْ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا -

(তোমাদের মধ্যে যার হাত দীর্ঘ সেই খুব তাড়াতাড়ি আমার মৃত্যুর পর আমার সাথে মিলিত হবে।) —দ্বারা যায়নাব বিন্‌ত খুযায়মার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 'দীর্ঘ হাত' কথাটি রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ দানশীলতা। যেহেতু হযরত যায়নাব, খুব বেশী দান-খায়রাত করতেন, তাই 'লম্বা হাত' বলে তাঁকে বুঝানো হয়েছে।

কিন্তু তাঁদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। মূলত এ হাদীস দ্বারা যায়নাব বিন্‌ত জাহাশকেই বুঝানো হয়েছে। তাঁর মৃত্যু হয় রাসূলুল্লাহর (স) ওফাতের পরে সকল আযওয়াজে মুতাহারাতের আগে। আর মুহাদ্দিসগণ তো এ ব্যাপারে একমত যে, যায়নাব বিন্‌ত খুযায়মা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় ইনতিকাল করেন।[১৩]

ইবন হিশাম বলেন ঃ[১৪]

وكانت تسمىٰ أمُّ المساكين ، لرحمتها إيّاهم ورقّتها عليهم -

–'গরীব-মিসকীনদের প্রতি তাঁর দয়া-মমতা ও সহমর্মিতার কারণে, তাঁকে 'উম্মুল মাসাকীন' বা 'মিসকীনদের মা' বলা হতো।'

---

৭. প্রাগুক্ত
৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১৮
৯. আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৯
১০. তাবাকাত-৮/৮২; আল-ইসাবা-৪/৩১৬
১১. তাবাকাত-৮/৮২
১২. আল-ইসাবা-৪/৩১৬
১৩. তাবাকাত-৮/৮২; আল-ইসাবা-৪/৩১৬
১৪. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬৪৭

হাফেজ ইবন হাজার (র) বলেন ঃ[১৫]

وكنت يقال له أمُّ المساكين لأنها كانت تطعمهم و تصدق عليهم۔

–'তিনি গরীব-মিসকীনদের আহার করাতেন এবং তাদেরকে দান-খায়রাত করতেন, এ কারণে তাঁকে 'উম্মুল মাসাকীন' বলা হতো।'

ইবন আবদিল বার ও বালাজুরী বলেন, জাহিলী যুগেই তাঁকে এ নামে ডাকা হতো।[১৬]

হযরত যায়নাব বিন্ত খুযায়মা (রা) সম্পর্কে হাদীস, সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে খুব বেশী তথ্য পাওয়া যায়না। সম্ভবত এর কারণ তাঁর অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ।

১৫. আল-ইসাবা-৪/৩১৫

১৬. আল-ইসতী'য়াব–৪/৩১৩; আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৯

# উম্মু সালামা বিন্ত আবী উমাইয়্যা (রা)

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মু সালামার (রা) আসল নাম 'হিন্দা'। 'উম্মু সালামা' ডাকনাম এবং এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধ।[১] অনেকে তাঁর নাম 'রামলা' বলেছেন, কিন্তু মুহাদ্দিসগণ একে ভিত্তিহীন মনে করেছেন।[২] মূলত 'রামলা' উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মু হাবীবার (রা) নাম। উম্মু সালামার (রা) পিতা আবু উমাইয়্যা ইবন আল-মুগীরা ইবন আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-মাখযুম। আবু উমাইয়্যার আসল নাম 'হুজাইফা'। তবে তিনি 'আবু উমাইয়্যা' নামেই খ্যাত।[৩] তাঁর উপাধি ছিল 'যাদুর রাকব'। 'যাদুর রাকব' অর্থ কাফেলার পাথেয়। মক্কার দানশীল ও অতিথি সেবকদের মধ্যে তাঁর এক বিশেষ স্থান ছিল। তিনি যখন কোন কাফেলার সাথে কোথাও বের হতেন তখন গোটা কাফেলার খাওয়া-দাওয়াসহ যাবতীয় দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতেন। তাঁর এমন উদারতা ও মহানুভবতায় তুষ্ট হয়ে সমকালীন আরববাসী তাঁকে এ উপাধি দান করে।[৪] উল্লেখ্য যে, সেকালে কুরাইশদের মধ্যে 'যাদুর রাক্‌ব' উপাধি ধারণকারী ব্যক্তি ছিলেন মোট তিনজন। আবু উমাইয়্যা ইবন আল-মুগীরা, আল-আসওয়াদ ইবন আবদুল মুত্তালিব, মুসাফির ইবন আবী আমর।[৫]

মক্কার আবু জাহলের পিতা হিশাম, 'উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) নানা হাশিম, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের (রা) পিতা ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা, আবু হুজাইফা মাখযুমী, 'আয়্যাশ ইবন রাবী'আর পিতা আবু রাবী'আ, ফাকিহ্‌া, হিন্দা বিন্ত উতবার প্রথম স্বামী, হাফস, আবদ্ শাম্‌স– এঁরা সবাই ছিলেন মুগীরা আল-মাখযুমীর ছেলে, আবু উমাইয়্যার ভাই এবং হযরত উম্মু সালামার (রা) চাচা। আর 'আমর ইবনুল 'আসের (রা) মা উম্মু হারমালা বিন্ত হিশাম, 'উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) মা খানতামা বিন্ত হাশিম– উভয়ে ছিলেন উম্মু সালামার (রা) চাচাতো বোন।খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ, ওয়ালীদ ইবন ওয়ালীদ, 'আয়্যাশ ইবন আবী রাবী'আ, সালামা ইবন হিশাম, আবু জাহল ইবন হিশাম, খালিদ ইবন হিশাম, হারিস ইবন হিশাম– এঁরা সবাই ছিলেন তাঁর চাচাতো ভাই।[৬]

হযরত উম্মু সালামার (রা) মাতার নাম 'আতিকা বিন্ত 'আমির ইবন রাবী'আ ইবন মালিক আল-কিনানিয়্যা।[৭] কোন কোন গ্রন্থকার মনে করেছেন উম্মু সালামার (রা) মা 'আতিকা' ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা। সুতরাং উম্মু সালামা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা)

---

১. আনসাবুল আশরাফ–১/২০৭, ৪২৯,
২. আল-ইসাবা-৪/৪৫৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৪/২০২,
৩. আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৯
৪. আল-ইসাবা-৪/৪৫৮
৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, টীকা নং-২, ২/২০২,
৬. আসাহ আস-সিয়ার-৬২০,৬২১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২০২
৭. আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৯

ফুফাতো বোন।[৮] আসলে উম্মু সালামার (রা) পিতার সাথে এই আতিকার বিয়ে হয়েছিল এবং তাঁর গর্ভে আবদুল্লাহ, উম্মু যুহাইর ও কারীবা নামের তিনটি সন্তান জন্মলাভ করে। কিন্তু এ 'আতিকা উম্মু সালামার (রা) মা নন। তাঁর মা আমির ইবন রাবী'আর কন্যা আতিকা।[৯]

## প্রথম বিয়ে

হযরত উম্মু সালামার (রা) প্রথম বিয়ে হয় আবদুল্লাহ ইবন আবদিল আসাদ আল-মাখযুমীর সাথে। যার ডাকনাম আবু সালামা এবং এ নামেই প্রসিদ্ধ। আবু সালামার (রা) পিতামহ হিলাল এবং উম্মু সালামার (রা) পিতামহ মুগীরা দুই ভাই। আবু সালামার পিতা আবদুল্লাহ ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফা। রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু বুর্‌রাকে তিনি বিয়ে করেন। তাঁরই ছেলে আবু সালামা (রা)। হযরত আবু তালিব হযরত হামযা (রা) ও হযরত 'আব্বাস (রা) আবু সালামার সম্মানিত মামা।[১০] অন্য দিকে আবু সালামা ছিলেন রাসূলুল্লাহর দুধভাই।[১১]

তাঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ছিলেন ঐ সকল লোকদের অন্তর্গত যাঁদেরকে বলা হয় 'কাদীমুল ইসলাম' বা প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারী। ইসলামের সূচনা পর্বে যখন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে কি করবে না– এমন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছিল এবং যখন সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া ছিল একটি দুরুহ কাজ তখন এই দম্পতি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।[১২] ইবনুল আসীর লিখেছেন, আবু সালামা ইবন আবদুল আসাদ, আবু উবাইদা ইবনুল হারিস, আরকাম ইবন আবী আরকাম, উসমান ইবন মাজউন– এঁরা সকলে একসাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। এঁদের পরে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ, সা'ঈদ ইবন যায়িদ ও অন্যরা মুসলিম হন।[১৩]

ইসলাম গ্রহণের পর বনু মাখযুম হযরত আবু সালামার (রা) উপর নির্দয়ভাবে অত্যাচার উৎপীড়ন চালাতে থাকলে এক পর্যায়ে তিনি পালিয়ে হযরত আবু তালিবের আশ্রয়ে চলে আসেন। বনু মাখযুমের লোকেরা বললো ঃ আবু তালিব! এতদিন আপনি আপনার ভাতিজার সাহায্য সমর্থন করছিলেন, এখন আপনার আশ্রয়ে থাকা আমাদের ভাইয়ের ছেলেকেও আমাদের হাতে সমর্পণ করছেন না। আবু তালিব বললেন ঃ যে বিপদ থেকে আমার ভাইয়ের ছেলেকে রক্ষা করছি, সেই একই বিপদ থেকে আমার বোনের ছেলেকেও রক্ষা করছি। হিজরাতের হুকুম হলে তিনি হাবশায় হিজরাত করেন। ইবন ইসহাক বলেন, তিনিই সর্বপ্রথম সস্ত্রীক হাবশায় হিজরাত করেন।[১৪]

---

৮. প্রাগুক্ত-১/৮৮
৯. আসাহ্ আস-সিয়ার-৬২১; প্রাগুক্ত-১/৪২৯
১০. প্রাগুক্ত,
১১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২০২; আল-ইসাবা-৪/৪৫৮
১২. আল-ইসাবা-৪/৪৫৮
১৩. আসাহ্ আস-সিয়ার-৬২১
১৪. প্রাগুক্ত-৬২২

## হিজরাত

ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে যেমন দু'জন একসাথে সিদ্ধান্ত নেন তেমনি হিজরাতের ব্যাপারেও তাঁরা একসাথে ও একমতে ছিলেন। পর পর দুইবার তাঁরা হাবশায় হিজরাত করেন।[১৫] সেখানে কিছু দিন অবস্থান করার পর তাঁরা আবার মক্কায় ফিরে আসেন। তারপর আবার মদীনার দিকে যাত্রা করেন। মদীনায় হিজরাতের সময় হ্যরত উম্মু সালামা (রা) যে হৃদয় বিদারক ঘটনার সম্মুখীন হন তা তাঁরই ভাষায় ইবনুল আসীর তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

'আবু সালামা যখন মদীনায় চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন তাঁর কাছে মাত্র একটি উট ছিল। তিনি সেই উটের উপর আমাকে ও তাঁর ছেলে সালামাকে উঠান এবং নিজে উটের লাগাম ধরে চলতে আরম্ভ করেন। আমার পিতৃকূল বনু মুগীরার লোকেরা আবু সালামাকে বাধা দিয়ে বললো, আমরা আমাদের মেয়েকে এমন খারাপ অবস্থায় যেতে দেব না। আবু সালামার হাত থেকে তারা উটের লাগাম ছিনিয়ে নিল এবং আমাকে তারা সংগে করে নিয়ে চললো। ইতোমধ্যে আমার স্বামীর খান্দান বনু 'আবদিল আসাদের লোকেরা এসে পড়ে এবং তারা আমার সন্তান সালামাকে তাদের দখলে নিয়ে নেয়। তারা বনু মুগীরাকে বললো, তোমরা যদি তোমাদের মেয়েকে তার স্বামীর সাথে যেতে না দাও তাহলে আমরা আমাদের সন্তানকে তোমাদের মেয়ের কাছে থাকতে দেব না। এভাবে আমি, আমার স্বামী ও আমার সন্তান–তিনজন তিনদিকে ছিটকে পড়লাম। স্বামী-সন্তানের বিচ্ছেদ ব্যথায় আমার অবস্থা খুবই কাহিল হয়ে পড়লো। যেহেতু হিজরাতের নির্দেশ এসে গিয়েছিল, তাই আবু সালামা মদীনায় পৌঁছে যান। আর এদিকে মক্কায় আমি একাকিনী। প্রতিদিন সকালে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তাম এবং আবতাহ্ উপত্যকায় একটি টিলার উপর বসে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাঁদতাম। এভাবে প্রায় সাত/ আটদিন চলে যায়।

একদিন আমাদের হিতাকাঙ্খী বনু মুগীরার এক ব্যক্তি আমার এ দুরবস্থা দেখে ভীষণ কষ্ট পেলেন। তিনি বনু মুগীরার লোকদের একত্র করে তাদের সম্বোধন করে বললেন ঃ 'আপনারা এ অসহায় মেয়েটিকে মুক্তি দিচ্ছেন না কেন? তাকে কেন তার স্বামী-সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন? তাকে মুক্তি দিন এবং স্বামী-সন্তানের সাথে মিলিত হতে দিন।' তিনি কথাগুলি এমন আবেগভরা শব্দে প্রকাশ করেন যে, তাতে আমার পিতৃগোত্রের লোকদের অন্তরে দয়া ও করুণার সঞ্চার হয়। তাঁরা আমাকে আমার স্বামীর কাছে যাওয়ার অনুমতি দেন।

এ খবর শুনে বনু আবদুল আসাদও আমার সন্তানটিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। এখন আমি উটের উপর হাওদায় বসলাম এবং সালামাকে কোলে করে সওয়ার হয়ে গেলাম। মক্কা থেকে একাকিনী বের হয়ে তান'ঈম পৌঁছলাম। সেখানে কা'বার চাবি রক্ষক

---

১৬. হায়াতুস সাহাবা-১/৩৪৮; সিফাতুস সাফওয়া-২/২১

'উসমান ইবন তালহা ইবন আবী তালহার সাথে দেখা হলো। তিনি আমার ইচ্ছার কথা জেনে, আমার সাথে আর কেউ আছে কিনা তা জানতে চাইলেন। বললাম, না, আর কেউ নেই। শুধু আমি ও আমার এ শিশু সন্তান। একথা শুনে তিনি আমার উটের লাগাম মুট করে ধরে টানতে টানতে উটের আগে আগে চলতে লাগলেন।

আল্লাহ জানেন, আমি তালহার চেয়ে বেশী ভালো ও ভদ্র মানুষ আরবে আর কাউকে পাইনি। যখন আমরা কোন মানযিলে পৌঁছতাম, এবং আমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন পড়তো, তিনি উট বসিয়ে দিয়ে দূরে কোন গাছের আড়ালে চলে যেতেন। আবার চলার সময় হলে, তিনি উট প্রস্তুত করে আমার কাছে এসে বলতেন, 'উঠে বস।' আমি উটের পিঠে আরাম করে বসার পর তিনি লাগাম ধরে আগে আগে চলতে থাকতেন। গোটা ভ্রমণটাই এই নিয়মে হয়েছিল। যখন আমরা মদীনার বনু আমর ইবন আওফের পল্লী কুবায় পৌঁছলাম, উসমান ইবন তালহা আমাকে বললেন, তোমার স্বামী এই পল্লীতে আছেন। আবু সালামা সেখানে অবস্থান করছিলেন। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে মহল্লার মধ্যে ঢুকে গেলাম এবং আবু সালামার দেখা পেয়ে গেলাম। এভাবে উসমান ইবন তালহা আমাকে আবু সালামার সন্ধান দিয়ে আবার মক্কার দিকে যাত্রা করেন।[১৬]

'উসমান ইবন তালহার এই সহানুভূতি ও সহমর্মিতার কথা হযরত উম্মু সালামা সারা জীবন মনে রেখেছেন। তিনি প্রায়ই বলতেন ঃ

مَا رَأَيْتُ صَاحِبًا قَطُّ أَكْرَمُ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ -

– 'আমি 'উসমান ইবন তালহার চেয়ে বেশী ভদ্র সঙ্গী আর কখনও দেখিনি।'

এই পরীক্ষাপর্বে চারিদিক থেকে মুসলমানরা নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছিল এবং তাদের দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার কোন অন্ত ছিল না। হিজরাতের সময় উম্মু সালামাকে যে দুর্ভোগ পোহাতে হয় এ তারই কিছু অংশমাত্র। তাঁর নিজের অন্তরেও এ উপলব্ধি ছিল। তাই পরবর্তীকালে হিজরাতের প্রসঙ্গ উঠলেই তিনি একটু গর্বের সঙ্গে বলতেন ঃ 'ইসলামের জন্যে আবু সালামার পরিবারকে যে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে, আহলে বাইতের আর কেউ তেমন পোহায়েছে কিনা তা আমার জানা নেই।'[১৭]

অন্যান্য গুণে হযরত উম্মু সালামা যেমন রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য বিবিগণের উপর প্রাধান্যযোগ্য ছিলেন, তেমনিভাবে এ বৈশিষ্ট্যও লাভ করেন যে, তিনিই প্রথম পর্দানশীল মহিলা যিনি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করেন।[১৮]

হযরত উম্মু সালামা (রা) প্রখর আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্না মহিলা ছিলেন। তাঁর পিতা আবু উমাইয়্যা ছিলেন কুরাইশদের একজন খ্যাতিমান ও মর্যাদাবান ব্যক্তি। উম্মু সালামা (রা)

---

১৬. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৩/১৬৯; উসুদুল গাবা-৫/৫৮৮; হায়াতুস সাহাবা-১/৩৫৮,৩৫৯

১৭. প্রাগুক্ত

১৮. উসুদুল গাবা-৫/৫৮৯

যখন কুবায় পৌছেন তখন লোকেরা তাঁর পরিচয় জানতে চাইতো। তিনি পিতার নাম বললে কেউ বিশ্বাস করতে চাইতো না। কারণ, সে যুগেও তাঁর মত কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা একাকী এভাবে ভ্রমণ থেকে বিরত থাকতো। উম্মু সালামার ছিল ইসলামের প্রতি প্রচণ্ড দরদ এবং আল্লাহর নির্দেশ পালন তিনি অপরিহার্য বলে বিশ্বাস করতেন। এ কারণে তিনি কারও কোন কথায় কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেন না। সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করতেন। হজ্জের মওসুম এসে গেল। যখন কিছু লোক কুবা থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওয়ানা দিল, তিনি তাদেরকে মক্কায় পিতার ঠিকানা দিলেন। তখন সবাই তাঁর শরাফতী ও খান্দানী আভিজাত্য বিশ্বাস করলো। সবার অন্তরে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার আসন লাভ করলেন।[১৯]

হিজরাতের দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনার দগদগে স্মৃতি তখনও তাঁদের মন থেকে মুছে যায়নি এবং স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানসহ এক সাথে বসবাসের সুযোগও বেশী দিন হয়নি, এরই মধ্যে উহুদ যুদ্ধের ডাক এসে যায় এবং হযরত আবু সালামা (রা) সেই ডাকে সাড়া দিয়ে যুদ্ধে যোগদান করেন। যুদ্ধে একই নামের প্রতিপক্ষের অপর এক ব্যক্তি আবু সালামা হাশমীর নিক্ষিপ্ত একটি তীরে তাঁর বাহু আহত হয় এবং একমাস চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে যান।[২০] এর কিছুদিন পরে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে 'কাতান' অভিযানে পাঠান এবং ২৯ দিন সেখানে অতিবাহিত হয়। হিজরী ৪র্থ সনের সফর মাসের আট অথবা নয় তারিখ মদীনায় ফিরে আসেন। তখন তাঁর সেই পুরানো ক্ষত আবার তাজা হয়ে জীবন আশঙ্কা দেখা দেয়। সেই বছর জামাদিউস সানী মাসের নয় তারিখ তিনি ইনতিকাল করেন।[২১] হযরত উম্মু সালামা (রা) স্বামীর মৃত্যুর খবর রাসূলুল্লাহকে (সা) দিতে আসেন। রাসূল (সা) উম্মু সালামার গৃহে যান। উম্মু সালামা তখন শোকে বিহ্বল। তিনি বারবার শুধু বলছিলেন ঃ 'হায়, বিদেশ-বিভূঁয়ে এ তাঁর কেমন মৃত্যু হলো!' রাসূল (সা) তাঁকে ধৈর্য ধরার উপদেশ দিয়ে বলেন, তোমরা তাঁর মাগফিরাত কামনা করে দু'আ কর। আর বল–

اَللّٰهُمَّ اَخْلِفْنِىْ خَيْرًا مِنْهَا ـ

'হে আল্লাহ, আমাকে তাঁর চেয়ে ভালো কোন বিকল্প দান করুন।'

তারপর রাসূল (সা) আবু সালামার লাশের কাছে যান এবং অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাঁর জানাযার নামায আদায় করেন। সেই নামাযে তিনি নয়টি তাকবীর বলেন। লোকেরা মনে করেছিলেন হয়তো ভুল হয়েছে। তাই তাঁরা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ। আপনার ভুল হয়নি তো? বললেন ঃ এ ব্যক্তি হাজার তাকবীর লাভের যোগ ছিলেন। মৃত্যুর সময় আবু সালামার চোখ দুইটি খোলা ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের দুইটি পবিত্র হাত দিয়ে চোখ দুইটি বন্ধ করে দেন এবং তাঁর মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করেন।[২২]

১৯. মুসনাদে ইমাম আহমাদ-৬/৩০৭; আল-ইসাবা-৪/৪৫৯; তাবাকাত-৮/৯৩
২০. তাবাকাত-৮/৮৮
২১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২০৩; আল-ইসাবা-৪/৪৫৮ তাবাকাত-৮/৮৭
২২. মুসনাদে আহমাদ-৬/২৮৯; ২৯১, ৩০৬; মুসলিম : কিতাবুল জানায়িয (৯১৯); আবু দাউদ : আল-জানায়িয (৩১১৫); তিরমিযী : আল-জানায়িয (৯৭৭)

## দ্বিতীয় বিয়ে

হযরত আবু সালামার (রা) যখন ইনতিকাল হয় তখন হযরত উম্মু সালামা সন্তানসম্ভবা। সন্তান প্রসবের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর একাকীত্ব ও দুঃখ-বেদনার কথা চিন্তা করে তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। হযরত উম্মু সালামা (রা) এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।[২৩]

একটি বর্ণনায় একথাও এসেছে যে, হযরত 'উমারও (রা) তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। কিন্তু 'আল-ইসাবা' গ্রন্থকারের ধারণা যে, 'উমারের (রা) মাধ্যমে হযরত রাসূলে কারীম (সা) বিয়ের পয়গাম পাঠান। হযরত আবু সালামার আত্মত্যাগ এবং হযরত উম্মু সালামার (রা) অসহায় অবস্থা ও একাকীত্ব হযরত রাসূলে কারীমের অনুভূতিকে তীব্রভাবে নাড়া দিয়ে থাকবে। তাই হযরত আবু বকরের (রা) প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর আল্লাহ পাকের নির্দেশে রাসূল (সা) হযরত 'উমারের (রা) মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠান। হযরত উম্মু সালামা (রা) কতকগুলি কারণ উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহর (সা) প্রস্তাব গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) উম্মু সালামার (রা) সকল শর্ত মেনে নেন। তখন উম্মু সালামা (রা) রাজি হয়ে যান। উম্মু সালামা রাসূলুল্লাহর (সা) প্রস্তাব কবুল করতে অপারগতার যে কারণগুলি দেখান তা এরকম ঃ (ক) আমি ভীষণ আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মহিলা, (খ) আমার কয়েকটি সন্তান রয়েছে, (গ) আমি একজন বয়স্ক মহিলা, (ঘ) আমার কোন ওলী নেই। জবাবে রাসূল (সা) বলেন ঃ তোমার সন্তানদের দায়িত্ব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর। তোমার প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ আল্লাহ দূর করে দেবেন। ওলী, তা তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে রাজি হবেনা, আর তুমি বয়স্কা, তা তোমার চেয়ে আমার বয়স বেশী।

তারপর তিনি ছেলে 'উমারকে বলেন ঃ 'যাও, রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আমার বিয়ের ব্যবস্থা কর।'[২৪]

হিজরী ৪র্থ সনের শাওয়াল মাসের শেষের দিকে হযরত রাসূলে পাকের (সা) সাথে বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়। স্বামী আবু সালামার (রা) মৃত্যুতে তিনি যে দুঃখ-বেদনার শিকার হন, এভাবে তা দূর হয় এবং তাঁর চেয়ে ভালো বিকল্প লাভ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দুঃখকে অনন্তকালের জন্য আনন্দে রূপান্তর করে দেন।

আহমাদ ইবন ইসহাক হাদরামী, যিয়াদ ইবন মারইয়ামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। একবার উম্মু সালামা স্বামী আবু সালামাকে বলেন ঃ আমি জেনেছি, যদি কোন মহিলার স্বামী মৃত্যুর পর জান্নাতে যায়, আর তার স্ত্রী-দ্বিতীয় বিয়ে না করে তাহলে আল্লাহ সে স্ত্রীকেও স্বামীর সাথে জান্নাতে স্থান দান করবেন। এই অবস্থা পুরুষের জন্যেও যদি হয়, তাহলে আসুন আমরা অঙ্গীকার করি, আপনি আমার পরে আর বিয়ে করবেন না, আর আমিও

---

২৩. তাবাকাত-৮/৯০

২৪. প্রাগুক্ত-৮/৯০, ৯১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২০৪, ২০৫; আল-ইসাবা-৪/৪৫৯; সিফাতুস সাফওয়া-২/২১

আপনার পরে আর বিয়ে করবো না। আবু সালামা বলেন ঃ তুমি কি আমার কথা মানবে? উম্মু সালামা বললেন, আপনার কথা মানা ছাড়া আমার আনন্দ আর কোথায়? আবু সালামা বললেন ঃ আমি যদি তোমার আগে মারা যাই, তুমি আবার বিয়ে করবে। তারপর আবু সালামা দু'আ করেন ঃ 'হে আল্লাহ, আমার পরে উম্মু সালামাকে আমার চেয়েও ভালো পাত্র দান করুন।' হযরত উম্মু সালামা (রা) বলেন ঃ যখন আবু সালামা মারা গেলেন, তখন আমি মনে মনে বলতাম, আবু সালামার চেয়ে ভালো আর কে হবে? এর কিছুদিন পরেই রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আমার বিয়ে হয়ে যায়।[২৫]

উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা এই দম্পতির মধ্যে এক মধুর সম্পর্কের কথা যেমন জানা যায়, তেমনি একথাও জানা যায় যে, সেকালে ইসলামের সঠিক ও পরিচ্ছন্ন শিক্ষার প্রভাব কত গভীর ছিল। যার ফলে একজন স্বামী-তাঁর সকল আবেগ দমন করে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীকে তার অবর্তমানে দ্বিতীয় বিয়ের উপদেশ দিতে সক্ষম হয়েছেন।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) একজোড়া যাঁতা, দুইটি মশক, এবং চামড়ার কভার ও খোরমার ছালে ভরা একটি বালিশ উম্মু সালামাকে দেন। এ সকল জিনিসই তিনি অন্য বিগিণকেও দিয়েছিলেন।[২৬]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) উম্মু সালামাকে বিয়ে করার পর তাঁর রূপ ও সৌন্দর্যের কথা হযরত আয়িশার (রা) কানে গেলে তাঁর মনের মধ্যে একটু ঈর্ষার সৃষ্টি হয়। তিনি উম্মু সালামাকে দেখতে আসেন। গভীরভাবে দেখার পর তিনি বুঝতে পারলেন, উম্মু সালামার রূপের কথা যতটুকু বলা হয়, তিনি তার চেয়েও বেশী সুন্দরী। তিনি তাঁর রূপের কথা হযরত হাফসাকে (রা) বললেন। হাফসা (রা) 'আয়িশাকে (রা) বুঝালেন যে, লোকে একটু বাড়িয়ে বলছে। তারপর হযরত হাফসা (রা) তাঁকে দেখেন এবং একই কথা বলেন। হযরত আয়িশা (রা) আবার তীক্ষ্ণভাবে উম্মু সালামাকে দেখেন এবং হাফসার কথাই ঠিক বলে বিশ্বাস করেন।[২৭] যাই-হোক, এ বর্ণনা এবং এ ধরনের আরও বহু বর্ণনা দ্বারা হযরত উম্মু সালামার (রা) সুদর্শন চেহারার প্রমাণ পাওয়া যায়।

হযরত উম্মু সালামা ছিলেন একজন লজ্জাবতী ও প্রখর আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্না মহিলা। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ের পর প্রথম দিকে তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, যখনই রাসূল (সা) কাছে আসতেন, তিনি দুগ্ধপোষ্য মেয়ে যায়নাবকে দুধ পান করাতে শুরু করতেন। এ অবস্থা দেখে রাসূল (সা) ফিরে যেতেন। হযরত 'আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) ছিলেন তাঁর দুধভাই। তিনি একথা শুনে ক্ষেপে যান এবং মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে যান। এরপর রাসূল (সা) উম্মু সালামার ঘরে আসেন এবং এদিক ওদিক তাকাতে থাকেন। শিশু মেয়েকে না দেখে জিজ্ঞেস করেন ঃ যায়নাব কোথায়? তাকে কি করেছো? তিনি

২৫. তাবাকাত-৮/৮৮; মুসনাদ-৬/২৯৫; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২০৩
২৬. তাবাকাত-৮/৯০; আন-নাসাঈ : কিতাবুন নিকাহ : মুসনাদ-৬/২৯৫, ৩১৩-৩১৭; সিফাতুস সাফয়া-২/২১
২৭. তাবাকাত-৮/৯৪; হায়াতুস সাহাবা-২/৬৩৯

জবাব দিলেন ঃ আম্মার এসে নিয়ে গেছে। সেদিন থেকে রাসূল (সা) অবস্থান করতে থাকেন।[২৮]

ধীরে ধীরে এ অবস্থা দূর হয়ে যায় এবং অন্য বিবিগণ যেভাবে ছিলেন সেভাবে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। পরে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সম্পর্ক এত গভীর হয় যে, হযরত 'আয়িশার (রা) পরেই তাঁর স্থান নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাথে হযরত উম্মু সালামার (রা) বিয়ের ঘটনাসমূহের মধ্যে এ ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, যেদিন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) ঘরে আসেন সেদিনই নিজহাতে খাবার তৈরী করেন। হযরত যায়নাব বিন্‌ত খুযায়মা (রা) অল্প কিছুদিন আগে ইনতিকাল করেছিলেন। উম্মু সালামাকে তাঁরই ঘরে এনে উঠানো হয়। ঘর-গৃহস্থালীর জিনিসপত্র আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। হযরত উম্মু সালামা (রা) একটি কলস থেকে কিছু যব বের করেন এবং অন্য একটি পাত্র থেকে কিছু চর্বি বের করে একটি হাঁড়িতে চড়িয়ে দেন। তারপর যবগুলি যাঁতায় পিষে চর্বিতে মিশিয়ে এক প্রকার খাবার তৈরী করেন। তাই ছিল হযরত রাসূলে কারীম (সা) ও তাঁর জীবন সঙ্গিনীর বাসর রাতের খাদ্য।[২৯]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) বিবিগণের দুইটি দল ছিল। একদলে ছিলেন হযরত আয়িশা (রা), হযরত হাফসা (রা), হযরত সাফিয়্যা (রা) ও হযরত সাওদা (রা)। আর অন্য দলে ছিলেন হযরত উম্মু সালামা (রা) ও অন্যরা। আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সর্বাধিক প্রিয় স্ত্রী। লোকেরা তা জানতো। এ কারণে রাসূল (সা) যে দিন 'আয়িশার (রা) ঘরে থাকতেন, সেদিন তাঁরা হাদিয়া তোহফা পাঠাতো। উম্মু সালামার (রা) দলের বিবিগণ বললেন, আমরাও আয়িশার মত হাদিয়া তোহফা পেতে চাই। সুতরাং রাসূল (সা) যার ঘরেই থাকুন না কেন, লোকদের সেখানেই যা কিছু পাঠাবার পাঠানো উচিত। তাঁরা তাঁদের দাবীর কথা রাসূলুল্লাহকে (সা) জানানোর জন্য উম্মু সালামাকে মুখপাত্র মনোনীত করেন।

হযরত উম্মু সালামা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) কথাটি পর পর দুইবার বললেন। তিনি উপেক্ষা করলেন। তৃতীয়বারের মাথায় বললেন ঃ আয়িশার ব্যাপারে তোমরা আমাকে কষ্ট দিও না। কারণ, সে ছাড়া তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার লেপের মধ্যে আমার নিকট ওহী এসেছে।

উম্মু সালামা (রা) তখন বললেন ঃ

أَتُوْبُ إِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ أَذَاكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ -

—ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনাকে কষ্টদানের জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা করছি।

রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের অভাব ও দারিদ্র্যকে মেনে নিয়েই সন্তুষ্টচিত্তে তাঁর সাথে জীবন

২৮. মুসনাদ-৬/৩১৩, ৩১৪; তাবাকাত-৮/৯০
২৯. তাবাকাত-৮/৯৩; কানযুল উম্মাল-৭/১১৭

কাটিয়েছেন। একবার হযরত আল-ইরবাদ, জু'আল ইবন সুরাকা ও আবদুল্লাহ ইবন মুগাফ্‌ফিল (রা) কোন এক সফর থেকে ফিরে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আসলেন। তাঁরা ছিলেন অভুক্ত। রাসূল (সা) তাদেরকে কিছু আহার করানোর ইচ্ছায় উম্মু সালামার (রা) নিকট গেলেন এবং কিছু খাবার চাইলেন। কিন্তু তাঁর ঘরে খাবার মত কিছুই পেলেন না।[৩০]

আল-মুত্তালিব ইবন আবদুল্লাহ বলেন ঃ আরবের বিধবা উম্মু সালামা সন্ধ্যার প্রথম পর্বে সাইয়্যেদুল মুসলিমীনের ঘরে বউ হিসেবে আসেন এবং রাতের শেষ পর্বে যব পিষতে লেগে যান।[৩১]

হিজরী ৫ম সনে মদীনার ইহুদী গোত্র বনু কুরায়জার অবরোধের এক পর্যায়ে তাদের সাথে আলোচনার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) আবু লুবাবাকে (রা) পাঠান। তাদের সাথে আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি হাতের ইঙ্গিতে তাদেরকে একথা বুঝিয়ে দেন যে, তোমাদের হত্যা করা হবে। কিন্তু এটাকে রাসূলুল্লাহর (সা) গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে মনে করে ভীষণ অনুতপ্ত হন। তারপর তিনি মসজিদের একটি খুঁটিতে নিজেকে বেঁধে ফেলেন। অনেকদিন পর্যন্ত তিনি নিজেকে এ অবস্থায় রাখেন, অতঃপর তাঁর তাওবা কবুল হয়। সেদিন রাসূল (সা) উম্মু সালামার (রা) ঘরে ছিলেন।

সকালে রাসূল (সা) উম্মু সালামার (রা) ঘরে ঘুম থেকে জেগে মৃদু হাসতে থাকেন। হযরত উম্মু সালামা (রা) তা দেখে বলেন ঃ 'আল্লাহ আপনাকে সর্বদা হাসিতে রাখুন। এ সময় হাসির কারণ কি?' বললেন ঃ আবু লুবাবার তাওবা কবুল হয়েছে। হযরত উম্মু সালামা তাঁকে এ খোশখবরটি শোনাবার অনুমতি চাইলেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ হাঁ, চাইলে শোনাতে পার। উম্মু সালামার ঘরটি ছিল মসজিদে নববীর এত নিকটে যে, ঘর থেকে আওয়ায দিলে মসজিদ থেকে শোনা যেত। অনুমতি পেয়ে তিনি হুজরার দরজায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে ওঠেন ঃ আবু লুবাবা! তোমাকে মুবারকবাদ। তোমার তাওবা কবুল হয়েছে। এ আওয়ায মানুষের কানে যেতেই গোটা মদীনা যেন আনন্দ উত্তেজনায় ফেটে পড়ে।[৩২]

এটা হিজাবের হুকুম নাযিলের আগের ঘটনা।

সেই বছর হিজাবের (পর্দা) আয়াত নাযিল হয়। এ আয়াত নাযিলের আগ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর (সা)'বিবিগণ কিছু কিছু দূরের আত্মীয়-স্বজনদের সামনে যেতেন। এখন কিছু বিশেষ আত্মীয় ও আপনজন ছাড়া সবার থেকে পর্দা করার নির্দেশ হলো। হযরত ইবন উম্মে মাকতুম ছিলেন কুরাইশ বংশের একজন অতিমর্যাদাবান অন্ধ সাহাবী। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) মু'য়াজ্জিনও ছিলেন। যেহেতু তিনি অন্ধ ছিলেন, এ কারণে রাসূলুল্লাহর (সা) অন্দর মহলেও তাঁর যাতায়াত ছিল। হিজাবের আয়াত নাযিলের পর পূর্বের অভ্যাস

---

৩০. হায়াতুস সাহাবা-৩/৬৩২

৩১. প্রাগুক্ত-২/৫৬৬; তাবাকাত-৮/৮৪

৩২. সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৩৭

মত একদিন তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন। রাসূল (সা) হযরত উম্মু সালামা (রা) ও হযরত মায়মূনাকে (রা) বললেন ঃ 'তার থেকে তোমরা পর্দা কর।' তাঁরা বললেন ঃ তিনি তো একজন অন্ধ মানুষ। রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমরা তো আর অন্ধ নও। তোমরা তো তাকে দেখছো।[৩৩]

খন্দক যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেননি। তবে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) এত নিকটে ছিলেন যে, তাঁর প্রতিটি কথা ভালোমত শুনতে পেতেন। তিনি বলতেন, আমার সেই সময়ের কথা খুব ভালো মনে আছে, যখন রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র বুকে ধূলোবালি লেগে ছিল। তিনি লোকদের মাথায় ইট উঠিয়ে দিচ্ছিলেন, আর কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। হঠাৎ আম্মার ইবন ইয়াসিরের প্রতি দৃষ্টি পড়লে তিনি বললেন ঃ হে ইবন সুমাইয়্যা, তোমাকে একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী হত্যা করবে।[৩৪]

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় হযরত উম্মু সালামা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) একটি সঠিক পরামর্শ দান করেছিলেন। সহীহ বুখারীতে এসেছে, সন্ধি চুক্তির পর রাসূল (সা) বলেন, লোকেরা যেন হুদায়বিয়ায় নিজ নিজ পশু কুরবানী করে। যেহেতু সন্ধির শর্তাবলী দৃশ্যত মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী ছিল। এ কারণে, সাধারণভাবে মুসলমানরা মনঃক্ষুণ্ন ও বিমর্ষ ছিল। রাসূল (সা) তিনবার নির্দেশ দানের পরেও কারও মধ্যে নির্দেশ পালনের তোড়জোড় দেখা গেলনা। রাসূল (সা) তাঁবুতে ফিরে এসে উম্মু সালামার নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তখন উম্মু সালামা বলেন ঃ 'আপনি কাকেও কিছু বলবেন না। বাইরে যেয়ে নিজের কুরবানী করুন এবং ইহরাম ভাঙ্গার জন্য মাথার চুল ফেলে দিন।' রাসূল (সা) তাঁর পরামর্শ মত কাজ করেন। লোকেরা যখন দেখলো রাসূল (সা) তাঁর নির্দেশ মত নিজেই আমল করছেন তখন সবাই কুরবানী করে ইহরাম ভেঙ্গে ফেলে। তখন কুরবানী করা ও ইহরাম ভাঙ্গার জন্য রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়।[৩৫]

হযরত উম্মু সালামার (রা) এ পরামর্শ ছিল খুবই সময় উপযোগী ও বাস্তব সম্মত। যা এক কঠিন সমস্যাকে নিমেষেই সমাধান করে দেয়।

হিজরী ৯ম সনের ঈলা ও তাখঈর-এর ঘটনার সময় হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত 'উমার (রা) নিজ নিজ মেয়েকে উপদেশ দেন। হযরত 'উমার (রা) উম্মু সালামার কাছে এসে কথা বলেন। হযরত উম্মু সালামা (রা) একটু কর্কশ কণ্ঠে তাঁকে বলেন ঃ

عجبا لك ياابن الخطاب دخلت فى كل شيئ حتى تبغى أن تدخل بين رسول الله وأزواجه ـ

—ইবন খাত্তাব! এ আশ্চর্যের ব্যাপার যে, আপনি প্রত্যেকটি ব্যাপারে নাক গলান।

৩৩. মুসনাদ-৬/২৯৬
৩৪. প্রাগুক্ত-৬/৩১৯
৩৫. হায়াতুস সাহাবা-১/১৫৪; বুখারী-১/৩৮০

এমনকি আপনি রাসূল (সা) ও তাঁর বিবিগণের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারেও নাক গলাতে শুরু করেছেন।[৩৬]

হযররত আয়িশার (রা) জীবনকথা'য় আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। হযরত উম্মু সালামার (রা) জবাবটি ছিল বড় শক্ত। তাই হযরত 'উমার (রা) নীরবে উঠে চলে যান। এদিকে রাতের মধ্যে খবর রটে যায় যে, হযরত রাসূলে কারীম তাঁর বিবিগণকে তালাক দান করেছেন। সকালে হযরত উমার (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে সকল ঘটনা তাঁকে বলেন। উম্মু সালামার (রা) শক্ত জবাবের কথা শুনে তিনি মৃদু হেসে দেন।[৩৭]

মক্কা বিজয়ের সময় হযরত উম্মু সালামা (রা) ও রাসূলুল্লাহর (সা) সফর সঙ্গিনী ছিলেন। কাফেলা যখন মক্কার অদূরে মাররুজ জাহরান মতান্তরে নীকুল ওকাব নামক স্থানে তখন রাতের অন্ধকারে মক্কার আবু সুফইয়ান ইবনুল হারিস ইবন আবদুল মুত্তালিব ও আবদুল্লাহ ইবন আবী উমাইয়্যা ইবনুল মুগীরা মুসলমান শিবিরে উপস্থিত হন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। এ সময় উম্মু সালামা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) পরামর্শ দেন এভাবে ঃ

يارسول الله إبن عمك ، وابن عمتك وصهرك -

–ইয়া রাসূলাল্লাহ! একজন আপনার চাচার ছেলে, আর একজন আপনার ফুফুর ছেলে ও আপনার শালা।' উল্লেখ্য যে, আবু সুফইয়ান রাসূলুল্লাহর (সা) বড় চাচা আল-হারিসের ছেলে, আর আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহর ফুফু আতিকার ছেলে এবং উম্মু সালামার (রা) ভাই।[৩৮]

তায়িফ অভিযানের সময় হযরত উম্মু সালামা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে ছিলেন।[৩৯] হিজরী ১০ম সনে বিদায় হজ্জের সময় হযরত উম্মু সালামা (রা) অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু একটি দ্বীনী ফরজ কাজ আদায়ে কোন রকম শিথিলতা তাঁর পছন্দ হয়নি, তাই সঠিক ওজর বা কারণ থাকা সত্ত্বেও তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সফরসঙ্গিনী হন। তাওয়াফের ব্যাপারে রাসূল (সা) তাঁকে বলেন ঃ উম্মু সালামা! যখন ফজর নামাযের সময় হতে থাকবে তুমি উটের উপর সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করে নিবে। তিনি তাই করেছিলেন।[৪০]

হিজরী একাদশ সনে হযরত রাসূলে কারীম (সা) জীবনের শেষ দিনগুলিতে যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং হযরত আয়িশার (রা) ঘরে অবস্থান করতে থাকেন তখন হযরত উম্মু সালামা (রা) প্রায়ই রাসূলকে (সা) দেখতে আসতেন। একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। তিনি নিজেকে সামলাতে পারলেন না। হঠাৎ চিৎকার

---

৩৬. মুসলিম : বাবুল ঈলা; বুখারী-২/৭২০
৩৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২০৪
৩৮. হায়াতুস সাহাবা-১/১৬৩; আনসাবুল আশরাফ-১/৩৬১; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪০০
৩৯. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪৮২
৪০. বুখারী-১/২১৯, ২২০

দিয়ে উঠলেন। রাসূল (সা) নিষেধ করে বললেন ঃ এটা মুসলমানদের আদর্শ নয়।

এ সময় একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) অসুখ বেড়ে যায়। বিবিগণ তাঁকে দুধ পান করাতে চান। পান করার ইচ্ছে না থাকায় অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু যখন তিনি একটু অচেতন হয়ে পড়েন তখন উম্মু সালামা ও উম্মু হাবীবা (রা) জোর করে মুখ হা করে সামান্য পান করিয়ে দেন।

এ সময় একদিন উম্মু সালামা (রা) ও উম্মু হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হাবশার খ্রিস্টানদের উপাসনালয়ে মানুষের মূর্তির ছবি রাখার আলোচনা করলেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ তাদের মধ্যে কোন নেক্‌কার লোক মারা গেলে তারা তার কবরকে উপাসনালয় বানিয়ে নেয় এবং তাদের মূর্তি তৈরী করে তার মধ্যে স্থাপন করে। কিয়ামতের দিন এই লোকেরা হবে আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।

হযরত হুসাইনের (রা) শাহাদাতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উম্মু সালামার নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। হযরত হুসাইন (রা) যে সময় ইয়াযীদের বাহিনীর সাথে বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে চলেছেন, ঠিক সেই সময় হযরত উম্মু সালামা (রা) স্বপ্নে দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এসেছেন। তিনি ভীষণ অস্থির। মাথা ও দাড়ি মুবারক ধুলিমলিন। উম্মু সালামা জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ। এ অবস্থা কেন? বললেন ঃ 'হুসাইনের শাহাদাত স্থল থেকে ফিরে আসছি।' ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগলো। এ অবস্থায় তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হলো, ইরাকীরা হুসাইনকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন! হুসাইনকে তারা অপমান করেছে, তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ পড়ুক।[৪১]

## সন্তান

হযরত উম্মু সালামার সকল ছেলে-মেয়ে প্রথম স্বামীর। রাসূলুল্লাহর (সা) ঘরে তাঁর কোন সন্তান হয়নি। আল-ইসাবা, উসুদুল গাবা ও তাবাকাতে সালামা ও 'উমার-দুই ছেলে এবং যায়নাব নামের এক মেয়ের বর্ণনা এসেছে। সহীহ বুখারীতে 'দুররা' নামে একটি মেয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। এই হিসেবে হযরত উম্মু সালামার (রা) সন্তান সংখ্যা চারজন হয়। নিম্নে সংক্ষেপে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ

**সালামা ঃ** হাবশায় জন্মগ্রহণ করেন।[৪২] উম্মু সালামার মদীনায় হিজরাতের সময় তিনি কোলে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত হামযার (রা) মেয়ে উমামাকে এ সালামার সাথে বিয়ে দেন।[৪৩]

**'উমার ঃ** রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের সময় তার বয়স ছিল নয় বছর। ডাকনাম ছিল আবু হাফ্‌স। রাসূলুল্লাহর (সা) কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের সময় মদীনায় মারা যান। এই 'উমারের তত্ত্বাবধানে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর মা উম্মু

---

৪১. মুসনাদ-৬/২৯৮
৪২. ইবন হিশাম-২/৩৬৮
৪৩. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩০

সালামার বিয়ে সম্পন্ন হয়। হযরত 'আলীর (রা) খিলাফতকালে তিনি ফারেস ও বাহরাইনের শাসক নিযুক্ত হন। মা তাঁকে উটের যুদ্ধে আলীর (রা) সাথে পাঠান। তিনি আলীকে (রা) বলেন, আমার জানের চেয়েও প্রিয় সন্তানকে আপনার সাথে পাঠালাম। আপনার সাথে থাকবে, তারপর আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই হবে। যদি রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশের খেলাফ না হতো তাহলে আমিও আপনার সাথে বের হতাম। যেমন বের হয়েছেন আয়িশা (রা), তালহা ও যুবাইরের সাথে।[৪৪]

**দুররা :** সহীহ বুখারীতে তার উল্লেখ এসেছে। একদিন হযরত উম্মু হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন, আমি শুনেছি আপনি নাকি দুররাকে বিয়ে করতে চান? রাসূল (সা) বললেন : তা কি করে হয়? আমি তাকে লালন-পালন না করলেও সে আমার জন্য কোনভাবেই হালাল ছিল না, কারণ, সে আমার দুধ ভাইয়ের মেয়ে।[৪৫]

**যায়নাব :** তাঁর প্রথম নাম ছিল 'বাররা'। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) রাখেন যায়নাব। তাঁর এই সন্তানগণের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবিয়্যাতের মর্যাদার অধিকারী হন।[৪৬]

## আখলাক

হযরত উম্মু সালামার (রা) গোটা জীবনই ছিল যুহ্দ ও তাকওয়ার বাস্তব নমুনা। দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও চাকচিক্যের প্রতি খুব কমই দৃষ্টি দিতেন। একবার তিনি একটি হার গলায় পরেন। হারটিতে সামান্য সোনা ছিল। রাসূল (সা) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করায় তা খুলে ফেলেন।[৪৭]

তিনি প্রতিমাসের প্রতি সোম, বৃহস্পতি ও শুক্রবার মোট তিনদিন রোযা রাখতেন।[৪৮]

প্রথম স্বামীর ছেলে-মেয়েরা সঙ্গে ছিল। অতি যত্নের সাথে তাদের লালন-পালন করতেন। একবার রাসূলুল্লাহকে (সা) জিজ্ঞেস করেন যে, আমি কি এর কোন সওয়াব পাব? তিনি বলেন : 'হাঁ, পাবে।'[৪৯] শরীয়াতের আদেশ-নিষেধের প্রতি অত্যধিক সতর্ক থাকতেন। কিছু লোক একবার নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত ছেড়ে দেয়। উম্মু সালামা তাদের সতর্ক করে দেন এবং বলেন : রাসূল (সা) জুহরের নামায তাড়াতাড়ি আদায় করতেন, আর তোমরা আসরের নামায তাড়াতাড়ি আদায় করে থাক?[৫০]

হযরত উম্মু সালামার (রা) এক ভাতীজা একদিন তাঁর সামনে দুই রাকায়াত নামায পড়লেন। সিজদার স্থানটিতে ধুলোবালি থাকায় তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে কপাল থেকে মাটি ঝাড়েন। উম্মু সালামা তাঁকে নিষেধ করেন এবং বলেন, এটা রাসূলুল্লাহর

---

৪৪. প্রাগুক্ত
৪৫. বুখারী-২/৭৬৪
৪৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২০২
৪৭. মুসনাদ-৬/৩১৫, ৩২২
৪৮. প্রাগুক্ত-৬/২৮৯
৪৯. বুখারী-১/১৯৮
৫০. মুসনাদ-৬/২৮৯

(সা) আচরণের পরিপন্থী। রাসূলুল্লাহর (সা) একটি দাস একবার এমন করেছিল। তিনি তাঁকে বলেন ঃ

تَرِبَ وَجْهُكَ لِلّٰهِ -

আল্লাহর জন্য তোমার চেহারা ধুলিমলিন হোক।

তিনি নিজেও যেমন দানশীল ছিলেন তেমনি অন্যকেও দানশীলতার প্রতি উৎসাহ দিতেন। একবার কয়েকজন অভাবী মানুষ তাঁর গৃহে এসে সাহায্য প্রার্থনা করে। উম্মুল হুসাইন তাঁর কাছে বসা ছিলেন, তিনি তাদের ধমক দিলেন। কিন্তু উম্মু সালামা তাঁকে থামান এবং বলেন, আমাদের এমন করার আদেশ নেই। তারপর তিনি দাসীকে নির্দেশ দেন, তাদেরকে কিছু দিয়ে বিদেয় করো। যদি কিছু না থাকে তাহলে একটি খোরমা তাদের হাতে দাও।

একবার হযরত আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা) তাঁকে বললেন ঃ আম্মা! আমার কাছে এত বেশী পরিমাণ অর্থ-সম্পদ জমা হয়ে গেছে যে, আমি আমার ধ্বংসের আশঙ্কা করছি। তিনি বললেন ঃ ছেলে! খরচ করে ফেল! রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, অনেক সাহাবী এমন আছে যে আমাকে আমার মৃত্যুর পর আর কখনও দেখবে না।[৫১]

তিনি অন্যের আরাম-আয়েশের প্রতি খুবই সতর্ক থাকতেন। যতদূর সম্ভব ভালো কাজে কার্পণ্য করতেন না। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি ভালোবাসার স্মৃতি হিসেবে তাঁর দেহের একটি পশম তিনি নিজের কাছে সংরক্ষণ করেন। সহীহ বুখারীতে এসেছে, তার কাছে রূপোর একটি পাত্র ছিল, তাতে তিনি পশম মুবারক সংরক্ষণ করেছিলেন। সাহাবীদের কেউ কোন দুঃখ-বেদনা পেলে একপেয়ালা পানি এনে তাঁর সামনে রাখতেন, তিনি পশম মুবারকটি সেই পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিতেন। সেই পানির বরকতে তাঁর সকল দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যেত। আবদুল্লাহ ইবন মাওহাব বলেন, আমি উম্মু সালামার (রা) নিকট গেলাম। তিনি 'হিন্না ও কাতাম'-এ রক্ষিত রাসূলুল্লাহর (সা) একটি পশম বের করেন।[৫২]

যেদিন হযরত রাসূলে কারীম (সা) হযরত উম্মু সালামার (রা) ঘরে রাত কাটাতেন, জায়নামাজের সামনে বিছানা করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) নামাজ আদায় করতেন, আর তিনি সেই বিছানায় শুয়ে থাকতেন।[৫৩]

রাসূলুল্লাহর (সা) আরাম-আয়েশের প্রতি এতই সতর্ক ছিলেন যে, নিজের দাস সাফীনাকে এই শর্তে মুক্ত করে দেন যে, যতদিন রাসূলুল্লাহ (সা) জীবিত থাকেন তাঁর সেবা করতে হবে।[৫৪]

---

৫১. প্রাগুক্ত-৬/২৯০; হায়াতুস সাহাবা-২/২৬৫
৫২. আনসাবুল আশরাফ-১/৩৯৫; সাহাবিয়াত-৮০
৫৩. মুসনাদ-৬/৩২২
৫৪. প্রাগুক্ত-৬/৩১৯; হায়াতুস সাহাবা-১/৪৭৮

একবার হযরত উম্মু সালামা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) এর কী কারণ যে, কুরআনে আমাদের (মেয়েদের) উল্লেখ নেই? এ প্রশ্নের পর রাসূল (সা) মসজিদের মিম্বারে উঠে দাঁড়ান এবং সূরা আল-আহযাবের ৩৫তম আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعدالله لهم مغفرة وأجرا عظيما ـ

–নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী নারী আল্লাহর অধিক জিকরকারী পুরুষ ও জিকরকারী নারী—তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।'

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাথে গভীর সম্পর্ক ও ভালোবাসা থাকার কারণেই হযরত উম্মু সালামা (রা) এমন প্রশ্ন করতে সাহস পান।

## হযরত উম্মু সালামার (রা) মহত্ত্ব ও মর্যাদা

রাসূলুল্লাহর (সা) বিবিগণের মধ্যে মহত্ত্ব ও মর্যাদায় হযরত আয়িশার (রা) পরেই হযরত উম্মু সালামার স্থান। ইবন হাজার বলেন ঃ

كانت أم سلمة موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأى الصائب ـ

–উম্মু সালামা অনুপম সৌন্দর্য, পূর্ণ প্রজ্ঞা ও সঠিক সিদ্ধান্তের গুণে গুণান্বিতা ছিলেন।

তিনি আবু সালামা, ফাতিমাতুয যাহরা এবং খোদ রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যাঁরা উম্মু সালামার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকজন হলেন ঃ 'উমার, যায়নাব (ছেলে-মেয়ে), তাঁর ভাই 'আমির, ভাইয়ের ছেলে মুস'আব ইবন আবদিল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবন রাফে, 'নাফে', ইবন সাফীনা, আবু কাসীর, খায়রা, সাফিয়্যা বিন্‌ত শায়বা, হিন্দা বিন্‌ত হারিস, কাবীসা বিন্‌ত জুরাইব, আবু 'উসমান নাহদী', আবু ওয়ায়িল, সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, হুমাইদ, 'উরওয়া, আবু বকর ইবন

আবদির রহমান, সুলায়মান ইবন ইয়াসার প্রমুখ সাহাবী ও তাবে'ঈ।[৫৫] হাদীসের গ্রন্থসমূহে তাঁর ৩৭৮টি হাদীস পাওয়া যায়। তার মধ্যে তেরটি মুত্তাফাক আলাইহি। ইমাম বুখারী তিনটি ও ইমাম মুসলিম তেরটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এ হিসেবে তিনি মুহাদ্দিস সাহাবীদের তৃতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত। হাদীস বর্ণনাকারী মহিলাদের মধ্যে একমাত্র হযরত আয়িশা (রা) ছাড়া তাঁর উপরে আর কেউ নেই।[৫৬]

হযরত উম্মু সালামার (রা) হাদীস শোনার প্রবল আগ্রহ ছিল। একদিন তিনি চুলের বেনী বাঁধাচ্ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) খুতবা দানের জন্যে মসজিদের মিম্বারে উঠলেন। তিনি কেবল 'ওহে জনমণ্ডলী!' বলেছেন, আর অমনি উম্মু সালামা চুল বিন্যস্তকারিণীকে বললেন, 'চুল বেঁধে দাও'। সে বললো! এত তাড়া কিসের। সবে তো 'ওহে জনমণ্ডলী!' বলেছেন। উম্মু সালামা বললেন! খুব ভালো কথা, আমরা কি জনমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত নই? তারপর তিনি নিজেই চুল বেঁধে দ্রুত উঠে যান এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) পূর্ণ ভাষণটি শোনেন।[৫৭]
এ ঘটনা দ্বারা তাঁর জ্ঞান অর্জনের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রমাণিত হয়।

হযরত উম্মু সালামার (রা) হাদীসগুলি মুসনাদে ইমাম আহমাদের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২৮৯ হতে ৩২৪ পৃষ্ঠাগুলিতে সংকলিত হয়েছে।

হযরত উম্মু সালামার (রা) স্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে মাহমুদ ইবন লাবীদ বলেন ঃ

كان أزواج النبى صلى الله عليه وسلم يحفظن من حديث النبى صلى الله عليه وسلم كثيرا ولا مثلا لعائشة وأم سلمة (طبقات ٧/١٧٦)

– রাসূলুল্লাহর (সা) বিবিগণের বহু হাদীস মুখস্থ ছিল। তবে হযরত আয়িশা ও হযরত উম্মু সালামার (রা) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।[৫৮]

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম বলেন ঃ যদি তাঁর ফাতওয়া সংগ্রহ করা হয়, তাহলে ছোটখাট একটি পুস্তিকার আকার ধারণ করতে পারে।[৫৯]
ইমামুল হারামাইন বলেন ঃ 'হযরত উম্মু সালামার (রা) চেয়ে বেশী সঠিক সিদ্ধান্ত দানের অধিকারী কোন মেয়ে আমার নজরে পড়েনা।'

---

৫৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২০২; আল-ইসাবা-৪/৪৫৯
৫৬. প্রাগুক্ত-২/২১০
৫৭. মুসনাদ-৬/৬৯৭
৫৮. তাবাকাত-২/১২৬; আনসাবুল আশরাফ-১/৪১৫; হায়াতুস সাহাবা-৩/২৬৩
৫৯. আ'লাম আল-মুওয়াক্কি'ঈন-১/১৩

মারওয়ান ইবন হাকাম হযরত উম্মু সালামার (রা) নিকট মাসয়ালা জিজ্ঞেস করতেন এবং প্রকাশ্যে বলতেন ঃ ৬০

كيف نسأل أحدا وفينا أزواج النبى صلى الله عليه وسلم -

–আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) বিবিগণ থাকতে কিভাবে আমরা অন্যদের নিকট জিজ্ঞেস করি?

হযরত আবু হুরায়রা (রা) ও হযরত ইবন আব্বাস (রা)– যাঁদেররকে বলা হয় জ্ঞানের সাগর, তাঁরাও জানার জন্য হযরত উম্মু সালামার (রা) দরজায় ধর্না দিতেন। তাবে'ঈদের বিরাট একটি দল তাঁর থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন।৬১

হযরত উম্মু সালামা (রা) খুব সুন্দর করে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) কায়দা ও রীতিতে পড়তে পারতেন। একবার কোন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে জানতে চায় ঃ রাসূল (সা) কিরায়াত পড়তেন কেমন করে? বললেন ঃ এক একটি আয়াত পৃথক পৃথক করে পড়তেন। তারপর তিনি নিজেই কিছু আয়াত পাঠ করে শুনিয়ে দেন।৬২

তাঁর মধ্যে দারুণ বিচক্ষণতা ছিল। হযরত রাসূলে কারীম (সা) ইনতিকালের পূর্বে কন্যা ফাতিমাকে গোপনে একটি কথা বলেন। হযরত আয়িশার (রা) মত সর্বগুণে গুণান্বিতা স্ত্রীও তখনই ফাতিমাকে জিজ্ঞেস করে তা জানতে চান। কিন্তু ফাতিমা (রা) তা বলতে অস্বীকৃতি জানান এবং আয়িশা (রা) লজ্জিত হন। কিন্তু উম্মু সালামা (রা) সেই গোপন কথা জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েননি। তিনি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর জিজ্ঞেস করেন।

সূরা আল-আহযাবের ৩৩ নং আয়াত, যাকে 'আয়াতে তাতহীর' বলা হয়, হযরত উম্মু সালামার (রা) ঘরে নাযিল হয়। রাসূল (সা) তখন তাঁর ঘরে অবস্থান করছিলেন। আয়াতটি এই ঃ

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا -

–হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ্ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে।

এ আয়াত নাযিলের পর রাসূল (সা) হযরত ফাতিমা, হযরত আলী, হযরত হাসান ও হযরত হুসাইনকে (রা) ডেকে আনেন এবং বলেন, এরা আমার আহলে বায়ত বা আমার পরিবারের সদস্য। হযরত উম্মু সালামা (রা) জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিও

৬০. মুসনাদ-৬/৩১৭
৬১. প্রাগুক্ত-৬/৩১৩
৬২. প্রাগুক্ত-৬/৩০০, ৩০২

কি আহলে বায়তের অন্তর্গত? বললেন ঃ بَلَى إِنْ شَاءَ اللّٰه হাঁ, ইনশাআল্লাহ।[৬৩] জামে আত-তিরমিযীতে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা) উপরে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গকে ডেকে এনে তাঁদের মাথার উপর কম্বল উড়িয়ে দেন এবং বলেন, হে আল্লাহ! এরাই আমার আহলে বায়ত। এদেরকে আপনি পবিত্র করুন। এ দু'আ শুনে হযরত উম্মু সালামা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমিও কি ওদের অন্তর্গত? বললেন ঃ তুমি তোমার স্থানেই আছ এবং ভালো আছ।[৬৪]

একদিন হযরত উম্মু সালামা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে বসে আছেন। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আ) আসেন এবং কথা বলতে থাকেন। তাঁর চলে যাওয়ার পর রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করেন ঃ তাঁকে চেন? উম্মু সালামা বললেন ঃ দাহইয়া আল-কালবী। কিন্তু উম্মু সালামা (রা) যখন ঘটনাটি অন্য লোকদের নিকট বললেন তখন জানলেন, লোকটি দাহইয়া নন, বরং জিবরাঈল (আ)। মুহাদ্দিসদের ধারণা, এটা হিজাবের হুকুম নাযিলের আগের ঘটনা।[৬৫]

তিনি যে ইসলামী শরী'আতের তত্ত্বজ্ঞানে কতখানি পারদর্শী ছিলেন তা তাঁর জীবনের বহু ঘটনা ও তাঁর কথায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হলো ঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলতেন, রমজান মাসে কেউ অপবিত্র হলে সুবহে সাদিকের পূর্বে তাড়াতাড়ি গোসল করে নিতে হবে। অন্যথায় তার রোযা ভেঙ্গে যাবে। এক ব্যক্তি হযরত আয়িশা ও হযরত উম্মু সালামার (রা) নিকট আবু হুরায়রার কথার সত্যতা জানতে চান। তাঁরা দুইজনই তাঁর কথার প্রতিবাদ করেন এবং বলেন, অপবিত্র অবস্থায় খোদ রাসূলকে (সা) রোযা রাখতে দেখা গেছে। আবু হুরায়রা একথা জানতে পেরে খুব অনুতপ্ত হন। তিনি বলেন, আমি কি করবো। ফাদল ইবন আব্বাস আমাকে এমনই বলেছিলেন ঃ কিন্তু একথা স্পষ্ট যে, এ ব্যাপারে উম্মু সালামা ও আয়িশার (রা) জ্ঞান বেশী।[৬৬]

একবার কতিপয় সাহাবী হযরত উম্মু সালামার (রা) নিকট আবদার করেন যে, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহর (সা) গোপন জীবন সম্পর্কে কিছু বলুন। বললেন ঃ তাঁর প্রকাশ্য ও গোপন—উভয় জীবনই এক রকম। একথা বলার পর হযরত উম্মু সালামার (রা) অনুভূতি হলো যে, রাসূলুল্লাহর (সা) কোন গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়া হলো না তো! অনুতপ্ত হলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ঘরে এলে সবকথা বললেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি খুব ভালো করেছো।[৬৭]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর আসরের পর দুই রাকায়াত নামায আদায় করতেন।

---

৬৩. উসুদুল গাবা-৫/৫৮৯
৬৪. তিরমিযী-৫২০
৬৫. মুসলিম-২/৩৪
৬৬. মুসনাদ-৬/৩০৬, ৩০৮
৬৭. প্রাগুক্ত-৬/৩০৯

একদিন মারওয়ান জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এ নামায কেন পড়েন? তিনি জবাব দিলেন, রাসূল (সা) পড়তেন। যেহেতু হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর এ হাদীস হযরত আয়িশার সূত্রে জেনেছিলেন, তাই মারওয়ান তার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য 'আয়িশার (রা) নিকট লোক পাঠান। আয়িশা (রা) বললেন, হাদীসটি আমি উম্মু সালামা (রা) থেকে পেয়েছি। হযরত উম্মু সালামার (রা) নিকট লোক গেল এবং তাঁকে 'আয়িশার (রা) কথা বলা হলো। তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ 'আয়িশাকে (রা) মাফ করুন! তিনি আমার কথার ভুল অর্থ করেছেন। আমি তাঁকে কি একথা বলিনি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ নামায পড়তে বারণ করেছেন।[৬৮]

একবার তিনি এক ব্যক্তিকে একটি মাসয়ালার সমাধান বললেন! লোকটি তাতে তৃপ্ত হলো না। সে তাঁর নিকট থেকে উঠে অন্য বিবিগণের নিকট গেল। সবাই একই জবাব দিলেন। লোকটি ফিরে এসে উম্মু সালামাকে কথাটি জানালো। তিনি তাকে বললেন ঃ হাঁ, দাঁড়াও। আমি তোমাকে তৃপ্ত করতে চাই। আমি ঐ বিষয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে একটি হাদীস শুনেছি।[৬৯]

হযরত উম্মু সালামা (রা) যে খুবই লজ্জাবতী মহিলা ছিলেন হাদীসে বর্ণিত অনেক ঘটনা দ্বারা তা প্রমাণিত হয়। একবার হযরত উম্মু সুলাইম (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) জিজ্ঞেস করলেন, কোন মহিলা যদি স্বপ্নে দেখে যে তার স্বামী তার সাথে যৌনক্রিয়া করছে, তাহলে তার উপর কি গোসল ওয়াজিব হবে? পাশেই বসা ছিলেন হযরত উম্মু সালামা (রা)। তিনি বলে উঠলেন, উম্মু সুলাইম! তোমার হাত ধুলিমলিন হোক! রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গোটা নারী জাতিকে লজ্জায় ফেলে দিয়েছো। জবাবে যখন রাসূল (সা) বললেন, পানি দেখা গেলে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে, তখন উম্মু সালামা (রা) প্রশ্ন করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! মেয়েদেরও কি পানি আছে?[৭০]

খিলাফতে রাশেদার পর উমাইয়্যা খান্দানের শাসক ও তাদের উগ্র সমর্থকরা নবী খান্দানের বিরুদ্ধে, বিশেষত হযরত আলী (রা) সম্পর্কে নানা রকম অশালীন মন্তব্য করতো। অনেকে তাঁকে গালি দিত। উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামা (রা) সে সময় জীবিত। তিনি তাদেরকে ঘৃণা করতেন। অনেক সময় প্রতিবাদও করতেন। হযরত আবু আবদুল্লাহ আল-জাদালী (রা) বলেন, একদিন আমি হযরত উম্মু সালামার সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহকে (সা) গালি দেওয়া হয়? বললাম ঃ মা 'আজাল্লাহ (আল্লাহর পানাহ্)। তখন তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আলীকে গালি দিয়েছে সে যেন আমাকে গালি দিয়েছে।

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, উম্মু সালামা (রা) বলেন, আলী এবং তাকে যারা

---

৬৮. প্রাগুক্ত-৬/২৯৯, ৩০৩ ঘটনাটি সহীহ বুখারীতেও বর্ণিত হয়েছে।

৬৯. প্রাগুক্ত-৬/২৯৭

৭০. হায়াতুস সাহাবা-৩/২২২

ভালোবাসে তাদেরকে কি গালি দেওয়া হয় না? অথচ রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ভালোবাসতেন।

এ বর্ণনা দ্বারা নবী পরিবারের সদস্যদের প্রতি কত গভীর ভালোবাসা ও দরদ ছিল তা জানা যায়।[৭১]

হযরত উম্মু সালামা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) দিন-রাতের অনেক দু'আ ও ওজীফা বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, রাসূল (সা) সালাতুল ফাজরের পর এই দু'আ করতেন ঃ[৭২]

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ أَسْأَلُكَ رِزْقاً طَيِّبًا وَعِلْمًا نَافِعًا وَعَملاً مُتَقَبَّلاً -

–হে আল্লাহ ঃ আমি আপনার কাছে চাই পবিত্র রিযক, কল্যাণকর জ্ঞান ও কবুলকৃত কর্ম।

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন ঃ[৭৩]

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُبِكَ اَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ، أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ، أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا -

–বিস্‌মিল্লাহ, তাওয়াক্‌কালতু আলাল্লাহি। হে আল্লাহ : আমরা পদস্খলন, পথভ্রষ্টতা, অত্যাচার করা, অত্যাচারিত হওয়া, কারও উপর বাড়াবাড়ি করা অথবা আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করা থেকে আপনার আশ্রয় চাই।

তিনি আরও বলেছেন, রাসূল (সা) প্রায়ই বলতেন ঃ[৭৪]

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلَى دِيْنِكَ -

–হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আপনি আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর সুদৃঢ় করে দিন।

তাঁর থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা) বলতেন ঃ[৭৫]

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْ وَاهْدِنِىْ السَّبِيْلَ الْأَقْوَمَ -

–প্রভু হে! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমার প্রতি সদয় হোন এবং আমাকে সোজা পথ দেখান।

---

৭১. প্রাগুক্ত-২/৪৫১
৭২. প্রাগুক্ত-৩/৩৫০
৭৩. প্রাগুক্ত-৩/২৫৭
৭৪. প্রাগুক্ত-৩/৩৬৩
৭৫. প্রাগুক্ত-৩/৩৬৪

## মৃত্যু

তাঁর মৃত্যুসন নিয়ে মতভেদ আছে। আল-ওয়াকিদীর ধারণা, হিজরী ৫৯ সনের শাওয়াল মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং হযরত আবু হুরায়রা (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। ইবন হিব্বান বলেন, হিজরী-৬১ সনের শেষ দিকে হুসাইন ইবন আলীর (রা) শাহাদাতের পরে তিনি ইনতিকাল করেন। আবু খায়সামার মতে, ৬০ হিজরীর শেষের দিকে ইয়াযীদ ইবন মু'য়াবিয়ার খিলাফতকালে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু হিজরী ৬৩ সনের মতটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। এ বছরই হাররার ঘটনা সংঘটিত হয়। অর্থাৎ ইয়াযীদ-এর বাহিনী হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের (রা) বাহিনীকে মক্কায় অবরোধ করে এবং মক্কার উপর আক্রমণ চালায়।[৭৬]

মৃত্যুর সময় হযরত উম্মু সালামার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। হযরত আবু হুরায়রা (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান।[৭৭] নিয়ম অনুযায়ী তৎকালীন মদীনার গভর্নর জানাযার নামায পড়াতেন। ওয়ালীদ ইবন 'উতবা ছিলেন তখন মদীনার গভর্নর। এই ওয়ালীদ আবু সুফইয়ানের (রা) পৌত্র। মৃত্যুর পূর্বে হযরত উম্মু সালামা (রা) অসীয়াত করে যান যে, 'ওয়ালীদ যেন আমার জানাযার নামায না পড়ায়'। এ কারণে তাঁর ইনতিকালের পর ওয়ালীদ মদীনার বাইরে জঙ্গলের দিকে চলে যান এবং জানাযার নামায পড়ানোর জন্য হযরত আবু হুরায়য়াকে (রা) পাঠিয়ে দেন। তবে ইমাম আযযাহাবী একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, আবু হুরায়রার (রা) নামায পড়ানোর কথাটি প্রমাণিত নয়। কারণ তিনি উম্মু সালামার আগেই মারা যান। হযরত উম্মু সালামাকে (রা) মদীনার আল-বাকী গোরস্তানে দাফন করা হয়।[৭৮]

---

৭৬. মুসলিম-২/৪৯৩; আল-ইসাবা-৪/৪৬০

৭৭. তাবাকাত-৮/৯৬

৭৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২০৮, ২১০; তাবারী-১৩/২২০৩, সিফাতুস সাফওয়া-২/২১; তাবাকাত-৮/৯৬

# যায়নাব বিন্ত জাহাশ (রা)

উম্মুল মুমিনীন হযরত যায়নাব-এর ডাকনাম ছিল উম্মু হাকাম। তাঁর পিতা ছিলেন বনু আসাদ ইবন খুযায়মা গোত্রের জাহাশ ইবন রাবাব আল-আসাদী এবং মাতা রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু উমায়মা বিন্ত আবদিল মুত্তালিব। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) আপন ফুফাতো বোন।[১] হযরত যায়নাবের (রা) দুই ভাই– 'উবায়দুল্লাহ ইবন জাহাশ ও আবু আহমাদ ইবন জাহাশ হযরত আবু সুফইয়ানের (রা) দুই মেয়ে যথাক্রমে উম্মু হাবীবা ও ফারি'আকে বিয়ে করেন। তাঁর আর এক ভাই 'আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা) উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। কাফিররা তাঁর পেট ফেঁড়ে লাশ বিকৃত করে ফেলে। তাঁকে তাঁর মামা হযরত হামযার (রা) সাথে উহুদ প্রান্তরে একই কবরে দাফন করা হয়। হামনা বিন্ত জাহাশ ও উম্মু হাবীবা বিন্ত জাহাশ হযরত যায়নাবের দুই বোন।[২] দুই জনেরই মেয়েলী রোগ 'ইসতিহাজা' ছিল। তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট প্রায়ই এ সম্পর্কিত নানা মাসয়ালা জিজ্ঞেস করতেন। এ কারণে হাদীসে তাঁদের উল্লেখ দেখা যায়।[৩]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ এবং তাঁর অন্য সকল ভাই-বোন প্রথম পর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) দারুল আরকামে যাওয়ার আগেই মুসলমান হন। তারপর তাঁরা সবাই হাবশায় হিজরত করেন। সেখানে তাঁদের ভাই 'উবায়দুল্লাহ খ্রিস্টান হয়ে যান এবং তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মু হাবীবা (রা) ইসলামের উপর অটল থাকেন। পরে নাজ্জাশীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বিয়ে করেন। অতঃপর তাঁরা সকলে মক্কায় ফিরে আসেন। কিছুদিন পর আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ ও আবু আহমাদ ইবন জাহাশ আপন পরিবারবর্গ ও বোনদের নিয়ে মদীনায় হিজরাত করেন।[৪]

হযরত যায়নাব (রা) ইসলামের আদি-পর্বেই মুসলমান হন। ইবনুল আসীর বলেন ঃ

كَانَتْ قَدِيْمَةَ الْاِسْلَامِ

তিনি ছিলেন আদিপর্বের মুসলমান।[৫]

## বিয়ে

হযরত রাসূলে কারীম (সা) স্বীয় আযাদকৃত দাস ও পালিত পুত্র যায়িদ ইবন হারিসার সাথে তাঁর বিয়ে দেন। পৃথিবীতে ইসলাম যেভাবে সাম্য ও সমতার শিক্ষার বাস্তবায়ন

১. উসুদুল গাবা-৫/৪৬৩
২. আনসাবুল আশরাফ-১/৮৮, ১০৯-১১০
৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১৬; আসাহ আস-সিয়ার-৬২৭; দেখুন হাদীস ঃ আবু দাউদ (২৮৭), মুসনাদে আহমাদ-৬/৪৩৯; তিরমিযী-১২৮); ইবন মাজাহ্ (৬২৭); আল-বায়হাকী-১/৩৩৮-৩৩৯, মুসলিম (৩৩৪), নাসাঈ ১/৮৩।
৪. আসাহ আস-সিয়ার-৬২৭,
৫. উসুদুল গাবা-৫/৪৬৩,

ঘটিয়েছে এবং যেভাবে সকল স্তরের মানুষকে একই কাতারে এনে দাঁড় করিয়েছে ইতিহাসে তার অগণিত দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। তবে হযরত যায়নাবের (রা) বিয়ের ঘটনাটি ছিল সাম্য ও সমতার বাস্তব শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ। এ কারণে তা এ জাতীয় সকল দৃষ্টান্তের উপর প্রাধান্য ও গুরুত্ব লাভ করেছে।

পবিত্র কা'বার খাদিম হিসেবে গোটা আরবে কুরাইশ খান্দান, বিশেষত বনু হাশিমের যে উঁচু মর্যাদা ও সম্মানের আসন ছিল, তৎকালীন ইয়ামেনের কোন বাদশাহ্ও তার সমকক্ষতার দাবী করতে দুঃসাহসী হতো না।

কিন্তু ইসলাম সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি ঘোষণা করে তাকওয়া ও আল্লাহ্ ভীতিকে এবং ঘোষণা করে যে, যে কোন ধরনের গর্ব, আভিজাত্য ও কৌলিন্য জাহিলিয়াতের প্রতীক। এই ভিত্তিতে হযরত যায়িদ যদিও দৃশ্যত একজন দাস ছিলেন, তবুও যেহেতু ইসলাম তাঁর দ্বারা সীমাহীন শক্তি লাভ করে, এ কারণে হাজার হাজার স্বাধীন ব্যক্তি থেকেও তাঁকে শ্রেষ্ঠতর গণ্য করা হতো। ইসলামী সাম্যের বাস্তব শিক্ষাদান ছাড়া এই বিয়ের আরো একটি উদ্দেশ্য ছিল। ইবনুল আসীর তা বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ

زَوَّجَهَا لِيُعَلِّمَهَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ -

–রাসূলুল্লাহ (সা) যায়িদের সাথে তাঁর বিয়ে এজন্য দিয়েছিলেন, যাতে যায়িদ তাঁকে কিতাবুল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতের তা'লীম ও তারবিয়াত দান করেন।[৬]

কুরাইশরা বংশের বড়াই করতো। বংশ নিয়ে তাদের গৌরবের অন্ত ছিলনা। কিন্তু রাসূল (সা) যায়নাব বিনতু জাহাশের বিয়ে দিলেন যায়িদ ইবন হারিসার সাথে। যায়িদ ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) প্রীতিভাজন ব্যক্তি। হযরত খাদীজা (রা) ও হযরত আবু বকর (রা) যে সময়ে মুসলমান হন, যায়িদও সে সময় মুসলমান হন।

অধিকাংশ অভিযানে রাসূল (সা) কুরাইশ নেতাদের উপর তাঁকে পরিচালক নিয়োগ করতেন। যায়িদ রাসূলুল্লাহর (সা) এত কাছের মানুষ হয়ে যান যে, তিনি যায়িদ ইবন মুহাম্মাদ হিসেবে প্রসিদ্ধি পান। তাঁর প্রতি রাসূলুল্লাহর (সা) বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। এতসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন দাস। আর যায়নাবের ছিল বংশ কৌলিন্য। প্রথম থেকেই এ বিয়েতে হযরত যায়নাবের মত ছিলনা। তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) সরাসরি বলে দিয়েছিলেন–

"لَا اَرْضَاهُ لِنَفْسِىْ"

তাকে নিজের জন্য পছন্দ করিনে।[৭] কিন্তু সবশেষে রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে রাজী হন। কারণ, তখন সূরা আল আহযাবের এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

---

৬. প্রাগুক্ত

৭. তাবাকাত-৮/১০৮

مَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ -

অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দান করেন তখন কোন মুমিন নারী পুরুষের কোন প্রকার ইখতিয়ার থাকে না।[৮]

বিয়ের পর এক বছর দুইজন একসাথে থাকেন কিন্তু প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠলো না। দিন দিন সম্পর্ক তিক্ত থেকে তিক্ততর হয়ে উঠলো। হযরত যায়িদ (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে অভিযোগ করলেন এবং তালাক দানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।[৯]

جَاءَ زَيْدُبْنُ حَارِثَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ زَيْنَبَ اَشْتَدَّ عَلَىَّ لِسَانَهَا وَاَنَا اُرِيْدُ أَنْ اُطَلِّقَهَا -

–যায়িদ রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যায়নাব তাঁর কঠোর বাক্যবানে আমাকে বিদ্ধ করে। আমি তাঁকে তালাক দিতে চাই।

রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়িদকে তালাক দান থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কুরআন পাকে সে চেষ্টা এভাবে বিধৃত হয়েছে।[১০]

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِىْ أَنْعَمَ اللّٰه عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ -

–যখন আপনি সেই ব্যক্তিকে যার প্রতি আল্লাহ ও আপনি অনুগ্রহ করেছেন, বলছিলেন যে, তোমার স্ত্রীকে রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর।

রাসূলুল্লাহর (সা) শত চেষ্টা সত্ত্বেও হযরত যায়নাব ও হযরত যায়িদের (রা) বিয়ে টিকলো না। হযরত যায়িদ (রা) তাঁকে তালাক দিয়েই ছাড়লেন।[১১]

পূর্বেই উল্লেখ করেছি হযরত যায়িদের (রা) সাথে হযরত যায়নাবের (রা) বিয়েটি হয় রাসূলুল্লাহর (সা) ইচ্ছায়। এ বিয়েতে যায়নাবের মোটেই মত ছিলনা। যায়নাব ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) বোন। বোধ-বুদ্ধি হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে লালন পালন করেন। তাই যখন তাঁদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, তখন রাসূল (সা) তাঁকে খুশী করার জন্য নিজেই বিয়ে করার ইচ্ছে পোষণ করতে লাগলেন। কিন্তু যেহেতু তখনও পর্যন্ত মুসলিমদের মন-মানসে জাহিলী যুগের প্রথা ও সংস্কারের প্রভাব কিছুটা বিদ্যমান ছিল, এ

---

৮. সূরা আল-আহযাব-৩৬

৯. ফাতহুল বারী ঃ তাফসীর সূরা আল-আহযাব; তাবাকাত-৮/১০৯

১০. সূরা আল-আহযাব-৩৭

১১. আল-ইসতীয়াব-২/৭৫৪; আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৪

কারণে তিনি নিজের মনের ইচ্ছা চেপে রাখেন। কারণ, যায়িদ ছিলেন তাঁর পালিত পুত্র। আর জাহিলী সমাজ আপন ঔরসজাত পুত্র ও পালিত পুত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য করতো না। যায়নাব ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) পালিত পুত্র যায়িদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী। তাঁকে বিয়ে করলে মুনাফিক ও কাফিররা হৈচৈ বাধিয়ে দিতে পারে এমন আশঙ্কা রাসূলুল্লাহ (সা) করছিলেন।[১২] কিন্তু যেহেতু পালিত পুত্রের বিচ্ছেদপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে না করার প্রথাটি ছিল একটি জাহিলী সংস্কার মাত্র, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) ইচ্ছা ছিল তার মূলোৎপাটন করা, এ কারণে আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহর (সা) সে সময়ের মনের ইচ্ছাটি প্রকাশ করে দেন এভাবে ঃ[১৩]

وَتُخْفِى فِىْ نَفْسِكَ مَااللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ـ

–'আপনি আপনার অন্তরে এমন কথা গোপন করে রাখছেন যা আল্লাহ প্রকাশ করে দিচ্ছেন। আর আপনি মানুষকে ভয় করছেন, অথচ আল্লাহকে ভয় করা আপনার জন্য অধিকতর সঙ্গত।'

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) যদি ওহীর কোন কিছু গোপন করতেন তাহলে এ আয়াতটিই করতেন।'[১৪] কারণ আল্লাহ এ আয়াতে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি গোপন ইচ্ছা প্রকাশ করে দিয়েছেন।

সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। হযরত যায়নাবের (রা) 'ইদ্দাত' কাল শেষ হলে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়িদকেই তাঁর কাছে এই বলে পাঠালেন যে, তুমি তার কাছে আমার বিয়ের পয়গাম নিয়ে যাও। যায়িদ (রা) যেয়ে দেখেন যায়নাব (রা) আটা চটকাচ্ছেন। যায়িদ বলছেন, তাঁর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই আমার অন্তরে তাঁর সম্পর্কে এক বড় ধরনের সম্ভ্রম বোধ সৃষ্টি হয়। আমি তাঁর প্রতি চোখ তুলে তাকানোর হিম্মত হারিয়ে ফেলি। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বিয়ের পয়গাম পাঠিয়েছেন। আমি একটু পেছনে সরে আসি। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত যায়িদ (রা) যায়নাবের (রা) ঘরের দরজার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে বলেন, যায়নাব! আমি রাসূলুল্লাহর (সা) পয়গাম নিয়ে এসেছি। হযরত যায়নাব জবাব দিলেন, 'এখন আমি কাজ করছি। আল্লাহর কাছে ইসতিখারা ব্যতীত কিছু বলতে পারিনে।' এ কথা বলে তিনি মাসজিদের দিকে যেতে শুরু করেন। এদিকে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এ আয়াত নাযিল করেন ঃ[১৫]

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَىْ لَا يَكُوْنَ عَلَى

---

১২. উসুদুল গাবা-৫/৪৬৪
১৩. সূরা আল-আহযাব-৩৫
১৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১১, টীকা-১,
১৫. প্রাগুক্ত-২/২১৭; সহীহ মুসলিম-(১৪২৮)-কিতাবুন নিকাহ; নাসাঈ-৬/৭৯, কিতাবুন নিকাহ।

الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْ اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُاللهِ مَفْعُوْلاً ـ

–পরে যায়িদ যখন তার নিকট হতে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করে নিল তখন আমরা তাকে (তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে) তোমার সাথে বিয়ে দিলাম। যেন নিজেদের মুখ-ডাকা পুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে মুমিন লোকদের কোন অসুবিধে না থাকে– যখন তারা তাদের নিকট হতে নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করে নেয়। আল্লাহর আদেশ তো বাস্তবায়ন হতেই হবে। এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, যায়নাবের সাথে তোমার বিয়ের কাজটি আমিই সমাধা করে দিলাম। এ কারণে যায়নাব রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রী হয়ে যান। এ ব্যাপারে যায়নাবের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন প্রয়োজন ছিল না। ইবন ইসহাক বলেছেন, রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে হযরত যায়নাবের (রা) বিয়ের কাজটি আঞ্জাম দেন হযরত আবু আহমাদ ইবন জাহাশ (রা)।[১৭] হতে পারে পরে সামাজিকভাবে বিয়ে হয়েছিল এবং সেই কাজটি করেন আবু আহমাদ ইবন জাহাশ। কিন্তু সহীহ মুসলিমে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে, উপরোক্ত আয়াত নাযিলের পর রাসূলুল্লাহ (সা) কোন পূর্ব অনুমতি ছাড়াই যায়নাবের (রা) নিকট উপস্থিত হন।[১৮] সাহীহাইনের একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত যায়নাব (রা) তাঁর সতীনদের নিকট এই বলে গর্ব করতেন যে, আপনাদের বিয়ে আপনাদের অভিভাবকরা দিয়েছেন, আর আমার বিয়ে দিয়েছেন খোদ আল্লাহ তা'আলা। রাসূলুল্লাহর (সা) এ বিয়ের কাজটি সম্পন্ন হয় ৫ম হিজরীর জিলকা'দ মাসে।[১৯]

সূরা আল আহযাবের ৩৭তম আয়াতে আল্লাহ বলছেন, 'আমরা তাকে (তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যায়নাবকে) তোমার সাথে বিয়ে দিলাম।' এই কথাগুলি ও ব্যবহৃত শব্দগুলি দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নবী কারীম (সা) এ বিয়ে নিজের ইচ্ছা ও কামনার ভিত্তিতে নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশেই করেন।[২০]

উক্ত আয়াত হতে একথা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর দ্বারা এ কাজটি করিয়েছেন একটি বিশেষ প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে। যা এ পন্থা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে অর্জিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। আরবে মুখ-ডাকা আত্মীয়দের সম্পর্কে অত্যন্ত মারাত্মক ধরনের ভুল প্রথা প্রচলিত হয়েছিল এবং যুগ যুগ ধরে অব্যাহতভাবে তা চলে আসছিল পূর্ণ দাপটের সাথে। তা উৎখাত করার একটি মাত্র উপায় কার্যকর ও সফল হতে পারতো। আর তা হলো আল্লাহর রাসূল (সা) নিজেই

---

১৬. আল-আহযাব-৩৭

১৭. আসাহ আস-সিয়ার-৬২৮

১৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১৭; মুসলিম-(১৪২৮), কিতাবুন নিকাহ।

১৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১৭

২০. তাফহীমুল কুরআন, তাফসীর সূরা আল-আহযাব, আয়াত-৩৭

সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তা শিকড়সহ উপড়ে ফেলবেন। অতএব স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, নবী কারীমের (সা) ঘরে তাঁর স্ত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা এই বিয়ে করাননি। একটি অত্যন্ত বড় ও অতিশয় প্রয়োজনীয় কাজের লক্ষ্যেই তিনি তা করিয়েছিলেন।[২১]

হযরত যায়নাবের (রা) সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) বিয়ে তো হয়ে গেল। কিন্তু ইসলামের দুশমনরা বড় হৈ চৈ করে বাজার গরম করে তুললো এই বলে যে, মুহাম্মাদ (সা) তাঁর পুত্র-বধূকে বিয়ে করেছেন, অথচ তাঁর নিজের উপস্থাপিত শরীয়াতের আইনেও পুত্র-বধূকে বিয়ে করা পিতার জন্য হারাম করা হয়েছে। এর জবাবে আল্লাহ পাক নাযিল করেন সূরা আল-আহযাবের ৪০তম আয়াত ঃ

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ - وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمًا -

-(হে জনগণ) মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারও পিতা নয়, বরং আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী মাত্র। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞানী।

'মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারও পিতা নয়।' অর্থাৎ যে ব্যক্তির পরিত্যক্ত স্ত্রীকে মুহাম্মাদ (সা) বিয়ে করেছেন সে তো রাসূলের (সা) পুত্রই ছিল না। কাজেই তার পরিত্যক্ত স্ত্রীকে বিয়ে করা রাসূলের (সা) জন্য কখনও হারাম ছিল না। তোমরা নিজেরাই জান যে, নবী কারীমের (সা) আদপেই কোন পুত্র সন্তান বর্তমান নেই।

বিরুদ্ধবাদীদের দ্বিতীয় প্রশ্ন এই ছিল যে, মুখ-ডাকা পুত্র যদি প্রকৃত ঔরসজাত পুত্র না-ও হয়, তবুও তার পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিয়ে করা খুব বেশী হলেও জায়েয হতে পারে। কিন্তু তাকে বিয়ে করতেই হবে এমন কোন প্রয়োজন তো ছিল না। এর জবাবে বলা হয়েছে ঃ 'সর্বোপরি তিনি আল্লাহর রাসূল।' অর্থাৎ যে হালাল ও জায়েয কাজ তোমাদের ভুল প্রথার কারণে শুধু শুধুই হারাম বিবেচিত হয়ে আসছে, সে বিষয়ে সকল ভুল-ভ্রান্তির মূলোৎপাটন করে দেওয়া রাসূল হওয়ার কারণেই হযরত মুহাম্মাদের (সা) কর্তব্য। তাছাড়া তিনি সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোন রাসূল আসা তো দূরের কথা, কোন নবী পর্যন্তও আসবেন না। কাজেই তাঁর জীবনকালে কোন আইন ও সমাজের কোন সংশোধনী যদি অকার্যকর ও অবাস্তবায়িত থেকে যায়, তবে তা পরবর্তী কোন নবীর দ্বারা সম্পন্ন হওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। কাজেই এই জাহিলী কু-প্রথা বিলুপ্ত করা তাঁর নিজের পক্ষেই একান্ত কর্তব্য হয়ে দেখা দিয়েছে। তারপর আলোচ্য বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপের জন্য বলা হয়েছে ঃ 'আল্লাহ সর্ববিষয়েই জ্ঞানী।' অর্থাৎ আল্লাহ ভালো করেই জানেন যে, এখনই শেষ নবীর দ্বারা এ কু-প্রথা বিলোপ করে দেওয়া একান্ত জরুরী। তা না হলে তার পরে এমন কোন ব্যক্তি দুনিয়ায় থাকবে না যার দ্বারা

---

২১. প্রাগুক্ত

এহেন মজবুত কু-প্রথা দূর করা সম্ভব হবে।[২২]

## ওলীমার অনুষ্ঠান

রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়নাবকে (রা) স্ত্রী হিসেবে ঘরে আনার পর ওলীমার আয়োজন করেন। আয়োজন অর্থ এই নয় যে, তিনি রাজকীয় ভোজের আয়োজন করেন। তবে হযরত যায়নাবের (রা) ওলীমা তুলনামূলকভাবে একটু জাঁকজমকপূর্ণ হয়েছিল। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল দুপুর বেলা মতান্তরে রাতের বেলা। হযরত আনাস (রা) বলেন, 'রাসূল (সা) আমাদের সকলকে রুটি ও গোশ্‌ত খাওয়ান।' আমাদের রাসূলে পাকের (সা) জন্য এটা রাজকীয় আয়োজনই বটে। কারণ, দিনের পর দিন যে পরিবারের লোকদের শুধু দুধপান করে কাটাতে হতো, তাঁদের পক্ষে তিন শো লোকের জন্য গোশ্‌ত-রুটির ব্যবস্থা করা জাঁকজমকপূর্ণই বলা চলে। এ কারণে পরবর্তীকালে হযরত যায়নাব (রা) তাঁর সতীনদের সামনে গর্ব করে বলতেন, কেবল আমার বিয়েতেই হযরত রাসূলে কারীম (সা) গোশ্‌ত-রুটি দিয়ে ওলীমা করেন। ইবন সা'দ এই ওলীমার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ[২৩]

مَا أَوْلَمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْئٍ مِنْ نِسَائِهِ مَاأَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ ـ

–'রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর অন্য কোন স্ত্রীর ওলীমা সেভাবে করেননি যেভাবে যায়নাবের (রা) ওলীমা করেছিলেন। তিনি যায়নাবের (রা) ওলীমা করেন ছাগলের গোশত দিয়ে।' হযরত আনাস (রা) বলেন, এতো ভালো ও এত বেশী খাবারের আয়োজন তিনি অন্য কোন স্ত্রীর ওলীমাতে করেননি।[২৪]

হযরত আনাসের (রা) সম্মানীত মা হযরত উম্মু সুলাইম (রা), যিনি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) খালা হতেন, হযরত যায়নাবের (রা) ওলীমায় নবীগৃহে কিছু খাবার পাঠিয়েছিলেন। খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত হয়ে গেলে হযরত রাসূলে কারীম (সা) মানুষকে ডাকার জন্য খাদেম আনাসকে (রা) পাঠান। তিন শো মেহমান সমবেত হন। রাসূল (সা) দশজন দশজন করে খাবারের ব্যবস্থা করেন। লোকেরা দলে দলে এসে খেয়ে চলে যাচ্ছিলেন। দাওয়াতী মেহমানরা পেট ভরে আহার করেন।

আবু হাতেম থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহর (সা) কোন এক স্ত্রীর সাথে প্রথম মিলন উপলক্ষে উম্মু সুলাইম 'হাইস' নামক (খেজুর, আকিত ও চর্বি দ্বারা তৈরী) এক প্রকার খাবার তৈরী করে পিতল বা কাঠের পাত্রে ঢালেন। তারপর ছেলে আনাসকে ডেকে বলেন ঃ এটা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে যেয়ে বলবে, আমাদের পক্ষ থেকে সামান্য

---

২২. প্রাগুক্ত, আয়াত নং ৪০

২৩. তাবাকাত-৮/১০৯

২৪. আসাহ আস-সিয়ার-৬২২

হাদিয়া। আনাস বলেন ঃ মানুষ সে সময় দারুণ অন্নকষ্টে ছিল। আমি পাত্রটি নিয়ে যেয়ে বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা উম্মু সুলাইম আপনাকে পাঠিয়েছেন। তিনি আপনাকে সালামও পেশ করেছেন এবং বলেছেন, এ হচ্ছে আমাদের পক্ষ থেকে সামান্য হাদিয়া। রাসূল (সা) পাত্রটির দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ ওটা ঘরের এক কোণে রাখ এবং অমুক অমুককে ডেকে আন। তিনি অনেক লোকের নাম বললেন। তাছাড়া আরও বললেন ঃ পথে যে মুসলমানের সাথে দেখা হবে, সাথে নিয়ে আসবে। আনাস বলেন ঃ যাদের নাম তিনি বললেন তাদেরকে তো দাওয়াত দিলাম। আর পথে আমার সাথে যে মুসলমানের দেখা হলো তাদের সকলকেও দাওয়াত দিলাম। আমি ফিরে এসে দেখি রাসূলুল্লাহর (সা) গোটা বাড়ী, সুফ্‌ফা ও হুজরা— সবই লোকে লোকারণ্য। বর্ণনাকারী আনাসকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তা কত লোক হবে? বললেন ঃ প্রায় তিন শো। আনাস বলেন ঃ রাসূল (সা) আমাকে খাবার পাত্রটি আনতে বললেন। আমি কাছে নিয়ে এলাম। তিনি তার ওপর হাত রেখে দু'আ করলেন। তারপর বললেন ঃ তোমরা দশজন দশজন করে বসবে, বিসমিল্লাহ বলবে এবং প্রত্যেকে নিজের পাশ থেকে খাবে। রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ মত সবাই পেট ভরে খেলো। তারপর তিনি আমাকে বললেন ঃ পাত্রটি উঠাও। আনাস বলেন ঃ আমি এগিয়ে এসে পাত্রটি উঠালাম। তারমধ্যে তাকিয়ে দেখলাম। কিন্তু আমি বলতে পারবো না, যখন রেখেছিলাম তখন বেশী ছিল, না যখন উঠালাম।[২৫] এ ছিল হযরত যায়নাবের (রা) ওলীমার সময়ের ঘটনা।

আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে একটি সুসভ্য জাতিতে পরিণত করতে চান। তাই তিনি জাহিলী যুগের মানুষের মধ্যে যে বর্বর ও অসভ্য রীতি-নীতি চালু ছিল তার কিছু বিলুপ্ত করার লক্ষ্যে হযরত যায়নাবের (রা) ওলীমার একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন।[২৬]

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ يَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ إِنٰهُ، وَلٰكِنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلاَ مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لاَ يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ -

–হে ঈমানদার লোকেরা তোমরা নবীর ঘরের মধ্যে বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়ো না; আর না এসে খাওয়ার সময়ের অপেক্ষায় বসে থাকবে। তবে তোমাদেরকে যদি খাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয় তবে অবশ্যই আসবে। কিন্তু খাওয়া হয়ে গেলে সংগে সংগে সরে পড়। কথায় মশগুল হয়ে বসে থেকোনা। তোমাদের এ ধরনের আচরণ নবীকে কষ্ট

---

২৫. হায়াতুস সাহাবা-২/২৬০-২৬১

২৬. সূরা আল-আহযাব-৫৩

দেয়। কিন্তু সে লজ্জায় কিছুই বলে না। আর আল্লাহ্ সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না।'

উপরোক্ত আয়াতে আরবদের কয়েকটি বদ-অভ্যাসের প্রতিবাদ করা হয়েছে।

১. প্রাচীনকালে আরববাসীরা অকুণ্ঠচিত্তে একজন আরেকজনের ঘরে প্রবেশ করতো। কারো সাথে সাক্ষাৎ করার প্রয়োজন হলে তার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আওয়ায দেওয়া এবং অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করার কোন বাধ্য বাধকতা কারও ছিল না। বরং ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে নারী ও শিশুদের নিকট জিজ্ঞেস করতো যে, গৃহস্বামী ঘরে আছে কি না। এই জাহিলী রীতি নানা প্রকারের দোষ-ক্রটির কারণ হয়ে দাঁড়াতো। অনেক সময় এর দরুন বিভিন্ন রকমের নৈতিক বিপর্যয়কারী অবাঞ্ছনীয় ঘটনাবলীর সূচনা হয়ে যেত। এ কারণে সর্বপ্রথম নবী কারীমের (সা) বাসগৃহে নিকটবর্তী কোন বন্ধু বা দূরবর্তী কোন আত্মীয় বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে পারবে না বলে নিয়ম ঘোষণা করা হয়। পরে সূরা আন-নূর-এর মাধ্যমে এ নিয়ম সকল মুসলমানের ঘরের জন্য সাধারণভাবে চালু করা হয়।

২. আরবদের মধ্যে আরেকটি বদ-অভ্যাস ও কু-প্রথা চালু ছিল। তারা কোন বন্ধু বা সাক্ষাতের লোকের ঘরে আহারের সময় দেখে উপস্থিত হতো, অথবা এ ধরনের লোকের ঘরে এসে আহারের সময় পর্যন্ত বসে থাকতো। স্বাভাবিকভাবেই এরূপ অবস্থায় গৃহস্বামী দারুণ বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যেত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে এই বদ অভ্যাস পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। আদেশ দিয়েছেন যে, কারও ঘরে খাওয়ার উদ্দেশ্যে কেবল তখনই যাবে যখন গৃহস্বামী খাওয়ার দাওয়াত দিবে। এই আদেশ কেবলমাত্র নবী কারীমের (সা) ঘরের জন্য ছিল না। বরং এই নিয়ম সাধারণভাবে সব মুসলমানের ঘরের সাধারণ প্রচলিত রীতিতে পরিণত হবে। এ উদ্দেশ্যে নমুনাস্বরূপ রাসূলের (সা) ঘরের কথা বলা হয়েছে মাত্র।

৩. এ আয়াতে আরেকটি বদ-অভ্যাসের প্রতিবাদ করা হয়েছে। সমাজে এমন লোকও দেখা যায়, যারা কারও বাড়ীতে আমন্ত্রিত হয়ে খাওয়ার জন্য যায় এবং খাওয়া শেষ হওয়ার পরও অহেতুক ধর্ণা দিয়ে বসে থাকে। আর পরস্পরে কথাবার্তার এমন এক ধারাবাহিকতা শুরু করে দেয় যে, তা আর শেষ হতেই চায় না। এর দরুন বাড়ীর মালিক ও ঘরের লোকদের কি অসুবিধা হয়, তা তারা মোটেই চিন্তা করে দেখে না। অনেকে রাসূলে কারীমকে (সা) পর্যন্ত অসুবিধায় ফেলতো। তিনি তাঁর সীমাহীন ভদ্রতা ও বিনম্র স্বভাবের কারণে এসব যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করে যেতেন। শেষ পর্যন্ত হযরত যায়নাবের (রা) ওলীমার দিন এরূপ একটি ঘটনা রাসূলুল্লাহর (সা) যন্ত্রণার চূড়ান্ত করে ছাড়ে। মূলত আয়াতটি নাযিলের কারণ সেই ঘটনা।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) বিশেষ খাদিম হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাত্রিকালে ছিল এই ওলীমার দাওয়াত। সাধারণ লোকেরা দাওয়াত খেয়ে বিদায় হয়ে চলে গেল। কিন্তু দুই তিনজন লোক ঠায় বসে নানা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে রইল।

রাসূলে কারীম (সা) অতিষ্ঠ হয়ে এক সময় উঠে পড়লেন এবং অন্দর মহলে বেগমদের নিকট হতে একবার ঘুরে আসলেন। ফিরে এসে তিনি দেখতে পেলেন, লোকগুলি অবিচলভাবে বসে আছে। তিনি আবার ভেতরে গেলেন ও 'আয়িশার (রা) ঘরে গিয়ে বসলেন, অনেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর যখন তিনি জানতে পারলেন যে, লোকগুলি চলে গেছে, তখন তিনি যায়নাবের (রা) ঘরে গমন করেন। এ ঘটনার পর স্বয়ং আল্লাহ তা'আলারই লোকদের এই বদ-অভ্যাস সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়ার আবশ্যক হয়ে পড়লো। হযরত আনাসের বর্ণনামতে আলোচ্য আয়াত ঠিক এই ঘটনা সম্পর্কেই নাযিল হয়।[২৭]

উপরে উল্লেখিত ঘটনার পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) ঘরের দরজায় পর্দা টানিয়ে দেন এবং মানুষকে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এটা পঞ্চম হিজরীর জিলকাদ মাসের ঘটনা।[২৮]

হযরত যায়নাবের (রা) বিয়ের মধ্যে এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যা আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ ঃ

১. পালিত ও ধর্মপুত্রকে যে ঔরসজাত পুত্রের সমান জ্ঞান করা হতো, সেই ভ্রান্তি দূর হয়।

২. দাস ও স্বাধীন ব্যক্তির মধ্যে মর্যাদার যে পর্বত পরিমাণ ব্যবধান ছিল তা দূর করে ইসলামী সাম্যের বাস্তব দৃষ্টান্ত এ বিয়েতে প্রতিষ্ঠিত হয়। দাস যায়িদকে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক অভিজাত খান্দান বনু হাশিমের সম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

৩. এ বিয়েকে কেন্দ্র করে হিজাবের হুকুম নাযিল হয় অথবা বলা চলে এ বিয়ে ছিল হিজাবের হুকুম নাযিলের পটভূমি।

৪. এ বিয়ের জন্য ওহী নাযিল হয়।

৫. এ বিয়ের ওলীমা হয় জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে।

এসবের কারণেই হযরত যায়নাব (রা) তাঁর অন্য সতীনদের সামনে গর্ব করতেন। একদিন তো তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলেই বসলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আমি আপনার অন্য কোন বিবির মত নই। তাঁদের মধ্যে এমন কেউ নেই যাঁর বিয়ে তাঁর পিতা, ভাই, অথবা খান্দানের কোন অভিভাবক দেননি। একমাত্র আমি- যার বিয়ে আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে আপনার সাথে সম্পন্ন করেছেন। আপনার ও আমার দাদা একই ব্যক্তি, আর আমার ব্যাপারে জিবরীল হলেন দূত।[২৯]

ইমাম জাহাবী বলেনঃ[৩০] فَزَوَّجَهَا اللّٰهُ بِنَبِيِّهِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شَاهِدٍ -

---

২৭. তাফহীম, আল-আহযাব-৫৩; মা'য়ারিফুল কুরআন, উক্ত আয়াতের তাফসীর। তাবাকাত-৮/১০৪; আল-বিদায়া-৪/১৪৬

২৮. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৩; সিয়ারুস সাহাবা-৬৪

২৯. তাবাকাত-৮/১০৪; আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৫;

৩০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১১

– 'আল্লাহ যায়নাবকে তাঁর নবীর (সা) সাথে কোন অভিভাবক ও সাক্ষী ছাড়াই বিয়ে দেন।'

রাসূলুল্লাহর (সা) বিবিগণের মধ্যে যাঁরা হযরত 'আয়িশার (রা) সমকক্ষতা দাবী করতে পারতেন তাঁদের মধ্যে হযরত যায়নাব (রা) অন্যতম। এ ব্যাপারে খোদ 'আয়িশার (রা) মন্তব্য ছিল এ রকমঃ[৩১]

هي التي تساومني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم -

– রাসূলুল্লাহর (সা) বিবিগণের মধ্যে একমাত্র তিনিই আমার সমকক্ষতার দাবীদার ছিলেন।

হযরত যায়নাবের (রা) এ দাবীর যৌক্তিকতাও ছিল। কারণ, তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফাতো বোন এবং রূপ ও সৌন্দর্যের অধিকারী। রাসূলুল্লাহও (সা) সব সময় তাঁকে খুশী রাখতে চাইতেন। হযরত যায়নাবের (রা) চরিত্রে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যা খুব কম নারীর মধ্যেই পাওয়া যেত। রাসূলুল্লাহর (সা) নৈকট্য লাভের ব্যাপারে হযরত আয়িশা (রা)ও তাঁর মধ্যে ভিতরে ভিতরে একটি প্রতিযোগিতার মনোভাব কাজ করতো। যা নারী স্বভাবের দাবী অনুযায়ী এক প্রকার পবিত্র ঈর্ষার রূপ লাভ করে। যাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'গিবতা' বলে। পবিত্র ঈর্ষা কথাটি এজন্য বলেছি যে, হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে তাঁদের একজনের অন্যজন সম্পর্কে যে সকল ধারণা, মতামত ও মন্তব্য বর্ণিত হয়েছে, তাতে কোনভাবেই অপবিত্র ঈর্ষার ভাব ফুটে উঠে না। কারণ প্রকৃত ঈর্ষা মানুষকে অন্ধ করে দেয়। প্রতিপক্ষের ভালো কোন কিছুই সে দেখতে পারে না এবং সহ্যও করতে পারে না। কিন্তু তাঁরা কেউই এমন ছিলেন না। রাসূলে পাকের (সা) পবিত্র সুহবতের বরকতে তাঁরা এত উদার ও মহানুভব হয়ে গিয়েছিলেন যে, একজন অপরজনের ভালো গুণগুলি অকপটে স্বীকার করেছেন। আমরণ মানুষের কাছে তা প্রচার করে গেছেন। এ কাজ কেবল বড় মাপের মানুষেরাই করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত হিসেবে 'ইফ্ক-এর ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। হযরত 'আয়িশার (রা) প্রতি কলঙ্ক আরোপের ঘটনা হলো 'ইফক'। এই ষড়যন্ত্রের সাথে হযরত যায়নাবের (রা) বোন হযরত হামনা বিনত জাহাশও জড়িয়ে পড়েন। তিনি মনে করেন, এই সুযোগে বোন যায়নাবের (রা) সতীন ও প্রতিদ্বন্দ্বী 'আয়িশাকে (রা) কাবু করতে পারলে বোন যায়নাব অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যাবেন। বোনের শুভ চিন্তায় তিনি এই নোংরা ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েন।

আমাদের দেখার বিষয় হলো, এ সময় হযরত যায়নাবের (রা) ভূমিকা কি ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী সতীনকে ঘায়েল করার, পথের কাঁটা দূর করার চমৎকার একটা সুযোগ। এমন মোক্ষম সুযোগ জগতের কোন সতীন হাতছাড়া করেছে বলে জানা যায়না। কিন্তু হযরত যায়নাব (রা) নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার যে স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন তাতে তাঁর মত লোকের

---

৩১. মুসলিম (২৪২২), ফাদায়িমুস সাহাবা; প্রাগুক্ত-২/২১৩,

পক্ষে এমন নোংরা ষড়যন্ত্রের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন এমন কল্পনা করা যায় কেমন করে! তাই হযরত 'আয়িশার (রা) সে দুর্যোগের দিনে একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) 'আয়িশা (রা) সম্পর্কে হযরত যায়নাবের (রা) মতামত জানতে চাইলেন। হযরত যায়নাব (রা) অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বললেন,

مَا عَلِمْتُ اِلاَّ خَيْرًا -

আমি তাঁর মধ্যে ভালো ছাড়া আর কিছুই জানিনে। পরে হযরত আয়িশার (রা) পবিত্রতা ঘোষণা করে আল-কুরআনের দশটি আয়াত নাযিল হয়। আর সেইসাথে হযরত যায়নাবের (রা) সত্যবাদিতা ও উন্নত নৈতিকতাও প্রমাণিত প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত 'আয়িশা (রা) আজীবন হযরত যায়নাবের (রা) এ ঋণ মনে রেখেছেন। সারা জীবন তিনি মানুষের কাছে সে কথা বলেছেন। যায়নাবের (রা) মধ্যে যত গুণাবলী তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, অকপটে তা মানুষকে জানিয়েছেন। ইবন হাজার আল-আসকিলানী (রহ) লিখেছেনঃ৩২

وَقَدْ وَصَفَتْ عَائِشَةَ زَيْنَبَ بِالْوَصْفِ الْجَمِيْلِ فِىْ قِصَّةِ الْاِفْكِ -

–হযরত 'আয়িশা (রা) 'ইফক'-এর ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত যায়নাবের (রা) ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

হযরত 'আয়িশার (রা) মত প্রখর বুদ্ধিমতী, বিদূষী ও মহিয়সী নারী যখন হযরত যায়নাবের (রা) প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তখন তাঁর মর্যাদা ও স্থান যে কোন স্তরে তা অনুমান করতে আর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ হযরত 'আয়িশা (রা) তাঁর খোদাপ্রদত্ত ও তীক্ষ্ণ মেধা দিয়ে গভীরভাবে অতি নিকট থেকে হযরত যায়নাবকে (রা) পর্যবেক্ষণ অধ্যয়ন করেছিলেন। হাদীসের গ্রন্থাবলীতে হযরত 'আয়িশার (রা) যেসব উক্তি ছড়িয়ে আছে তাতেই হযরত যায়নাবের (রা) প্রকৃত মর্যাদা ফুটে উঠেছে। হযরত আয়িশা বলেন ঃ৩৩

لَمْ أَرَقَطُّ خَيْرًا فِىْ الدِّيْنِ مِنْ زَيْنَبَ وَأَتْقٰى لِلّٰهِ وَأَصْدَقُ حَدِيْثًا وَأَوْصَلُ لِلرَّحْمِ وَاَعْظَمُ صَدَقَةً وَأَشَدُّ اِبْتِذَالاً لِنَفْسِهَا فِى الْعَمَلِ الَّذِىْ تَصَدَّقُ بِهِ وَتُقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللّٰهِ مَا عَدَا سُوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيْهَا تَسْرَعُ مِنْهَا الْفَيْئَةُ -

–'আমি যায়নাবের (রা) চেয়ে কোন মহিলাকে বেশী দ্বীনদার, বেশী পরহেযগার, বেশী

৩২. আল-ইসাবা-৪/৩১৩
৩৩. মুসলিম (২৪২২), ফাদায়িলু যায়নাব; আহমাদ-৬/১৫১

সত্যভাষী, বেশী উদার, দানশীল, সৎকর্মশীল এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে বেশী তৎপর দেখিনি। শুধু তাঁর মেজাজে একটু তীক্ষ্ণতা ছিল। তবে তার জন্য তিনি খুব তাড়াতাড়ি লজ্জিত হতেন।'

আল্লামা ইবন 'আবদিল বার হযরত যায়নাব (রা) সম্পর্কে হযরত 'আয়িশার (রা) নিম্নোক্ত মন্তব্যটি বর্ণনা করেছেন ঃ৩৪

مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً قَطُّ فِى الدِّيْنِ مِنْ زَيْنَبَ -

–দ্বীনের ব্যাপারে আমি যায়নাবের (রা) চেয়ে ভালো কোন মহিলা কক্ষণো দেখিনি।

ইবন সা'দ হযরত আয়িশার (রা) নিম্নোক্ত মন্তব্যটি সংকলন করেছেন ঃ৩৫

يَرْحَمُ اللّٰهُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ لَقَدْ نَالَتْ فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا الشَّرَفَ لَا يَبْلُغُهُ شَرَفٌ إِنَّ اللّٰهَ زَوَّجَهَا بِنَبِيِّهِ فِى الدُّنْيَا وَنَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ -

–আল্লাহ যায়নাব বিন্ত জাহশের প্রতি সদয় হোন! সত্যিই তিনি দুনিয়াতে অতুলনীয় সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছেন। আল্লাহ স্বয়ং তাঁর নবীর সাথে তাঁকে বিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর উপলক্ষে আল কুরআনের কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে।

হযরত আয়িশা (রা) আরও বলেছেনঃ 'রাসূল (সা) পরকালে তাঁর সাথে সর্বপ্রথম মিলিত হওয়ার এবং জান্নাতে তাঁর স্ত্রী হওয়ার সুসংবাদ দান করে গেছেন।'৩৬

হযরত উম্মু সালামা (রা) তাঁর সম্পর্কে বলেছেনঃ৩৭

كَانَتْ صَالِحَةً صَوَّامَةً قَوَّامَةً -

অর্থাৎ তিনি ছিলেন খুব বেশী সৎকর্মশীলা, বেশী সাওম পালনকারিনী ও বেশী বেশী সালাত আদায়কারিনী।

রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হযরত যায়নাবের (রা) যে একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল সেকথা বিভিন্ন ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয়। একবার একটি ব্যাপারে 'আযওয়াজে মুতাহ্হারাত' (পবিত্র সহধর্মিণীগণ) রাসূলুল্লাহকে (সা) রাজী করানোর জন্য হযরত ফাতিমাকে (রা) দূত হিসেবে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠান। কিন্তু তিনি দূতিয়ালীতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। তখন সকলে একমত হয়ে এই দূতিয়ালীর জন্য নির্বাচন করেন হযরত যায়নাবকে (রা)। কারণ তাঁদের সকলের দৃষ্টিতে তিনিই এ কাজের যোগ্য ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসের সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গিয়ে

---

৩৪. আল-ইসতীয়াব-২/৭৫৪

৩৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১৫; তাবাকাত-৮/১০৩

৩৬. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৫

৩৭. আল-ইসাবা-৪/৩১৩; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১৭

অত্যন্ত প্রবলভাবে একথা প্রমাণ করতে চান যে, হযরত 'আয়িশা (রা) এই মর্যাদার যোগ্য নন। হযরত আয়িশা (রা) পাশে বসেই চুপ করে তাঁর বক্তব্য শুনছিলেন, আর রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারা মুবারকের প্রতি আড় চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। হযরত যায়নাবের (রা) বক্তব্য শেষ হলে হযরত 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতি নিয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং এমন শক্তিশালী বক্তব্য উপস্থাপন করেন যে, যায়নাব (রা) নিরুত্তর হয়ে যান। তখন রাসূল (সা) বলেন ঃ এমন কেন হবেনা, আবু বকরের মেয়ে তো।[৩৮]

হযরত যায়নাব (রা) ছিলেন খুবই দানশীল, দরাজহস্ত, আল্লাহ-নির্ভর ও স্বল্পে তুষ্ট মহিলা। ইয়াতিম, দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্তদের আশা-ভরসার কেন্দ্রস্থল বলে বিবেচিত হতেন। গরীব-দুঃখীদের প্রতি তাঁর দয়া-মমতার শেষ ছিল না। ইবন সা'দ বর্ণনা করেছেন ঃ[৩৯]

مَا تَرَكَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ دِرْهَمًا وَلاَ دِينَارًا كَانَتْ تَصَدَّقُ لِكُلِّ مَا وَقَدَتْ عَلَيْهِ وَكَانَتْ مَأْوَاى الْمَسَاكِين ـ

–'যায়নাব বিন্‌ত জাহাশ দিরহাম-দীনার কিছুই রেখে যাননি। যা কিছুই তাঁর হাতে আসতো দান করে দিতেন। তিনি ছিলেন গরীব-মিসকীনদের আশ্রয়স্থল।

হযরত যায়নাব (রা) একজন হস্তশিল্পী ছিলেন। তিনি নিজহাতে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় চামড়া দাবাগাত করে পাকা করতেন এবং তার থেকে যে আয় হতো তা সবই অভাবী মানুষদের দান করতেন।[৪০]

হযরত আয়িশা (রা) থেকে আরেকটি বর্ণনায় এসেছে। যায়নাব (রা) হাতে সূতা কেটে রাসূলুল্লাহর (সা) যুদ্ধবন্দীদেরকে দিতেন। আর তারা কাপড় বুনতো। রাসূলুল্লাহ (সা) যুদ্ধের কাজে তা ব্যবহার করতেন।[৪১] তাঁর দানের হাত এমন ছিল যে, খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাঁর জন্য বাৎসরিক বারো হাজার দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করে দেন; কিন্তু তিনি কখনও তা গ্রহণ করেননি। একবার উমার (রা) তাঁর এক বছরের ভাতা পাঠালেন। হযরত যায়নাব দিরহামগুলি একখানা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেন। তারপর বাযরাহ ইবন রাফে'কে নির্দেশ দেন দিরহামগুলো আত্মীয়-স্বজন ও গরীব মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করার জন্য। বাযরাহ বললেন, এতে আমাদেরও কি কিছু অধিকার আছে? তিনি বললেন কাপড়ের নীচে যেগুলি আছে সেগুলি তোমার। সেগুলি কুড়িয়ে গুণে দেখা গেল পঞ্চাশ মতান্তরে পঁচাশি দিরহাম। সব দিরহাম বন্টন করার পর তিনি দু'আ করেন এই বলে ঃ[৪২] اَللّٰهُمَّ لاَ يُدْرِكْنِى هٰذَا الْمَالُ قَابِلٌ فَإِنَّهُ فِتْنَةٌ ـ

---

৩৮. আনসাবুল আশরাফ-১/৪১৫
৩৯. তাবাকাত-৮/১০৪
৪০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১৭; আল-হাকেম-৪/২৫; আল- ইসাবা-৪/৩১৪
৪১. হায়াতুস সাহাবা-২/১৬৯ .
৪২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১২

'হে আল্লাহ! আগামীতে এই অর্থ যেন আমাকে আর না পায়। কারণ, এ এক পরীক্ষা।' এ খবর হযরত উমারের (রা) কানে গেল। তিনি মন্তব্য করলেন ঃ

هَذِهِ امْرَأَةٌ يُرَادُبِهَا خَيْرٌ-

'এ এমন মহিলা যার থেকে শুধু ভালো আশা করা যায়। তারপর হযরত উমার (রা) কিছুক্ষণ তাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন এবং সালাম বলে পাঠান। তিনি যায়নাবকে (রা) বলেন, আপনি যা কিছু করেছেন সবই আমি জেনে গেছি। ফিরে গিয়ে তিনি আরও এক হাজার দিরহাম তাঁর খরচের জন্য পাঠান। তিনি সেগুলিও আগের মত খরচ করে ফেলেন। ঐতিহাসিকরা বলছেন, হযরত যায়নাবের (রা) উপরোক্ত দু'আ কবুল হয় এবং তিনি সে বছরই ইনতিকাল করেন।[৪৩]

হযরত যায়নাব যে চূড়ান্ত পর্যায়ের খোদাভীরু, বিনয়ী ও 'আবিদা মহিলা ছিলেন তার সাক্ষ্য দিয়েছেন খোদ রাসূলুল্লাহ (সা)। একবার রাসূল (সা) মুহাজিরদের মধ্যে গনীমতের মাল বন্টন করছিলেন। মাঝখানে হযরত যায়নাব তাঁকে কিছু বলে ওঠেন। সাথে সাথে হযরত 'উমার (রা) তাঁকে এক ধমক লাগান। রাসূল (সা) 'উমারকে (রা) বলেন, তাকে কিছু বলো না। সে একজন বড় আবিদ ও যাহিদ মহিলা।[৪৪]

## মৃত্যু

খলীফা হযরত উমারের (রা) খিলাফতকালে হিজরী ২০ সনে হযরত যায়নাব (রা) ইনতিকাল করেন। সে বছরই মিসর বিজয় হয়। হাফেজ ইবন হাজারের মতে তিনি তিপ্পান্ন বছর জীবন পেয়েছিলেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মত এটাই। কিন্তু ঐতিহাসিক ওয়াকিদীর মতে হযরত যায়নাবের (রা) মোট জীবনকাল পঞ্চাশ বছর। আর যা অধিকাংশের মতের পরিপন্থী। আল-ওয়াকিদী আরও বলেছেন, রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বছর; পক্ষান্তরে অন্যদের মতে আটত্রিশ বছর।[৪৫]

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর দানের স্বভাব বিদ্যমান ছিল। নিজের কাফনের ব্যবস্থা নিজেই করে যান। তবে তিনি আপনজনদের বলে যান, আমার মৃত্যুর পর 'উমার (রা) কাফনের কাপড় পাঠাতে পারেন, যদি তেমন হয় তাহলে দুইটির যে কোন একটি কাফন গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিবে।[৪৬] হযরত উমার (রা) পাঁচখানা কাপড় পাঠান এবং তাই দিয়ে কাফন দেওয়া হয়। আর হযরত যায়নাব (রা) যে কাপড় রেখে গিয়েছিলেন তাঁর বোন হাফসা তা দান করে দেন।[৪৭] তিনি আরও অসীয়াত করে যান যে,

---

৪৩. তাবাকাত-৮/১০৯; আল-ইসাবা-৪/১১৪
৪৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১৭
৪৫. আল-ইসাবা-৪/৩১৫
৪৬. তাবাকাত-৮/১০৯; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১১
৪৭. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৫

রাসূলুল্লাহকে (সা) যে খাটিয়াতে করে কবরের কাছে নেওয়া হয়েছিল, তাঁকেও যেন সেই খাটিয়াতে উঠানো হয়। তিনিই প্রথম মহিলা যাঁকে হযরত আবু বকরের (রা) পরে এই খাটিয়ায় ওঠানো হয়।[৪৮] তাঁর দুইটি অসীয়াতই পালিত হয়। রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য বিবিগণ তাঁকে গোসল দেন।[৪৯]

খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং আল-বাকী গোরস্তানে দাফন করা হয়।

রাবী'আ ইবন আবদিল্লাহ্ বলেন ঃ 'আমি 'উমারকে দেখলাম, তাঁর এক কাঁধে দুররা ঝোলানো। সেই অবস্থায় সামনে গেলেন এবং চার তাকবীরের সাথে যায়নাবের (রা) জানাযার নামায পড়ালেন, কবরের উপরে পানি ছিটিয়ে দেওয়া পর্যন্ত তিনি কবরের পাশে ছিলেন।[৫০]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আবী সুলাইত (রা) বলেন ঃ আমি আবু আহমাদ ইবন জাহাশকে (যায়নাবের (রা) ভাই) দেখলাম কাঁদতে কাঁদতে যায়নাবের (রা) লাশবাহী খাটিয়া বহন করছেন। তিনি ছিলেন অন্ধ। আমি শুনলাম, উমার (রা) তাঁকে বলছেন, আবু আহমাদ, তুমি খাটিয়া থেকে সরে এসো, যাতে মানুষের চাপে কষ্ট না পাও। আবু আহমাদ বললেন ঃ 'উমার, তাঁরই অসীলায় আমরা সব কল্যাণ লাভ করেছি। আমার এই কান্না আমার ভিতরের তীব্র জ্বালাকে প্রশমিত করছে। উমার বললেন ঃ ঠিক আছে, থাক, থাক।[৫১]

হযরত যায়নাবকে (রা) যখন দাফন করা হচ্ছিল ঠিক সেই সময় একজন কুরাইশ যুবক দুইখানা মিসরীয় রঙ্গিন কাপড়ে সেজে, চুলে চিরুনী করে উপস্থিত হয়। 'উমার, (রা) তাঁর মাথার উপর ছড়ি তুলে ধরে বলেন, তুমি যেভাবে এসেছো তাতে মনে হচ্ছে আমরা খেলা করছি। এখানে প্রবীণরা তাঁদের মাকে দাফন করছে।[৫২] তখন ছিল প্রচণ্ড গরমের দিন। যেখানে কবর খোঁড়া হচ্ছিল হযরত 'উমার (রা) সেখানে তাঁবু টানিয়ে দেন। বলা হয়ে থাকে যে, এ ছিল প্রথম তাঁবু যা বাকী'র কোন কবরের উপর টানানো হয়েছিল।[৫৩] লাশ কবরে নামানোর সময় হযরত উমার (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য

৪৮. প্রাগুক্ত ১/৪৩৬; তাবাকাত-৮/১০৭; হযরত রাসূলে কারীমকে (সা) যে খাটিয়ায় উঠানো হয়েছিল সেই খাটিয়ায় হযরত আবু বকরের (রা) পরে হযরত যায়নাবকে (রা) উঠানো হয়। তারপর থেকে মদীনার লোকদেরকে সেই খাটিয়ায় বহন করা হতো। মারওয়ান মদীনার গভর্নর হওয়ার আগ পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকে। মারওয়ান কেবল সম্মানীয় ব্যক্তিদের ছাড়া অন্যদের জন্য ঐ খাটিয়ার ব্যবহার বন্ধ করে দেন। বিকল্প হিসেবে তনি বহু খাটিয়া তৈরী করে মদীনায় বিতরণ করেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৬)

৪৯. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৬

৫০. প্রাগুক্ত

৫১. তাবাকাত-৮/১০৯; হায়াতুস সাহাবা-২/৫৯৬

৫২. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৭

৫৩. তাবাকাত-৮/১০৯; আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৬,

বিবিগণের নিকট জানতে চান যে, তাঁর কবরে কে কে নামবে? তাঁরা বলেন, জীবদ্দশায় যারা তাঁর কাছে যাওয়া-আসা করতো তারা নামবে। অতঃপর হযরত 'উমারের (রা) নির্দেশে মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহ ইবন জাহাশ, উসামা ইবন যায়িদ, আবদুল্লাহ ইবন আবী আহমাদ ইবন জাহাশ ও মুহাম্মাদ ইবন তালহা (রা) কবরে নামেন। তাঁরা সকলে ছিলেন হযরত যায়নাবের (রা) আত্মীয় স্বজন।[৫৪]

হযরত যায়নাবের (রা) মৃত্যুতে হযরত 'আয়িশা (রা) দারুণ শোকাভিভূত হন। তিনি তাঁর সেই সময়ের অনুভূতি প্রকাশ করেন এভাবে ঃ[৫৫]

لقد ذهبت حميدة فقيدة مفزعا للارامل واليتامى

–তিনি প্রশংসিত ও অতুলনীয় অবস্থায় চলে গেলেন। ইয়াতীম ও বিধবাদের অস্থির করে রেখে গেলেন। হযরত যায়নাব (রা) যেদিন মারা যান সেদিন মদীনায় গরীব-মিসকীন ও অভাবী মানুষরা শোকে আহাজারি শুরু করে দেয়।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) খায়বারে উৎপন্ন ফসল থেকে হযরত যায়নাবের (রা) জন্য এক শো ওয়াসাক শস্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।[৫৬]

হযরত যায়নাব (রা) উত্তরাধিকার হিসেবে শুধু একটি বাড়ী রেখে যান। উমাইয়্যা খলীফা ওয়ালীদ ইবন আবদুল মালিক তাঁর খিলাফতকালে পঞ্চাশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে তাঁর নিকট-আত্মীয়দের থেকে বাড়ীটি খরীদ করে মসজিদে নববীর সাথে মিলিয়ে দেন।[৫৭]

হযরত যায়নাব (রা) খুব কম হাদীস বর্ণনা করতেন। হাদীসের গ্রন্থাবলীতে তাঁর বর্ণিত মাত্র এগারোটি হাদীস সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে দুইটি মুত্তাফাক আলাইহি।[৫৮] তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে হযরত উম্মু হাবীবা (রা), যায়নাব বিন্‌ত আবী সালামা, মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহ ইবন জাহাশ, কুলসুম বিন্‌ত তালাক এবং দাস মাজকুর বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৫৯]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) ওফাতের পূর্বে একবার তাঁর বিবিগণের কাছে বলেন ঃ[৬০]

أَسْرَعُكُنَّ لِحَاقًابِىْ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا -

–তোমাদের মধ্যে খুব দ্রুত সেই আমার সাথে মিলিত হবে যার হাত সবচেয়ে বেশী লম্বা। তিনি হাত লম্বা দ্বারা রূপক অর্থে দানশীলতা বুঝিয়েছেন। কিন্তু সম্মানিত বিবিগণ

---

৫৪. উসুদুল গাবা-৫/৪৬৫; তাবাকাত-৮/১০৯

৫৫. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৫

৫৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১৫

৫৭. তাবারী-১৩/২৪৪৯; তাবাকাত-৮/১০৯; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১৮

৫৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১৮

৫৯. প্রাগুক্ত।

৬০. প্রাগুক্ত।

শব্দগত অর্থ বুঝেছিলেন। এ কারণে তাঁরা একত্র হলে পরস্পর পরস্পরের হাত মেপে দেখতেন যে, কার হাত বেশী লম্বা। যায়নাব (রা) ছিলেন ছোট খাট মানুষ। যায়নাব বিনত জাহাশের (রা) ইনতিকাল না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা এমন করতেন। কিন্তু তিনি যখন সবার আগে মারা গেলেন তখন গভীরভাবে চিন্তা করে তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) কথার তাৎপর্য বুঝতে পারেন। তাই হযরত আয়িশা (রা) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ৬১

كَانَتْ اَطْوَلُنَا يَدًا زَيْنَبُ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدٍ وَتَتَصَدَّقُ

–আমাদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা হাতের অধিকারিণী ছিলেন যায়নাব। কারণ, তিনি নিজের হাতে কাজ করে উপার্জন করতেন এবং তা দান করতেন।

অনেকে মনে করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এ মন্তব্য দ্বারা হযরত যায়নাব বিন্‌ত খুযায়মাকে (রা) বুঝিয়েছেন। কিন্তু তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ, হযরত যায়নাব বিন্‌ত খুযায়মা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) আগেই ইনতিকাল করেন।

হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে যেসব বর্ণনা এসেছে তাদ্বারা একথা বুঝা যায় যে, হযরত যায়নাব (রা) খুবই রূপবতী মহিলা ছিলেন। একবার হযরত 'উমার (রা) তার মেয়ে হযরত হাফসাকে (রা) উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন ঃ৬২

لَا تُرَاجِعِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِنَّهُ لَيْسَ لَكِ جَمَالُ زَيْنَبَ وَلَا حَظَّةَ عَائِشَةَ -

–তুমি রাসূলুল্লাহর (সা) কথার প্রত্যুত্তর করবে না। কারণ তোমার না আছে যায়নাবের রূপ-সৌন্দর্য, আর না আছে আয়িশার স্বামী সোহাগ।

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর অন্য বিবিগণ হজ্জ আদায় করলেও হযরত সাওদা (রা) ও হযরত যায়নাব (রা) আর হজ্জ করেননি। তাঁরা আর ঘর থেকে বের হননি।৬৩ তাঁরা দুইজন আল্লাহ ও রাসূলের (রা) নির্দেশ সেভাবেই বুঝেছিলেন।

---

৬১. মুসলিম (২৪৫৩)-ফাদায়িলু যায়নাব; বুখারী-৩/২২৬; আল-ইসাবা-৪/৩১৪

৬২. আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৭

৬৩. প্রাগুক্ত-১/৪৬৫।

# জুওয়াইরিয়া বিন্‌ত হারিস (রা)

উম্মুল মুমিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) আরবের বিখ্যাত খুযা'আ গোত্রের 'মুসতালিক' শাখার কন্যা। পিতা হারিস ইবন দিরার ছিলেন বনু মুসতালিকের নেতা।[১]

হযরত জুওয়াইরিয়ার (রা) প্রথম বিয়ে হয় তাঁরই গোত্রের 'মুসাফি' ইবন সাফওয়ান' (জী শুফার) নামের এক ব্যক্তির সাথে। তিনি ছিলেন হযরত জুওয়াইরিয়ার (রা) চাচাতো ভাই এবং 'জী আশ-শুফার' নামে প্রসিদ্ধ।[২] পিতা হারিস ও স্বামী মুসাফি' উভয়ে ছিলেন ইসলামের চরম শত্রু। পরে তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৩]

### বনু আল-মুসতালিক-এর যুদ্ধ

'মুসতালিক' হলো বনু খুযা'আ গোত্রের জুজায়মা ইবন সা'দ নামের এক ব্যক্তির উপাধি। আর বনু খুযা'আ গোত্রের একটি পানির কূপের নাম হলো 'আল-মুরাইসী'। বনু মুসতালিক অভিযানে হযরত রাসূলে কারীম (সা) বাহিনীসহ এই কূপের ধারে অবস্থান করেন, তাই ইতিহাসে এই অভিযান 'বনু মুসতালিক' অথবা 'আল-মুরাইসী'র যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। এ অভিযান পরিচালিত হয় হিজরী পঞ্চম সনের শা'বান মাসে। অবশ্য অনেকে ষষ্ঠ সনের কথাও বলেছেন।[৪] কিন্তু তা সঠিক বলে মনে হয় না।

হিজরী পঞ্চম সনে রাসূলুল্লাহ (সা) খবর পেলেন যে, বনু আল-মুসতালিক-এর নেতা হারিস ইবন দিরার মক্কার কুরাইশদের প্ররোচনায় নিজের ও অন্য আরব গোত্রের লোকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণের তোড়জোড় শুরু করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) খবরটির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বুরাইদা ইবন আল-হুসাইব আল-আসলামীকে (রা) পাঠালেন। তিনি সেখানে পৌঁছে সরাসরি হারিসের সাথে কথা বলে বুঝলেন, ঘটনা সত্য। তিনি সাথে সাথে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহকে (সা) প্রকৃত অবস্থা জানালেন। কাল বিলম্ব না করে রাসূল (সা) সাহাবীদেরকে অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন।

বাহিনী প্রস্তুত হলো। রাসূলুল্লাহ (সা) যায়িদ ইবন হারিসা (রা), মতান্তরে আবু জার আল-গিফারীকে মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করে নিজেই বাহিনী নিয়ে যাত্রা করেন। কোন কোন বর্ণনায় নুমাইলা ইবন আবদিল্লাহ আল-লাইসীকে মদীনায় খীলফা হিসেবে রেখে যাওয়ার কথা এসেছে। যাই হোক, তিনি পঞ্চম হিজরীর শা'বান মাসের ২ তারিখ

---

১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৬১
২. তাবাকাত-৮/১১৬; আল-ইসাবা-৪/২৬৬,
৩. উসুদুল গাবা-১/৪০০; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৬৩
৪. আল-ইসাবা-৪/২৬৫

মদীনা থেকে বের হন এবং মদীনা থেকে নয় মানযিল দূরে 'মুরাইসী' পৌছে যাত্রাবিরতি করেন।

হারিসের নেতৃত্বে গঠিত কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনীর নিকট সব খবর পৌঁছে গেল। তারা ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়লো। অন্যান্য আরব গোত্র প্রতিরোধের ইচ্ছা ত্যাগ করে যার যার মত বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। হারিসের সংগে থাকলো শুধু তার গোত্রের লোকেরা। তারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো এবং দীর্ঘক্ষণ তীর-বর্শা ছুড়ে ছুড়ে মুসলিম বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখলো। অবশেষে মুসলিম বাহিনী হঠাৎ করে একসাথে আক্রমণ করে বসে এবং শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করে। নেতা আল-হারিস পালিয়ে যায়।

এগারোজন কাফির সৈন্য মারা যায় এবং অন্যরা সকলে বন্দী হয়। মুসলিম বাহিনীর কোন সৈন্য শাহাদাত বরণ করেনি। তবে ভুলক্রমে হযরত 'উবাদা ইবন সামিতের (রা) হাতে হিশাম ইবন সাবাবা নামে এক ব্যক্তি শহীদ হন। শত্রুপক্ষের পুরুষ-নারী-শিশু মিলে প্রায় ৬০০ জন বন্দী হয় এবং তাদের দুই হাজার উট পাঁচ হাজার ছাগল-ভেড়া গনীমাত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) হিসেবে মুসলিম বাহিনী লাভ করে।[৫]

এই যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে হযরত জুওয়াইরিয়াও (রা) ছিলেন। ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসের কোন কোন গ্রন্থেও তাঁর বর্ণনাটি সংকলিত হয়েছে। সকল যুদ্ধবন্দীকে দাস-দাসী ঘোষণা করে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়। হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) পড়েন হযরত সাবিত ইবন কায়সের (রা) মতান্তরে তাঁর চাচাতো ভাইয়ের ভাগে। তিনি ছিলেন গোত্রীয় নেতার কন্যা। তদুপরি তাঁর ছিল প্রবল আত্মসম্মানবোধ, কোমল স্বভাব, রূপ ও সৌন্দর্য। দাসীর জীবন মেনে নিতে পারলেন না। তিনি হযরত সাবিত ইবন কায়সের (রা) নিকট 'মুকাতাবা'-এর আবেদন জানালেন। সাবিত (রা) নয় উকিয়া স্বর্ণের বিনিময়ে দাসত্ব থেকে মুক্তিদানের 'মুকাতাবা' বা চুক্তি করলেন। কিন্তু হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) এ পরিমাণ অর্থ কোথায় পাবেন? তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, মানুষের কাছে সাহায্যের হাত পেতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করবেন।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) গনীমাতের মাল বন্টন শেষ করার পর হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) তাঁর সামনে এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইসলাম গ্রহণ করে এসেছি। আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্নাকা রাসূলুহু।' আমি আমার গোত্রপতি হারিস ইবন দিরারের কন্যা। মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয়ে এসেছি এবং সাবিত ইবন কায়সের ভাগে পড়েছি। সাবিত আমার সাথে 'মুকাতাবা' করেছেন। কিন্তু আমি অর্থ পরিশোধ করতে পারছিনে। আমি আপনার নিকট এই প্রত্যাশা নিয়ে এসেছি যে, আপনি আমার চুক্তিবদ্ধ অর্থ পরিশোধে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি কি এর চেয়ে ভালো কিছু আশা কর না? বললেন, তা কী? রাসূল

৫. আসাহ আস-সিয়ার-১৭২

(সা) বললেন, আমি তোমার চুক্তিকৃত সকল অর্থ পরিশোধ করে দিই এবং তোমাকে বিয়ে করি। এমন অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) দারুণ খুশী হন এবং সম্মতি প্রকাশ করেন। অতঃপর হযরত রাসূলে কারীম (সা) সাবিতকে ডেকে পাঠান এবং চুক্তিকৃত অর্থ তাঁকে দান করে জুওয়াইরিয়াকে (রা) দাসত্ব থেকে মুক্ত করেন। তারপর তাঁকে বিয়ে করে স্বাধীন স্ত্রীর মর্যাদা দান করেন। ইবন ইসহাক ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন।[৬]

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত জুওয়াইরিয়ার (রা) পিতা হারিস ছিলেন আরবের একজন অন্যতম নেতা। মুসলিম বাহিনীর হাতে তাঁর কন্যা বন্দী হলে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বলেন, 'আমার কন্যা দাসী হতে পারে না। আমার মর্যাদা দাসত্বের অনেক উর্ধে। আপনি তাঁকে মুক্ত করে দিন।' রাসূল (সা) বললেন, বিষয়টি জুওয়াইরিয়ার মর্জির উপর ছেড়ে দেওয়া হোক– সেটাই কি ভালো হবে না? হারিস কন্যা জুওয়াইরিয়ার নিকট যেয়ে বললেন, মুহাম্মাদ তোমার মর্জির উপর তোমাকে ছেড়ে দিয়েছেন। দেখ, তুমি যেন আমাকে লজ্জায় ফেলো না। জুওয়াইরিয়া পিতাকে বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে থাকতে পছন্দ করছি।' অতঃপর রাসূল (সা) তাঁকে বিয়ে করেন।[৭]

ইবন সা'দ তাবাকাতে একথাও উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর পিতাই তাঁর মুক্তিপণ পরিশোধ করেন। যখন তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে যান তখন তাঁর সম্মতিতে রাসূল (সা) তাঁকে বিয়ে করেন।

বিয়ের খবর যখন মুসলিম মুজাহিদদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো, তখন তাঁরা বললেন, বনু আল-মুসতালিক তো এখন রাসূলুল্লাহর (সা) সম্মানিত শ্বশুরকুল। যে খান্দানে রাসূলুল্লাহ (সা) বিয়ে করেছেন, তাঁরা কক্ষণো দাস-দাসী হতে পারে না। এরপর তাঁরা পরামর্শ করলেন এবং একজোট হয়ে একসাথে সকল বন্দীকে মুক্ত করে দিলেন।[৮]

ইবনুল আসীর লিখেছেন, এই উপলক্ষে বনু মুসতালিকের এক শো বাড়ীর সকল বন্দী মুক্তি পায়। ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম আহমাদ হযরত 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ[৯]

مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهَا عَلَى قَوْمِهَا -

'আমি কোন নারীকে তার সম্প্রদায়ের জন্য জুওয়াইরিয়া থেকে অধিকতর কল্যাণময়ী দেখিনি।'

ইবন ইসহাক বলেছেন, এক শো বাড়ী অর্থ এক শো মানুষ নয়। কেন না, তাদের সংখ্যা

---

৬. তাবাকাত-৮/১১৬; সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৯৪, ২৯৫; আল-ইসাবা-৪/২৬৫

৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৬৩; তাবাকাত-৮/১১৮

৮. সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৯৪, ২৯৫; আল-ইসতী'য়াব-৪/২৬০; আবু দাউদ : কিতাবুল 'ইতাক-২/১০৫; তাবাকাত-৮/১১৬

৯. উসুদুল গাবা-৫/৪২০; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৫/১৫৯

সাত শো'রও অধিক ছিল। এক শো বাড়ী অর্থ এক শো বাড়ীর মানুষ।[১০]

ইবনুল আসীরসহ অনেকে ঘটনাটি এভাবেও বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রী হিসেবে ঘর করা শুরু করেছেন। পিতা হারিস তা জানতেন না। তিনি কন্যাকে মুক্ত করার জন্য অনেকগুলি উটের উপর মুক্তিপণের অর্থ-সম্পদ বোঝাই করে মদীনার দিকে যাত্রা করেন। পথে আকীক উপত্যকায় পৌঁছে উটগুলি চরানোর জন্য লাগামমুক্ত করে দেন। সেই উটগুলির মধ্যে দুইটি উট ছিল তাঁর অতি প্রিয়। এ কারণে তিনি উট দুইটি একটি গোপন স্থানে বেঁধে রাখেন। এরপর তিনি মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে পৌঁছে আরজ করেন ঃ

'আপনি আমার কন্যাকে বন্দী করে নিয়ে এসেছেন। এই নিন তার মুক্তিপণ এবং তাকে আমার সাথে যাওয়ার অনুমতি দিন।'

তারপর তিনি যে অর্থ-সম্পদ, উট ইত্যাদি নিয়ে এসেছিলেন, এক এক করে সবই উপস্থাপন করতে লাগলেন। তখন রাসূল (সা) তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, 'সেই উট দুইটি কোথায়, যাদেরকে আকীক উপত্যায় লুকিয়ে রেখে এসেছো?'

রাসূলুল্লাহর (সা) এই অবগতিতে হারিস দারুণ বিস্মিত হলেন। তিনি সাথে সাথে কালেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে যান। তারপর তিনি জানতে পারলেন যে, যাঁকে মুক্ত করতে তিনি ছুটে এসেছেন, তিনি এত দিনে নবীগৃহের শোভায় পরিণত হয়েছেন। তিনি কন্যার এমন সৌভাগ্যে দারুণ পুলকিত হলেন এবং অত্যন্ত আনন্দের সাথে কন্যার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তারপর খুশী মনে তাঁকে সাথে নিয়ে নিজ গোত্রের আবাসভূমির দিকে যাত্রা করলেন।[১১]

আল-ওয়াকিদী হযরত 'উরওয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) বলেছেন, নবীর (সা) আগমনের তিনদিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন ইয়াসরিবের দিক থেকে চাঁদ ছুটে এসে আমার কোলে পড়লো। কোন মানুষকে একথা বলা আমি ভালো মনে করিনি। অতঃপর নবী (সা) এসে গেলেন। যখন আমি বন্দী হলাম, তখন আমার দেখা স্বপ্নের বাস্তবে রূপ লাভের আশা করলাম। তারপর রাসূল (সা) আমাকে মুক্ত করে বিয়ে করলেন। আমি এ স্বপ্নের কথা আমার গোত্রের কাউকে বলিনি। রাসূল (সা)-এর যে আগমন ঘটেছে সেকথা আমার এক চাচাতো বোন আমাকে না বলা পর্যন্ত আমার কিছুই জানা ছিল না। অতঃপর আমি আল্লাহ তা'আলার হামদ পেশ করলাম।[১২]

ইমাম মুসলিম হযরত ইবন আব্বাসের (রা) একটি বর্ণনা সংকলন করেছেন। তিনি বলেন ঃ[১৩]

---

১০. সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৯৪, ২৯৫

১১. উসুদুল গাবা-৫/৪২০

১২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৫/১৫৯; আল-হাকেম-৪/২৭ হায়াতুস সাহাবা-২/৬৬৫

১৩. মুসলিম (২১২০); আল-মুসনাদ-৬/৪২৯, ৪৩০; তাবাকাত-৮/১১৮

كانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله صلي الله عليه وسلم إلى جويرية -

–হযরত জুওয়াইরিয়ার (রা) প্রথম নাম ছিল 'বাররা'। বিয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সা) পরিবর্তন করে জুওয়াইরিয়া রাখেন। কারণ, প্রথম নামটির মধ্যে কিছুটা আত্ম-প্রশস্তির ভাব বিদ্যমান থাকায় রাসূল (সা) তাতে অশুভ ও অকল্যাণের ইঙ্গিত দেখতে পান। এ কারণে তিনি তা পছন্দ করেননি। হযরত ইবন আব্বাসের (রা) একটি বর্ণনায় এসেছে ঃ১৪

كره أن يقال خرج من عند برة -

–'তিনি তাঁকে 'বাররা' বলা অপছন্দ করলেন। তাই তাঁর নিকট থেকে বেরিয়ে গেলেন।'

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন ঃ

لَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ -

–তোমরা নিজেদেরকে পূতঃপবিত্র মনে করো না। মূলতঃ এ আয়াতের দিকে লক্ষ্য রেখেই রাসূল (সা) তাঁর নামটি পরিবর্তন করেন।

ইবন সা'দ হযরত জুওয়াইরিয়ার (রা) দেন-মোহর সম্পর্কে বলেছেন ঃ১৫

وجعل صداقها عتق كل مملوك من بنى المصطلق -

–বনু আল-মুসতালিক-এর প্রতিটি বন্দীর মুক্তি তাঁর মোহর হিসেবে ধার্য হয়।

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে হযরত জুওয়াইরিয়ার (রা) যে সময় বিয়ে হয় তখন তিনি মাত্র বিশ বছর বয়সের এক মহিলা। হযরত 'আয়িশা (রা) প্রথম দর্শনেই তাঁকে যথেষ্ট রূপবতী এবং তাঁর চাল-চলন খুবই মিষ্টি-মধুর বলে মনে করেছেন। হযরত 'আয়িশা (রা) তাঁর রূপ-সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ১৬

كانت جويرية إمرأة حلوة وملاحة لا يكاد يراها أحد الا وقعت فى نفسه -

–জুওয়াইরিয়ার মধ্যে মধুরতা ও ছলাকলা উভয় রকমের গুণ বিদ্যমান ছিল। কেউ তাঁকে দেখলেই তাঁর অন্তরে স্থান করে নিতেন।

---

১৪. আল-ইসাবা-৪/২৬৬

১৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৬২, ২৬৩; তাবাকাত-৮/১১৭

১৬. ইবন হিশাম-২/২৯৪; মুসনাদ-৬/২৭৭; উসুদুল গাবা-৫/২২০

ইমাম আজ-জাহাবী বলেন ঃ[১৭]

وكانت من أجمل النساء ـ

'তিনি ছিলেন সেরা রূপবতী মহিলাদের একজন।'

তিনি ছিলেন খুবই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলা। তাঁর মধ্যে ছিল সীমাহীন আত্মসম্মান বোধ। তার প্রমাণ হলো, দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য তাঁর অস্থিরতা ও চেষ্টা সাধনা। পার্থিব ভোগ-বিলাসিতার প্রতি ছিলেন নির্মোহ এবং আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি ছিলেন একাগ্রচিত্ত। হাদীসের একাধিক বর্ণনায় জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কাছে এসে তাঁকে তাসবীহ ও তাহলীলে মশগুল দেখতে পেয়েছেন।

খলীফা 'উমার (রা) যখন ভাতা প্রচলন করলেন তখন রাসূলুল্লাহর (সা) বিবিগণের মধ্যে সাফিয়্যা (রা) ও জুওয়াইরিয়া (রা) ব্যতীত অন্য সকলের জন্য বারো হাজার করে নির্ধারণ করলেন। তাঁদের দুইজনের জন্য করলেন ছয় হাজার করে। তাঁদের দুইজনের জীবনের এক পর্যায়ে দাসত্ব থাকার কারণে তিনি এমন করেন। কিন্তু তাঁরা 'উমারের (রা) আচরণে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন এবং ভাতা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। তাঁরা সমতার দাবী জানালেন। 'উমার (রা) তাঁদের দাবী মানতে বাধ্য হলেন। অন্য একটি বর্ণনায় মায়মূনার (রা) কথাও এসেছে এবং বারো হাজারের স্থলে দশ হাজার এসেছে।[১৮]

একদিন সকালে হযরত রাসূলে কারীম (সা) দেখলেন যে, হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) মসজিদে বসে দু'আ করছেন। তিনি চলে গেলেন। দুপুরে এসে তাঁকে একই অবস্থায় পেয়ে বললেন, তুমি সব সময় এ অবস্থায় থাক? সেই অবস্থায় তিনি 'হাঁ' বলে জবাব দিলেন। তখন রাসূল (সা) বললেন, আমি কি তোমাকে এর চেয়ে ভালো কিছু কথা শিখিয়ে দিবনা, যা তোমার এই নফল ইবাদাত থেকেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ? তারপর তিনি তাঁকে এ দু'আ শিখিয়ে দেন ঃ[১৯]

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ (ثلاث مرات) سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضٰى نَفْسِهِ (ثلاث مرات) سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ (ثلاث مرات) سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ (ثلاث مرات) -

অবশ্য বিভিন্ন বর্ণনায় কিছু ভিন্নতাও আছে।

ইবন সা'দের একটি বর্ণনায় এসেছে। এক জুম'আর দিন রাসূল (সা) হযরত

১৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৬১

১৮. হায়াতুস সাহাবা-২/২১৬

১৯. মুসলিম (২৭২৬); তাবাকাত-৮/১১৯; আল-ইসাবা-৪/২৬৫; মুসনাদ-৬/৩২৪, ৩২৭, ৪২৯, ৪৩০; তারগীব ওয়াত তারহীব-৩/৯৮

জুওয়াইরিয়ার (রা) নিকট আসলেন। সেদিন জুওয়াইরিয়া (রা) রোযা রেখেছিলেন। তিনি যেহেতু একটি মাত্র রোযা রাখা পছন্দ করতেন না, এ কারণে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি গতকাল রোযা রেখেছিলে? তিনি জবাব দিলেন 'না'। তিনি আবার জানতে চাইলেন আগামীকাল রাখার ইচ্ছা আছে কি? বললেন ঃ না। তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ তাহলে তুমি ইফতার করে রোযা ভেঙ্গে ফেল।[২০]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। সব সময় তাঁর ঘরে আসা-যাওয়া করতেন। একবার তাঁর ঘরে এসে জিজ্ঞেস করেন 'খাওয়ার কিছু আছে কি?' তিনি জবাব দিলেন ঃ 'আমার দাসী কিছু সাদাকার গোশ্‌ত দিয়েছিল, শুধু তাই আছে। তাছাড়া আর কিছু নেই।' রাসূল (সা) বললেন ঃ তাই নিয়ে এসো। কারণ, সাদাকা যাকে দেওয়া হয়েছিল তার নিকট পৌঁছে গেছে।[২১]

হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সাতটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে ইমাম বুখারী একটি ও মুসলিম দুইটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২২] তাঁর কাছে যাঁরা হাদীস শুনেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন ঃ ইবন 'আব্বাস, জাবির, ইবন 'উমার, 'উবাইদ ইবন আস-সাবাক, তুফাইল, আবু আইউব মুরাগী, মুজাহিদ, কুরাইব, কুলসুম ইবন মুসতালিক, আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ ইবন আল-হাদ প্রমুখ।[২৩]

হিজরী ৫ম সনে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ের সময় হযরত জুওয়াইরিয়ার (রা) বয়স ছিল বিশ বছর। সঠিক মত অনুযায়ী হিজরী ৫০ (পঞ্চাশ) সনের রবীউল আওয়াল মাসে তিনি মদীনায় ইনতিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বছর। তৎকালীন মদীনার গভর্নর মারওয়ান জানাযার নামায পড়ান। তাঁর কবর মদীনার আল-বাকী গোরস্তানে। মুহাম্মাদ ইবন 'উমারের বর্ণনামতে তাঁর মৃত্যুসন হিজরী ৫৬।[২৪]

রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বারে উৎপন্ন ফসল থেকে আশি ওয়াসাক খেজুর এবং বিশ-ওয়াসাক যব, মতান্তরে গম হযরত জুওয়াইরিয়ার (রা) জীবিকার জন্য নির্ধারণ করেন।[২৫]

হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেছেন। একবার হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন ঃ আমি এই দাসটি মুক্ত করে দিতে চাই। তিনি বললেন ঃ ওকে তুমি তোমার মামাকে দিয়ে দাও– যিনি গ্রামে থাকেন। সে তাঁকে দেখাশুনা করবে। এতে তুমি বেশী সাওয়াব পাবে।[২৬]

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন। কিন্তু তাঁর এ সময়ের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না।

---

২০. তাবাকাত-৮/১১৯
২১. আল-ইসাবা-৪/২৬৬
২২. বুখারী-৪/২০৩; মুসলিম, (হাদীস নং ১০৭৩, ২৭২৬); সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৬৩
২৩. আল-ইসাবা-৪/২৬৬; সাহাবিয়াত-৯৭
২৪. তাবাকাত-৮/১২০; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৬৩
২৫. তাবাকাত-৮/১২০
২৬. হায়াতুস সাহাবা-২/৫৩০

# উম্মু হাবীবা (রা)

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা) কুরাইশ নেতা হযরত আবু সুফইয়ানের (রা) কন্যা। ইসলাম-পূর্ব মক্কার কুরাইশদের তিন ব্যক্তি—'উতবা, আবু জাহল ও আবু সুফইয়ান খুব দাপটের নেতা ছিলেন। কুরাইশদের সামরিক ঝাণ্ডা 'ইকাব' আবু সুফইয়ানের কাছেই থাকতো। তিনি ছিলেন একজন বড় ব্যবসায়ী। শাম, রোম ও আজমে তিনি বাণিজ্য কাফেলা পাঠাতেন। মাঝে মাঝে কাফেলার সাথে তিনি নিজেও যেতেন। এই আবু সুফইয়ানের আসল নাম সাখর ইবন হারব।[১]

আবু সুফইয়ানের এক কন্যা যায়নাব। তার বিয়ে হয় তায়েফের দাউদ ইবন 'উরওয়া ইবন মাস'উদ আস-সাকাফীর সাথে।[২] অপর দুই কন্যার বিয়ে হয় উম্মুল মুমিনীন হযরত যায়নাব বিন্‌ত জাহাশের (রা) দুই ভাইয়ের সাথে। ফারি'আকে আবু আহমাদ ইবন জাহাশ এবং উম্মু হাবীবাকে 'উবাইদুল্লাহ ইবন জাহাশ বিয়ে করেন। আবু সুফইয়ানের এক পুত্র হযরত মু'আবিয়া (রা)। আমীরুল মুমিনীন হযরত 'আলীর (রা) সাথে যাঁর সংঘাত ও সংঘর্ষ হয়। এই মু'আবিয়ার (রা) পুত্র ইয়াযীদ রাসূলুল্লাহর (সা) নাতি হযরত ইমাম হুসাইনকে (রা) কারবালায় শহীদ করেন। মু'আবিয়া (রা) উমাইয়্যা খিলাফতের প্রতিষ্ঠা করেন।

আবু সুফইয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিন্‌ত 'উতবা উহুদের প্রান্তরে রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা হযরত হামযার (রা) কলিজা চিবিয়েছিলেন। হিন্দা ছিলেন হযরত মু'আবিয়ার (রা) মা। আবু সুফইয়ানের অন্য এক স্ত্রী সাফিয়্যা বিন্‌ত আবীল 'আস উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মু হাবীবার (রা) মা। মু'আবিয়া (রা) উম্মু হাবীবার (রা) সৎ ভাই। উম্মু হাবীবার মা সাফিয়্যা ছিলেন তৃতীয় খলীফা হযরত 'উসমান ইবন 'আফ্‌ফানের ফুফু। রাসূলুল্লাহর (সা) নুবুওয়াত প্রাপ্তির সতেরো বছর পূর্বে উম্মু হাবীবা (রা) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।[৩]

আবু সুফইয়ান, তাঁর স্ত্রী হিন্দা ও তাঁর খান্দানের অধিকাংশ মানুষ মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হন। কিন্তু তখনও আবু সুফইয়ান প্রকৃত মুসলমান হতে পারেন নি। তিনি তখন 'মুয়াল্লাফাতুল কুলূব'-এর অন্তর্গত। কোন কোন বিশেষজ্ঞ লিখেছেন যে, পরে তিনি একজন ভালো মুসলমান হয়ে যান।[৪]

পিতৃ-পরিবার ইসলামের প্রতি মক্কা বিজয় পর্যন্ত বিদ্বেষী থাকলেও উম্মু হাবীবা ও ফারি'আ (রা)-এর স্বামীর পরিবার কিন্তু ইসলামের সূচনা পর্বেই মুসলমান হয়ে যায়। তাঁরাও তাঁদের স্বামীদের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন।

---

১. আল-ইসাবা-৪/৩০৫

২. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৮

৩. আল-ইসাবা-৪/৩০৫

৪. আসাহ আস-সিয়ার-৬৪২

হযরত উম্মু হাবীবা (রা) স্বামী 'উবাইদুল্লাহ ইবন জাহাশসহ মক্কার কাফিরদের নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচার জন্য হাবশায় হিজরাত করেন। এই হাবশার মাটিতে উবাইদুল্লাহর ঔরসে কন্যা হাবীবার জন্ম হয়। তবে ইবন সা'দ আল-ওয়াকিদীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, হাবশায় হিজরাতের পূর্বে মক্কায় 'হাবীবা'র জন্ম হয়।[৫] আর এই কন্যার নামে তাঁর উপনাম হয় 'উম্মু হাবীবা'। তাঁর আসল নাম 'রামলা' হারিয়ে যায় এবং এই উপনামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[৬]

হাবশায় যাওয়ার কিছুদিন পর স্বামী উবাইদুল্লাহ ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। তার ধর্মত্যাগের পূর্বে হযরত উম্মু হাবীবা (রা) একবার স্বপ্নে স্বামীকে বিভৎসরূপে দেখেন। তিনি ভীত-শংকিত হয়ে আপন মনে বলেন, নিশ্চয় তার কোন খারাপ পরিণতি হতে যাচ্ছে। সকাল বেলা 'উবাইদুল্লাহ তাঁকে বললো ঃ 'উম্মু হাবীবা! আমি ধর্মের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি। খ্রিষ্টধর্ম থেকে অন্য কোন ধর্ম বেশী ভালো বলে মনে হয়নি। যদিও আমি মুসলমান হয়েছি, তবে এখন আমি খ্রিষ্টান হয়ে যাচ্ছি। হযরত উম্মু হাবীবা (রা) স্বামীর এহেন পথভ্রষ্টতায় যথেষ্ট তিরস্কার করলেন এবং নিজের স্বপ্নের কথাও তাকে বললেন। কিন্তু কোন কিছুতেই কাজ হলো না। সে খ্রিষ্টান থেকেই গেল। এভাবে তাঁদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। 'উবাইদুল্লাহ এখন বেপরোয়াভাবে জীবন যাপন করতে আরম্ভ করলো। একদিন অতিরিক্ত মদ পান অবস্থায় পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে। মতান্তরে মদ্যপ অবস্থায় সাগরে ডুবে মারা যায়।[৭] উম্মু হাবীবা আরও বলেছেন, আমি দেখলাম, কেউ আমাকে 'ইয়া উম্মুল মুমিনীন'– বলে ডাকছে। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আমি এর ব্যাখ্যা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বিয়ে করবেন।[৮]

ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পর হযরত উম্মু হাবীবা (রা) কন্যা হাবীবাকে নিয়ে হাবশায় বসবাস করতে থাকেন। এ খবর মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) কানে পৌঁছলো। উম্মু হাবীবার (রা) ইদ্দাত পূর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা থেকে 'আমর ইবন উমাইয়্যা আদ-দামরীকে (রা) একটি চিঠি এবং চার শো দীনার দেন-মোহরের অর্থসহ হাবশার সম্রাট নাজ্জাশীর নিকট পাঠান। চিঠিতে তিনি নাজ্জাশীকে লেখেন– 'আমার সাথেই উম্মু হাবীবার বিয়ের কাজ সমাধা করে দাও।' চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে নাজ্জাশী তাঁর দাসী আবরাহাকে উম্মু হাবীবার নিকট পাঠিয়ে বিয়ের পয়গাম পৌঁছে দেন। তাঁকে একথাও জানান যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আপনার বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্য আমাকে লিখেছেন। এখন এ অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য আপনি আপনার পক্ষের একজন উকিল মনোনীত করুন। হযরত উম্মু হাবীবা (রা) এ সুসংবাদ দানের জন্য আবরাহাকে নিজের দুইটি রূপোর চুড়ি, কানের দুল ও একটি নকশা করা আংটি দান করেন। আর মামাতো ভাই

৫. তাবাকাত-৮/৯৭
৬. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৮
৭. প্রাগুক্ত
৮. তাবাকাত-৮/৯৭; শারহুল মাওয়াহিব-৩/২৭৬; আল-মুসতাদরিক-৪/২০,২২

খালিদ ইবন সা'ঈদ ইবন আবীল 'আসকে উকিল নিয়োগ করে নাজ্জাশীর নিকট পাঠান।[৯]

সন্ধ্যার সময় নাজ্জাশী হাবশায় বসবাসরত হযরত জা'ফর ইবন আবী তালিব (রা) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামকে (রা) দরবারে ডেকে পাঠান এবং তাঁদের সবার উপস্থিতিতে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করেন।[১০] নাজ্জাশী নিজেই বিয়ের খুতবা পাঠ করেন এবং চার শো দীনার মোহরের অর্থ রাসূলুল্লাহর (সা) পক্ষ থেকে খালিদ ইবন সা'ঈদের হাতে তুলে দেন। অনুষ্ঠান শেষে সবাই যখন উঠার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখন খালিদ ইবন সা'ঈদ সবাইকে থামিয়ে বললেন, নবীদের (সা) সুন্নাত বা রীতি হচ্ছে বিয়ের পর আহার করানো। তারপর তিনি সকলকে আহার করিয়ে বিদায় দেন।[১১] এ বিয়ের দেন-মোহরের পরিমাণের ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। মুসতাদরিকের একটি বর্ণনায় চার হাজার দীনারের কথা এসেছে। আবু দাউদের বর্ণনায় চার হাজার দিরহাম এসেছে। ইবন আবী খায়সামা ইমাম যুহরী থেকে চল্লিশ উকিয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। তবে আল্লামা যুরকানী চার শো দীনারের বর্ণনাটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন।[১২]

মোহরের অর্থ হযরত উম্মু হাবীবার (রা) নিকট পৌঁছলে তাঁর থেকে পঞ্চাশ দীনার তিনি দাসী আবরাহাকে দিতে চান। কিন্তু আবরাহা নিতে অসম্মতি জানান এবং বলেন, নাজ্জাশী আমাকে নিতে বারণ করেছেন। উম্মু হাবীবা (রা) পূর্বে যা কিছু তাকে দিয়েছিলেন তাও ফিরিয়ে দেন। বিয়ের পর নাজ্জাশী বহু মিশ্‌ক, আম্বর, সুগন্ধি এবং আরও অন্যান্য জিনিস উপহার হিসাবে উম্মু হাবীবার (রা) নিকট পাঠান। এসব কথা হযরত উম্মু হাবীবা নিজে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, সে সময় আবরাহা তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা জানায় এবং আমাকে অনুরোধ করে আমি যেন তাঁর ইসলামের কথা রাসূলুল্লাহকে (সা) অবহিত করি এবং তাঁর সালাম পৌঁছে দিই। উম্মু হাবীবা বলেন, মদীনায় পৌঁছে আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বিয়ের সব কথা বলি এবং আবরাহার সকল আচরণের কথা অবহিত করে তাঁর সালাম পেশ করি। তিনি মৃদু হেসে বলেন ঃ

وَعَلَيْهَا السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ۔[১৩]

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে উম্মু হাবীবার (রা) এ বিয়ে হিজরী ৬, মতান্তরে ৭ সনে সম্পন্ন হয়। তখন উম্মুল মুমিনীন উম্মু হাবীবার বয়স ৩৬ অথবা ৩৭ বছর হবে। বিয়ের পর নাজ্জাশী শুরাহবীল ইবন হাসানার (রা) মতান্তরে জা'ফর ইবন আবী তালিবের (রা)[১৪] নেতৃত্বে একদল মুহাজিরের সাথে উম্মু হাবীবাকে (রা) জাহাজযোগে মদীনায় পাঠিয়ে

৯. আল-বিদায়া-৪/১৪৩; তাবাকাত-৮/৯৮.৯৯;
১০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২১
১১. মুসনাদ-৬/৪২৭; তাবাকাত-৮/৯৮; ইবন হিশাম-১/২২২
১২. আল-ইসাবা-৪/৩০৬
১৩. তাবাকাত-৮/৯৭; হায়াতুস সাহাবা-২/৬৫৯,
১৪. আনসাবুল আশরাফ-১/২২৯,৪৩৯.

দেন। এই কাফেলা যখন মদীনায় পৌঁছে তখন রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বারে অবস্থান করছিলেন।[১৫]

ইবন হাযাম (রা) দাবী করেছেন যে, উম্মু হাবীবার (রা) 'আকদ হাবশায় হওয়ার ব্যাপারে ইজমা হয়েছে। এ বিষয়ে সীরাত বিশেষজ্ঞরা একমত। তবে হযরত কাতাদা (রা) ও ইমাম যুহরীর একটি বর্ণনায় এসেছে যে, উম্মু হাবীবার (রা) এ আকদ অনুষ্ঠিত হয় মদীনায় উসমান ইবন 'আফ্ফানের (রা) ব্যবস্থাপনায়।[১৬] এ বিয়েতে ওলীমা করা হয় এবং তাতে তিনি মেহমানদেরকে গোশ্‌ত খাওয়ান। সীরাত বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ বলেছেন, হতে পারে মদীনায় আসার পর আবার একটি আক্‌দ ও ওলীমা অনুষ্ঠান করা হয়।

সহীহ মুসলিমের একটি বর্ণনায় এসেছে, মানুষ মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণকারী আবু সুফইয়ানকে সুনজদের দেখতো না এবং তাঁর সাথে উঠাবসাও পছন্দ করতো না। তাই তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট তিনটি জিনিসের আবেদন জানান। রাসূল (সা) তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেন। সেই তিনটি জিনিসের একটি হলো ঃ আবু সুফইয়ান বলেন, আমার কাছে আরবের সেরা সুন্দরী মেয়ে হলো উম্মু হাবীবা, আপনি তাকে বিয়ে করুন। রাসূল (সা) রাজী হন।[১৭]

এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় আবু সুফইয়ানের (রা) ইসলাম গ্রহণের সময় পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে উম্মু হাবীবার (রা) বিয়ে হয়নি। সীরাত বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এটা বর্ণনাকারীর একটি ধারণামাত্র। তাই ইবন সা'দ' ইবন হাযাম, ইনুল জাওযী, ইবনুল আসীর, বায়হাকী, আবদুল 'আজীম মুনজিরী প্রমুখ মুহাদ্দিসীন মুসলিমের উপরোক্ত বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করেছেন। অনেকে এ বর্ণনার ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে, মূলতঃ আবু সুফইয়ান দ্বিতীয়বার আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করার কথা বলেন।[১৮]

উম্মু হাবীবার (রা) 'আকদ যে হাবশায় হয়েছিল সে ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞদের ঐকমত্যের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তাছাড়া এর সপক্ষে আরও একটি ঘটনার কথা সীরাতের গ্রন্থাবলীতে সংকলিত হয়েছে। হুদায়বিয়ার সন্ধির একটি ধারা অনুযায়ী মক্কার পার্শ্ববর্তী খুযা'আ গোত্র মদীনার মুসলমানদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে। এতে কুরাইশরা এই চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের উপর অত্যাচার চালায়। খুযা'আ গোত্র রাসূলুল্লাহর (সা) সাহায্য প্রার্থনা করে। এতে মক্কার কুরাইশরা শঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা সন্ধিচুক্তি বলবৎ রাখার জন্য তাদের পক্ষ থেকে আবু সুফইয়ানকে মদীনায় পাঠায়। আবু সুফইয়ান মদীনায় এসে প্রথমে কন্যা উম্মুল মুমিনীন উম্মু হাবীবার (রা) নিকট যান।

---

১৫. আবু দাউদ : কিতাবুন নিকাহ-বাবুস সুদাক (২১০৭); আন-নাসা'ঈ-৬/১১৯; কিতাবুন নিকাহ; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২১; মুসনাদ-৬/৪২৭

১৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২১

১৭. মুসলিম : ফাদায়িলুস সাহাবা-(২৫০১)

১৮. আসাহ আস-সিয়ার-২৯১ ঃ সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২২

কন্যা পিতাকে দেখে রাসূলুল্লাহর (সা) বিছানা গুটিয়ে বসতে দেন। আবু সুফইয়ান মেয়েকে প্রশ্ন করেন, মেয়ে! তুমি বিছানা গুটিয়ে নিলে। তা বিছানা আমার বসার উপযুক্ত মনে না করে, না আমাকে বিছানার উপযুক্ত মনে না করে? মেয়ে বললেন, এটা রাসূলুল্লাহর (সা) বিছানা। আর আপনি একজন মুশরিক (অংশীবাদী) ও অপবিত্র। এ কারণে আমি ইচ্ছা করিনি যে, আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) বিছানায় বসুন। মেয়ের এমন কথা শুনে আবু সুফইয়ান সেখান থেকে উঠে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গিয়ে বসেন এবং মেয়েকে বলেন ঃ

لَقَدْ أَصَابَكِ بَعْدِيْ شَرٌّ -

আমাকে ছাড়ার পর তোমার মধ্যে অনেক মন্দ ঢুকেছে।[১৯]

উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় আবু সুফইয়ানের ইসলাম গ্রহণের অনেক আগে উম্মু হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করেন। তাছাড়া ইবন সা'দের একটি বর্ণনায় এসেছে। উম্মু হাবীবার (রা) বিয়ের খবর মক্কায় আবু সুফইয়ানের নিকট পৌঁছে। তখন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিপক্ষ ও দুশমন। তবে তিনি এ বিয়েকে অপছন্দ করেননি। তিনি মন্তব্য করেন ঃ

ذاك الفحل، لا يقرع أنفه -

–এ এমন সম্ভ্রান্ত কুফু যা প্রত্যাখ্যান করা যায় না।[২০]

হযরত উম্মু হাবীবা (রা) তাঁর ভাই হযরত আমীর মু'আবিয়ার (রা) খিলাফতকালে হিজরী ৪৪ মতান্তরে ৪২ সনে মদীনায় ইনতিকাল করেন। তাকে মদীনায় দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। মারওয়ান জানাযার নামায পড়ান। তার ভাই ও বোনের ছেলেরা কবরে নেমে তাঁকে সমাহিত করেন।[২১] কবরের ব্যাপারে এতটুকু জানা যায় যে, সেটা হযরত আলীর (রা) গৃহে ছিল। ইমাম যায়নুল আবেদীন (রাহ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একবার আমি আমার বাড়ীর একটি কোনা খুড়লাম। সেখানে একটি শীলালিপি পেলাম। তাতে লেখা ছিল–

هذاقبر رملة بنت صخر،

'এটা রামলা বিনত সাখর-এর কবর'। আমি সেটা আবার সেখানে রেখে দিই। এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় তাঁর কবরটি আলীর (রা) ঘরে ছিল।[২২] তিনি তাঁর ভাই হযরত মু'আবিয়ার (রা) সাথে সাক্ষাতের জন্য দিমাশক সফরে গিয়েছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে, সেখানে মারা যান এবং সেখানেই তাঁকে কবর দেওয়া হয়। ইমাম জাহাবী বলেন,

---

১৯. আল-বিদায়া-৪/২৮০; তাবাকাত-৮/৯৯, ১০০

২০. আনসাবুল-আশরাফ-১/৪৩৯; তাবাকাত-৮/৯৯

২১. আনসাবুল আশরাফ-১/৪২০

২২. আল-ইসতী'য়াব ঃ আল-ইসাবার পার্শ্বটীকা-৪/৩০৬

এটা ভিত্তিহীন কথা, তাঁর কবর মদীনায়।[২৩]

মৃত্যুর পূর্বে তিনি হযরত আয়িশা (রা) ও হযরত উম্মু সালামাকে (রা) ডেকে আনান। তিনি তাঁদেরকে বলেন, আমার ও আপনাদের মধ্যে তেমন সম্পর্ক ছিল, যেমন সতীনদের পরস্পরের থাকে। যেহেতু আপনারা তেমন চেয়েছিলেন, তাই আমিও তাই পছন্দ করেছিলাম। আপনারা আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করুন। হযরত 'আয়িশা (রা) তাঁর মাগফিরাতের জন্য দু'আ করলে তিনি খুশী হয়ে বলেন ঃ

سررتني سرك الله ـ

–আপনি আমাকে খুশী করেছেন, আল্লাহ আপনাকে খুশী করুন।[২৪]

প্রথম স্বামীর ঔরসে দুইটি সন্তান আবদুল্লাহ ও হাবীবা জন্মগ্রহণ করে। হাবীবা রাসূলুল্লাহর (সা) গৃহে তাঁরই তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন। সাকীফ গোত্রের এক বড় নেতার সাথে তার বিয়ে হয়।

হযরত উম্মু হাবীবা (রা) খুবই রূপবতী ছিলেন। সহীহ মুসলিমে পিতা আবু সুফইয়ানের বর্ণনা এভাবে এসেছে ঃ

عِنْدِىْ أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلِهِ أُمُّ حَبِيْبَةَ.

–আমার আছে আরবের সেরা সুন্দরী ও সেরা রূপবতী কন্যা উম্মু হাবীবা।

হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে হযরত উম্মু হাবীবার (রা) পয়ষট্টিটি (৬৫) হাদীস সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে দুইটি হাদীস মুত্তাফাক আলাইহি এবং দুইটি ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[২৫] তাঁর সূত্রে যে সকল রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের সংখ্যাও একেবারে কম নয়, তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন ঃ হাবীবা (কন্যা), মু'আবিয়া, 'উতবা (আবু সুফইয়ানের দুই ছেলে), 'আবদুল্লাহ ইবন 'উতবা, আবু সুফইয়ান ইবন সা'ঈদ সাকাফী, সালিম ইবন সাওয়ার, আবুল জাররাহ, সাফিয়্যা বিনত শায়বা, যায়নাব বিনত উম্মু সালামা, 'উরওয়া ইবন যুবাইর, আবু সালিহ আস-সাম্মান, শাহর ইবন হাওশাব, আনবাসা, শুতাইর ইবন শাকাল, আবুল মালীহ 'আমির আল-হুজালী প্রমুখ।[২৬]

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা) অত্যন্ত শক্ত ঈমানদার মহিলা ছিলেন। তিনি যে যুগের মহিলা, সে অনুপাতে যে ধৈর্য, দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতা দেখিয়েছেন, তা ভেবে দেখলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। ইসলামের আবির্ভাবকালেই তিনি স্বীয় মেধা ও বুদ্ধি দ্বারা সত্যকে চিনতে পেরে আঁকড়ে ধরেন। যে কাজ সে সময়ের অনেক বড়

---

২৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২০

২৪. তাবাকাত-৮/১০০; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২৩; আনসাবুল আশরাফ-১/৪৪০

২৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১৯

২৬. প্রাগুক্ত; আল-ইসাবা-৪/৩০৬

বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা করতে পারেনি, বা করতে যাদের অনেক সময় লেগেছে, তিনি সহজেই তা করতে পেরেছেন। সত্যের জন্য তিনি মা-বাবা, ভাই-বোনসহ সকল আত্মীয় বন্ধুদের ছেড়ে দেশ-ত্যাগ করেছেন। যে স্বামীকে অবলম্বন করে সবকিছু ছাড়লেন, বিদেশ-বিভুঁইয়ে সে স্বামী তাঁকে ছেড়ে গেল। কিন্তু তিনি সত্য থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হলেন না। তিনি তাঁর বিশ্বাসের উপর পর্বত পরিমাণ অটল থাকলেন। কী পরিমাণ বিশ্বাসের জোর থাকলে এতকিছু করা যায়। সম্ভবতঃ তাঁর এই মজবুত ঈমানের জন্যই আল্লাহ পাক পুরস্কার স্বরূপ দুনিয়াতে উম্মুল মুমিনীনের সুমহান মর্যাদা দান করেন।

মজবুত ঈমানের সাথে আল্লাহর রাসূলের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসাও তাঁর অন্তরে ছিল। আল্লাহর রাসূলকে (সা) তিনি যে কত বড় ও পবিত্র বলে জানতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর মুশরিক পিতাকে রাসূলুল্লাহর (সা) বিছানায় বসতে না দেওয়ার মাধ্যমে। তিনি পিতার মুখের উপর বলে দিলেন, আপনি মুশরিক, অপবিত্র। আমি চাইনা আপনি আল্লাহর রাসূলের (সা) বিছানায় বসে অপবিত্র করুন। এরই নাম ঈমান, এরই নাম আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) হাদীসের উপর তিনি নিজে যেমন কঠোরভাবে আমল করতেন, তেমনি অন্যদেরও আমল করার তাকীদ দিতেন। তাঁর ভাগিনা আবু সুফইয়ান ইবন সা'ঈদ ইবন আল-মুগীরা একবার দেখা করতে আসেন। তিনি ছাতু খেয়ে শুধু কুলি করলেন, উম্মুল মুমিনীন বললেন, তোমার ওজু করা উচিত। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আগুনে পাকানো কোন জিনিস খেলে ওজু করতে হবে।[২৭]

পিতা আবু সুফইয়ানের (রা) ইনতিকালের তিনদিন পর তিনি সুগন্ধি চেয়ে নিয়ে কপালে মাখেন এবং বলেন ঃ

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل
لإمرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تحد على ميت فوق
ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة اشهر وعشرا -

–আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি, আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মহিলার একমাত্র স্বামী ছাড়া কোন মৃতব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক করা জায়েয নেই। স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক করবে।[২৮]

একবার তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখে শুনলেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন বারো রাক'আত নফল নামায আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানানো হবে। উম্মু হাবীবা বলেন, তারপর থেকে আমি সর্বদাই তা আদায় করে থাকি। এর ফল এই দাঁড়ায় যে, তাঁর ছাত্র

---

২৭. মুসনাদ-৬/৩২৬
২৮. তাবাকাত-৮/৯৯

এবং ভাই 'উতবা, উতবার ছাত্র 'আমর ইবন উওয়াইস এবং 'আমরের ছাত্র নু'মান ইবন সালিম প্রত্যেকে তাঁদের নিজ নিজ সময়কালে এ নামায সব সময় আদায় করতেন।

স্বভাবগতভাবেই তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ। একবার তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন, আপনি আমার বোনকে বিয়ে করুন। রাসূল (সা) বললেন ঃ 'তুমি কি তা চাও'? বললেন, 'কেন চাইবো না। এতে ক্ষতি কি! আমি এবং আমার কোন বোনকে কোন ভালো অবস্থায় দেখতে বাধা থাকা উচিত নয়।'

আল্লামা জাহাবী তাঁর মর্যাদা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, বংশের দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কোন বেগমই তাঁর চেয়ে বেশী নিকটের ছিলেন না। রাসূলুল্লাহর (সা) কোন বেগমেরই মোহর তাঁর চেয়ে বেশী ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা) কোন বেগমকেই তাঁর চেয়ে বেশী দূরে অবস্থান করা অবস্থায় বিয়ে করেননি।[২৯]

হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হযরত উম্মু হাবীবাকে (রা) বিয়ে করেন তখন নিম্নের এ আয়াতটি নাযিল হয় ঃ[৩০]

عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً -

(الممتحنة - ٦٠/٧)

–'যারা তোমাদের শত্রু আল্লাহ তাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সম্ভবতঃ বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন।' (সূরা আল-মুমতাহিনা-৭)

২৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১৯

৩০. আল-ইসাবা-৪/৩০৬; আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৯

# মায়মূনা বিনতুল হারিস (রা)

উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসার (রা) পরে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মায়মূনা বিনতুল হারিস আল-হিলালিয়্যাকে (রা) বিয়ে করেন। ইনিই সেই মহিলা যাঁকে রাসূল (সা) সর্বশেষ বিয়ে করেন– একথা বলেছেন ইবন সা'দ। তাঁর পিতা হারিস ইবন হায়ন এবং মাতা হিন্দা বিন্ত আওফ।[১]

হযরত মায়মূনা (রা) কুরাইশ গোত্রের মেয়ে। আরবের অনেক বড় নামী-দামী বংশ ও ঘরের সাথে ছিল তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক। তাঁর এক বোন উম্মুল ফাদল লুবাবা আল-কুবরা ছিলেন হযরত 'আব্বাসের (রা) স্ত্রী। যাঁর ছয় ছেলে– ফাদল, আবদুল্লাহ, উবাইদুল্লাহ, মা'বাদ, কুসাম ও আবদুর রহমান ছিলেন ইসলামের প্রসিদ্ধ সন্তান। তাঁর দ্বিতীয় বোন লুবাবা সুগরা ছিলেন হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদের (রা) মা। তৃতীয় বোন বারযাহ্ ছিলেন ইয়াযীদ ইবনুল আসাম-এর মা। ৪র্থ বোন উম্মু হাফীদের নাম হুযায়লা। ইমাম মালিক (রহ) 'আল মুওয়াত্তা' গ্রন্থে বিস্তারিত এবং বুখারী ও মুসলিম একটু সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মায়মূনার (রা) বাড়ী যান। সেখানে হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) ও হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সামনে গুঁইসাপের গোশ্ত উপস্থাপন করা হয়। মায়মূনা (রা) বলেন, এ গোশ্ত আমার বোন হুযায়লা বিন্ত হারিস পাঠিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) গুঁইসাপের গোশ্ত খেলেন না; কিন্তু তাঁর অনুমতিতে অন্যরা খেলেন। ইমাম তাহাবী সংকলিত একটি বর্ণনায় জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) না খাওয়ার কারণে হযরত মায়মূনাও (রা) খেলেন না।

উপরে উল্লেখিত বোনেরা সবাই ছিলেন বৈমাত্রেয়। 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, হযরত জা'ফর ইবন আবী তালিব (রা)-এর স্ত্রী হযরত আসমা বিন্ত 'উমাইস (রা) ছিলেন তাঁর বৈপিত্রেয় বোন। হযরত জা'ফরের (রা) ঔরসে 'আবদুল্লাহ, মুহাম্মাদ ও আওন নামের তিন ছেলে ছিল। হযরত জা'ফর (রা) মূতার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করার পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁকে বিয়ে করেন এবং তাঁর ঔরসে মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আবু বকরের (রা) ইনতিকালের পর হযরত আসমাকে (রা) বিয়ে করেন হযরত আলী (রা) এবং তাঁর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন ইয়াহইয়া ও আওন নামের দুই ছেলে। হযরত মায়মূনার (রা) বৈপিত্রেয় আর এক বোন সালমা বিন্ত 'উমাইস (রা) ছিলেন হযরত হামযার (রা) স্ত্রী। তাঁর বৈপিত্রেয় আর এক বোন সালামা বিন্ত উমাইস। তিনি অমুসলমান থেকে যান।[২]

---

১. তাবাকাত-৮/১৩৪; আনসাবুল আশরাফ-১/৪৪৪

২. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ আনসাবুল আশরাফ-১/৪৪৫ ৪৪৬; আল-ইসতী'য়াব-৪/৪০৭

## বিয়ে

হযরত মায়মূনার (রা) প্রথম বিয়ে হয় মাস'উদ ইবন 'আমর ইবন 'উমাইর আস-সাকাফীর সঙ্গে। এ বর্ণনা পাওয়া যায় তাবাকাত, যুরকানী ও অন্যান্য গ্রন্থে। তবে 'আল-ইসাবা' গ্রন্থকার ইবন হাজার তাঁর প্রথম স্বামী কে ছিলেন, সে ব্যাপারে কোন আলোচনা করেননি। শুধু এতটুকু বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহর (সা) পূর্বে তিনি আবু রুহ্‌ম ইবন আবদুল 'উয্‌যার স্ত্রী ছিলেন। যা হোক, বিভিন্ন বর্ণনায় জানা যায়, মাস'উদ ইবন 'আমরের সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পর আবু রুহ্‌মের সাথে বিয়ে হয়। হিজরী ৭ম সনে আবু রুহমের মৃত্যু হলে রাসূলুল্লাহর (সা) বেগমের মর্যাদা লাভ করেন। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) সর্বশেষ বেগম। তাঁর পর আর কোন মহিলাকে রাসূলুল্লাহ (সা) বেগমের মর্যাদা দান করেননি।[৩]

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে হযরত মায়মূনার (রা) বিয়ে সম্পন্ন হয় হযরত 'আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবের (রা) অভিভাবকত্বে। রাসূলুল্লাহ (সা) হিজরী ৭ম সনে 'উমরাতুল কাজা' আদায়ের উদ্দেশ্যে যখন মক্কার দিকে বেরিয়ে পড়েন তখন হযরত জা'ফর ইবন আবী তালিবকে (রা) বিয়ের পয়গামসহ মক্কায় অবস্থানরত হযরত মায়মূনার (রা) নিকট পাঠান। তিনি ভগ্নিপতি হযরত 'আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবকে (রা) উকিল নিয়োগ করেন। অনেকের ধারণা হযরত আব্বাস নিজেই রাসূলুল্লাহকে (সা) এ বিয়েতে আগ্রহী করেন।[৪]

ইবন হিশামের বর্ণনা মতে, মায়মূনা (রা) বিয়ের বিষয়টি বোন উম্মুল ফাদলের উপর ছেড়ে দেন। আর তিনি সে দায়িত্ব ছেড়ে দেন স্বামী আব্বাসের (রা) হাতে।[৫]

যাই হোক, এই 'উমরার ইহ্‌রামের অবস্থায় হিজরী ৭ম সনের জিলকা'দা মাসে পাঁচ শত মতান্তরে চারশত দিরহাম[৬] দেন-মোহরের বিনিময়ে হযরত রাসূলে কারীম (সা) হযরত মায়মূনাকে (রা) বিয়ে করেন।[৭] 'উমরা আদায়ের পর মদীনা ফেরার পথে মক্কা হতে ছয় থেকে বারো মাইল দূরে 'সারাফ' নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করেন। এদিকে রাসূলুল্লাহর (সা) খাদেম হযরত আবু রাফে' হযরত মায়মূনাকে (রা) নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। এই 'সারাফে' রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য নির্মিত তাঁবুতে হযরত মায়মূনা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিলিত হন।[৮]

ইবন 'আব্বাসের (রা) একটি বর্ণনায় জানা যায়, রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মায়মূনার (রা) বিয়ে হয় 'উমরা আদায়কালীন সময়ে মক্কাতে। 'উমরা উপলক্ষে তিনদিন সেখানে

---

৩. তাবাকাত-৮/১৩৫
৪. উসুদুল গাবা-৫/৫৫০; তাবাকাত-৮/১৩২, ১৩৩
৫. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৭২
৬. প্রাগুক্ত-২/৬৪৬
৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৩৯
৮. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৭২

অবস্থান করেন। তৃতীয় দিনে হুয়ায়তিব ইবন আবদুল 'উয্যা আরও কয়েকজন কুরাইশ ব্যক্তিকে সঙ্গে করে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে দেখা করে বলে ঃ 'হুদায়বিয়ার চুক্তি অনুযায়ী আপনার অবস্থানের মেয়াদ আজ শেষ হয়ে যাচ্ছে। আপনি মক্কা ছেড়ে চলে যান।' রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ 'আমাকে আরও একটু সময় দিলে তোমাদের এমন কি হতো। আমি তোমাদের মধ্যে মায়মূনার সাথে মিলিত হতাম এবং তোমাদের জন্য ওলীমার খাবার তৈরী করতাম।' তারা বললো ঃ 'আপনার এ খাবারের আমাদের প্রয়োজন নেই। আপনি মক্কা ছাড়ুন।'[৯] এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) তড়িঘড়ি করে মক্কা থেকে বেরিয়ে 'সারাফে' এসে অবস্থান করতে থাকেন এবং সেখানে মায়মূনার (রা) সাথে বাসর করেন।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) 'উমরাতুল কাজা'র সময়কালে হযরত মায়মূনাকে (রা) বিয়ে করেন। এ ব্যাপারে সকল সীরাত বিশেষজ্ঞ একমত। তবে ফকীহদের মধ্যে এ ব্যাপারে ভীষণ মতপার্তক্য রয়েছে যে, বিয়ের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) ইহরাম অবস্থায় ছিলেন না হালাল অবস্থায়।[১০]

ইবন হাজার (রহ) এই মতপার্থক্যের সমন্বয় করতে গিয়ে বলেছেন, ইহরাম অবস্থায় বিয়ে সম্পন্ন হয়, আর মিলন হয় 'উমরা আদায়ের পর হালাল অবস্থায়।[১১]

হযরত 'আয়িশা (রা) হযরত মায়মূনার (রা) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন ঃ

إنها كانت من اتقانالله وأوصلنا للرحم -

—আমাদের মধ্যে মায়মূনা সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করতেন এবং সবচেয়ে বেশী আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখতেন।[১২]

তিনি খুব পরিচ্ছন্ন বিশ্বাস ও শুদ্ধ ধ্যান-ধারণার মহিলা ছিলেন। বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে তাঁর স্বচ্ছ চিন্তা-বিশ্বাসের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন, একবার এক মহিলা অসুস্থ অবস্থায় মান্নত মানেন যে, আল্লাহ তাকে সুস্থ করলে বায়তুল মাকদাসে গিয়ে নামায আদায় করবেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। এখন তিনি মান্নত পূর্ণ করতে বায়তুল মাকদাসে যাবেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি হযরত মায়মূনার (রা) নিকট বিদায় নিতে আসেন। হযরত মায়মূনা (রা) তাঁকে বুঝালেন যে, মসজিদে নববীতে নামায আদায়ে সাওয়াব অন্য মসজিদের চেয়ে হাজার গুণ বেশী। সুতরাং তুমি সেখানে না গিয়ে এখানে থাক।[১৩]

---

৯. হায়াতুস সাহাবা-২/৬৬৫

১০. দেখুন ঃ তাবাকাত-৮/১৩৩-১৩৬; মুসলিম (১৪১১), 'আন-নিকাহ' অধ্যায়; ইবন মাজাহ-(১৯৬৪); আহমাদ-৬/৩৯৩; আল-মুসতাদরিক-৪/৩১;

১১. আসাহ আস-সিয়ার-৬৪৯

১২. তাবাকাত-৮/১৩৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৪৪

১৩. তাবাকাত-৮/১৩৯

তিনি মাঝে মধ্যে ধার-করজ করতেন। একবার একটু বেশী ধার করে ফেললেন। তাই কেউ একজন বললেন, এত ধার শোধের উপায় কি হবে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে বক্তি শোধ করার ইচ্ছা রাখে, আল্লাহ নিজেই তা শোধ করে দেন।[১৪]

হযরত মায়মূনার (রা) মধ্যে ছিল দাস মুক্ত করার প্রবল আগ্রহ। একবার একটি দাসীকে মুক্তি দিলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এতে তুমি অনেক সাওয়াব অর্জন করেছো।[১৫]

শরীয়াতের আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে ভীষণ কঠোর ছিলেন। এ ব্যাপারে কোন রকম নমনীয়তা তাঁর মধ্যে ছিল না। একবার তাঁর এক নিকট-আত্মীয় দেখা করতে আসে। তার মুখ দিয়ে তখন মদের গন্ধ বের হচ্ছিল। তিনি লোকটিকে শক্ত ধমক দেন। তাকে আর কখনও তাঁর কাছে না আসার জন্য শক্তভাবে বলে দেন।[১৬]

হযরত মায়মূনার (রা) একজন দাসী একবার হযরত ইবন আব্বাসের (রা) বাড়ীতে যেয়ে দেখেন, তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর বিছানা বেশ দূরে দূরে। দাসী মনে করলেন সম্ভবতঃ মিয়া-বিবির মধ্যে কিছুটা তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন, না, তা নয়; বরং স্ত্রীর মাসিকের সময় ইবন আব্বাস (রা) পৃথক বিছানায় চলে যান। দাসী ফিরে এসে সব কথা উম্মুল মুমিনীন মায়মূনাকে (রা) জানিয়ে দিলেন। তিনি দাসীকে বললেন, যাও, তাকে বল, রাসূলুল্লাহর (সা) রীতি-পদ্ধতির প্রতি এত উপেক্ষা কেন? তিনি তো সব সময় আমাদের বিছানায় আরাম করতেন।[১৭]

একবার হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) খালা হযরত মায়মূনার (রা) সাথে দেখা করতে আসেন। তাঁর মাথার চুল ও দাড়ি অবিন্যস্ত দেখে খালা প্রশ্ন করেন, বেটা, তোমার এ অবস্থা কেন? ইবন আব্বাস বললেন, উম্মু 'আম্মারের বর্তমানে মাসিক অবস্থা চলছে। সেই আমার কেশ পরিপাটি করে থাকে। হযরত মায়মূনা বললেন, বাহ্, খুব ভালো! রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকতেন, কুরআন তিলাওয়াত করতেন, যখন আমরা সেই বিশেষ অবস্থায় থাকতাম। সে অবস্থায় মাদুর উঠিয়ে আমরা মসজিদে রেখে আসতাম। বেটা! হাতে কি কিছু থাকে?[১৮]

হযরত মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৪৬টি, মতান্তরে ৭৬টি। তার মধ্যে সাতটি মুত্তাফাক আলাইহি। একটি বুখারী ও পাঁচটি মুসলিম স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করেছেন। অন্যগুলি হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তাঁর থেকে বর্ণিত কিছু হাদীসের মাধ্যমে শরীয়াতের গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

হযরত মায়মূনার (রা) নিকট থেকে যাঁরা হাদীস শুনেছেন এবং বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন ঃ

---

১৪. প্রাগুক্ত-৮/১৪০

১৫. মুসনাদ-৬/৩৩২

১৬. তাবাকাত-৮/১৩৯; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৪৪

১৭. কানুযুল 'উম্মাল-৫/১৩৮; হায়াতুস সাহাবা-২/৬৯৭; আল-ইসাবা-৪/৪১২

১৮. মুসনাদ-৬/৩৩১

হযরত ইবন আব্বাস (রা), আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ ইবনুল হাদ, আবদুর রহমান ইবনুস সায়িব, ইয়াযীদ ইবন আসাম, (তাঁরা সবাই তাঁর বোনের ছেলে) 'উবায়দুল্লাহ আল-খাওলানী, নাদবা (দাসী), আতা ইবন ইয়াসার, সুলায়মান ইবন ইয়াসার, ইবরাহীম ইবন আবদুল্লাহ ইবন মা'বাদ ইবন 'আব্বাস, কুরাইব, 'উবায়দা ইবন সিবাক, 'উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উতবা, আলীয়া বিন্‌ত সুবায় প্রমুখ।[১৯]

হযরত মায়মূনার (রা) মৃত্যুসন নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য আছে। বিভিন্ন বর্ণনায় হিজরী ৫১, ৬১, ৬৩ ও ৬৬ সনের কথা এসেছে। তবে ইবন হাজারসহ অধিকাংশ সীরাত বিশেষজ্ঞ হিজরী ৫১ সনের মতটি সঠিক বলে মত প্রকাশ করেছেন।[২০] তাঁর জীবনের এটাও এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে, একদিন যে 'সারাফ' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করে প্রথম মিলিত হন, তার প্রায় ৪৪ বছর পর সেখানেই ইনতিকাল করেন। যে স্থানটিতে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বাসর করেন, ঠিক সেখানেই সমাহিত হন।[২১]

এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি হজ্জ আদায়ের জন্য মক্কায় যান। হজ্জ শেষে সেখানেই ইনতিকাল করেন। হযরত ইবন আব্বাসের (রা) নির্দেশে মরদেহ কাঁধে করে 'সারাফে' আনা হয় এবং সেখানে দাফন করা হয়।[২২]

হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) জানাযার নামায পড়ান। ইবন 'আব্বাস (রা), আবদুর রহমান ইবন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ, আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ ইবনুল হাদ, আবদুল্লাহ ইবনুল খাওলানী ও ইয়াযীদ ইবনুল আসাম্ম লাশ কবরে নামান। যখন লাশটি খাটিয়ায় করে উঠানো হয় তখন হযরত ইবন আব্বাস (রা) লোকদের বলেন, 'সাবধান! রাসূলুল্লাহর (সা) বেগম। বেশী ঝাঁকি দিবে না। আদবের সাথে নিয়ে চলো। কারণ, তিনি তোমাদের মা।'[২৩]

---

১৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৩৯
২০. প্রাগুক্ত-২/২৪৫; আল-ইসাবা-৪/৪১৩
২১. মুসনাদ-৬/৩৩৩; বুখারী-২/৬১১
২২. তাবাকাত-৮/১৪০; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৪৫
২৩. তাবাকাত-৮/১৪০; আনসাবুল আশরাফ-১/৪৪৭।

# সাফিয়্যা বিন্‌ত হুয়ায় ইবন আখতাব (রা)

উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়্যা বিন্‌ত হুয়ায় ইবন আখতাব ছিলেন লাবী ইবন ইয়াকুব-এর বংশধারায় হযরত হারূন ইবন 'ইমরান আলাইহিস সালামের বংশধর। এ কারণে তাঁকে সাফিয়্যা বিন্‌ত হুয়ায় ইসরাঈলিয়্যা বলা হয়। তাঁর পিতা হুয়ায় ইবন আখতাব মদীনার বিখ্যাত ইহুদী গোত্র বনু নাদীরের এবং মাতা 'বার্‌রা' বিন্‌ত সামাওয়াল ইহুদী গোত্র বনু কুরাইজার সন্তান।[১]

মূলতঃ হযরত সাফিয়্যার (রা) আসল নাম যায়নাব। যেহেতু তিনি খায়বার যুদ্ধের গনীমাতের মাল হিসেবে মুসলমানদের অধিকারে আসেন এবং বণ্টনের সময় রাসূলুল্লাহর (সা) ভাগে পড়েন, আর তৎকালীন আরবে নেতা অথবা বাদশার অংশের গনীমাতের মালকে 'সাফিয়্যা' বলা হতো, তাই যায়নাবও সেখান থেকে 'সাফিয়্যা' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যান এবং তাঁর আসল নামটি হারিয়ে যায়। *'সিয়ারুস সাহাবিয়াত'* গ্রন্থকার যুরকানীর সূত্রে একথা বলেছেন।[২]

হযরত সাফিয়্যার (রা) পিতা ও নানা উভয়ে নিজ নিজ খান্দানের অতি সম্মানীয় নেতা ছিলেন। অতি প্রাচীনকাল থেকে আরবের উত্তরাঞ্চলে বসবাসরত ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁদের দুইটি খান্দান– বনু কুরাইজা ও বনু নাদীর অন্যসব আরবীয় ইহুদী খান্দানের চেয়ে বেশী সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী বলে গণ্য হতো। তাঁর পিতা হুয়ায় ইবন আখতাবকে সীমাহীন সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হতো। গোত্রের প্রতিটি সদস্য তাঁর হুকুম ও নেতৃত্ব বিনা প্রশ্নে মেনে নিত। নানা সামাওয়াল গোটা আরব উপদ্বীপে বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। মোটকথা, হযরত সাফিয়্যা (রা) পিতৃ ও মাতৃকূলের দিক দিয়ে দারুণ কৌলিন্যের অধিকারিণী ছিলেন।[৩]

## বিয়ে

বনু কুরাইজার সালাম ইবন মাশ্‌কাম ছিলেন একজন বিখ্যাত কবি ও নেতা। তাঁর সাথে হযরত সাফিয়্যার (রা) প্রথম বিয়ে হয়। এ বিয়ে টেকেনি। ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর হিজাযের বিখ্যাত সওদাগর ও খায়বারের অন্যতম নেতা আবু রাফে'-এর ভাতিজা কিনানা ইবন আবিল হুকাইক-এর সাথে দ্বিতীয় বিয়ে হয়। সম্মান ও প্রতিপত্তির দিক দিয়ে কিনানা সালামের চেয়ে কোন অংশে কম ছিলেন না। তিনি খায়বারের অতি প্রসিদ্ধ দুর্গ 'আল-কামূসে'র নেতা এবং বড় কবি ছিলেন।[৪] পরিবার-পরিজনসহ এই দুর্গেই বসবাস করতেন। এক প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে খায়বার যখন মুসলমানদের অধিকারে আসে এবং

---

১. তাবাকাত-৮/১২৪; আল-ইসতী'য়াব (আল-ইসাবার পার্শ্বটীকা) ৪/৩৪৬
২. সিয়ারুস সাহাবিয়াত-৮১
৩. সাহাবিয়াত-১০২
৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নু'বালা-২/২৩১

'আল-কামূস' দুর্গের পতন ঘটে তখন দুর্গের অভ্যন্তরেই হযরত সাফিয়্যার (রা) স্বামী কিনানা নিহত হন এবং সাফিয়্যাসহ তাঁর পরিবারের অন্যসব সদস্য মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। তাঁদের মধ্যে সাফিয়্যার (রা) দুইজন চাচাতো বোনও ছিলেন। ইবন ইসহাক বলেছেন, সাফিয়্যা (রা) ছিলেন কিনানার তরুণী স্ত্রী। মাত্র কিছুদিন আগেই তাঁদের বিয়ে হয়েছিল।[৫]

এ যুদ্ধ খায়বারের ইহুদীদের জন্য এত বিপর্যয়কর ছিল যে, তাদের সকল আশা-ভরসা কর্পুরের মত উড়ে যায় এবং ভবিষ্যতে তারা মাথা তুলে দাঁড়াবার সকল যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। এ যুদ্ধে তাদের সকল নামী-দামী-নেতা নিহত হয়। নিহতদের মধ্যে হযরত সাফিয়্যার (রা) পিতা ও ভাইও ছিলেন। এ কারণে তিনি সকল যুদ্ধ বন্দীর মধ্যে অধিকতর দয়া ও অনুগ্রহ লাভের যোগ্য ছিলেন।

নিয়ম অনুযায়ী যখন 'মালে গনীমাত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও দাস-দাসী) মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টনের প্রস্তুতি চললো এবং এ উদ্দেশ্যে সকল বন্দীকে একত্র করা হলো, তখন দাহইয়াতুল কালবী রাসূলুল্লাহকে (সা) তাঁর একটি দাসীর প্রয়োজনের কথা জানালেন। রাসূল (সা) তাঁকে বন্দী মেয়েদের মধ্য থেকে পসন্দ করার অনুমতি দিলেন। দাহইয়া (রা) সাফিয়্যাকে (রা) পছন্দ করলেন। যেহেতু মান-মর্যাদার দিক দিয়ে হযরত সাফিয়্যা (রা) দাহইয়ার (রা) চেয়েও উঁচু স্তরের ছিলেন, এ কারণে সাহাবীদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ 'সাফিয়্যা (রা) বনু নাদীর ও বনু কুরাইজার নেত্রী। সে আপনারই উপযুক্ত।' রাসূল (সা) এ পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং সাফিয়্যাসহ দাহইয়া কালবীকে ডেকে আনালেন। তিনি দাহইয়াকে অন্য একটি দাসী পছন্দ করতে বলে সাফিয়্যাকে (রা) নিজের কাছে রেখে দিলেন। পরে তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে বিয়ে করেন।[৬] সহীহ বুখারীতে এসেছে দাসত্ব থেকে মুক্তিই তাঁর মোহর ধার্য হয়।

[৭] عِتْقُهَا صَدَاقُهَا -

ইমাম শাফি'ঈ 'কিতাবুল উম্ম' গ্রন্থে আল-ওয়াকিদীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) দাহইয়া কালবীকে সাফিয়্যার (রা) পরিবর্তে তাঁর স্বামী কিনানার বোনকে দান করেন। ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা) তাঁকে সাফিয়্যার (রা) চাচাতো বোনকে দান করেন। সহীহ মুসলিমে এসেছে, রাসূল (সা) সাতজন বন্দীর বিনিময়ে দাহইয়ার নিকট থেকে সাফিয়্যাকে (রা) খরীদ করেন।[৮] আল্লামা যুরকানী বলেন, খরীদ

---

৫. আসাহ আস-সিয়ার-২৩৭

৬. উসুদুল গাবা-৫/৪৯০; মুসলিম-১/৫৪৬

৭. বুখারী-৭/৩৬০, বাবু গুযওয়াতু খায়বার; ৯/১১১-আন-নিকাহ : বাবু মান জা'আলা 'ইতকাল আমাতি সুদাকাহা; ৯/২০৫-বাবুল ওয়ালীমা; মুসলিম-(১৩৬৫, ৮৫) আন-নিকাহ; আবু দাউদ-(২০৫৪); তিরমিযী-(১১১৫); নাসা'ঈ-৬/১১৪

৮. তাবাকাত-৮/১২২; মুসলিম (১৩৬৫), (৮৭)-আন-নিকাহ; আবু দাউদ-(২৯৯৭)-আল-খারাজ ওয়া আল-ইমারাহ্

করা কথাটি আসল অর্থে নয়।[৯]

এ হিজরী ৭ম সনের ঘটনা। বুখারীর একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সা) খায়বার অভিযান শেষ করে মদীনায় ফেরার পথে 'সাহ্‌বা' নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করেন। সেখানে হযরত আনাসের (রা) মা হযরত উম্মু সুলাইম (রা) সাফিয়্যার (রা) মাথায় চিরুনী করেন, কাপড় পাল্টান এবং তাঁর দেহে সুগন্ধি লাগান। তারপর তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে পাঠান। সেখানে বাসর হয় এবং সেখানে ওলীমাও হয়। কেউ খেজুর, কেউ চর্বি, কেউ হাইস অর্থাৎ যার কাছে খাবার যা কিছু ছিল নিয়ে এলো। সব যখন একত্র হলো তখন সবাই এক সাথে বসে আহার করেন। মূলতঃ এটাই ছিল ওলীমা। এই ওলীমার কথা সহীহাইনে হযরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে।[১০] এই 'সাহ্‌বা'তে রাসূল (সা) সাফিয়্যার (রা) সাথে তিন দিন কাটান। প্রথম বাসর রাতে হযরত আবু আইউব আল-আনসারী (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) অজান্তে কোষমুক্ত তরবারি হাতে সারা রাত রাসূলুল্লাহর (সা) তাঁবুর দরজায় পাহারা দেন। সকালে রাসূল (সা) তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলেন, এই মহিলার পিতা, স্বামী, ভাইসহ সকল নিকটআত্মীয় নিহত হয়েছে। তাই আমার আশঙ্কা হচ্ছিল, কোন খারাপ কিছু করে না বসে। তাঁর কথা শুনে রাসূল (সা) একটু হেসে দেন এবং তাঁর জন্য দু'আ করেন।[১১]

'সাহ্‌বা' থেকে যখন সাফিয়্যাকে (রা) নিজের উটের উপর বসিয়ে যাত্রা করেন তখন লোকেরা বুঝতে পারছিল না যে, রাসূল (সা) তাঁকে বেগমের মর্যাদা দান করেছেন, না দাসী হিসেবে নিজের মালিকানায় রেখেছেন। রাসূল (সা) মানুষের এ মনোভাব বুঝতে পেরে একটি পর্দা টানিয়ে সাফিয়্যাকে (রা) মানুষের দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে যান। মূলতঃ এ পর্দা দ্বারা একথা জানিয়ে দেন যে, সাফিয়্যা (রা) দাসী নন; বরং তিনি পবিত্র বেগমের মর্যাদা লাভ করেছেন।[১২] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূল (সা) স্বীয় 'আবা' দ্বারা পর্দা করেন। 'সাহবা' থেকে চলার পথে রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাফিয়্যার (রা) বাহন উটটি হোঁচট খায়। তাতে পিঠের আরোহীদ্বয় ছিটকে পড়ে যান। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে অক্ষত রাখেন। পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে হযরত আবু তালহা (রা) তাঁর বাহনের পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে ছুটে যেয়ে বলেন ঃ ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ! আপনি কষ্ট পেয়েছেন কি? তিনি জবাব দেন ঃ 'না। তুমি মহিলাকে দেখ।' সাথে সাথে আবু তালহা কাপড় দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে দিয়ে হযরত সাফিয়্যার (রা) দিকে এগিয়ে যান এবং তাঁর উপর একখানি কাপড় ছুড়ে দেন। সাফিয়্যা (রা) উঠে দাঁড়ান। আবু তালহা নিজের উটটি প্রস্তুত করেন এবং তার উপর রাসূল (সা) সাফিয়্যাকে (রা) নিয়ে আরোহন করেন।[১৩]

---

৯. আসাহ আস-সিয়ার-৬৪৬

১০. মুসলিম ঃ (১৩৬৫,৮৭); সিয়ারু আ'লাম আন-নু'বালা-২/২৩৫

১১. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৪৩; কানযুল 'উম্মাল-৭/১১৯; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৪০

১২. আল-বিদায়া-৪/১৯৬; তাবাকাত-৮/১২৩

১৩. বুখারী-৬/১৩৪; মুসলিম-(১৩৬৫,৮৭); সিয়ারু আ'লাম আন-নু'বালা-২/২৩৬

'সাহবা' থেকে যাত্রার সময় রাসূলুল্লাহর (সা) হাঁটুর উপর হযরত সাফিয়্যা (রা) পা রেখে উটের পিঠে আরোহন করেন।[১৪]

হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ সাফিয়্যাকে (রা) যখন রাসূলুল্লাহর (রা) তাঁবুতে ঢোকানো হলো, আমরা সেখানে উপস্থিত হলাম। রাসূল (সা) বললেন ঃ 'তোমরা তোমাদের মায়ের কাছ থেকে ওঠো।' সন্ধ্যায় আমরা আবার গেলাম। রাসূল (সা) আমাদের কাছে আসলেন। তখন তাঁর চাদরের মধ্যে দেড় 'মুদ' পরিমাণ 'আজওয়া' খেজুর ছিল। তিনি আমাদেরকে বললেন ঃ 'তোমরা তোমাদের মায়ের ওলীমা খাও।'[১৫]

মদীনা পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত সাফিয়্যাকে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত হারিস ইবন নু'মানের (রা) বাড়ীতে উঠালেন। হযরত হারিস (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) একজন জান-কোরবান সাহাবী। আল্লাহ তাঁকে অঢেল অর্থও দান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রয়োজনের কথাও সব সময় স্মরণ রাখতেন। প্রয়োজনের সময় দ্রুত এগিয়ে আসতেন। হযরত সাফিয়্যাকেও তিনি সানন্দে থাকার জন্য ঘর ছেড়ে দেন। উম্মু সিনান সালমিয়্যার বর্ণনা থেকে জানা যায়, হযরত সাফিয়্যার (রা) রূপ ও সৌন্দর্যের কথা শুনে আনসার মহিলাদের সাথে হযরত যায়নাব বিনত জাহাশ, হযরত হাফসা, হযরত 'আয়িশা ও হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) তাঁকে দেখতে এই ঘরে আসেন। 'আতা ইবন ইয়াসার বর্ণনা করেছেন, আনসার মেয়েদের সাথে হযরত 'আয়িশাও (রা) মুখে নিকাব টেনে সাফিয়্যাকে দেখতে আসেন। ফেরার সময় রাসূল (সা) তাঁর পিছনে পিছনে যান এবং প্রশ্ন করেন।

—আয়িশা! তাঁকে কেমন দেখলে?'

—আয়িশা (রা) বললেন ঃ দেখেছি, সে তো এক ইহুদী নারী। রাসূল (সা) বললেন ঃ এমন বলো না। সে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং একজন ভালো মুসলমান হয়েছে।[১৬]

উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়্যা (রা) ছিলেন খুবই দৃঢ় চিত্তের মহিলা। জীবনে কখনও অধৈর্য্য হয়েছেন এমন কথা জানা যায় না। আল-কামূস দুর্গের পতন ঘটলে এবং গোটা খায়বারে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হলে হযরত বিলাল (রা) সাফিয়্যা (রা) ও তাঁর চাচাতো বোনদের সংগে করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যেতে থাকেন। ইহুদীদের লাশের পাশ দিয়েই তাঁরা চলছিলেন। সাধারণতঃ এরূপ পরিস্থিতি খুবই মর্মস্পর্শী হয়। অত্যন্ত শক্ত মনের মানুষের অন্তরও কেঁপে ওঠে। এ কারণে তাঁর সাথের মহিলারা এ ভয়াবহ দৃশ্য দেখে চিৎকার দিয়ে ওঠে। তাঁরা মাথার চুল ছিঁড়ে মাতম করতে থাকে। কিন্তু হযরত সাফিয়্যার (রা) অবস্থা দেখুন। প্রিয় স্বামীর লাশের পাশ দিয়ে বন্দী অবস্থায় চলছেন, তিনি একটুও বিচলিত নন। কোন রকম ভাবান্তর নেই। দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি

---

১৪. আল-বিদায়া-৪/১৯৬

১৫. মুসনাদ-৩/৩৩৩; তাবাকাত-৮/১২৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নু'বালা-২/২৩৬

১৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নু'বালা-২/২৩৭, তাবাকাত-৮/১২৫, ১২৬

হেঁটে চলেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) পরে এভাবে তাঁদের বাপ-ভায়ের লাশের পাশ দিয়ে আনার জন্য বিলালকে (রা) তিরস্কার করেন।[১৭]

রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি হযরত সাফিয়্যার ছিল অন্তহীন ভালোবাসা। রাসূল (সা) যখন হযরত 'আয়িশার (রা) গৃহে অন্তিম রোগশয্যায় তখন একদিন সাফিয়্যা (রা) সহ অন্য বিবিগণ স্বামীকে দেখতে ও সেবা করতে একত্র হয়েছেন। হযরত সাফিয়্যা (রা) এক সময় অত্যন্ত ব্যথা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললেন ঃ 'হে আল্লাহর নবী! আপনার এইসব কষ্ট যদি আমিই ভোগ করতাম, খুশী হতাম।' তাঁর এমন কথা শুনে অন্য বিবিগণ একে অপরের দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগলেন যেন, তাঁর কথায় তাঁরা সন্দেহ করছেন। তখন রাসূল (সা) বললেন, 'আল্লাহর কসম! সে সত্য বলেছে।'[১৮]

হযরত সাফিয়্যার (রা) প্রতি হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ভালোবাসার অবস্থা ঠিক একই রকম ছিল। সাফিয়্যার (রা) সঙ্গ তিনি পছন্দ করতেন এবং সব সময় তাঁকে খুশী রাখার চেষ্টা করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সাফিয়্যাসহ অন্য বেগমগণকে সংগে নিয়ে হজ্জের সফরে বের হয়েছেন। পথিমধ্যে সাফিয়্যার (রা) বাহন উটটি অসুস্থ হয়ে বসে পড়ে। সাফিয়্যা (রা) ভয় পেয়ে যান এবং কান্না শুরু করে দেন। খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) আসেন এবং নিজের পবিত্র হাতে তাঁর চোখের পানি মুছে দেন। কিন্তু এতেও তাঁর কান্না না থেমে আরও বেড়ে যায়। উপায়ান্তর না দেখে রাসূল (সা) সকলকে নিয়ে সেখানে যাত্রাবিরতি করেন। সন্ধ্যার সময় রাসূল (সা) স্ত্রী হযরত যায়নাব বিন্ত জাহাশকে (রা) বলেন, 'যায়নাব, তুমি সাফিয়্যাকে একটি উট দিয়ে দাও।' হযরত যায়নাব (রা) বললেন, 'আমি উট দিব আপনার এই ইহুদী মহিলাকে?' তাঁর এমন প্রত্যুত্তরে রাসূল (সা) ভীষণ নাখোশ হন এবং দুই অথবা তিন মাস যাবত হযরত যায়নাবের (রা) সাথে কথা বলা এবং কাছে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন। অবশেষে হযরত 'আয়িশার (রা) মধ্যস্থতায় অতি কষ্টে রাসূলুল্লাহর (সা) এ অসন্তুষ্টি তিনি দূর করান।[১৯]

আর একবার হযরত 'আয়িশা (রা) হযরত সাফিয়্যার (রা) দৈহিক গঠন সম্পর্কে একটি মন্তব্য করলে রাসূল (সা) বলেন, তুমি এমন একটি কথা বলেছো, যদি তা সাগরেও ছেড়ে দেওয়া হয়, তাতে মিশে যাবে। অর্থাৎ সাগরের পানিও ঘোলা করে ফেলবে।[২০]

ইসলাম গ্রহণ করে পবিত্র হওয়ার পর তাঁকে কেউ ইহুদী বলে কটাক্ষ করলে তিনি ভীষণ কষ্ট পেতেন। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ঘরে গিয়ে দেখেন, তিনি কাঁদছেন। কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলে বলেন, 'আয়িশা (রা) ও যায়নাব (রা) দাবী করে যে, তাঁরা অন্য বেগমগণের চেয়ে উত্তম। কারণ, তাঁরা আপনার বেগম হওয়া ছাড়াও চাচাতো বোন।'

---

১৭. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৩৬; উসুদুল গাবা-৫/৪৯০

১৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নু'বালা-২/২৩৫; আল-ইসাবা-৪/৩৪৬

১৯. মুসনাদ-৬/৩৩৭, ৩৩৮; তাবাকাত-৮/১২৬, ১২৭; উসুদুল গাবা-৫/৪৯২

২০. আবু দাউদ-২/১৯৩

রাসূল (সা) তাঁকে খুশী করার জন্য বলেন, তুমি তাদেরকে একথা কেন বললে না যে, আমার বাবা হারূন (আ), আমার চাচা মূসা (আ) এবং আমার স্বামী মুহাম্মাদ (সা)। এ কারণে তোমরা আমার চেয়ে ভালো হতে পার কিভাবে।'[২১]

হযরত সাফিয়্যা (রা) স্বভাবগতভাবেই ছিলেন অত্যন্ত উদার ও দানশীল। ইবন সা'দ লিখেছেন, যে ঘরখানিতে তিনি বসবাস করতেন জীবদ্দশায় তা দান করে গিয়েছিলেন। আল্লামা যুরকানীর বর্ণনায় জানা যায়, উম্মুল মুমিনীন হিসেবে মদীনায় আসার পর তিনি নিজের কানের সোনার দুইটি দুল হযরত ফাতিমা (রা) ও অন্য আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের মধ্যে ভাগ করে দেন।[২২]

হিজরী দশ সনে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে হযরত সাফিয়্যা হজ্জ করেন। এ ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) বিদায় হজ্জ।

হিজরী ৩৫ সনে বিদ্রোহীরা তৃতীয় খলীফা হযরত 'উসমানকে (রা) মদীনায় তাঁর গৃহে অবরুদ্ধ করে রাখে। সে সময় হযরত সাফিয়্যা (রা) খলীফার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। বিদ্রোহীরা যখন খলীফার গৃহে বাইরের সকল সরবরাহ ও যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়, তাঁর গৃহের চতুর্দিকে পাহারা বসায়, তখন একদিন হযরত সাফিয়্যা (রা) খচ্চরের উপর চড়ে খলীফার গৃহের দিকে যেতে থাকেন। সংগে দাস ছিল। তিনি আশতার নাখ'ঈর দৃষ্টিতে পড়ে যান। আশতার তাঁর চলায় বাধা দিয়ে খচ্চরটিকে মারতে শুরু করে। হযরত সাফিয়্যা (রা) বললেন, আমার লাঞ্ছিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি ফিরে যাচ্ছি। তুমি আমার গাধা ছেড়ে দাও। এভাবে গৃহে ফিরে এসে হযরত ইমাম হাসানকে (আ) খলীফার গৃহের সাথে যোগাযোগের দায়িত্বে নিয়োগ করেন। তিনি উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যার (রা) গৃহ থেকে খাবার ও পানি খলীফার বাসগৃহে পৌঁছে দিতেন।[২৩]
খলীফা উমার (রা) যখন ভাতার প্রচলন করেন তখন রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য বেগমদের প্রত্যেকের জন্য বারো হাজার নির্ধারণ করলেও হযরত জুওয়াইরিয়া ও হযরত সাফিয়্যার (রা) জন্য ছয় হাজার নির্ধারণ করেন। কারণ তাঁদের জীবনের একাংশ দাসত্বে কেটেছে। কিন্তু তাঁরা প্রতিবাদ করায় বারো হাজার নির্ধারণ করা হয়।[২৪]

---

২১. আল-ইসতী'য়াব-৪/৩৪৬; তিরমিযী-(৩৮৯২)-আল-মানাকিব; আল-মুসতাদরিক-৪/২৯
হাদীসটির ভাব ও বিষয়ের ব্যাপারে কারও কোন দ্বিমত নেই। হতে পারে রাসূল (সা) এমন কথা বলেছিলেন। ইবন সা'দ, ইবন হাজার প্রমুখ সীরাত বিশেষজ্ঞ তাঁদের রচনাবলীতে এ হাদীসটি সংকলন করেছেন। তবে হাদীসটির সনদের ব্যাপারে ইমাম তিরমিযীর মত হলো ঃ
–এ একটি 'গারীব' হাদীস। একমাত্র হাশিম কূফী ছাড়া আর কারও মাধ্যমে হাদীসটি আমরা পাই না। আর সনদটি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।
এই হাশিম সূফী সম্পর্কে মুহাদ্দিসদের ধারণা তেমন ভালো না।
কিন্তু ইমাম আহমাদ ও ইমাম তিরমিযী ভিন্ন সনদে হযরত আনাস থেকে একই মর্মের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ সনদ সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য। (মুসনাদ-৩/১৩৫, ১৩৬; তিরমিযী-৩৮৯৪)
২২. তাবাকাত-৮/১২৭; শারহুল মাওয়াহিব-৩/২৯৬
২৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৩৭; আল-ইসাবা-৪/৩৪৭; তাবাকাত-৮/১২৯
২৪. হায়াতুস সাহাবা-২/২১৬, ২১৮

সকল সীরাত বিশেষজ্ঞ হযরত সাফিয়্যার (রা) নৈতিক গুণাবলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। আল্লামা ইবন 'আবদিল বার লিখেছেন ঃ

كانت صفية حليمة عاقلة فاضلةً ـ

—'সাফিয়্যা (রা) ছিলেন ধৈর্য্যশীলা, বুদ্ধিমতি ও বিদূষী নারী।'[২৫]

ইবনুল আসীর বলেছেন ঃ

كانت عاقلة من عقلاء النساء ـ

—'তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমতি মহিলা।'[২৬]

আল্লামা জাহাবী বলেছেন ঃ

كانت شريفة عاقلة ، ذات حسب وجمال ودين، رضى الله عنه،

—'হযরত সাফিয়্যা (রা) ছিলেন ভদ্র, বুদ্ধিমতি, উঁচু বংশীয়া, রূপবতী ও দ্বীনদার মহিলা।'[২৭]

রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য বেগমগণের মত হযরত সাফিয়্যা (রা)ও ছিলেন ইলম ও মারিফাতের কেন্দ্র। প্রায়ই লোকেরা তার কাছে বিভিন্ন বিষয় প্রশ্ন করতো এবং তারা জবাব পেয়ে তুষ্ট হতো। সুহায়রা বিন্‌ত হায়কার নাম্নী এক মহিলা একবার হজ্জ আদায় করে হযরত সাফিয়্যার (রা) সাথে সাক্ষাৎ করতে মদীনায় আসেন। তিনি হযরত সাফিয়্যার (রা) গৃহে যখন যান তখন দেখতে পান, সেখানে কূফার বহু মহিলা বসে আছেন এবং তাঁকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করছেন। আর তিনি খুব সুন্দরভাবে তাঁদের জবাব দিচ্ছেন।

সুহায়রাও একই উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। তিনি কূফার মহিলাদের মাধ্যমে 'নাবীজ'-এর হুকুম সম্পর্কে জানতে চান। প্রশ্নটি শুনে হযরত সাফিয়্যা (রা) বলেন, ইরাকীরা এই মাসয়ালাটি প্রায় জিজ্ঞেস করে থাকে।[২৮]

হযরত সাফিয়্যা (রা) থেকে দশটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেগুলি ইমাম যায়নুল আবেদীন, ইসহাক ইবন 'আবদিল্লাহ্ ইবন হারিস, মুসলিম ইবন সাফওয়ান, কিনানা, ইয়াযীদ ইবন মু'আত্তাব প্রমুখ ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। দশটির মধ্যে একটি হাদীস মুত্তাফাক আলাইহি।[২৯]

হিজরী ৫০ সনের রমজান মাসে ৬০ বছর বয়সে হযরত সাফিয়্যা (রা) মদীনায় ইনতিকাল করেন। হযরত সা'ঈদ ইবনুল 'আস (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। মতান্তরে হযরত মু'আবিয়া (রা) নামায পড়ান, তখন তিনি হজ্জ আদায় করে মদীনায়

---

২৫. আল-ইসতীয়াব-৪/৩৪৮
২৬. উসুদুল গাবা-৫/৪৯০
২৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৩২
২৮. মুসনাদ-৩/৩৩৭
২৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৩৮; আল-ইসাবা-৪/৩৪৭

ছিলেন।[৩০] আল-বাকী গোরস্থানে দাফন করা হয়।[৩১] মৃত্যুর পূর্বে অসীয়াত করে যান যে, আমার পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পদের এক তৃতীয়াংশ পাবে আমার ভাগ্নে।[৩২]

ইবন সা'দ আল-ওয়াকিদীর সূত্রে লিখেছেন, তিনি এক লাখ দিরহাম রেখে যান। ইবন হিশাম তিরিশ হাজারের কথা বলেছেন। হযরত সাফিয়্যার (রা) ভাগ্নে ছিল ইহুদী। এ কারণে লোকেরা তাঁর অসীয়াত বাস্তবায়নের ব্যাপারে দ্বিধা-সংকোচ করতে থাকে। কিন্তু হযরত 'আয়িশার (রা) কানে কথাটি গেলে তিনি লোক মারফত বলে পাঠান 'লোকেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা সাফিয়্যার (রা) অসীয়াত বাস্তবায়ন কর।' অবশেষে তা বাস্তবায়িত হয়।[৩৩]

ইবন সা'দ আল-ওয়াকিদীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত সাফিয়্যা বলেছেন ঃ যখন আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আসি তখন আমার বয়স সতেরো বছর পূর্ণ হয়নি।[৩৪] আল ওয়াকিদী আরও বলেছেন, তিনি হিজরী ৫২ সনে ইনতিকাল করেন। তাঁর অপর একটি বর্ণনায় হিজরী ৫০ সনের কথা এসেছে। ইবন হাজার ৫০ সনের বর্ণনাটিই অধিকতর সঠিক বলে মনে করেছেন। ইবন মুন্দাহ্ ও ইবন হিব্বান হিজরী ৩৬ সনে তাঁর মৃত্যুর কথা বলেছেন। কিন্তু ইবন হাজার বলেছেন, এ সম্পূর্ণ ভুল। কারণ হিজরী ৩৬ সনে 'আলী ইবন হুসাইনের (রা) জন্মই হয়নি। অথচ বুখারী ও মুসলিমে হযরত সাফিয়্যা (রা) থেকে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।[৩৫]

হযরত সাফিয়্যা (রা) খুব সুন্দর খাবার তৈরী করতে পারতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন অন্য বেগমদের ঘরে অবস্থান করতেন, তখনও মাঝে মাঝে খাবার তৈরী করে পাঠাতেন। হযরত 'আয়িশার (রা) ঘরে রাসূলুল্লাহর (সা) অবস্থানের সময় একবার তিনি খাবার পাঠিয়েছিলেন, তার বর্ণনা বুখারী, নাসাঈসহ বিভিন্ন গ্রন্থে এসেছে।

একবার হযরত সাফিয়্যা (রা) বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ছাড়া আপনার অন্য সব বেগমদেরই আত্মীয় স্বজন আছে। আপনার যদি কোন কিছু হয়ে যায়, আমি কোথায় আশ্রয় নিব? রাসূল (সা) বলেন, 'আলীর (সা) নিকট।[৩৬]

উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়্যা (রা) বর্ণনা করেছেন। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) রমজানের শেষ দশদিনের ই'তিকাফে মসজিদে অবস্থান করছেন। সে সময় একদিন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করতে মসজিদে যান। কিছুক্ষণ রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে

---

৩০. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৪৪
৩১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৩৮
৩২. যুরকানী-৩/২৯৬; সাহাবিয়াত-১০৫
৩৩. তাবাকাত-৮/১২৮
৩৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৩৭; তাবাকাত-৮/১২৯
৩৫. ফাতহুল বারী-৪/২৪০
৩৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৩৪। ইমাম যাজ-জাহাবী হাদীসটি 'গারীব' বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী 'আত-তারীখ আল-কাবীর' (৭/৩১১) গ্রন্থে এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী 'মালিক' সম্পর্কে বলেছেন, তিনি একজন অখ্যাত ব্যক্তি। এ হাদীস ছাড়া অন্য কোথাও তাঁর নাম পাওয়া যায় না।

কথা বলার পর ঘরে ফেরার জন্য উঠে দাঁড়ান। রাসূল (সা) উম্মু সালামার দরজার কাছে মসজিদের দরজা পর্যন্ত তাঁর সাথে আসেন। তখন সেই পথে আনসারদের দুই ব্যক্তি যাচ্ছিল। তাঁরা রাসূলুল্লাহকে (সা) সালাম করলো। রাসূল (সা) তাঁদের দুইজনকে বললেন ঃ তোমরা একটু থাম, এ হচ্ছে সাফিয়্যা বিন্‌ত হুয়ায়। এ কথা শুনে তারা–সুবহানাল্লাহ পাঠ করলো, ও তাকবীর ধ্বনি দিল। অতঃপর নবী (সা) বললেন ঃ শয়তান আদম সন্তানের রক্ত চলাচলের প্রতিটি শিরা উপশিরায় পৌছতে পারে। আমি শঙ্কিত হয়েছিলাম, সে তোমাদের দুইজনের অন্তরে খারাপ কিছু ঢুকিয়ে না দেয়।[৩৭]
হযরত সাফিয়্যার (রা) এক দাসী একবার খলীফা হযরত 'উমারের (রা) নিকট অভিযোগ করলেন যে, এখনও তাঁর মধ্যে ইহুদী-ভাব বিদ্যমান। কারণ, তিনি এখনও শনিবারকে মানেন এবং ইহুদীদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখেন। দাসীর কথার সত্যতা যাচায়ের জন্য হযরত 'উমার (রা) লোক মারফত হযরত সাফিয়্যাকে (রা) অভিযোগের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। তিনি জবাব দেন, 'যখন থেকে আল্লাহ আমাকে শনিবারের পরিবর্তে জুমআকে দান করেছেন, তখন থেকে শনিবারকে মানার কোন প্রয়োজন নেই। আর ইহুদীদের সাথে আমার সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, সেখানে আমার আত্মীয়-স্বজন আছে। তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার দিকে আমার দৃষ্টি রাখতে হয়।' তারপর তিনি দাসীকে ডেকে জানতে চান, এ অভিযোগ করতে কে তোমাকে উৎসাহিত করেছে? দাসী বললেন, শয়তান। হযরত সাফিয়্যা (রা) চুপ হয়ে যান এবং দাসীকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেন।[৩৮]

রাসূলুল্লাহর সাথে বিয়ের পূর্বে হযরত সাফিয়্যা এক রাতে স্বপ্ন দেখেন যে, আকাশের চাঁদ ছুটে এসে তাঁর কোলে পড়ছে। স্বপ্নের কথা তাঁর মাকে মতান্তরে স্বামীকে বললে তিনি গালে এক থাপ্পড় মেরে বলেন, তুমি আরবের বাদশা মুহাম্মাদের দিকে ঘাড় লম্বা করছো। রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আসার সময় পর্যন্ত সেই থাপ্পড়ের দাগ তাঁর গালে ছিল। রাসূল (সা) কিসের দাগ জানতে চাইলে তিনি ঘটনাটি খুলে বলেন।[৩৯]

---

৩৭. মুসলিম (২১৭৫)-বাবুস সালাম।
৩৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৩৩; আল-ইসতীয়াব-৪/৩৪৮
৩৯. প্রাগুক্ত; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৩৬; আল-ইসাবা-৪/৩৪৭; হায়াতুস সাহাবা-২/৬৬৩

# গ্রন্থপঞ্জি


১. আল-ইমাম আজ-জাহাবী ঃ

(ক) সিয়ারু আ'লাম আন-নু'বালা, (বৈরুত, আল-মুওয়াস্সাতুর রিসালা, ৭ম সংস্করণ, ১৯৯০)

(খ) তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ, (বৈরুত, দারু ইহ্ইয়া আত-তুরাস আল-ইসলামী)

(গ) তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আ'লাম, (কায়রো, মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৬৭ হিঃ)

২. ইবন হাজার ঃ

(ক) তাহজীবুত তাহজীব, (হায়দ্রাবাদ, দায়িরাতুল মা'য়ারিফ, ১৩২৫ হিঃ)

(খ) তাকরীবুত তাহজীব, (লাখ্নৌ)

(গ) আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা, (বৈরুত, দার আল-ফিক্র, ১৯৭৮)

(ঘ) লিসানুল মীযান, (হায়দ্রাবাদ, ১৩৩১ হিঃ)

(ঙ) ফাতহুল বারী, (মিসর, ১৩১৯ হিঃ)

৩. ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী ঃ শাজারাতুজ জাহাব, (বৈরুত, আল-মাকতাব আত-তিজারী)

৪. জামাল উদ্দীন ইউসুফ আল-মুযী ঃ তাহজীব আল-কামাল ফী আসমা আর-রিজাল, (বৈরুত, মুওয়াসসাতুর রিসালা, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮)

৫. আবু ইউসুফ ঃ কিতাবুল খারাজ, (বৈরুত, দার আল-মা'রিফা, ১৯৭৯)

৬. ইবন কাসীর ঃ

(ক) আত-তাফসীর, (মিসর, দারু ইহইয়া আল-কুতুব আল-'আরাবিয়্যা)

(খ) আস-সীরাহ্ আন-নাবাবিয়্যাহ, (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা)

(গ) আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, (বৈরুত, মাকতাবাতুল মা'য়ারিফ)

৭. ইবনুল জাওযী ঃ

(ক) আ'লাম আল-মুওয়াক্কি'ঈন, (দিল্লী, আলরাফুল মাতাবি', ১৩১৩ হিঃ)

(খ) কিতাবুত তানবীহ ওয়াল ইশরাফ, (মিসর, মাতবা'য়াতুল হাসানিয়্যা ১২২৩ হিঃ)

(গ) কিতাবুল আজকিয়া, (সম্পাদনা ঃ আবদুর রহমান ইবন আলী, ১৩০৪ হিঃ)

(ঘ) সিফাতুস্ সাফওয়া, (হায়দ্রাবাদ, দায়িরাতুল মা'য়ারিফ, ১৩৫৭ হিঃ)

৮. ইবন সা'দ ঃ আত-তাবাকাত আল-কুবরা, (বৈরুত, দারু সাদির)

৯. ইবন আসাকির ঃ আত-তারীখ আল-কাবীর, (শাম, মাতবায়াতুশ শাম, ১৩২৯ হিঃ)

১০. ইয়াকূত আল-হামাবী ঃ মু'জামুল বুলদান, (বৈরুত, দারু ইহইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী)

১১. আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী ঃ কিতাবুল আগানী, (মিসর, ১৯২৯)

১২. ইবন হাযাম ঃ জামহারাতু আনসাবুল 'আরাব, (মক্কা, দারুল মা'আরিফ ১৯৬২)

১৩. ইবন খাল্লিকান ঃ ওফায়াতুল আ'য়ান, (মিসর, মাকতাবাতু আন-নাহ্দাতুল মিসরিয়্যা, ১৯৪৮)

১৪. মুহাম্মাদ আল-আলুসী ঃ বুলুগুল আরিব ফী মা'রিফাতি আহওয়ালিল 'আবাব, (১৩১৪ হিঃ)

১৫. ইবনুল আসীর ঃ

(ক) উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা, (বৈরুত, দারু ইহইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী)
(খ) আল-তামিল ফিত তারীখ, (রৈরুত)
(গ) তাজরীদু আসমা আস-সাহাবা, (হায়দ্রাবাদ, দায়িরাতুল মা'য়ারিফ, ১ম সংস্করণ, ১৩১৫)
১৬. আল-বালাজুরী ঃ
(ক) আনসাবুল আশরাফ, (মিসর, দারুল মা'য়ারিফ)
(খ) ফুতুহুল বুলদান, (মিসর, মাতবায়াতুল মাওসূয়াত, ১৯০১)
১৭. আয্-যিরিক্লী ঃ আল-আ'লাম, (বৈরুত, দারুল 'ইল্ম লিল মালাঈন, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৭৯)
১৮. ইবন হিশাম ঃ আস-সীরাহ্ (বৈরুত)
১৯. ইউসুফ আল-কান্ধালূবী ঃ হায়াতুস সাহাবা, (দিমাশ্ক, দারুল কালাম, ২য় সংস্করণ ১৯৮৩)
২০. সা'ঈদ আনসারী, মাওলানা ঃ সিয়ারে আনসার, (ভারত, ১৯৪৮)
২১. ইবন আবদিল বার ঃ আল-ইসতী'য়াব, ('আল-ইসাবা' গ্রন্থের পার্শ্ব টীকা)
২২. ইবন সাল্লাম আল-জামহী ঃ তাবাকাত আশ শু'য়ারা, (বৈরুত, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, ১৯৮০)
২৩. ইবন কুতায়বা ঃ আশ-শি'রু ওয়াশ শু'য়ারাউ, (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ, ১৯৮১)
২৪. ডঃ আবদুর রহমান আল-বাশা ঃ সুওয়ারুম মিন হায়াতুস সাহাবা, (সৌদি আরব, ১ম সংস্করণ)
২৫. খালিদ মুহাম্মদ খালিদ ঃ রিজালুন হাওয়ালার রাসূল, (বৈরুত, দারুল ফিক্র)
২৬. ডঃ শাওকী দাঈফ ঃ তারীখুল আদাব আল-আরাবী, (কায়রো, দারুল মা'য়ারিফ, ৭ম সংস্করণ)
২৭. ডঃ 'উমার ফাররূখ ঃ তারীখুল আদাব আল-আরাবী, (বৈরুত, দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৮৫)
২৮. জুরযী যায়দান ঃ তারীখু আদাবিল লুগাহ আল-আরাবিয়্যা, (বৈরুত, দারু মাকতাবাতুল হায়াত, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৮)
২৯. আহমাদ আবদুর রহমান আল বান্না ঃ বুলূগুল আমানী মিন আসরার আল-ফাতহির রাব্বানী, (কায়রো, দারুশ শিহাব)
৩০. 'আলাউদ্দীন 'আলী আল-মুত্তাকী ঃ কানযুল 'উম্মাল, (বৈরুত, মুওয়াস্সাসাতুর রিসালা, ৫ম সংস্করণ, ১৯৮৫)
৩১. ডঃ মুস্তাফা আস্-সিবা'ঈ ঃ আস্-সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরী' আল-ইসলামী, (বৈরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৬)
৩২. হাজী-খলীফা ঃ কাশফুজ জুনুন 'আন আসামী আল-কুতুব ওয়াল ফুনূন, (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯০)
৩৩. মুহাম্মদ আল-খাদারী বেক ঃ তারীখুল উমাম আল-ইসলামিয়া, (মিসর, আল-মাকতাবাতু তিজারিয়্যা আল-কুবরা, ১৯৬৯)

৩৪. মুহাম্মদ আলী আ-সাবুনী ঃ
(ক) রাওয়ায়ি 'উল কুরআন, তাফসীরু আয়াতিল আহকাম মিনাল কুরআন, (বৈরুত, মুওয়াস্‌সাসাতু মানাহিলিল 'ইরফান, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮১)
(খ) আত-তিবইয়ান ফী 'উলূমিল কুরআন, (বৈরুত)
৩৫. মুহিউদ্দীন ইবন শারফ আন-নাওবী ঃ তাহ্‌জীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, (মিসর, আত-তিবায়া' 'আল-মুগীরিয়্যা)
৩৬. ইমাম আহমাদ ঃ আল-মুসনাদ
৩৭. R.A.Nicholson : A Literary History of the Arabs, (Cambridge, University Press, 1969)
৩৮. পবিত্র কোরআনুল করীম ঃ অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।
৩৯. হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থ।
৪০. দায়িরা-ই-মা'য়ারিফই ইসলামিয়্যা (উর্দূ)
৪১. কুদামাহ ইবন জা'ফর ঃ নাকদুশ শি'র (বৈরুত)
৪২. ইবন রাশীক ঃ কিতাবুল 'উমদাহ, (কায়রো-১৯৩৪)
৪৩. আবু তাম্মাম ঃ আল-হামাসা, (বৈরুত)
৪৪. আল-বাকিল্লানী ঃ ই'জাযুল কুরআন, (বৈরুত-১৯৯১)
৪৫. আল-জুরজানী ঃ দালায়িলুল ই'জায, (কায়রো-১৯৭৬)
৪৬. বুতরুস আল-বুসতানী ঃ উদাবাউল আরাব ফিল জাহিলিয়্যাতি ওয়া সাদরিল ইসলাম (বৈরুত-১৯৮৯)
৪৭. 'আবদুর রউফ দানাপুরী ঃ আসাহ আস-সীরাহ (করাচী)
৪৮. সা'ঈদ আনসারী ঃ সিয়ারুস সাহবিয়াত, (ভারত, মাতবা'আ মা'আরিফ, আজম গড় ১৩৪১ হিঃ)
৪৯. নিয়ায ফতেহপুরী ঃ সাহাবিয়াত, (করাচী, নাফীস একাডেমী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬২)
৫০. আবদুস সালাম নাদবী ঃ উসওয়ায়ে সাহাবিয়াত, (ভারত, মাতবা'আ মা'আরিফ, আজমগড়, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৫৩)
৫১. যুরকানী ঃ শারহুল মাওয়াহিব, (কায়রো)
৫২. ইবন আবদি রাব্বিহি ঃ আল-ইকদুল ফারীদ, (কায়রো, লুজনাতুত তালীফ ওয়াত তারজামা, ১৯৬৮)
৫৩. শিবলী নু'মানী ঃ সীরাতুন নবী, (ভারত, মাতবা'আ মা'আরিফ, আজমগড়, ১২শ সংস্করণ, ১৯৭৮)
৫৪. ডঃ আবদুল কারীম যায়দান ঃ আল-মুফাস্‌সাল ফী আহকাম আল-মারয়াতি ওয়াল বায়ত ফিশ শারী'আ আল-ইসলামিয়্যা, (বৈরুত, মুওয়াস্‌সাসাতুর রিসালা, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৭)
৫৫. ডঃ আহমাদ আস-শালবী ঃ আত-তারীখ আল-ইসলামী, (কায়রো, ১৯৮২)।

বাংলাদেশ
ইসলামিক
সেন্টার

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা